শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৯৫
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯
পৌষ ১৪১০

ISBN-81-7522-361-8 (V.6)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক নব প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬ গ্রে স্ট্রীট। কলকাতা ৬

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

গীতাঞ্জলি

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
৩১ শ্রাবণ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্রনাথ
গীতাঞ্জলি-রচনাকালে
ফোটোগ্রাফ সুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে

গীতাঞ্জলি

১

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন-মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

১৩১৩

২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।

আমি কখনো-বা ভুলি, কখনো-বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে ;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে
যাও যে সরে ।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে ।

১৩১৩

৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ।
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই ।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে ।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর ;
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই ।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ।

১৩১৩

৪

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।

দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয় ।
আমার ভার লাঘব করি
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ।

১৩১৩

৫

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।
নির্মল করো উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে ।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে ।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে
অন্তর মম বিকশিত করো,
অন্তরতর হে ।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে ।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।

শিলাইদহ
২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল-সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৭

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে।
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে অমৃতময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে ;
এসো সকল-কর্ম-অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ?

৮

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে ;

আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা ।
ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে ।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে ।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি ।
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা ।

১৩১৩ ?

৯

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান ।
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই,
টান রে সবাই টান্ ।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি
যায় যদি যাক প্রাণ ।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান ।

কে ডাকে রে পিছন হতে,
কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ—
ভয় আছে সব জানা ।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে ;
পালের রশি ধরব কষি,
চলব গেয়ে গান ।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান ।

১৩১৫

১০

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার ।
জননী গো,গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার ।

চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার।

১৩১৫ ?

১১

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল
আলো-ঝলমল
বনগিরিপর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল-শিশির-ঢালা।

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।

গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।

রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।

শান্তিনিকেতন
৩ ভাদ্র ১৩১৫

১২

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন—
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া।

শান্তিনিকেতন
৩ ভাদ্র ১৩১৫

১৩

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা-চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩১৫

১৪

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণ রূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে ;
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণ রূপে।

১৩১৫

১৫

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া-মাঝে।

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

নয়নদুটি মেলিলে কবে
পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে
জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৬

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

তুমি যদি না দেখা দাও,
কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৭

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো ।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো ।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো ।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো ।

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান ।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান ।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান ।'

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি ।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি ।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি ।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে ।
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে ।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে ।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো ।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো ।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো ।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো ।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৮

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কূজনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৯

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় কয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে,
খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,

কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

শিলাইদহ
আষাঢ় ১৩১৬

২০

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

'পদ্মা' বোট
শ্রাবণ ১৩১৬

২১

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ-কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন।

কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষন ।

বোলপুর
১০ ভাদ্র ১৩১৬

২২

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি ।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী ।

মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই ।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে ;
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে ;
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি !

১০ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি

২৩

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না ।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না ।

বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বলো, আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না ।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না ।
জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না ।

নাহয় আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা

তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল,
চকিতে ফল ফলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।

বোলপুর
১১ ভাদ্র ১৩১৬। রাত্রি

২৪

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

১২ ভাদ্র ১৩১৬

২৫

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।

১২ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি

২৬

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের 'পরে
সেই ধ্বনিতে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ,
উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।

১৩ ভাদ্র ১৩১৬

২৭

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় একেবেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ওই ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।

১৪ ভাদ্র ১৩১৬

২৮

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

ধুলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে।
কৃপা নাই পাই,
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

আজি এ জগত-মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চলে গেল সবে আগে।

সাথি নাই পাই,
তোমায় চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

চারি দিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই নাই,
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

১৪ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি

২৯

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী—
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জান, মম মন তোমারে চায়।

ছাড়িতে পারি নি অহংকারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়—
তুমি জান, মন তোমারে চায়।

যা আছে আমার সকলই কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে।
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়,
মনে মনে মন তোমারে চায়।

১৫ ভাদ্র ১৩১৬

৩০

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরন।
এই-যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।

প্রভাত-আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩১

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎসভায়
এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন-মাঝে
লাগি নি নাথ, কোনো কাজে—
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ।

নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন্‌।
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে
বাজবে বীণা সোনার সুরে
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ো মোর মান।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩২

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।
পাশে থেকে চিনতে নারি,
কোন্‌ দিকে যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী
হৃদয়পানে হাসিয়া চাও।

বলো আমায় বলো কথা,
গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধরো।

যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে—
হাসি মিছে, কান্না মিছে,
সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৩

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে,
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখো
আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৪

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

ওগো পথিক, আজকে আমার
সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠছে কেঁপে কেঁপে
যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ—
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৫

এসো হে এসো, সজল ঘন,
বাদলবরিষনে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে।
এসো হে গিরিশিখর চুমি,
ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি—
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি
গভীর গরজনে।

ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন
নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
এসো হে এসো পিপাসা-হরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এসো মনে।

১৭ ভাদ্র ১৩১৬

৩৬

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

পাগল-করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই-বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,

প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরন গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।

বোলপুর
১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৭

নিশার স্বপন ছুটল রে, এই
ছুটল রে।
টুটল বাঁধন টুটল রে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে,
হৃদয়শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুটল রে, এই
ফুটল রে।

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণতলে লুটল রে।
আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই
উঠল রে।

১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৮

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়,
আনন্দগান গা রে।
নীল আকাশের নীরব কথা
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।

শস্যখেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে।

যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে।

শান্তিনিকেতন
১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৯

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া—
আজো কেবলই সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে ফুল, শুধু
বহেছে এক হাওয়া।
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধ'রে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

কলিকাতা
২৭ ভাদ্র ১৩১৬

৪০

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে
রইব কত আর।
আর পারি নে রাত জাগতে হে নাথ,
ভাবতে অনিবার।
আছি রাত্রিদিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার।

তাই তো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।

তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই রয় না তাও
ধুলায় একাকার।

কলিকাতা
১ আশ্বিন ১৩১৬

৪১

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।
দিনের কাজে ধুলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহংকার।

এখন তো কাজ সাঙ্গ হল
দিনের অবসানে,
হল রে তাঁর আসার সময়
আশা এল প্রাণে।
স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই যে আর।

১৯ আশ্বিন ১৩১৬

৪২

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর।
আজিকে এই আকাশতলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর।

কেমন খেলা হল আমার
আজি তোমার সনে ।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে ।
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর ।

শিলাইদহ
২৫ আশ্বিন ১৩১৬

৪৩

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি ।
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী ।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি ।

আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে ।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক-তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি ।

শিলাইদহ
২৭ আশ্বিন ১৩১৬

৪৪

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ।
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন ।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন ।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি ।

গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্নাহাসি ।
এখন সময় হয়েছে কি ।
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
এ মোর নিবেদন ।

শিলাইদহ
৩০ আশ্বিন ১৩১৬

৪৫

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো ।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো ।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক -পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো ।

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ ।
তোমার আলো পাখির বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান ।
তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত
বুলালো বুলালো ।

বোলপুর
২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬

৪৬

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব ।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব ।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ।

আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে ।

প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইব না তো রইব চেয়ে ;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লব ।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ।

শান্তিনিকেতন
১০ পৌষ ১৩১৬

৪৭

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী ।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি ।

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে ।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি ।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩১৬

৪৮

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল ।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল ।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে,
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল ।

আকাশেতে ঢেউ দিয়ে রে
বাতাস বহে যায় ।

চার দিকে গান বেজে ওঠে,
চার দিকে প্রাণ নাচে ছোটে,
গগনভরা পরশখানি
লাগে সকল গায়।
ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে,
ফিরে ফিরে আমায় ঘিরে
বাতাস বহে যায়।

দশ দিকেতে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।
রয়েছে জীব যে যেখানে
সকলকে সে ডেকে আনে,
সবার হাতে সবার পাতে
অন্ন সে দেয় বাঁটি।
ভরেছে মন গীতে গন্ধে,
বসে আছি মহানন্দে,
আমায় ঘিরে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।

আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক অপরাধ।
ললাটেতে রাখো আমার
পিতার আশীর্বাদ।
বাতাস, তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ,
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্বাদ।
মাটি, তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্ব সাধ।
গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো
পিতার আশীর্বাদ।

পৌষ ১৩১৬

৪৯

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই,
মনের মতো করে।
গান গেয়ে আনন্দমনে
ঝাঁটিয়ে দে সব ধুলা।

যত্ন করে দূর করে দে
আবর্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ
সাজিখানি ভরে—
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই,
মনের মতো করে।

দিনরজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
সকালবেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে
নয়ন মেলে চাই,
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে
দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।
সকালবেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।

একলা তিনি বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অন্য কোথাও
চলি কাজের তরে,
দ্বারের কাছে তিনি মোদের
এগিয়ে দিয়ে যান—
মনের সুখে ধাই রে পথে,
আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন
নানা কাজের পরে,
দেখি তিনি একলা বসে
আমাদের এই ঘরে।

তিনি জেগে বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যা-'পরে।
জগতে কেউ দেখতে না পায়
লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে
জ্বালান সারা রাতি।

ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই
আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি
আমাদের এই ঘরে ।

পৌষ ১৩১৬

৫০

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার,
আজ লব তাঁর দেখা ।
সারাদিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয় নি আমার শেখা ।

তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি ।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজালোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা ।

শান্তিনিকেতন
১৭ পৌষ ১৩১৬

৫১

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস ।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস ।

এই অকূল সংসারে
দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে ।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ।

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে ।
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস ।

তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।

১৭ পৌষ ১৩১৬

৫২

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।

আমায় দাও সুধাময় সুর,
আমার বাণী করো সুমধুর ;
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

দুখী জেনেই কাছে আস,
ছোটো বলেই ভালোবাস,
আমার ছোটো মুখে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

মাঘ ১৩১৬

৫৩

নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়নজলে।
একা আমি অহংকারের
উচ্চ অচলে,
পাষাণ-আসন ধুলায় লুটাও,
ভাঙো সবলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে।

কী লয়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।

দিনের কর্ম ডুবেছে মোর
আপন অতলে,
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন
যায় না বিফলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে।

মাঘ ১৩১৬

৫৪

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর-মাঝে
এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধ্যে,
নব- পল্লব-মর্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

বোলপুর
ফাল্গুন ১৩১৬

৫৫

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে—

দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

বোলপুর
২৬ চৈত্র ১৩১৬

৫৬

তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা বসে আপন-মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

তোমার সভায় কত-না গান
কতই আছেন গুণী;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজল তোমার প্রেমে।
লাগল বিশ্বতানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

২৭ চৈত্র ১৩১৬

৫৭

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।
যে দিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহি না,
যাক সে ধুলাতে।

এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।

কী আবেশে কিসের কথায়
ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে
তোমার আপন বাণী কহো

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না,
তারে আগুন দিয়ে দহো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬

৫৮

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল-আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার,
হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ,
শান্তচরণে এসো।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬

৫৯

এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তার হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।

নিশীথরাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে,
যে তান দিয়ে অবাক কর'
গ্রহশশীরে।

যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন-মরণে,
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।

৩০ চৈত্র ১৩১৬

৬০

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাই নে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পুরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার।

৪ বৈশাখ ১৩১৭

৬১

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে.

নিশীথরাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে,
যে তান দিয়ে অবাক কর'
গ্রহশশীরে।

যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন-মরণে,
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।

৩০ চৈত্র ১৩১৬

৬০

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাই নে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পুরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার।

৪ বৈশাখ ১৩১৭

৬১

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,

স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি দখিন-হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়—
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি।

বোলপুর
১২ বৈশাখ ১৩১৭

৬২

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন-মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।

কলিকাতা
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৩

মেনেছি, হার মেনেছি।
ঠেলতে গেছি তোমায় যত
আমায় তত হেনেছি।
আমার চিত্তগগন থেকে
তোমায় কেউ যে রাখবে ঢেকে

স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী ।

জেগে দেখি দখিন-হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া ।
কেন আমার রজনী যায়—
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি ।

বোলপুর
১২ বৈশাখ ১৩১৭

৬৬

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই ।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান—
দুঃখসুখের অনেক বেড়া
ধনজনমান ।

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা ।
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার ।

না রাখ তার ঘরের আড়াল
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন ।

না থাকে তার মান অপমান,
লজ্জা শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্বভুবনময়।

এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।

তিনধরিয়া
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৭

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরন পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়নপানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায় লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি-উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

তিনধরিয়া
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৮

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।

ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি' নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৯

ওই রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে
থাক্ না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলি,
একলা পড়ে রইলি কূলে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় করে
সঁপে দে তার চরণমূলে।

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭০

চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলি তার বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়াল রে অঙ্গ আমার,
ছড়াল প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি
হল আমার সাথের সাথি,
অট্টহাসে ধায় কোথা সে—
বারণ না মানে।

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭১

ওগো মৌন, না যদি কও
না-ই কহিলে কথা।
বক্ষ ভরি বইব আমি
তোমার নীরবতা।
স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে,
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা
ধৈর্যে অবনতা।

হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে।
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।
তখন আমার পাখির বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা ?

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭২

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল—
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।

পূজাগৌরব পুণ্যবিভব
কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ—
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
ভাঙা মন্দির -দ্বারে।

তিনধরিয়া
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৩

সবা হতে রাখব তোমায়
আড়াল ক'রে
হেন পূজার ঘর কোথা পাই
আমার ঘরে।
যদি আমার দিনে রাতে,
যদি আমার সবার সাথে
দয়া ক'রে দাও ধরা তো
রাখব ধরে।

মান দিব যে তেমন মানী
নই তো আমি,
পূজা করি সে আয়োজন
নাই তো স্বামী।
যদি তোমায় ভালোবাসি,
আপনি বেজে উঠবে বাঁশি,
আপনি ফুটে উঠবে কুসুম,
কানন ভরে।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৪

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

তিনধরিয়া
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৫

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে—
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরান আমার পারি নে তাই
পায়ে থুতে।

এতদিন তো ছিল না মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—
দিয়ো না গো, দিয়ো না আর
ধুলায় শুতে।

কলিকাতা
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৬

সভা যখন ভাঙবে তখন
শেষের গান কি যাব গেয়ে।
হয়তো তখন কণ্ঠহারা
মুখের পানে রব চেয়ে।
এখনো যে সুর লাগে নি
বাজবে কি আর সেই রাগিণী,
প্রেমের ব্যথা সোনার তানে
সন্ধ্যাগগন ফেলবে ছেয়ে?

এতদিন যে সেধেছি সুর
দিনেরাতে আপন-মনে
ভাগ্যে যদি সেই সাধনা
সমাপ্ত হয় এই জীবনে—
এ জনমের পূর্ণ বাণী
মানস-বনের পদ্মখানি
ভাসাব শেষ সাগরপানে
বিশ্বগানের ধারা বেয়ে।

কলিকাতা
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৭

চিরজনমের বেদনা,
ওহে চিরজীবনের সাধনা।
তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে,
কৃপা করিয়ো না দুর্বল ব'লে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।

অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে।
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে প'ড়ে যাক পিছে।
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা।

কলিকাতা
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৮

তুমি যখন গান গাহিতে বল
গর্ব আমার ভ'রে ওঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছল ছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।

তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে,
ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে,
জানি আমি এই গানেরই বলে
বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৯

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে,
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
যত বাধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।

বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

কলিকাতা
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮০

তারা দিনের বেলা এসেছিল
আমার ঘরে,
বলেছিল, একটি পাশে
রইব প'ড়ে।
বলেছিল, দেব্‌তাসেবায়
আমরা হব তোমার সহায়—
যা-কিছু পাই প্রসাদ লব
পূজার পরে।

এমনি করে দরিদ্র ক্ষীণ
মলিন বেশে
সংকোচেতে একটি কোণে
রইল এসে।
রাতে দেখি প্রবল হয়ে
পশে আমার দেবালয়ে,
মলিন হাতে পূজার বলি
হরণ করে।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮১

তারা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাসুল লয় যে ধরি।
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইকো পারের কড়ি।
তারা তোমার কাজের ভানে
নাশ করে গো ধনে প্রাণে,
সামান্য যা আছে আমার
লয় তা অপহরি।

আজকে আমি চিনেছি সেই
ছদ্মবেশী-দলে।
তারাও আমায় চিনেছে হায়
শক্তিবিহীন ব'লে।
গোপন মূর্তি ছেড়েছে তাই,
লজ্জা শরম আর কিছু নাই,
দাঁড়িয়েছে আজ মাথা তুলে
পথ অবরোধ করি।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮২

এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ ;
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান ।
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মুখ,
রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে
ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান ?

সাহস করে তোমার পদমূলে
আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
পড়ে আছি মাটিতে মুখ রেখে,
ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান ।
আপনি যদি আমার হাতে ধরে
কাছে এসে উঠতে ব'ল মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা
এই নিমেষেই হবে অবসান ।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮৩

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে ।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে ।

আজো সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি ।
ওগো ওই-যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে ।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি
আপন কুলায়-মাঝে সবাই এল ফিরে ।
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে ।
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে ।

বোলপুর
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮৪

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

নিখিল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ময়
দুঃখে সুখে,
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গপাত
ধরব বুকে।
মন্দ-ভালোর আঘাত-বেগে,
তোমার বুকে উঠব জেগে,
শুনব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে।
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

১ আষাঢ় ১৩১৭

৮৫

একা আমি ফিরব না আর
এমন করে—
নিজের মনে কোণে কোণে
মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে
ছোটো করে ঘিরতে গিয়ে
আপনাকে যে বাঁধি কেবল
আপন ডোরে।

যখন আমি পাব তোমায়
নিখিলমাঝে
সেই খনে হৃদয়ে পাব
হৃদয়রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল
তারি 'পরে বিশ্বকমল;
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে।

২ আষাঢ় ১৩১৭

৮৬

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।
নিবিড় বন-শাখার 'পরে
আষাঢ়-মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদলভরা আলসভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা-জলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৭

ছিন্ন করে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়।
ধুলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি, জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

কখন্ যে দিন ফুরিয়ে যাবে,
আসবে আঁধার করে,
কখন্ তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।
যেটুকু এর রঙ ধরেছে,
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে,

তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাকতে সুসময়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৮

চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,
তেমনি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৯

আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু,
নয় তো হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুজল।
মন্দমধুর সুখে শোভায়
প্রেমকে কেন ঘুমে ডোবায়।
তোমার সাথে জাগতে সে চায়
আনন্দে পাগল।

নাচো যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ-বিহ্বল।

সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক সে রসাতল ।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯০

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো,
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝংকারো ।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজে নি তা চরম তানে,
নিঠুর মূর্ছনায় সে গানে
মূর্তি সঞ্চারো ।

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ কোরো না ।
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো ।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯১

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো ।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো ।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো ।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার ।

অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯২

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে।

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াই নে তো তোমারই সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।

৫ আষাঢ় ১৩১৭

৯৩

তুমি যে কাজ করছ, আমায়
সেই কাজে কি লাগাবে না।
কাজের দিনে আমায় তুমি
আপন হাতে জাগাবে না?
ভালোমন্দ ওঠাপড়ায়
বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন
তোমার সাথে হয় গো চেনা।

ভেবেছিলেম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা,
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।

অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা।

৬ আষাঢ় ১৩১৭

৯৪

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

৭ আষাঢ় ১৩১৭

৯৫

ডাকো ডাকো ডাকো আমারে,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর
পবিত্র আঁধারে।
তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি
দিতেছে জীবন ধুলাতে টানি,
সারাক্ষণের বাক্যমনের
সহস্র বিকারে।

মুক্ত করো হে মুক্ত করো আমারে,
তোমার নিবিড় নীরব উদার
অনন্ত আঁধারে।
নীরব রাত্রে হারাইয়া বাক্
বাহির আমার বাহিরে মিশাক,
দেখা দিক মম অন্তরতম
অখণ্ড আকারে।

৭ আষাঢ় ১৩১৭



সপরিবারে রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৬

বাম দিক হইতে : কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী

সুকুমার রায় -গৃহীত ফোটোগ্রাফ। শ্রীপ্রণবেশ সিংহের সৌজন্যে

৯৬

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।
সোনার ঘটে সূর্য তারা
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

যেথায় তুমি বস' দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে
আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

৮ আষাঢ় ১৩১৭

৯৭

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া করে প্রভু রাখো মোর অভিমান।

তার পরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরার ধুলায় মেশে,
তবে ক্ষতি কিছু নাই— তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে কত টুটে,
তারা আমার জীবনে ক্ষণকালতরে ফুটে,
চিরকালতরে সার্থক করে প্রাণ।

৯ আষাঢ় ১৩১৭

৯৮

মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে।
এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে।
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরই মাঝখানে।

নানা ইচ্ছা ধায় নানা দিক -পানে,
একটি ইচ্ছা সফল করো প্রাণে।
সেই ইচ্ছাটি রাতের পরে রাতে
জাগে যেন একের বেদনাতে,
দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে
একের সূত্রে এক আনন্দগানে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

৯৯

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে—
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
এসেছে এসেছে এই কথা বলে প্রাণ,
এসেছে এসেছে উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

১০০

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে,
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ওই যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কী করিছে কানাকানি।
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠিছে কোন্ আসন্ন কাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

১১ আষাঢ় ১৩১৭

১০১

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

১৩ আষাঢ় ১৩১৭

১০২

এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে
তব আনন্দ মহাসংগীতে বাজে।
তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা,
দ্বার ছোটো দেখে ফেরে না যেন গো তারা,
ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তরে মোর নিত্য নূতন সাজে।

তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।

তব আনন্দ পরম দুঃখে মম
জ্বলে উঠে যেন পুণ্য আলোকসম,
তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি'
ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে।

১৩ আষাঢ় ১৩১৭

১০৩

একলা আমি বাহির হলেম,
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে
ঘুরে চলি, যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে,
আবার দেখি তারে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে—
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি, প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার দ্বারে।

১৪ আষাঢ় ১৩১৭

১০৪

আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে,
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে।

যেথা বাহিরের আবরণ নাহি রয়,
যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয়।
আমার বলিয়া কিছু নাই একেবারে,
এ সত্য যেথা নাহি ঢাকে আপনারে,

সেথায় দাঁড়ায়ে নিলাজ দৈন্য মম
ভরিয়া লইব তাঁহার পরম দানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।

১৫ আষাঢ় ১৩১৭

১০৫

আর আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে
রইব না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে
বেরিয়ে পড়ব অবহেলে—
কোনো খবর রাখব না ওর,
কোনো কথাই কইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

বাসনা মোর যারেই পরশ
করে সে,
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে
নিমেষে।
ওরে সেই অশুচি, দুই হাতে তার
যা এনেছে চাই নে সে আর
তোমার প্রেমে বাজবে না যা
সে আর আমি সইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

১৫ আষাঢ় ১৩১৭

১০৬

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে,
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,

হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা ।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন ।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর ।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ।

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি ।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া

বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

১০৭

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের'
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

১৯ আষাঢ় ১৩১৭

১০৮

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে
ধুলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক',
এখনো সরিয়া থাক',
আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

২০ আষাঢ় ১৩১৭

১০৯

ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ওই দেখ্ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে আর নেই ভয়।

এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার 'পর,

নিরাশ্বাস, আলস্য সংশয়,
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয়, আয় রে বাহিরে,
চেয়ে দেখ্, দেখ্ ঊর্ধ্বশিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়।
ওরে আর নেই ভয়।

২১ আষাঢ় ১৩১৭

১১০

আছ আমার হৃদয় আছ ভরে
এখন তুমি যা-খুশি তাই করো।
এমনি যদি বিরাজ অন্তরে
বাহির হতে সকলই মোর হরো।
সব পিপাসার যেথায় অবসান
সেথায় যদি পূর্ণ কর প্রাণ
তাহার পরে মরুপথের মাঝে
উঠে রৌদ্র উঠুক খরতর।

এই যে খেলা খেলছ কত ছলে
এই খেলা তো আমি ভালোবাসি।
এক দিকেতে ভাসাও আঁখিজলে
আরেক দিকে জাগিয়ে তোল হাসি।
যখন ভাবি সব খোয়ালেম বুঝি,
গভীর করে পাই তাহারে খুঁজি,
কোলের থেকে যখন ফেল দূরে
বুকের মাঝে আবার তুলে ধর।

রেলপথে। ই. আই. আর.
২১ আষাঢ় ১৩১৭

১১১

গর্ব করে নিই নে ও নাম, জান অন্তর্যামী,
আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে।
যখন সবাই উপহাসে তখন ভাবি আমি
আমার কণ্ঠে তোমার নাম কি বাজে।
তোমা হতে অনেক দূরে থাকি
সে যেন মোর জানতে না রয় বাকি,
নামগানের এই ছদ্মবেশে দিই পরিচয় পাছে
মনে মনে মরি যে সেই লাজে।

অহংকারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে
রাখো আমায় যেথা আমার স্থান।
আর-সকলের দৃষ্টি হতে সরিয়ে দিয়ে মোরে
করো তোমার নত নয়ন দান।
আমার পূজা দয়া পাবার তরে,
মান যেন সে না পায় কারো ঘরে,
নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধুলার 'পরে বসে
নিত্যনূতন অপরাধের মাঝে।

রেলপথে। ই. আই. আর.
২২ আষাঢ় ১৩১৭

১১২

কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে।
জীবনে তুই যা নিয়েছিস
মরণে সব নিতে হবে।
এই ভরা ভাণ্ডারে এসে
শূন্য কি তুই যাবি শেষে।
নেবার মতো যা আছে তোর
ভালো করে নে তুই তবে।

আবর্জনার অনেক বোঝা
জমিয়েছিস যে নিরবধি,
বেঁচে যাবি যাবার বেলা
ক্ষয় করে সব যাস রে যদি।
এসেছি এই পৃথিবীতে
হেথায় হবে সেজে নিতে,
রাজার বেশে চল্ রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৩

নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।
সবুজ নীলে সোনায় মিলে
যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,

জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর বাণী—
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

এমনি করে চলতে পথে
ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস দিবস-রাতে,
প্রতি দিনটি যতন করে
ভাগ্য মানি,
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৪

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কী ধন দিবে উহারে।
ভরা আমার পরানখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

কত শরৎ-বসন্ত-রাত,
কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত
জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে ;
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
দুঃখসুখের আলোছায়ার পরশে।
যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৫

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোটো হয়ে
এসো তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্যসুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোটো হয়ে এসো হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে
করব ছোটো বিশ্বনাথে।
জানাব আর জানব তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৬

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখসুখের ব্যথা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি
যা-কিছু মোর আশা।
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা ;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে,
আমার চিত্তমাঝে,

কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই-বা আপন, কেই-বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৭

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ-ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে।

যাত্রী আমি ওরে।
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে।
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার,
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালোমন্দ কাটিয়ে হব পার—
চলতে রব লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখি,
কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি
জেগেছিল অন্ধকারের 'পরে।

যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।

কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু-নয়ানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।

গোরাই নদী
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৮

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোনোমতে।

কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে।

ওই যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ।
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে।

গোরাই নদী
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৯

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কয়া। গোরাই
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

১২০

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,

হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

জানিপুর। গোরাই
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

১২১

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

জানিপুর। গোরাই
২৮ আষাঢ় ১৩১৭

১২২

মানের আসন, আরামশয়ন
নয় তো তোমার তরে।
সব ছেড়ে আজ খুশি হয়ে
চলো পথের 'পরে।
এসো বন্ধু তোমরা সবে
একসাথে সব বাহির হবে,
আজকে যাত্রা করব মোরা
অমানিতের ঘরে।

নিন্দা পরব ভূষণ করে
কাঁটার কণ্ঠহার,
মাথায় করে তুলে লব
অপমানের ভার।

দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধুলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্যপাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে।

গোরাই
২৯ আষাঢ় ১৩১৭

১২৩

প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো
বিপুল বল।
কোথায় বর্ম, অস্ত্র কোথায়,
ক্ষীণ দরিদ্র অতি অসহায়,
চারি দিক হতে এসেছে আঘাত
অনর্গল,
প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল।

প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় লুকাল আবার
বিপুল বল।
ধনুশর অসি কোথা গেল খসি,
শান্তির হাসি উঠিল বিকশি ;
চলে গেলে রাখি সারা জীবনের
সকল ফল,
প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল।

কলিকাতা
৩১ আষাঢ় ১৩১৭

১২৪

ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।
নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,
পাথেয় যা ছিল ফুরায়েছে বুঝি আজ,
যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।

কী নিরখি আজি, এ কী অফুরান লীলা,
এ কী নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।
পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে,
নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বুকে,
পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে।

কলিকাতা। ঠিকাগাড়িতে
৩১ আষাঢ় ১৩১৭

১২৫

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি'
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

কলিকাতা
১ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৬

নিন্দা দুঃখে অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি কিছুই সেথা
হারাবার তো নাই।
থাকি যখন ধুলার 'পরে
ভাবতে না হয় আসনতরে,
দৈন্যমাঝে অসংকোচে
প্রসাদ তব চাই।

লোকে যখন ভালো বলে,
যখন সুখে থাকি,
জানি মনে তাহার মাঝে
অনেক আছে ফাঁকি।
সেই ফাঁকিরে সাজিয়ে লয়ে
ঘুরে বেড়াই মাথায় বয়ে,
তোমার কাছে যাব এমন
সময় নাহি পাই।

বোলপুর
২ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৭

রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন-হার—
খেলাধুলা আনন্দ তার সকলই যায় ঘুরে,
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।
ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি,
পাছে ধুলায় হয় সে দাগি,
আপনাকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হতে দূরে,
চলতে গেলে ভাবনা ধরে তার—
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার।

কী হবে মা অমনতরো রাজার মতো সাজে,
কী হবে ওই মণিরতন-হারে।
দুয়ার খুলে দাও যদি তো ছুটি পথের মাঝে
রৌদ্রবায়ু-ধুলাকাদার পাড়ে।
যেথায় বিশ্বজনের মেলা
সমস্ত দিন নানান খেলা,
চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,
সেথায় সে যে পায় না অধিকার,
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার।

বোলপুর
২ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৮

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে।

এই বেসুরো জটিলতায়
পরান আমার মরে ব্যথায়,
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।
জীবনবীণা ঠিক সুরে আর
বাজে না রে।

এই বেদনা বইতে আমি
পারি না যে,
তোমার সভার পথে এসে
মরি লাজে।
তোমার যারা গুণী আছে
বসতে নারি তাদের কাছে,
দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে
বাহির-দ্বারে।
জীবনবীণা ঠিক সুরে আর
বাজে না রে।

বোলপুর
৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৯

গাবার মতো হয় নি কোনো গান,
দেবার মতো হয় নি কিছু দান।
মনে যে হয় সবই রইল বাকি
তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাঁকি,
কবে হবে জীবন পূর্ণ করে
এই জীবনের পূজা অবসান।

আর-সকলের সেবা করি যত
প্রাণপণে দিই অর্ঘ্য ভরি ভরি।
সত্য মিথ্যা সাজিয়ে দিই যে কত
দীন বলিয়া পাছে ধরা পড়ি।
তোমার কাছে গোপন কিছু নাই,
তোমার পূজায় সাহস এত তাই,
যা আছে তাই পায়ের কাছে আনি।
অনাবৃত দরিদ্র এই প্রাণ।

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩০

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩১

দুঃস্বপন কোথা হতে এসে
জীবনে বাধায় গণ্ডগোল।
কেঁদে উঠে জেগে দেখি শেষে
কিছু নাই আছে মার কোল।
ভেবেছিনু আর-কেহ বুঝি,
ভয়ে তাই প্রাণপণে যুঝি,
তব হাসি দেখে আজ বুঝি
তুমিই দিয়েছ মোরে দোল।

এ জীবন সদা দেয় নাড়া
লয়ে তার সুখ দুখ ভয়;
কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া,
সেই যেন মোর সমুদয়।
এ ঘোর কাটিয়া যাবে চোখে
নিমেষেই প্রভাত-আলোকে,
পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে
থেমে যাবে সকল কল্লোল।

৮ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩২

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।

নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।

কত শেখা সেই শেখালো,
কত গোপন পথ দেখালো,
চিনিয়ে দিল কত তারা
হৃদ্‌গগনে।
বিচিত্র সুখদুখের দেশে
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এল
কোন্ ভবনে।

৯ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৩

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নবজীবন-লোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন-ডোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নূতন লীলা তাই।
আবার তুমি জানি নে কোন্ বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে, নাথ, হেসে,
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

১০ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৪

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে—
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হেসে।
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
দুঃখ-ব্যথার রক্তশতদলে,
যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে
যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৫

যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে,
মনে করি আর পাব না ছাড়া।
যখন আমায় ফেল তুমি নীচে,
মনে করি আর হব না খাড়া।
আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে,
আবার তুমি নাও আমারে তুলে,
চিরজীবন বাহু-দোলায় তব
এমনি করে কেবলই দাও নাড়া।

ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর ক্ষয়,
ঘুম ভাঙায়ে তখন ভাঙ' ভয়।
দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে,
তাহার পরে লুকাও যে কোন্‌খানে,
মনে করি এই হারালেম বুঝি,
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৬

যতকাল তুই শিশুর মতো
রইবি বলহীন,
অন্তরেরই অন্তঃপুরে
থাক্‌ রে ততদিন।
অল্প ঘায়ে পড়বি ঘুরে,
অল্প দাহে মরবি পুড়ে,
অল্প গায়ে লাগলে ধুলা
করবে যে মলিন—
অন্তরেরই অন্তঃপুরে
থাক্‌ রে ততদিন।

যখন তোমার শক্তি হবে
উঠবে ভরে প্রাণ

আগুন-ভরা সুধা তাঁহার
করবি যখন পান—
বাইরে তখন যাস রে ছুটে,
থাকবি শুচি ধুলায় লুটে,
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন—
অন্তরেরই অন্তঃপুরে
থাক রে ততদিন।

১৪ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৭

আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে—
ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন
ঘটবে কবে।
সত্য সত্য সত্য জপি,
সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি,
সীমার বাঁধন পেরিয়ে যাব
নিখিল ভবে,
সত্য, তোমার পূর্ণ প্রকাশ
দেখব কবে।

তোমায় দূরে সরিয়ে, মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কাণ্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।
আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচব তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।

১৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৮

তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক বাকি।
তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,
তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি,

ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাক্ বাকি—
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

তোমায় আমি কোথাও নাহি ঢাকি
কেবল আমার সেইটুকু থাক্ বাকি।
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে,
রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্ বাকি—
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

১৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৯

যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি
খেদ রবে না এখন যদি মরি।
রজনীদিন কত দুঃখে সুখে
কত যে সুর বেজেছে এই বুকে,
কত বেশে আমার ঘরে ঢুকে
কত রূপে নিয়েছ মন হরি,
খেদ রবে না এখন যদি মরি।

জানি তোমায় নিই নি প্রাণে বরি,
পাই নি আমার সকল পূর্ণ করি।
যা পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি,
দিয়েছ তো তব পরশখানি,
আছ তুমি এই জানা তো জানি—
যাব ধরি সেই ভরসার তরী।
খেদ রবে না এখন যদি মরি।

১৬ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪০

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি।

১১৮

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে,
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে
[illegible]
[illegible]
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই —
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

২০শে
শ্রাবণ
১৩১৭



৭৮

গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগ্রহ

যেন আমার লাগছে মনে,
মন্দমধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তার নবীন আছে
এইবেলা নে সাজিয়ে সাজি।

১৮ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪১

মনকে, আমার কায়াকে,
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে।
ওই আগুনে জ্বালিয়ে দিতে,
ওই সাগরে তলিয়ে দিতে,
ওই চরণে গলিয়ে দিতে,
দলিয়ে দিতে মায়াকে—
মনকে, আমার কায়াকে।

যেখানে যাই সেথায় একে
আসন জুড়ে বসতে দেখে
লাজে মরি, লও গো হরি
এই সুনিবিড় ছায়াকে।
মনকে, আমার কায়াকে।

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।
মনকে, আমার কায়াকে।

১৯ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪২

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র-মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে

তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

২০ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৩

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
মরছে সে এই নামের কারাগারে।
সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ওই আকাশপানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে।

জড়ো করে ধূলির 'পরে ধূলি
নামটারে মোর উচ্চ করে তুলি।
ছিদ্র পাছে হয় রে কোনোখানে
চিত্ত মম বিরাম নাহি মানে,
যতন করি যতই এ মিথ্যারে
ততই আমি হারাই আপনারে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৪

নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে—
আপনগড়া স্বপন হতে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।
ঢেকে তোমার হাতের লেখা
কাটি নিজের নামের রেখা,
কতদিন আর কাটবে জীবন
এমন ভীষণ আপদ বয়ে।

সবার সজ্জা হরণ করে
আপনাকে সে সাজাতে চায়।
সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে
আপনাকে সে বাজাতে চায়।
আমার এ নাম যাক-না চুকে,
তোমারি নাম নেব মুখে,
সবার সঙ্গে মিলব সেদিন
বিনা-নামের পরিচয়ে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৫

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৬

তোমার দয়া যদি
চাহিতে নাও জানি
তবুও দয়া করে
চরণে নিয়ো টানি।
আমি যা গড়ে তুলে
আরামে থাকি ভুলে
সুখের উপাসনা
করি গো ফলে ফুলে—

সে ধুলা-খেলাঘরে
রেখো না ঘৃণাভরে,
জাগায়ো দয়া করে
বহ্নি-শেল হানি ।

সত্য মুদে আছে
দ্বিধার মাঝখানে,
তাহারে তুমি ছাড়া
ফুটাতে কে বা জানে ।
মৃত্যু ভেদ করি'
অমৃত পড়ে ঝরি',
অতল দীনতার
শূন্য উঠে ভরি' ।
পতন-ব্যথা মাঝে
চেতনা আসি বাজে,
বিরোধ কোলাহলে
গভীর তব বাণী ।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৭

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা ।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা ।
জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও
হয় নি মিছে ।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা ।

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৮

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।

ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।

নানা সুরের আকুল ধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ-পারে।

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৯

জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে,
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে,
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।

কথা তারে শেষ করে
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।
কী নিভৃতে চুপে চুপে
মোহন নবীনরূপে
নিখিল নয়ন হতে
ঢাকা ছিল, সখা, সে।
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

ভ্রমেছি তাহারে লয়ে
দেশে দেশে ফিরিয়া,
জীবনে যা ভাঙাগড়া
সবই তারে ঘিরিয়া।
সব ভাবে সব কাজে
আমার সবার মাঝে
শয়নে স্বপনে থেকে
তবু ছিল একা সে।
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

কত দিন কত-লোকে
চেয়েছিল উহারে,
বৃথা ফিরে গেছে তারা
বাহিরের দুয়ারে।
আর কেহ বুঝিবে না,
তোমা-সাথে হবে চেনা
সেই আশা লয়ে ছিল
আপনারি আকাশে,
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

২৪ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫০

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহে না—
দিনে দিনে উঠছে জমে
কতই দেনা।

সবাই তোমায় সভার বেশে
প্রণাম করে গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই
মান রহে না।

কী জানাব চিত্তবেদন,
বোবা হয়ে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই
আর কহে না।
ফিরায়ো না এবার তারে
লও গো অপমানের পারে,
করো তোমার চরণতলে
চির-কেনা।

বোলপুর
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫১

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে ;
অনেক দেরি হয়ে গেল,
দোষী অনেক দোষে।
বিধিবিধান-বাঁধনডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে,
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

লোকে আমায় নিন্দা করে,
নিন্দা সে নয় মিছে,
সকল নিন্দা মাথায় ধরে
রব সবার নীচে।
শেষ হয়ে যে গেল বেলা,
ভাঙল বেচা-কেনার মেলা,
ডাকতে যারা এসেছিল
ফিরল তারা রোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫২

সংসারেতে আর-যাহারা
আমায় ভালোবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে
বেঁধে কঠিন পাশে।
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা,
বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাক'
ছেড়েই রাখ দাসে।

আর-সকলে, ভুলি পাছে
তাই রাখে না একা।
দিনের পরে কাটে যে দিন,
তোমারি নেই দেখা।
তোমায় ডাকি নাই বা ডাকি,
যা খুশি তাই নিয়ে থাকি ;
তোমার খুশি চেয়ে আছে
আমার খুশির আশে।

ই আই আর রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৩

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে।
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে আমার তবে।

আর-যাহারা আসে আমার ঘরে
ভয় দেখায়ে তারা শাসন করে,
দুরন্ত মন দুয়ার দিয়ে থাকে,
হার মানে না, ফিরায়ে দেয় সবে।

সে এলে সব আগল যাবে ছুটে,
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে,
ঘরে তখন রাখবে কে আর ধরে
তার ডাকে যে সাড়া দিতেই হবে।

আসে যখন, একলা আসে চলে,
গলায় তাহার ফুলের মালা দোলে,
সেই মালাতে বাঁধবে যখন টেনে
হৃদয় আমার নীরব হয়ে রবে।

রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৪

গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে,
কত সুখের খেলায়, কত
নয়নজলে হে।
ধরা দিয়ে দাও না ধরা,
এস কাছে, পালাও ত্বরা,
পরান কর ব্যথায় ভরা
পলে পলে হে।
গান গাওয়ালে এমনি করে
কতই ছলে যে।

কত তীব্র তারে, তোমার
বীণা সাজাও যে,
শত ছিদ্র করে জীবন
বাঁশি বাজাও হে।
তব সুরে লীলাতে মোর
জনম যদি হয়েছে ভোর,
চুপ করিয়ে রাখো এবার
চরণতলে হে,
গান গাওয়ালে চিরজীবন
কতই ছলে যে।

রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৫

মনে করি এইখানে শেষ—
কোথা বা হয় শেষ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।
নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন করে হৃদয় জাগে,
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই সে উদ্দেশ।

সন্ধ্যাবেলার সোনার আভায়
মিলিয়ে নিয়ে তান
পূরবীতে শেষ করেছি
যখন আমার গান—

নিশীথ রাতের গভীর সুরে
আবার জীবন উঠে পূরে,
তখন আমার নয়নে আর
রয় না নিদ্রালেশ ।

রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৬

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
এই কথাটি, মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে ।
সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে ।

তারে যখন আঘাত লাগে,
বাজে যখন সুরে—
সবার চেয়ে বড়ো যে গান
সে রয় বহুদূরে ।
সকল আলাপ গেলে থেমে
শান্ত বীণায় আসে নেমে,
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে ।

কলিকাতা
২৬ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৭

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে—
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে—
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া-পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে ।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,

বসনভূষা মলিন হল ধূলায় অপমানে
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে—
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষাপানে
জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে।

কলিকাতা
২৯ শ্রাবণ ১৩১৭

গীতিমাল্য

গীতিমাল্য

১

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার-আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ওইপারে।

নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজল গভীর বাণী ;
নিকষেতে উঠল ফুটে
সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি-দেখি দেখতে না পাই,
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা,
কাঁদি আকুল ধারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন। নিশীথে [১৩১৭]

২

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।
এই হল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি।

আজ পারুলদিদির বনে
মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ার তলে
মোরা সবাই জুটেছি।

আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি।

শান্তিনিকেতন
১৩১৬ [?]

৩

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি,
নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়াছবি-সৃজনে;
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না।
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি' নিশীথ-তিমির-থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে;
আহা শ্বেতচন্দন-তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।

আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি,
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

শান্তিনিকেতন
১৩১৬ [?]

৪

স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ওই বিজন পুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন্ নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে
উদাস ধ্বনি উধাও আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে
তান তুলেছে কোন্ নূপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

নিচল জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,
পারাপারের সময় গেল
খেয়াতরীর নাইকো দেখা।
পশ্চিমে ওই সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি
বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

সারাটা দিন দিনের কাজে
হয় নি কিছুই দেখাশুনা,
কেবল মাথার বোঝা ব'হে
হাটের মাঝে আনাগোনা।

এখন আমায় কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি ;
সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে
ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে

শিলাইদহ
১৫ চৈত্র ১৩১৮

৫

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজের পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘটত না তো কোনোমতে।
এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া-আসা,
সূর্য উঠে অস্তে মিলায়
এই রাঙা পর্বতে,
প্রতিদিনের ভার বহে যাই
এই কাজেরই পথে।

জেনেছিলেম কিছুই আমার
নাই অজানা।
যেখানে যা পাবার আছে
জানি সবার ঠিক-ঠিকানা।
ফসল নিয়ে গেছি হাটে
ধেনুর পিছে গেছি মাঠে,
বর্ষা-নদী পার করেছি
খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েছে,
সকল পথই জানা।

সেদিন আমি জেগেছিলেম
দেখে কারে ?
পসরা মোর পূর্ণ ছিল
চলেছিলেম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম
দেখেছিলেম কারে।

সেদিন চলে যেতে যেতে
চমক লাগে।
মনে হল বনের কোণে
হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে।
পথের বাঁকে বটের ছায়ে
গেল কে যে চপল-পায়ে
চকিতে মোর নয়ন দুটি
ভরিয়ে অরুণ-রাগে।
সেদিন চলে যেতে যেতে
মনে হল কেমন লাগে।

এত দিনের পথ হারালেম
এক নিমেষে ;
জানি নে তো কোথায় এলেম
একটু পথের বাইরে এসে।
দিনের পরে কেটেছে দিন
পথে পথে বিরামহীন।
জানি নে তো চলেছিলেম
হেন অচিন দেশে।
চিরকালের জানাশোনা
ঘুচল এক নিমেষে।

রইল পড়ে পসরা মোর
পথের পাশে।
চারি দিকের আকাশ আজি
দিক্-ভোলানো হাসি হাসে।
সকল-জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে
তাই দেখে আজ বেলা গেল
নয়ন ভরে আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম
রইল পথের পাশে।

শিলাইদহ
১৬ চৈত্র ১৩১৮

৬

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।

ছেড়ে দে দে গো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস্ বসে
বসে থাক্ ভাগ্য মানি।

আমার এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলই তারি পিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।
এবার এই আঁধারেতে
রহিলাম আঁচল পেতে,
যখনি খুশি তোমার
নিয়ে সেই আসনখানি।

শিলাইদহ
১৭ চৈত্র [১৩১৮]

৭

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে।
বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ।

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।

শিলাইদহ
১৭ চৈত্র ১৩১৮

৮

কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিনদুপুরের মধ্যখানে,
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা
বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস-বেলার খেলার সাথি
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা-কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

শিলাইদহ
১৮ চৈত্র ১৩১৮

৯

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হত খবর আসে
উঠত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন হাওয়ায়
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায়
পরান-উন্মাদনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,

জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

এ কী গভীর, এ কী মধুর,
এ কী হাসি পরান-বঁধুর
এ কী নীরব চাহনি,
এ কী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া,
নয়ন-অবগাহনি।
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
নিতেছে সুর কুড়ায়ে,
সপ্তলোকের আলোকধারা
এই ছায়াতে হল হারা
গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন-সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
বিনা-সাজের কী বেশে।
আমার চির-জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে।

শিলাইদহ
১৯ চৈত্র ১৩১৮

১০

কে গো তুমি বিদেশী।
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজালো সুর কী দেশী।
নৃত্য তোমার দুলে দুলে,
কুন্তলপাশ পড়ছে খুলে
কাঁপছে ধরা চরণে,
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
ইন্দ্রধনুর বরনে।
আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ,
জলের 'পরে লেগেছে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখিতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।

মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয় না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।
নাটের লীলা হায় গো এ কী,
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে।
লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভুঁই-চাঁপারে।
রুদ্ধঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে।

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী,
নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে ;
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন-সমীরণে,
মিলবে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে।

শিলাইদহ
২০ চৈত্র ১৩১৮

১১

"ওগো পথিক দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্‌খানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই, করব গমন নিশীথে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে
কে আছে বা সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
জগৎজোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি তো কিছুরি;
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে, কেই বা এসে
পথ দেখাবে সেইখানে ?"
"কে জানে গো, কে জানে।
শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি,
লেখা আছে সকল আকাশ-মাঝে গো;

সে মন্ত্র এই প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল-সাঁঝে গো।"

শিলাইদহ
২১ চৈত্র ১৩১৮

১২

এই দুয়ারটি খোলা।
আমার খেলা খেলবে বলে
আপনি হেথায় আস চলে
ওগো আপন-ভোলা।
ফুলের মালা দোলে গলে,
পুলক লাগে চরণতলে
কাঁচা নবীন ঘাসে।
এসো আমার আপন ঘরে,
ব'সো আমার আসন-'পরে
লহ আমায় পাশে।
এমনিতরো লীলার বেশে
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
দাও আমারে দোলা।
ওঠে হাসি, নয়নবারি,
তোমায় যখন চিনতে নারি
ওগো আপন-ভোলা।

কত রাতে, কত প্রাতে,
কত গভীর বরষাতে,
কত বসন্তে,
তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে।
আমার পরশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ তো জানে না তা।
রইল আকাশ অবাক মানি,
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।
মোদের দোঁহার সেই কাহিনী
ধরেছে আজ কোন্ রাগিণী
ফুলের সুগন্ধে?
সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া
গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া
কত বসন্তে।

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
যেন তোমায় হল মনে
ধরা পড়েছ।
মন বলেছে, "তুমি কে গো,
চেনা মানুষ চিনি নে গো,
কী বেশ ধরেছ ?"
রোজ দেখেছি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
করছ যাওয়া-আসা ;
হঠাৎ কবে এক নিমেষে
তোমার মুখের সামনে এসে
পাই নে খুঁজে ভাষা।
সেদিন দেখি পাখির গানে
কী যে বলে কেউ না জানে—
কী গুণ করেছ।
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে
অচেনা সেই উঁকি মারে
ধরা পড়েছ।

শিলাইদহ
২২ চৈত্র ১৩১৮

১৩

এই যে এরা আঙিনাতে
এসেছে জুটি।
মাঠের গোরু গোঠে এনে
পেয়েছে ছুটি।
দোলে হাওয়া বেণুর শাখে
চিকন পাতার ফাঁকে ফাঁকে
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
উঠেছে ফুটি।

ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে
বসেছে মিলে।
তারি মাঝে তোমার আসন
তুমি যে নিলে।
আপন চেনা লোকের মতো
নাম দিয়েছে তোমায় কত,
সে-নাম ধরে ডাকে ওরা
সন্ধ্যা নামিলে।

মানীর দ্বারে মান ওরা হায়
পায় না তো কেহ।

ওদের তরে রাজার ঘরে
বন্ধ যে গেহ।
জীর্ণ আঁচল ধুলায় পাতে,
বসিয়ে তোমায় নৃত্যে মাতে,
কোন্ ভরসায় চরণ ধরে
মলিন ওই দেহ।

রাতের পাখি উঠছে ডাকি
নদীর কিনারে।
কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের রেখা
বনের ওপারে।
গাছে গাছে জোনাক জ্বলে,
পল্লীপথে লোক না চলে,
শূন্য মাঠে শৃগাল হাঁকে
গভীর আঁধারে।

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।
তারি মাঝে আঁধার রাতে
পল্লীঘরের আঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠছে গগনে।

শিলাইদহ
২৩ চৈত্র ১৩১৮

১৪

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম-আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।

পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে—
বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বলব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গ'লে।

শিলাইদহ
২৪ চৈত্র ১৩১৮

১৫

আমি আমায় করব বড়ো
এই তো তোমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

বিরহ-গান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি
কতই আশা-ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা—
এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে বসলে সেজে,

সোজা কিছু রাখলে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরনে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া-আসায়
কাটে সকল বেলা।

শিলাইদহ
২৫ চৈত্র ১৩১৮

১৬

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা,
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি।

জল উঠেছে ছলছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস।
সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮

১৭

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।

মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন-সমীরণে।

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮

১৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,
দিস নে তারে ফাঁকি।
চিরজীবন দিস নে তারে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

প্রখর রবির তাপে
নাহয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক চারি দিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি।

মনের মাঝে চাহি
দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি।

পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি
বাজবে তোরে ডাকি।
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

শিলাইদহ
২৭ চৈত্র ১৩১৮

১৯

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি।
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি।

হঠাৎ আকাশ উজলি'
কারে খুঁজে কে ওই চলে।
চমক লাগায় বিজলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ-গগন জুড়ে
আমার যাক সকলই উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী
কোনো বাঁধন নাহি মানি।

শিলাইদহ
২৮ চৈত্র ১৩১৮

২০

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে।

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

শিলাইদহ
২৯ চৈত্র ১৩১৮

২১

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর।
কী নিয়ে বা যাব সেথা
ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
শূন্য হাতেই চলব, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর।

মালা পরে যাব মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে,
মনে রাখি নে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরি
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

শিলাইদহ
৩০ চৈত্র ১৩১৮

২২

কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩১৯

২৩

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।

তোমারি ওই অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে
উথলি' উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,
হল না সারা কত-না যুগ ধরি,
কেবলই আমি লব।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯

২৪

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিনতরে।

আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে ।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯

২৫

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে ।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য ছুটে
সে পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে ।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে ।

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো ।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে ।

যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু-পবনে ।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে ।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে ।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯

২৬

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই ।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবি,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই ।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি ।

প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯

২৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ওই অরুণরাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার
মায়ার খেলাতে।

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই
মেঘের ভেলাতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ বৈশাখ ১৩১৯

২৮

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান।

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।

আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সমুদ্র
৩ জুন ১৯১২

২৯

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কী আছে কী চায় নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি
নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি,
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে।

নব নব রূপে বরনে বরনে ভরি
বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
হে নিরঞ্জন, নাই বাস তারে ভালো,
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে।

The Heath
[2] Holford Road
Hampstead
২৩ জুন ১৯১২

৩০

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে
যেন গো অস্ত-আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

The Heath
2 Holford Road
Hampstead
২৫ জুন ১৯১২

৩১

কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে ?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট-মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা এল রথে।
বললে হাতে ধরে, "তোমায়
কিনব আমি জোরে।"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে।
মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বললে,
"কিনব দিয়ে সোনা।"
উজাড় করে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বললে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে।"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে ;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে।

সাগরতীরে রোদ পড়েছে ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।

যেন আমায় চিনে বললে,
"অমনি নেব কিনে।"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেইদিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে।

[508 High Street
Urbana, Illinois, U.S.A.
২৪ পৌষ ১৩১৯]

৩২

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে।

বিনা-প্রয়োজনে ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে।

16 More's Garden
Cheyne Walk, London
৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৩

অসীম ধন তো আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি
আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক,
রয়েছি দ্বার এঁটে।

আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে,



সাহিত্যিকবর্গসহ রবীন্দ্রনাথ

সম্মুখে উপবিষ্ট ।। দক্ষিণ হইতে । সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডায়মান ।। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা

১৯১২ সালে বিলাতযাত্রার প্রাক্‌কালে গৃহীত ফোটোগ্রাফ। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে,
নামবে ধূলাপথে,
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চলবে হেঁটে হেঁটে।

Cheyne Walk
৮ ভাদ্র ১৩২০·

৩৪

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে,
সুর তো নাহি সরে,
ওই দিকে যে মন পড়ে রয়
মন লাগে না কাজে।

তাই তো বসে আছি,
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ
মণিমালার লাজে।

Cheyne Walk
৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৫

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে।

মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।

হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মতো
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে।

Cheyne Walk
৯ ভাদ্র [১৩২০]

৩৬

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না,
মনে ছিল এই ভাবনা
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন করে আপনাকে যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে।
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।

Cheyne Walk
৯ ভাদ্র [১৩২০]

৩৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত।
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটে তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত।

আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত।

Far Oakridge, Glos.
১১ ভাদ্র [১৩২০]

৩৮

ভেলার মতো বুকে টানি
কলমখানি
মন যে ভেসে চলে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় দুলে
কূলে কূলে
স্রোতের কলকলে।
ভবের স্রোতের কলকলে।

এবার কেড়ে লও এ ভেলা
ঘুচাও খেলা
জলের কোলাহলে।
অধীর জলের কোলাহলে।
এবার তুমি ডুবাও তারে
একেবারে
রসের রসাতলে।
গভীর রসের রসাতলে।

S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৩৯

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪০

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে ।
একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে ।
পথের ধারে বাজবে বেণু,
নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু,
পাখিরা গান গাবে ।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে ।

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি ।
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী ?
কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরানে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিনের জ্যোতি ?
তোমার কাছে আমার এই মিনতি ।

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ভরতে পারি ডালা ।
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা ।

S. S. City of Lahore
রোহিত সাগর
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪১

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার যে নিবল বাতি
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

রোহিত সাগর
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে।
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

শান্তিনিকেতন
২৮ আশ্বিন ১৩২০

৪৩

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।

আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগর-সন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না।

পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেমনি করে আমার হৃদয়-ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না।

শান্তিনিকেতন
২৯ আশ্বিন [১৩২০]

৪৪

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার
নামেরি ঝংকার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা।

সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম, বঁধু।

শান্তিনিকেতন
২ কার্তিক ১৩২০

৪৫

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ।
ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালোবেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

শান্তিনিকেতন
১ কার্তিক [১৩২০]

৪৬

কেবল থাকিস সরে সরে
পাস নে কিছুই হৃদয় ভরে।
আনন্দভাণ্ডারের থেকে
দূত যে তোরে গেল ডেকে,
কোণে বসে দিস নে সাড়া
সব খোয়ালি এমনি করে।

জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিস নে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যেটুকু দিন বাকি আছে—
কাটাস নে তা ঘুমের ঘোরে।

শান্তিনিকেতন
৫ কার্তিক [১৩২০]

৪৭

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমিই আমার বন্ধু,
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ।

দুঃখরথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সংকট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ।

শত্রু আমারে কর গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ।

বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ!

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০

৪৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে?

যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে ?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারি
তখন পরান আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে ?

শান্তিনিকেতন
১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৪৯

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে
সুগন্ধ ধন লুটবে।

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব
দেবার মতো ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার লুটবে।

১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৫০

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র ।।
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি।
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি ।।
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য ।।

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ ।
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান ।।
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত ।
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র ।।
জাগব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান ।
ছাড়ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ ।।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ [১৩২০]

৫১

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা ।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা ।

তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে ।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি
চিত্তগগনপারে ।

তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি
ওগো কবি
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা
ওই মহিমা
আর যাবে না ঢাকা ।

তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন-'পরে ।

তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে ।

শান্তিনিকেতন
১৪ পৌষ ১৩২০

৫২

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা ।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা ।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা ।

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে ।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে ।
মায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা ।

১৫ পৌষ ১৩২০

৫৩

জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে
কোন্ আলো ওই বেড়ায় দুলে ?
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই
বসে বসে বিজন কূলে ।
ভাসে তবু যায় না ভেসে,
হাসে আমার কাছে এসে,
দু-হাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই
মনে করি আনব তুলে ।

শান্ত হ রে শান্ত হ মন,
ধরতে গেলে দেয় না ধরা—
নয় সে মণি নয় সে মানিক
নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া ।

দূরে কাছে আগে পাছে,
মিলিয়ে আছে, ছেয়ে আছে,
জীবন হতে ছানিয়ে তারে
তুলতে গেলে মরবি ভুলে।

শান্তিনিকেতন
১৫ পৌষ ১৩২০

৫৪

কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেছ নাম ধরে—
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমের ঘোরে।
পুলকে প্রাণ ছেয়ে সেদিন
উঠেছি গান গেয়ে,
দুটি আঁখি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে।

দূর যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাই নে কথা বলে
সেদিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে।

শান্তিনিকেতন
২৯ মাঘ ১৩২০

৫৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তার
পরান-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা।

আমার দুটি মুগ্ধনয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।

দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা-অতলা।

শান্তিনিকেতন
মাঘী পূর্ণিমা। ২৮ মাঘ ১৩২০

৫৬

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে,
তখন দেখতে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে।

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ওই চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে।

শিলাইদহ
১২ ফাল্গুন ১৩২০

৫৭

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কী জানি তার নাম।
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে,
ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাই নি তাহার দাম।

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধরে।
ভুবন ভরে আছে যেন
পাই নে জীবন ভরে।
সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে 'চাই নে, চাই নে'
বাজে অবিশ্রাম।

শিলাইদহ
১২ ফাল্গুন [১৩২০]

৫৮

বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন-মাঝে রে।
মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে,
মরি লাজে রে।

থামা রে ঝংকার।
নীরব হয়ে দেখ্ রে চেয়ে
দেখ্ রে চারি ধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ওই
তোরি কাজে রে।

শিলাইদহ
১৪ ফাল্গুন ১৩২০

৫৯

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী।

টেনেছিল কতই কান্নাহাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
শুধায় সবাই হতভাগ্য বলে
"মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে?"
জানি জানি নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি।

শিলাইদহ
১৪ ফাল্গুন ১৩২০

৬০

সকল দাবি ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটা মনকে বোঝাই,
বুঝবে অবোধ কবে?

নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে
পাস নি যা তার হিসাব পেতে,
শুনিস নে তাই ভাণ্ডারেতে
ডাক পড়ে তোর যবে।

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায়
অশ্রু মুছে মুছে,
চোখের জলে দেখতে না পাস
দুঃখ গেছে ঘুচে।
সব আছে তোর ভরসা যে নেই,
দেখ চেয়ে দেখ্ এই যে সে এই,
মাথা তুলে হাত বাড়ালেই
অমনি পাবি তবে।

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬১

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক,
"কী নিলি তোর দান?"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কী বা আছে?
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই কখানি গান।

ঘরে আমার রাখতে যে হয়
বহুলোকের মন।
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য প'রে
করব মূল্যবান।

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬২

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে,
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি তার অন্ত আছে।
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার।

পথের ধারে ছায়াতরু
নাই তো তাদের কথা,
শুধু তাদের ফুল-ফোটানো
মধুর ব্যাকুলতা।
দিনের আলো হলে সারা
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে
কয় না কিছু আর।

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন ১৩২০
সন্ধ্যা। কলিকাতায় যাত্রার পূর্বে

৬৩

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে
পাপড়ি হেথা লুটায় ছিন্ন।
এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে জানাল তাই,
এমন করে আমারে হায়
কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন।

তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো,
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙিন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিলল না যে,
রইল বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ।

কুষ্টিয়ার মুখে। পালকি পথে
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে,
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি সম,
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

কলিকাতা
১৬ ফাল্গুন ১৩২০

৬৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন-দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।

শান্তিনিকেতন
১৮ ফাল্গুন ১৩২০

৬৬

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন করে
ফেল আমার মুখের 'পরে
আপনি থাক আলোর পিছনে।

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২০

৬৭

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে।

অন্ধকারে রইনু পড়ে
স্বপন-মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি।
সকালবেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের 'পরে।

শান্তিনিকেতন
২৩ ফাল্গুন ১৩২০

৬৮

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে,
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,

নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফাল্গুন ১৩২০

৬৯

তোমার কাছে শান্তি চাব না।
থাক্-না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার 'পরে
বসো বসো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা।

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে,
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে—
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা।

শান্তিনিকেতন
২৬ ফাল্গুন ১৩২০

৭০

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাই নে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর
হৃদয়-মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।

কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে।

শান্তিনিকেতন
২৮ ফাল্গুন ১৩২০

৭১

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমের তো নাই ক্ষয়।
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর,
সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়।

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কি গো তাই বলে?
এই খেলাতে আমার সনে
হার মানো যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়।

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন ১৩২০

৭২

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম বলে
যেমন খুশি এলেম চলে
ভয় করি নি তোমায় আমি
অন্ধকারে।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে,
ফিরে যা রে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।

শান্তিনিকেতন
১ চৈত্র ১৩২০

৭৩

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।

সকাল-সাঁঝে সুর যে বাজে
ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা,
এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি ?

শান্তিনিকেতন
২ চৈত্র ১৩২০

৭৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এপারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে
যে সুর আনে সঙ্গে করে
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পরান লয় রে কাড়ি।

কার কথা যে জানায় তারা
জানি নে তা।
হেথা হতে কী নিয়ে বা
যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি।

শান্তিনিকেতন
৩ চৈত্র ১৩২০

৭৫

জীবন আমার চলছে যেমন
তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চলে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে—
তাদের আমি চাব, তারা
আমায় চাবে।

জীবন আমার পলে পলে
এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে-জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সে-ও
আমায় চাবে।

শান্তিনিকেতন
৫ চৈত্র ১৩২০

৭৬

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার বোসো হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে,
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে।
মাঝি, এবার বোসো হালে।

দিন গিয়েছে এল রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথি।
কাটো বাঁধন, দাও গো ছাড়ি,
তারার আলোয় দেব পাড়ি,
সুর জেগেছে যাবার কালে।
মাঝি, এবার বোসো হালে।

শান্তিনিকেতন
৬ চৈত্র ১৩২০

৭৭

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেমনি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে।

শান্তিনিকেতন
৭ চৈত্র ১৩২০

৭৮

আরো চাই যে, আরো চাই গো—
আরো যে চাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই।
সকালবেলার আলোয় ভরা
এই যে আকাশ-বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-মাঝে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন যে বাইরে, আমার
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই।

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।
দিন-রজনীর বাঁশি পুরে
যে গান বাজে অসীম সুরে,
তারে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।

আপন গান যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।

শান্তিনিকেতন
৮ চৈত্র ১৩২০

৭৯

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া
সে-ও আমার পাওয়া,
তাই তো পরান পরানপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে।

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে!
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে
যাব কাহার ঘরে,
যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে।

৯ চৈত্র [১৩২০]

৮০

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে।

১৩ চৈত্র [১৩২০]

৮১

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়;
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

শান্তিনিকেতন
১৬ চৈত্র ১৩২০

৮২

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী,
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ।

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই
দখিন সমীরণ।

১৫ চৈত্র ১৩২০

৮৩

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে?

দিয়ে দুঃখ-সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে।

শান্তিনিকেতন
১৬ চৈত্র ১৩২০

৮৪

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা।

আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে
আপনা নিয়ে করব যতই
বেচা-কেনা।

শান্তিনিকেতন
১৭ চৈত্র ১৩২০

৮৫

বল তো এই বারের মতো,
প্রভু, তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝরে,
কিছু বা ফল আছে ধরে,
বছর হয়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত।

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ওই যে মেতে ওঠে নদী।
পার করে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত।

২২ চৈত্র [১৩২০]

৮৬

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাকব পড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে,
কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

২২ চৈত্র [১৩২০]

৮৭

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।

কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইশারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখির মুখে এই যে খবর পেনু।

২৩ চৈত্র [১৩২০]

৮৮

সকাল-সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে ।
আমি কেবল বসে আছি,
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে,
সকাল-সাঁজে ।

এ পথ বেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে ।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধুলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে,
সকাল-সাঁজে ।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৮৯

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে ।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে ?
আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে ।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কী গুণ আছে
কে জানে ।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯০

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
কেন পাগল কর এমন ক'রে ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরানখানি দেয় যে ভ'রে ।
পাগল করে এমন ক'রে ।

সোনার আলো কেমনে হে,
রক্তে নাচে সকল দেহে ।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হ'রে ।
পাগল করে এমন ক'রে ।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯১

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত ?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো ?
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু,
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়
এমন ভাগ্যহত ।

তখন আলসেতে বসে ছিলেম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা
বাজবে পায়ে পায়ে ।
তবু ওই বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার
গভীর হৃদয়ক্ষত ।

শান্তিনিকেতন
২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯২

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়-পানেই চাই নি।
আমার সকল ভালোবাসায়,
সকল আঘাত, সকল আশায়,
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাই নি।

তুমি মোর আনন্দ হয়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলে ছিলেম,
কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি
তোমার গান তো গাই নি।

কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে
২৫ চৈত্র [১৩২০]

৯৩

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে?
বনে তোর লাগাস আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম-'পরে মরিস যুঝে।

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি।
যে আলো শত ধারায় আঁখি-তারায় পড়ে ঝরে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে।

কলিকাতা
২৬ চৈত্র [১৩২০]

৯৪

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে
গানে গানে।

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে।

কলিকাতা
২৭ চৈত্র [১৩২০]

৯৫

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার ব'লে ছলে বলে
কে বলো আর রাখবে এঁটে।

আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে
রাত্রিদিবা।
আমি কি জানি নে তার অর্থ কী বা?
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো,
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে।

কলিকাতা
২৭ চৈত্র [১৩২০]

৯৬

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের
আলোক হানি।

সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে ;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুটবে বাণী ।

আমার বীণাখানি পড়ছে আজি
সবার চোখে ।
হেরো তারগুলি তার দেখছে গুনে
সকল লোকে ।
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে করুণ রবে ;
যখন তুমি তারে বুকের 'পরে
লবে টানি ।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩২১

৯৭

তোমার মাঝে আমারে পথ
ভুলিয়ে দাও গো, ভুলিয়ে দাও ।
বাঁধা পথের বাঁধন হতে
টলিয়ে দাও গো, দুলিয়ে দাও ।
পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব—
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও ।

কেউ বা ওরা ঘরে ব'সে
ডাকে মোরে পুঁথির পাতায় ।
কেউ বা ওরা অন্ধকারে
মন্ত্র প'ড়ে মনকে মাতায় ।
ডাক শুনেছি সকলখানে
সে কথা যে কেউ না মানে ;
সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও ।

শান্তিনিকেতন
২ বৈশাখ ১৩২১



নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের সুধীসমাজ -কর্তৃক রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা

শান্তিনিকেতন, নভেম্বর ১৯১৩

হিমাংশুমোহন গুপ্ত -কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ। সুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে

৯৮

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
এল এল এল গো । (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো ।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে
এল এল এল গো ।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো ।

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো ।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো ।
হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো ।
তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো
ওই আলোতে জ্বেলো গো ।

শান্তিনিকেতন
৩ বৈশাখ ১৩২১

৯৯

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই ।
তারে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ ।
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই ।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই ।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ ।
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তার অকারণের হর্ষ ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই ।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই ।

সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩২১

১০০

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
ওরা আমার হৃদয়পানে মুখ তুলে যে থাকে।
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে, ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মুখে তবু
প্রভু, তোমার মুখের সোহাগ-বাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
প্রাতের পরে প্রাতে ওরা, রাতের পরে রাতে
তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে।
তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়াটি ওদের মুখে আছে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩২১

১০১

আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে।

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমায় ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩২১

১০২

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর।

এই তোমারি পরশরাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।

রামগড়। হিমালয়
৩১ বৈশাখ [১৩২১]

১০৩

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে ।
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে ।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ?

রামগড়
১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে ।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ।

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া ।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া ।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে ।

রামগড়
৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]

১০৫

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা ?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
চিনি নাই তো আমি তারে,
আঘাত করি বারে বারে,
তার বাণীরে হাহাকারে,
ডুবায় আমার কাঁদনা ।

তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে।
দিনে রাতে চুরি ক'রে
এনেছি তাই লুটে যে।
তারি সাথে মিলব আসি,
এক সুরেতে বাজবে বাঁশি,
তখন তোমার দেখব হাসি,
ভরবে আমার চেতনা।

রামগড়
৪ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]

১০৬

এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে ?
হাসিতে আকাশ ভরিলে।
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা-কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে।

ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে।
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে।

রামগড়
৫ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]

১০৭

সন্ধ্যা হল গো—
ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো,
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধারমাঝে হোক-না জড়ো।

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।

তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি আমায় চুমি
কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে মা,
তোমার করে সকল হরো।

রামগড়
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। রাত্রি

১০৮

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।

গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে !
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে।

রামগড়
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৯

আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনে
ডাইনে বাঁয়ে
পূজার ছায়ে।
ওরা মিশায় ওদের নীরব কান্তি
আমার গানে
আমার প্রাণে।
ওরা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদের
সকল গায়ে
পূজার ছায়ে।

হেথায় সাড়া পেল বাহির হল
প্রভাত-রবি
অমল-ছবি।

সে যে আলোটি তার মিলিয়ে দিল
আমার মাথে
প্রণাম-সাথে।
সে যে আমার চোখে দেখে নিল
আমার মায়ে
পূজার ছায়ে।

রামগড়
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১১০

আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের
বহুক-না তুফান।
রসের বরিষনে
তারে মিলাও সবার সনে,
অঞ্জলি মোর ছাপিয়ে দিয়ে
হোক সে তোমার দান।

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত করো তাকে।
যেমন তোমার তারা,
তোমার ফুলটি যেমন ধারা.
তেমনি তারে তোমার করো
যেমন তোমার গান।

রামগড়
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১১১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।

এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র-ভাষণে।
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।

কলিকাতা
৩ আষাঢ় ১৩২১

গীতালি

আশীর্বাদ

এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি ব'লে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই ;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩২১
রাত্রি

গীতালি

১

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নামল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থামল।

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিটল সে পরশের
তিয়াষা।

এতদিনে জানলেম
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য।

ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।

শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩২১

২

তুমি আড়াল পেলে কেমনে
এই মুক্ত আলোর গগনে ?
কেমন করে শূন্য সেজে
ঢাকা দিলে আপনাকে যে,
সেই খেলাটি উঠল বেজে
বেদনে—
আমার প্রাণের বেদনে।

আমি এই বেদনার আলোকে
তোমায় দেখব দ্যুলোক-ভূলোকে।
সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা,
সেই কথাটি দেবে ধরা
জীবনে—
আমার গভীর জীবনে।

শান্তিনিকেতন
৪ ভাদ্র ১৩২১

৩

বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে।
পথ জুড়ে কী করবি বড়াই ?
সরতে হবে।
লুঠ-করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধুলায়
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।

নীচে বসে আছিস কে রে,
কাঁদিস কেন।
লজ্জা-ডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস কেন।
ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে।

শান্তিনিকেতন
৪ ভাদ্র ১৩২১

৪

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি,
সেথায় চরণ পড়ে,
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরান
কাঁপছে ব্যথার ভরে গো
কাঁপছে থরথরে।
ব্যথা-পথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি,
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে।

নয়নজলের বন্যা দেখে
ভয় করি নে আর,
আমি ভয় করি নে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার!
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইছে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি
ঠেকব চরণ-'পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে।

কলিকাতা
৬ ভাদ্র ১৩২১

৫

আলো যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে
সোনার রেখা।
এবারে ঘুচল কি ভয়।
এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালির লেখা।

কারে ওই
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?

ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্‌ নয়ন তুলে—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা।

কলিকাতা
৬ ভাদ্র ১৩২১

৬

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্মে আমায়
মারবে হিয়ার কাছে?
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি,
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।

মারকে তোমার
ভয় করেছি বলে
তাই তো এমন
হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যেদিন সে ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩২১

৭

সুখে আমায় রাখবে কেন
রাখো তোমার কোলে;
যাক-না গো সুখ জ্বলে।
যাক-না পায়ের তলার মাটি,
তুমি তখন ধরবে আঁটি,
তুলে নিয়ে দুলাবে ওই
বাহু-দোলার দোলে।

যেখানে ঘর বাঁধব আমি
আসে আসুক বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাই নে পরিত্রাণ।

হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেব, তোমায় আমি
ধরব যে তাই হলে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩২৮

৮

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

সুরুল
৮ ভাদ্র। বুধবার [১৩২১]

৯

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে।

সুরুল
৮ ভাদ্র [১৩২১]

১০

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে ?
কে রে এমন জাগায় তোকে ?
চেয়ে আছিস আপন মনে
ওই যে দূরে গগন-কোণে,
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে ।

রক্তশতদলের সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস আজি ?
কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড়-হাতে তুই ডাকিস কারে ?
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে ।

সুরুল
৯ ভাদ্র [১৩২১]

১১

আমি যে আর সইতে পারি নে ।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারি নে ।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে ।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্মরে ।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারি নে ।

সুরুল
৯ ভাদ্র [১৩২১]

১২

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে ।
আজ ধুলার আসন ধন্য করে
বসবে কি মোর সাথে ।

রচবে তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হয়ে তোমার পানে
চাইব গো জোড় হাতে।

এরা সবাই কী বলে যে
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল
কী মাধুরীর ভার।
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখবে না কি আড়াল করে,
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে।

সুরুল
৯ ভাদ্র ১৩২১

১৩

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ, সকল ধরা,
বর্ষণেরই বাণী-ভরা।
ঝরঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।

সুরুল
১০ ভাদ্র [১৩২১]

১৪

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার।

ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে
গাঁথা তোমার করে সারা।

সুরুল
১০ ভাদ্র [১৩২১]

১৫

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণমাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি,
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু
পড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৬

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ওই চরণ-মূলে ?
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা খেতে।

জানি গো আজ হাহারবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

সুরুল
১ ভাদ্র [১৩২১]

১৭

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।
এতদিন যা সংগোপনে
ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
ওই যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
রয়েছে কান পাতি।
বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা।

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৮

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য করো
দহন-দানে।
আমার এই
দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ওই
দেবালয়ের
প্রদীপ করো,

নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে ।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে ।

আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক তারা
নব নব ।
নয়নের
দৃষ্টি হতে
ঘুচবে কালো,
যেখানে
পড়বে সেথায়
দেখবে আলো,
ব্যথা মোর
উঠবে জ্বলে
উর্ধ্ব-পানে ।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে ।

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৯

হৃদয় আমার প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে ।
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে
বাতাসে বাতাসে ।
এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা
উদাস হয়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে ।

বাইরে তুমি নানা বেশে
ফের নানান ছলে ;
জানি নে তো আমার মালা
দিয়েছি কার গলে ।

আজ কী দেখি পরানমাঝে
তোমার গলায় সব মালা যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে।

সুরুল
১৩ ভাদ্র [১৩২১]

২০

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর-এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

মরণেরই পথ দিয়ে ওই
আসছে জীবন-মাঝে
ও যে আসছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

সুরুল
১৪ ভাদ্র [১৩২১]

২১

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায় ?
আমার ঘরে থাকাই দায় ।

সুরুল
১৫ ভাদ্র [১৩২১]

২২

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা ।
এরই গোপন হৃদয়-'পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা ।

বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে ।
দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভরা ।

সুরুল
১৬ ভাদ্র [১৩২১]
সন্ধ্যা

২৩

যে থাকে থাক্-না দ্বারে,
যে যাবি যা-না পারে ।
যদি ওই ভোরের পাখি
তোরই নাম যায় রে ডাকি,
একা তুই চলে যা রে ।

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে ।
ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তার আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে ।

সুরুল
১৭ ভাদ্র [১৩২১]
সকাল

২৪

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি
আমি ডুবতে রাজি আছি।
সকাল আমার গেল মিছে,
বিকেল যে যায় তারই পিছে ;
রেখো না আর, বেঁধো না আর
কূলের কাছাকাছি।

মাঝির লাগি আছি জাগি
সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে
করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি করব মিতে,
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র [১৩২১]
বিকাল

২৫

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তার
যা-কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে—
একলা পথে চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

শান্তিনিকেতন
১৮ ভাদ্র [১৩২১]

২৬

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

মানিক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরনের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গিতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি'।

সুরুল
১৯ ভাদ্র [১৩২১]

২৭

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।

মাটির 'পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার-মাঝে
দেখি না যে চক্ষে তারে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির করলি যারে।

সুরুল
২১ ভাদ্র [১৩২১]

২৮

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্বত,
মোর বীর্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়।

সুরুল
২২ ভাদ্র [১৩২১]

২৯

এবার আমায় ডাকলে দূরে।
সাগরপারের গোপন পুরে।
বোঝা আমার নামিয়েছি যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু
এবার যে ভোগ করবে বঁধু।
তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বালবে আনি,
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে।

সুরুল
২৩ ভাদ্র [১৩২১]

৩০

নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী?
কেবলই কি ঢেউ আছে তোর?
হায় রে লাজে মরি।
ঝড়ের কালো মেঘের পানে
তাকিয়ে আছিস আকুল প্রাণে,

দেখিস নে কি কাণ্ডারী তোর
হাসে যে হাল ধরি' ।

নিশার স্বপ্ন তোর
সেই কি এতই সত্য হল,
ঘুচল না তোর ঘোর ?
প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে, আশার গানে ;
সে খবর কি দেয় নি কানে
আঁধার বিভাবরী ?

শান্তিনিকেতন
২৪ ভাদ্র [১৩২১]

৩১

নাই বা ডাকো, রইব তোমার দ্বারে ;
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে ।
বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে ?
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে ।

রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে ।
জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে ।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বাল
বসে রব সেথায় অন্ধকারে ।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
গোরুর গাড়িতে
২৬ ভাদ্র [১৩২১]

৩২

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে ?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে ?
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছ যে
মরণ-মহোৎসবে ।

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে কর
উৎসব যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ?
এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ওই মুকুটমণি—
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে ।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
২৬ ভাদ্র [১৩২১]

৩৩

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি ।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথি ।
আকাশ-কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করছে মাতামাতি ।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চলতে হবে
গভীর অন্ধকারে ।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্তা কবে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি ।

সুরুল
২৬ ভাদ্র [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৩৪

মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও ।
ওই মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল—
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো মরতে দাও ।
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও ।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে, ভরে না তায় মন—
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও।

সুরুল
২৭ ভাদ্র [১৩২১]

৩৫

কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরানে
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে।
বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে,
পাতায় পাতায় কাঁপে হৃদয়-কাননে,
বাণী তোমার ফোটে লতাবিতানে।

তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগালো,
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো।
তরী আমার আজ প্রভাতের আলোকে
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পুলকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে।

সুরুল
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৬

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হল আমার দায়।
দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে—
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়তে যে ভয় পায়।

আবেশভরে ধুলায় পড়ে
কতই করে ছল,
যখন বেলা যাবে চলে
ফেলবে আঁখিজল।

নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
চিত্ত অবশ, চরণ অলস—
লতার মতো জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়।

শান্তিনিকেতন
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৭

সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা—
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

এমনি করে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্যনূতন সাধনাতে
নিত্যনূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু হাত মেলি—
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
নিত্য নেওয়া তাই।

শান্তিনিকেতন
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৮

শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে।
আঘাত হয়ে দেখা দিল,
আগুন হয়ে জ্বলবে।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে—
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।

পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।

সুরুল
২৮ ভাদ্র [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৩৯

না রে, তোদের ফিরতে দেব না রে
মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
সেই আরামের দ্বারে।
চলতে হবে সামনে সোজা,
ফেলতে হবে মিথ্যা বোঝা,
টলতে আমি দেব না যে
আপন ব্যথাভারে।

না রে, তোদের রইতে দেব না রে
দিবানিশি ধুলাখেলায়
খেলাঘরের দ্বারে।
চলতে হবে আশার গানে
প্রভাত-আলোর উদয়-পানে,
নিমেষতরে পাবি নেকো
বসতে পথের ধারে।

না রে, তোদের থামতে দেব না রে—
কানাকানি করতে কেবল
কোণের ঘরের দ্বারে।
ওই যে নীরব বজ্রবাণী
আগুন বুকে দিচ্ছে হানি—
সইতে হবে, বইতে হবে,
মানতে হবে তারে।

সুরুল
২৮ ভাদ্র [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৪০

মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে।
তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে
ধুলার 'পরে পড়ে থাকিস নে।

ওরে অবশ, ওরে খেপা,
মাটির 'পরে ফেলবি রে পা,
তারে নিয়ে গায়ে মাখিস নে।

ওই প্রদীপ আর জ্বালিয়ে রাখিস নে—
রাত্রি যে তোর ভোর হয়েছে,
স্বপন নিয়ে পড়ে থাকিস নে।
উঠল এবার প্রভাত-রবি,
খোলা পথে বাহির হবি,
মিথ্যা ধুলায় আকাশ ঢাকিস নে।

সুরুল
২৯ ভাদ্র [১৩২১]

৪১

এতটুকু আঁধার যদি
লুকিয়ে রাখিস বুকের 'পরে
আকাশ-ভরা সূর্যতারা
মিথ্যা হবে তোদের তরে।
শিশির-ধোওয়া এই বাতাসে
হাত বুলালো ঘাসে ঘাসে,
ব্যর্থ হবে কেবল যে সে
তোদের ছোটো কোণের ঘরে।

মুগ্ধ ওরে, স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসন-কোণে
ধুলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন-মনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে রবে
কত-না যুগযুগান্তরে।

সুরুল
৩০ ভাদ্র [১৩২১]

৪২

কাঁচা ধানের খেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো,
তেমনি করে আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো।

যেমন করে কালো মেঘে
তোমার আভা গেছে লেগে
তেমনি করে হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেছ গো ।

বসন্তে এই বনের বায়ে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা
তেমনি করে অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা ।
দিয়ে তোমার রুদ্র আলো
বজ্র-আগুন যেমন জ্বাল
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জ্বেলেছ গো ।

সুরুল
৩১ ভাদ্র [১৩২১]

৪৩

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে ।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে ।

এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে
ধরা দিতে হোস না কাতর ।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর ।
মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে ।

শান্তিনিকেতন
১ আশ্বিন [১৩২১]

৪৪

না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।
ভেবেছিলি দিনের শেষে
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
সারা দিনের সকল কাঁদন।

না রে, না রে, হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা।
পথিক বঁধু পাগল করে
পথে বাহির করবে তোরে,
হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে
ফুটবে তবে তাঁর আরাধন।

শান্তিনিকেতন
১ আশ্বিন [১৩২১]

৪৫

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে ?
এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে
সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে।

সুরুল
১ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৪৬

না গো, এই যে ধুলা আমার না এ,
তোমার ধুলার ধরার 'পরে
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।

দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি
রচলে দেহ পূজার থালি,
শেষ আরতি সারা করে
ভেঙে যাব তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হতে
অনেক যে তার গেছে পড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তার নিবল হাওয়ায়—
পৌঁছল না চরণ-ছায়ে।

সুরুল
২ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৪৭

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।
অভয়-মনে কণ্ঠ ছাড়ি
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে
মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে।

সুরুল
২ আশ্বিন [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৪৮

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই—
দেখ্ রে চেয়ে আপন-পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।

ফিরছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে
অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার ফুটে ওঠা,
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে পাই।

সুরুল
২ আশ্বিন [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৪৯

ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জ্বাল'
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
এই তো পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জ্বাল'
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
৭ আশ্বিন [১৩২১]

৫০

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
জীবনে আমার সংগীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

সুরুল
৮ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৫১

খুশি হ তুই আপন মনে।
রিক্ত হাতে চল্‌-না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।
চাস নে কিছু, কোস নে কিছু,
করিস নে তোর মাথা নিচু,
আছে রে তোর হৃদয় ভরা
শূন্য ঝুলির অলখ ধনে।

নাচুক-না ওই আঁধার আলো—
তুলুক-না ঢেউ দিবানিশি
চার দিকে তোর মন্দ ভালো।

তোর তরী তুই দে খুলে দে,
গান গেয়ে তুই পাল তুলে দে—
অকূল-পানে ভাসবি রে তুই,
হাসবি রে তুই অকারণে।

সুরুল
৮ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৫২

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।
কেন রে তোর দু হাত পাতা—
দান তো না চাই, চাই যে দাতা,
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হতে
বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি।

সুরুল
৯ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৫৩

ওরে ভীরু, তোমার হাতে
নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে,
করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কী ভাবনায়।

আসুক-নাকো গহন রাত্রি,
　　হোক-না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে,
　　করবে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস
　　মেঘে আকাশ ডোবা—
আনন্দে তুই পুবের দিকে
　　দেখ্‌-না তারার শোভা।
সাথি যারা আছে তারা
　　তোমার আপন ব'লে
ভাব' কি তাই রক্ষা পাবে
　　তোমারি ওই কোলে?
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক,
　　জাগবে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে,
　　করবে তরী পার।

শান্তিনিকেতন
৯ আশ্বিন [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৫৪

চোখে দেখিস, প্রাণে কানা।
হিয়ার মাঝে দেখ্‌-না ধরে
　　ভুবনখানা।
প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা,
সেথায় তারই আসন পাতা,
বাইরে তারে রাখিস তবু—
　　অন্তরে তার যেতে মানা?

তারই কণ্ঠে তোমার বাণী,
তোরই রঙে রঙিন তারই
　　বসনখানি।
যে জন তোমার বেদনাতে
লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে,
সামনে যে ওই রূপে রসে
　　সেই অজানা হল জানা।

শান্তিনিকেতন
১১ আশ্বিন [১৩২১]

৫৫

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে।
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।
তেমনি করে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি
জীবন-'পরে।

বাজে বলেই বাজাও তুমি—
সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে
সকল স'বে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে।

শান্তিনিকেতন
১৩ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৫৬

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস করে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো।

শান্তিনিকেতন
১৪ আশ্বিন [১৩২১]

৫৭

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
ওই গো বাজে
হৃদয়-মাঝে।
তোমার ঘরে নিশিভোরে
আগল যদি গেল সরে
আমার ঘরে রইব তবে
কিসের লাজে।

অনেক বলা বলেছি, সে
মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে
মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
আপন কাজে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৫৮

প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে
তোমার যে-জন, সে যদি গো
দ্বারে দ্বারে ঘোরে।
কাঁদিয়ে তারে ফিরিয়ে আন,
কিছুতেই তো হার না মান,
তার বেদনায় তোমার অশ্রু
রইল যে গো ভরে।

সামান্য নয় তব প্রেমের দান—
বড়ো কঠিন ব্যথা এ যে,
বড়ো কঠিন টান।
মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলনবেশে,
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধো বাহুর ডোরে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৫৯

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু ।
এই-যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো প্রভু ।

এই দীনতা ক্ষমা করো, প্রভু,
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু ।
দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো প্রভু ।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬০

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী ।
তুমি কি নাথ, দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি—
আমার আর হবে না দেরি ।

আমার কাজ হয়েছে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশি বাজায় সন্ধ্যাতারা ।
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি—
এখন আর হবে না দেরি ।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬১

ওই-যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলংকার ।
ওই সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার ।

ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখির নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।

ওই-যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ওই-যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনাভার।

ওই-যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশিরজলে।
ওই-যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৬২

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে।

চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে,
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,
গভীর শান্তি এ যে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৬৩

এদের পানে তাকাই আমি,
বক্ষে কাঁপে ভয়।
সব পেরিয়ে তোমায় দেখি,
আর তো কিছু নয়।
একটুখানি সামনে আমার আঁধার জেগে থাকে,
সেইটুকুতে সূর্যতারা সবই আমার ঢাকে—
তার উপরে চেয়ে দেখি
আলোয় আলোময়।

ছোটো আমার বড়ো হয় যে
যখন টানি কাছে—
বড়ো তখন কেমন করে
লুকায় তারি পাছে।
কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিন তো গেছে কেটে,
এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে—
এতকাল যে রইলে দূরে
তোমারি হোক জয়।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৬৪

হিসাব আমার মিলবে না তা জানি,
যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি।
করজোড়ে রইনু চেয়ে মুখে
বোঝাপড়া কখন যাবে চুকে,
তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি।

গর্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল তো কাড়বে না কেউ কভু।
নাই বসালে তোমার কোলের কাছে,
পায়ের তলে সবারই ঠাঁই আছে—
ধুলার 'পরে পাতব আসনখানি।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৬৫

মেঘ বলেছে 'যাব যাব',
রাত বলেছে 'যাই'।
সাগর বলে, 'কূল মিলেছে,
আমি তো আর নাই।'
দুঃখ বলে, 'রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে।'
আমি বলে, 'মিলাই আমি,
আর কিছু না চাই।'

ভুবন বলে, 'তোমার তরে
আছে বরণমালা।'
গগন বলে, 'তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।'
প্রেম বলে যে, 'যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে।'
মরণ বলে, 'আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।'

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৬

কাণ্ডারী গো, যদি এবার
পৌঁছে থাক কূলে
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার
হাত ধরে লও তুলে।
ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমায় তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেছে
ঢেউয়ের দোলায় দুলে।

কাণ্ডারী গো, ঘর যদি মোর
না থাকে আর দূরে,
ওই যদি মোর ঘরের বাঁশি
বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাও গো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
পথের বাঁশিখানি তোমার
পথতরুর মূলে।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৭

ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হল মোর গান—
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।
অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি—
ওই হাতে মোর হাত দুটি লও,
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা,
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথ-রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি—
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৮

তোমার ভুবন মর্মে আমার লাগে
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।
এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে সরস—
রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণরাগে।

আমার মনে এই শরতের
আকুল আলোখানি
এক পলকে আনে যেন
বহুযুগের বাণী।
নিশীথ-রাতে নিমেষ-হারা
তোমার যত নীরব তারা
এমন করে হৃদয়-দ্বারে
আমায় কেন মাগে।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৯

তোমার কাছে এ বর মাগি,
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়-মাঝে বেড়ায় ঘুরে
গানের সুরে।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭০

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরান দিক-না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

বোস্‌-না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন লয়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু-
মাখা হয়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্‌ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭১

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ, জয় হবে।

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচবে যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচবে যে।
কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুলবে তোমার তারা-মণির হারে সে,
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।

শান্তিনিকেতন
১৮ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৭২

ওগো আমার হৃদয়বাসী,
আজ কেন নাই তোমার হাসি।
সন্ধ্যা হল কালো মেঘে,
চাঁদের চোখে আঁধার লেগে—
বাজল না আজ প্রাণের বাঁশি।

রেখেছি এই প্রদীপ মেজে,
জ্বালিয়ে দিলেই জ্বলবে সে যে।
একটুকু মন দিলেই তবে
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোলা আছে ফুলের রাশি।

শান্তিনিকেতন
১৮ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭৩

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধুলার 'পরে
ফেল যারে মৃত্যু-শরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে—
ভয় কী বা তার পড়নকে।

আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ,
নয়ন মেলে দেখল না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।
মজল না সে চোখের জলে,
পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যেজন পালঙ্কে।

শান্তিনিকেতন
২৯ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৭৪

আমার সুরের সাধন রইল পড়ে।
চেয়ে চেয়ে কাটল বেলা
কেমন করে।
দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কী যে দেখি বলব কী এ—
গানের মতো চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।

সবুজ সুধা এই ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে ওঠে ভরে
আমার চিতে।
আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মতো নিল তুলি,
আশ্বিনের ওই আঁচলখানি
গেল ভরে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]

৭৫

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে—
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ওই কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।

যেখানে ওই গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাই বা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]

৭৬

ঘরের থেকে এনেছিলেম
প্রদীপ জ্বেলে—
ডেকেছিলেম, 'আয় রে তোরা
পথের ছেলে।'
বলেছিলেম, 'সন্ধ্যা হল,
তোমরা পূজার কুসুম তোলো,
আমার প্রদীপ দেবে পথে
কিরণ মেলে।'

পথের আঁধার পথে রেখে
এলেম ফিরে,
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো
ছেড়েছি রে।
এবার বলি, 'ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধুলায়
দিলেম ফেলে।'

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]

৭৭

সন্ধ্যা হল, একলা আছি ব'লে
এই-যে চোখে অশ্রু পড়ে গ'লে—
ওগো বন্ধু, বলো দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি ।
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে ।

থাক্-না তোমার লক্ষ গ্রহতারা,
তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা ।
সইবে না সে, সইবে না সে,
টানতে আমায় হবে পাশে—
একলা তুমি, আমি একলা হলে ।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭৮

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
কেমনে দিই ফাঁকি—
আধেক ধরা পড়েছি গো,
আধেক আছে বাকি ।
কেন জানি আপনা ভুলে
বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি—
আধেক ধরা পড়েছি যে,
আধেক আছে বাকি ।

বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি
একটি কান্না-ধন ।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে
চায় না কেন আঁখি—
আধেক ধরা পড়েছি যে,
আধেক আছে বাকি ।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৭৯

তোমায় সৃষ্টি করব আমি
এই ছিল মোর পণ।
দিনে দিনে করেছিলেম
তারই আয়োজন।
তাই সাজালেম আমার ধুলো,
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো,
আমার যত রঙিন আবেশ,
আমার দুঃস্বপন।

'তুমি আমায় সৃষ্টি করো'
আজ তোমারে ডাকি—
'ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।
তোমার সত্য, তোমার শান্তি,
তোমার শুভ্র অরূপ কান্তি,
তোমার শক্তি, তোমার বহ্নি
ভরুক এ জীবন।'

শান্তিনিকেতন
২০ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৮০

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য গ্রহ চাঁদ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।
মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদবারি পড়ে ঝরে,
সকল দেহে প্রভাতবায়ু
ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।

তৃণ যে এই ধুলার 'পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চিরনীরব
অমৃতময় বাণী—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,

এই-যে ভুবন দিকে দিকে
পুরায় কত সাধ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন
২০ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৮১

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
পর্দাখানি
ডেকে গেল নিশীথ-রাতে
কে না জানি।
কোন্ গগনের দিশাহারা
তন্দ্রাবিহীন একটি তারা?
কোন্ রজনীর দুঃস্বপনের
আর্তবাণী?
ডেকে গেল নিশীথ-রাতে
কে না জানি।

আঁধার রাতে ভয় এসেছে
কোন্ সে নীড়ে?
বোঝাই তরী ডুবল কোথায়
পাষাণ-তীরে?
এই ধরণীর বক্ষ টুটে
এ কী রোদন এল ছুটে
আমার বক্ষে বিরাম-হারা
বেদন হানি।
ডেকে গেল নিশীথ-রাতে
কে না জানি।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮২

ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে
কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেব না রে।
জাগব বসে সকল রাতি—
ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি
আগুন দিয়ে জ্বালব বারে বারে।

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার কান্না আমায় কেন ডাকে ?
দুঃখ দিয়ে জানাও রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র—
ভয় দিয়েছ, ভয় করি নে তারে।
ব্যথা যখন এল আমার দ্বারে
তারে আমি ফিরিয়ে দেব না রে।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৩

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গনি গনি
বিশ্বলোকের চরণ-ধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি।
কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধুলায় আঁচল পাতি।

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৪

বৃন্ত হতে ছিন্ন করি শুভ্র কমলগুলি
কে এনেছে তুলি।
তবু ওরা চায় যে মুখে নাই তাহে ভর্ৎসনা,
শেষ নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা—
মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী-সংগীত
বাজায় ক্লান্তি ভুলি
শুভ্র কমলগুলি।

এরা তোমার ক্ষণকালের নিবিড়নন্দন
নীরব চুম্বন,

মুগ্ধ নয়ন-পল্লবেতে মিলায় মরি মরি
তোমারি সুগন্ধ-শ্বাসে সকল চিত্ত ভরি—
হে কল্যাণলক্ষ্মী, এরা আমার মর্মে তব
করুণ অঙ্গুলি
শুভ্র কমলগুলি।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৫

বাজিয়েছিলে বীণা তোমার
দিই বা না দিই মন।
আজ প্রভাতে তারি ধ্বনি
শুনি সকল ক্ষণ।
কত সুরের লীলা সে যে
দিনে রাত্রে উঠল বেজে,
জীবন আমার গানের মালা
করেছ কল্পন।

আজ শরতের নীলাকাশে,
আজ সবুজের খেলায়,
আজ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে,
আজ চামেলির মেলায়—
কত কালের গাঁথা বাণী
আমার প্রাণের সে গানখানি
তোমার গলায় দোলে যেন
করিনু দর্শন।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৬

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি—
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিংবা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৭

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টানবে অচিন-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা,
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো,
তাই তো হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে
কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার—
বেড়াই তারি ঘোরে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৮

যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে—
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

রক্ত যে তার মেতে ওঠে
মহাসাগর-কল্লোলে,

ওঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে।
অরুণ-আলোর আশিস লয়ে
অস্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সুখে যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৯

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণ-তলে
তারে আমি ধুয়ে দিলেম
আমার নয়ন-জলে।
বিদায়-পথে যাবার বেলা ম্লান রবির রেখা
সারা দিনের ভ্রমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা,
আমি তাতেই সুর বসালেম
আপন গানের ছলে।

স্বর্ণ আলোর রথে চড়ে
নেমে এল রাত্রি—
তারি আঁধার ভরে আমার
হৃদয় দিনু পাতি।
মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়,
বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়
আমার বাণীর স্রোত মিলিছে
নীরব কোলাহলে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৯০

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার।
কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি
হল আঁধার পার।

বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হল
তাদের মালা গাঁথা।
বহুযুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে।
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৯১

তোমার কাছে চাই নে আমি
অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে যাক-না ফিরে
আপন ঘর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

জানি না এর কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা নয়
জানি না কে কোন্‌টা রাখে কোন্‌টা লয়।
চলবে হৃদয় তোমার পানে
শুধু আপন চলার গানে,
ঝরার সুখে ঝরবে সুরের
এ নির্ঝর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯২

এখানে তো বাঁধা পথের
অন্ত না পাই,
চলতে গেলে পথ ভুলি যে
কেবলই তাই।
তোমার জলে, তোমার স্থলে,
তোমার সুনীল আকাশ-তলে,
কোনোখানে কোনো পথের
চিহ্নটি নাই।

পথের খবর পাখির পাখায়
লুকিয়ে থাকে।
তারার আগুন পথের দিশা
আপনি রাখে।
ছয় ঋতু ছয় রঙিন রথে
যায় আসে যে বিনা পথে,
নিজেরে সেই অচিন পথের
খবর শুধাই।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯৩

যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে
এই তো তোমার কথা ছিল আমার সাথে।
তাই তো আমার অশ্রুজলে
তোমার হাসির মুক্তা ফলে,
তোমার বীণা বাজে আমার বেদনাতে।
যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

পরের কথায় চলতে পথে ভয় করি যে।
জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে।
ভুল আমারে বারে বারে
ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে,
আপন-মনে চলি গো তাই দিনে রাতে।
যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯৪

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
মনে ভাবি পথ ফুরালো—
কোন্ অনাদি কালের আশা
হেথায় বুঝি সব পুরালো।
কখন দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।

আবার কবে নবীন ফুলে
ভরে নূতন দিনের সাজি,
পথের ধারে তরুমূলে
প্রভাতী সুর ওঠে বাজি।
কেমন করে নূতন সাথি
জোটে আবার রাতারাতি,
দেখি রথের চূড়ার 'পরে
নূতন ধ্বজা কে উড়ালো।

বুদ্ধগয়া
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৫

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

বেলা স্টেশন
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৬

জীবন আমার যে অমৃত
আপন-মাঝে গোপন রাখে
প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে
কবে আমি দেখব তাকে।

তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে,
পেয়েছি তো আপন মনে,
গন্ধ তারি মাঝে মাঝে
উদাস করে আমায় ডাকে।

নানা রঙের ছায়ায় বোনা
এই আলোকের অন্তরালে
আনন্দরূপ লুকিয়ে আছে
দেখব না কি যাবার কালে।
যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপনি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বারেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে।

বেলা
পাল্কি-পথে
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৭

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন-ঘোরে।
চিরজীবন আমার বীণা-তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে,
তাই তো আমার নানা সুরের তানে
তোমার পরশ প্রাণে নিলেম ধরে।

আজ তো আমি ভয় করি নে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু-পারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে।

বেলা। পাল্কি-পথে
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৮

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার।

বেলা হইতে গয়ায়
রেল-পথে
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৯

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

এলাহাবাদ
২৯ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

১০০

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।
যেথা আমার গান
হয় গো অবসান
সেথা গানের নীরব পারাবার।

যেথা আমার আঁখি
আঁধারে যায় ঢাকি
অলখ-লোকের আলোক সেথা জ্বলে।
বাইরে কুসুম ফুটে
ধুলায় পড়ে টুটে,
অন্তরে তো অমৃত-ফল ফলে।
কর্ম বৃহৎ হয়ে
চলে যখন বয়ে
তখন সে পায় বৃহৎ অবকাশ।
যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ।

এলাহাবাদ
২৯ আশ্বিন [১৩২১]

১০১

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

এলাহাবাদ
৩০ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

১০২

তোমায় ছেড়ে দূরে চলার
নানা ছলে
তোমার মাঝে পড়ি এসে
দ্বিগুণ বলে।
নানান পথে আনাগোনা
মিলনেরই জাল সে বোনা,
যতই চলি ধরা পড়ি
পলে পলে।

শুধু যখন আপন কোণে
পড়ে থাকি
তখনি সেই স্বপন-ঘোরে
কেবল ফাঁকি।
বিশ্ব তখন কয় না বাণী,
মুখেতে দেয় বসন টানি,
আপন ছায়া দেখি আপন
নয়ন-জলে।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১৩২১]

১০৩

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উজিয়ে যেতে চাই যতবার
গর্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই যে বুকে।
আলো যখন আলসভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১৩২১]
সন্ধ্যা

১০৪

কেমন করে তড়িৎ-আলোয়
দেখতে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে রটে,
একটু তারি আভাস কেবল
দেখি ক্ষণে ক্ষণে।

মনে ভাবি, কান্নাহাসি
আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে
আমারই ঢেউ-খেলা।
সেই আমি তো বাহনমাত্র,
যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র—
যা রেখে যায় তোমার সে ধন
রয় তা তোমার সনে।

তোমার বিশ্বে জড়িয়ে থাকে
আমার চাওয়া পাওয়া।
ভরিয়ে তোলে নিত্যকালের
ফাল্গুনেরই হাওয়া।
জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায় শ্রীচরণে।

আপন-মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হয়ে
আমায় তখন বাঁধে।
মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ—
আমার মাঝে হে আনন্দ,
তোমার প্রকাশ দেখে মোহ
ঘুচল এ নয়নে।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১৩২১]
সন্ধ্যা

১০৫

এই নিমেষে গণনাহীন
নিমেষ গেল টুটে—
একের মাঝে এক হয়ে মোর
উঠল হৃদয় ফুটে।
বক্ষে কুঁড়ির কারায় বন্ধ
অন্ধকারের কোন্ সুগন্ধ
আজ প্রভাতে পূজার বেলায়
পড়ল আলোয় লুটে।

তোমায় আমায় একটুখানি
দূর যে কোথাও নাই—
নয়ন মুদে নয়ন মেলে
এই তো দেখি তাই।
যেই খুলেছি আঁখির পাতা,
যেই তুলেছি নত মাথা,
তোমার মাঝে অমনি আমার
জয়ধ্বনি উঠে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক [১৩২১]
প্রভাত

১০৬

যাস নে কোথাও ধেয়ে,
দেখ্ রে কেবল চেয়ে।
ওই যে পুরব গগন-মূলে
সোনার বরন পালটি তুলে
আসছে তরী বেয়ে—
দেখ্ রে কেবল চেয়ে।

ওই-যে আঁধার তটে
আনন্দ-গান রটে।
অনেক দিনের অভিসারে
অগম গহন জীবন-পারে
পৌঁছিল তোর নেয়ে।
দেখ্ রে কেবল চেয়ে।

ওই-যে রে তার তরী
আলোয় গেল ভরি।

চরণে তার বরণডালা
কোন্ কাননের বহে মালা
গন্ধে গগন ছেয়ে।
দেখ্ রে কেবল চেয়ে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক ১৩২১
প্রভাত

১০৭

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা-কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি—
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি।

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
    চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
    ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে—
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা—
    পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক [১৩২১]
সন্ধ্যা

১০৮

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ-মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষনে ;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

এলাহাবাদ
৩ কার্তিক ১৩২১
প্রভাত

সংযোজন

১

কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে
আপনাকে যে আপনি হারায়
কেমনে তার জয় হবে।
শত্রু বাঁধা আলিঙ্গনে
যত প্রণয় তারি সনে—
মুক্ত উদার কোন্ প্রেমে তার লয় হবে।
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।

যে মত্ততা বারে বারে
ছোটে সর্বনাশের পারে
কোন্ শাসনে কবে তাহার ভয় হবে।
কুহেলিকার অন্ত না পাই,
কাটবে কখন ভাবি যে তাই—
এক নিমেষে তুমি হৃদয়ময় হবে।
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।

বোলপুর
৩ শ্রাবণ ১৩১৭

২

জাগো নির্মল নেত্রে
রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে
মুক্তির অধিকারে।
জাগো ভক্তির তীর্থে
পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখ চিত্তে,
জাগো অম্লান প্রাণে।
জাগো নন্দননৃত্যে
সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে।
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে,
জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে
পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে,
জাগো সংগ্রামসাজে,

জাগো ব্রহ্মের নামে,
জাগো কল্যাণকাজে ।
জাগো দুর্গমযাত্রী,
দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ।

৪ আশ্বিন [১৩১৭]

৩

প্রভু আমার, প্রিয় আমার; পরমধন হে ।
চির পথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ।
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবনমরণ হে ।

আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে ।
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে ।
ওগো সবার, ওগো আমার,
বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ।

৫ আশ্বিন [১৩১৭]

৪

তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখো হে রাখো ধরে,
তারে দিয়ো না কভু ছুটি ।
তব আদেশ দিয়ে রজনীদিন দাও হে দাও ভরে,
প্রভু, আমার বাহু দুটি ।
তব পলকহারা আলোক-দিঠি মরম-'পরে রাখো,
যত শরমে মোর শরম দিয়ে নীরবে চেয়ে থাকো,
প্রভু, সকল-ভরা ক্ষমায় তব রাখো আবৃত করে
মোর যেখানে যত ত্রুটি ।
মোরে দিয়ো না দিন সুখের আশে করিতে দিন গত
শুধু শয়ন-'পরে লুটি ।
আমি চাই নি যাহা তাই দিয়ো হে আপন ইচ্ছামতো
আমার ভরিয়া দুই মুঠি ।
মোর যতই তৃষা ততই কৃপা-বরষা এসো নেমে,
মোর যত গভীর দৈন্য তত ভরিয়া তোলো প্রেমে,
মোর যত কঠিন গর্ব তারে হানো ততই বলে—
তাহা পড়ুক পায়ে টুটি ।

১৯ আশ্বিন ১৩১৭

৫

আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে কে জাগে।
ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে কে জাগে।
কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে।
এই অপার অম্বর-পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে কে জাগে।
মম গম্ভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩১৭

৬

আমি অধম অবিশ্বাসী,
এ পাপমুখে সাজে না যে
'তোমায় আমি ভালোবাসি'।
গুণের অভিমানে মেতে
আর চাহি না আদর পেতে,
কঠিন ধুলায় বসে এবার
চরণসেবার অভিলাষী।

হৃদয় যদি জ্বলে তারে
জ্বলিতে দাও, জ্বলিতে দাও।
ঘুরব না আর আপন ছায়ায়,
কাঁদব না আর আপন মায়ায়—
তোমার পানে রাখব ধরে
প্রাণের অচল হাসি।

? ১৩১৭

৭

যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
যদি আমার মলিন মনের কালি
ঘুচাও পুণ্য সলিল ঢালি
তোমার চন্দ্র সূর্য নূতন আলোয়
জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।

আজো ফোটে নি মোর শোভার কুঁড়ি,
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।

যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানের রবে।

? ১৩১৭

৮

লো, আমার সনে তোমার কী শত্রুতা।
আমায় মারতে কেন এতই ছুতা।
একে একে রতনগুলি
হার থেকে মোর নিলে খুলি,
হাতে আমার রইল কেবল সুতা।

গেয়েছি গান, দিয়েছি প্রাণ ঢেলে,
পথের 'পরে হৃদয় দিলেম মেলে।
পাবার বেলা হাত বাড়াতেই
ফিরিয়ে দিলে শূন্য হাতেই—
জানি জানি তোমার দয়ালুতা।

৭ ভাদ্র [১৩২১]

৯

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন।
পার আছে এর— এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত
এইখানে সব হবে গত—
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে
বিপুল সান্ত্বন।

মরণ যে তোর নয় রে চিরন্তন।
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি,
ছিঁড়বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে
পূজার কুসুম ঝরে পড়ে
যাবার বেলায় ভরি থালায়
মালা ও চন্দন।

সুরুল
১ আশ্বিন [১৩২১]

১০

ওগো, আপন রসে মাতে কারা,
তোমার রস যে পায় না।
আপনাকে যে খায় গো তারা,
তোমার প্রসাদ খায় না।
প্রেমের চোখে দুঃখে সুখে
চায় না তারা তোমার মুখে,
আপ্নারি মুখ দেখছে নিয়ে
সোনায় বাঁধা আয়না।
তারা রাত্রি-দিবস ফিরে ফিরে
আপ্নাকেই যে বেড়ায় ঘিরে।

? [আশ্বিন ১৩২১]

পাণ্ডুলিপিতে লেখক কর্তৃক বর্জনচিহ্নাঙ্কিত। অসম্পূর্ণ ?

১১

আমার বোঝা এতই করি ভারী—
তোমার ভার যে বইতে নাহি পারি।
আমারি নাম সকল গায়ে লিখা,
হয় নি পরা তব নামের টিকা—
তাই তো আমায় দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।

আমার ঘরে আমিই শুধু থাকি,
তোমার ঘরে লও আমারে ডাকি।
বাঁচিয়ে রাখি যা-কিছু মোর আছে
তার ভাবনায় প্রাণ তো নাহি বাঁচে—
সব যেন মোর তোমার কাছে হারি।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন ১৩২১

বলাকা

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর
৭ মে ১৯১৬



রবীন্দ্রনাথ
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক অঙ্কিত

বলাকা

১

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে

লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায় ।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা ।

শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি ।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা ।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা ।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে ।
বিবাগী কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে ।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা ।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা ।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি ।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা ।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩২১

২

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো ।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো ।
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো ।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো ।

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
এইবেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।
চাহিস নে আর আগুপিছু,
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নিচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

ছি ছি রে ওই চোখের জল আর ফেলিস নে।
ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস নে।
কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক-না তোর দ্বারের শিকল,
বাহিরপানে ছোট্-না সকল
দুঃখসুখের শেষে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না।
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল— সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয় রে সেজে
আয়-না বধূর বেশে গো।
ওই বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।

রামগড়
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৩

আমরা চলি সমুখপানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত-পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়,
যাব তাদের লঙ্ঘি।
একলা পথে করি নে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রামগড়
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৪

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে
এ কী রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই যে অভয় শঙ্খ।

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা।
এই কি আমার সন্ধ্যা।
গাঁথব রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।

যৌবনেরই পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্‌বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।

দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

রামগড়
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৫

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ওই যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ-দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূলছাড়া মোর নেয়ে।

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে।
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে।
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে।
নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
আসছে তরী বেয়ে।
নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে।

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ওই যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আসতে তরী বেয়ে।
বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,

দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে।

কলিকাতা
৫ ভাদ্র ১৩২১

৬

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়,
এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হল কত কাল ।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে ।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তূলিকা ধরি রসের মুরতি ।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী ।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি ।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে ।
চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ;
পথের দু ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী ।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে—
মেতেছি পথের প্রেমে ।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে ।
এই তৃণ, এই ধূলি— ওই তারা, ওই শশী-রবি,
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি ।

কী প্রলাপ কহে কবি ।
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি ।

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ।
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন ।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হত স্বপনের ।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল ।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল ।
ভুলি নে কি তারা ।
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর ।
ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা ।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল ।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল ।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে ।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি ।
নও ছবি, নও তুমি ছবি ।

এলাহাবাদ
৩ কার্তিক ১৩২১
রাত্রি

৭

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান ।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা ।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই ।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে ।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল ।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি ।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয় ।
নাই নাই, নাই যে সময় ।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে;

তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবত মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা— কে বলে যে ভোল' নাই।
কে বলে রে খোল' নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার।
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—

তাই এ-ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে ।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার ।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই ।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে ।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা ।
তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
'যত দূর চাই
নাই নাই, সে পথিক নাই ।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত ।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে ।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই ।'

এলাহাবাদ
১৫ কার্তিক ১৩২১
রাত্রি

৮

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে-অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা— ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;

নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া,
স্খলিয়া স্খলিয়া

চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ
৩ পৌষ ১৩২১
রাত্রি

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ।
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী ;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারো মাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ।

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে-রাজবিরহী
বিরহের রত্নখানি ;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।

নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক ।
আকাশ তাহার 'পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন ;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ ।

সম্রাটমহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী ।
সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে ।
অঙ্গ ধরি সে-অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি ।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী ।

সম্রাটের মন,
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা ।

এলাহাবাদ
৫ পৌষ ১৩২১
প্রভাতে

১০

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান।
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির 'পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।
কী তোমারে দিব আনি।
সন্ধ্যাদীপখানি ?
এ-দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
তার ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে।
নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,

দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,
সেই আলো অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না-চাহিতে না-জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

শান্তিনিকেতন
১০ পৌষ ১৩২১

১১

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়।
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে ;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;

সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা
তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধুলা দিয়ে যারা চলে যায়।
হে সুন্দর,
তোমার বিচারঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্যসমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গকূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে ;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধরো, প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার।
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তারা, মুগ্ধ তারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
চোরা ধন দুর্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার—
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার।
চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে ;
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে ;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে-বাতাসে কোথা যায় বয়ে।
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩২১

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিনরাত ;
কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে ;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।

নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন ;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধুলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,
আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে ।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে,
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে ।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
আজি আর
পারি না বহিতে ।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা ।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত-সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায় ।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে ।
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধুলায় ফেলিয়া টানি,
সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে ।

শান্তিনিকেতন
১৩ পৌষ ১৩২১

১৩

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায়ে উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ-বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধুমধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

লিখেছে সে—
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

সুরুল
২৩ পৌষ ১৩২১

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেইমত আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

শান্তিনিকেতন
২৬ পৌষ ১৩২১

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

সুরুল
২৭ পৌষ ১৩২১

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি ;
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে ;
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে ।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথি ।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে ।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী ।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর ।

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়-তীরে-তীরে ।
আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল ।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি,
দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে
আকারের অসহ্য পিয়াসে ।

কী জানি কে তারা কবে
কোথা পার হবে
যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি-'পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে।
আজ তারা কোথা হতে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।
অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে।
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম!

সুরুল
২৭ পৌষ ১৩২১

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে;
কী যে হল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধ চক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

সুরুল
২৮ পৌষ ১৩২১

১৮

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত-কিছু বস্তুভার ।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই ;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন ;
ততক্ষণ
চারি দিকে নেমে নেমে আসে আবরণ ;
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন ;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে,পক্ককেশে ।

যখন চলিয়া যাই সে-চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয় ।
পুণ্য হই সে-চলার স্নানে ।
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই ।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে ?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রব না ঘরের কোণে থেমে ।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা ।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন ।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন ।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি ।

সুরুল । প্রাতঃকাল
২৯ পৌষ ১৩২১

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আমার ভুবন।
ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না —
মোর আঁখি একদিন এ আলোকে লুটিবে না —
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;
মোর কানে কানে
রাত্রি কহিবে না তার রহস্যবারতা;
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি মোর শেষ কথা

'বলাকা'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো-অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন ।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো ।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি ।
মোর বাণী
একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ-আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা ।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেইমতো ।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না ।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো ।

সুরুল । প্রাতঃকাল
২৯ পৌষ ১৩২১

২০

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে ।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে ।

যাবার হাওয়া ওই যে উঠেছে— ওগো
ওই যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্-না ভাসিতে।

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা— ওগো
তারি বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে।

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশ-রাশিতে ;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

রেলগাড়ি
২৯ পৌষ ১৩২১

২১

ওরে, তোদের তর সহে না আর ?
এখনো শীত হয় নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান ?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাবলি নে তো সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি করে
উঠলি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
      দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি
তাহার লাগি রইলি নে দিন গুণে,
      আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি।
রাত না হতে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে।
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে!

ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
      দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধুলা
      তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে,
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে।

কলিকাতা
৮ মাঘ ১৩২১

২২

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনো দিকে এক পা বাড়াই,
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই।

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হল ছুটি,
ভাঙল আমার মানের খুঁটি,
খসল বেড়ি হাতে পায়ে;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।

লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায় ?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তি-মদে করল মাতাল ।
খসে-পড়া তারার সাথে
নিশীথরাতে
ঝাঁপ দিয়েছি অতলপানে
মরণ-টানে ।

আমি-যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধনছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে ;
একলা আপন তেজে
ছুটল সে-যে
অনাদরের মুক্তিপথের 'পরে
তোমার চরণধুলায়-রঙিন চরম সমাদরে ।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে ।
তোমার আদর যখন ঢাকে
জড়িয়ে থাকি তারই নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি ।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি ।

শিলাইদা । কুঠিবাড়ি
রাত্রি
১৯ মাঘ ১৩২১

২৩

কোন্‌ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি ।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী ।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী ।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দু-হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

পদ্মাতীরে
২০ মাঘ ১৩২১

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই।
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরই তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,
আকাশ-ভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ,
সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক,
তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝরনাধারায় তাই রে হুলুস্থুল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে,
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

শিলাইদা। কুঠিবাড়ি
২০ মাঘ ১৩২১

২৫

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা
২০ মাঘ ১৩২১

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরন হৃদয়ব্যথার মতো ;
দখিন হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মর কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার
রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,

সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে ।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা ।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি ।
যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারই আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইকো অজানা ।
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা ।
তাই ভেবেছি জীবন-মরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে ।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরই স্বত্বে
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে ।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

২৮

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান ।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান ।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন
আমারে দিয়েছ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন ;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;
সুখস্বপ্ন-রসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্যহাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

পদ্মাতীর
২৪ মাঘ ১৩২১

২৯

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি তবু
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

পদ্মাতীর
২৫ মাঘ ১৩২১

৩০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু-দিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তার পরে তার খবর কী যে ধারি নে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে

অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ,
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি ।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয় ।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বৃদ্ধ জনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি ।

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে ।
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে ।
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না,
সেই কূলে আর ভিড়বে না ।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে ।

ঘণ্টা যে ওই বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ,
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই তো দোলে বুক ।
কোন্‌ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্‌ সাগরের কোন্‌ কূলে গো কোন্‌ নবীনের রঙ্গ ।

পদ্মাতীর
২৬ মাঘ ১৩২১

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই ।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে ।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে ।
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব ।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয় ।

এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি, আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরণ্ময়।

পদ্মা
২৭ মাঘ ১৩২১

৩২

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ওই মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ওই-যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ওই যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায় ;
ওই যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার ওই অনন্ত মাঝে-এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

পদ্মা
২৭ মাঘ ১৩২১

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।
খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুশি তোমার ফাগুনবনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।

আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে,
তোমার সাগর অধিক ক'রে নাচে
দিনের পরে দিনে।
জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

পদ্মা
২৭ মাঘ ১৩২১

৩৪

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।
দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধ'রে
সে-নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

সুরুল
২১ চৈত্র ১৩২১

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে
তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগরজলে
কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

শ্রীনগর। কাশ্মীর
৭ কার্তিক ১৩২২

৩৬

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল— যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে।"

শ্রীনগর
কার্তিক ১৩২২

৩৭

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন;
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।"
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর।"

এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো— জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"
বাহিরিয়া এল কারা। মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল ;
"যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল"
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হল শেষ।"

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে ;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া,

কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

কলিকাতা
২৩ কার্তিক ১৩২২

৩৮

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে দেখতে কি পায় কেউ।
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতনভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয়-যে তারে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিলব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।



রবীন্দ্রনাথ ও পিয়ার্সন
১৯১৬

তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ,
তাই তো বসন রাঙিয়ে পড়ি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফরানী,
আজ তোরা দেখ্ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ-যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া
সাগরপানে ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী।

পদ্মা
১২ অগ্রহায়ণ ১৩২২

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলন্ডের দিকপ্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসংগীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শিলাইদহ
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২২

৪০

এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে-তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সংগীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা
কত যুগে কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।
সেই-সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।
কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

শিলাইদা
৭ ফাল্গুন ১৩২২

৪১

যে-কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।

অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধো-জাগা নয়নের মতো।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা।
চলেছে মাঠের ধারে, ফসল-খেতের যেন মিতা,
নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ-আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচকি কাকলি-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা— এই-সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পদ্মা
৮ ফাল্গুন ১৩২২

৪২

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান।
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোরবেলা :
ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছিনু ঢেলা।
বাতায়ন হতে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে।

ক্ষুধিত দরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম ।
ভেবেছিনু, 'এ কী দায়,
কাজের ব্যাঘাত এ-যে ।' দূর হতে করেছি বিদায় ।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মতো ।
দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি ।
গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি ।
এরই লাগি এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলই ধারিব,
না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ ।

তার পরে অর্ধরাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধুলাতে
মনে হবে আমি বড়ো একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা ।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে ।
বারে বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারে বারে-ফিরে-আসা হয়ে ।

শিলাইদা
৮ ফাল্গুন ১৩২২

৪৩

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে ।
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা ।

চলেছিস রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও মনোরথে ?
নিমেষতরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরই বিষম দোলার দোলে
কাটল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা।
আবার কবে কী সুর বাঁধা হবে
আজকে পালার শেষে।

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রইবে থলি-থালি,
কোথা বা সংসার।
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্-না চলার গান,
বাজা রে একতারা।
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইকো কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই-যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা !

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ ;
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সে-ও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির-নিরুদ্দেশ।

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে,
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুটবে আবার হেসে।

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি
নেব যে তার গান।

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
পরালো মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষতরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্মরে মর্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।

তারে নিয়ে হল না ঘর-বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরই জাল-বোনা।

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন ১৩২২

৪৪

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে।
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া ;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবি-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারি।
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারি।
মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ;
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্ তানের সাধনে।
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে।
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়মেঘে
ঝড়ের ঝংকারে ;
ঢেউয়ের 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে।
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।

খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারই বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব
আলোক-পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুণ্ঠিত।
আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে
রইবি কুণ্ঠিত ?
প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি,
আগুন আছে ঊর্ধ্ব শিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

শান্তিনিকেতন
৪ চৈত্র ১৩২২

৪৫

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।

নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার ।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম ।

মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী—
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী ।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী ।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর ।
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি ;
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী ।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি ।

কলিকাতা
৯ বৈশাখ ১৩২৩

নাটক ও প্রহসন

অচলায়তন

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপে
এই অচলায়তন নাটকখানি
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে
উৎসর্গ করিলাম।

শিলাইদহ
১৫ আষাঢ় ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচলায়তন

১

অচলায়তনের গৃহ

গান

পঞ্চক। তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে,
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! আবার গান।

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে— তোমাদের এখানকার মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই— কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ঐটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই যে বজ্রবিদারণ-মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না, আজ তার কী করলে?

পঞ্চক। সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক। খারাপ! তার মানে কী হল?

পঞ্চক। জিনিসটা যতই পুরোনো হচ্ছে মন ততই লাগছে না, ভুল ততই করছি— ভুল যতই বেশি বার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি, দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাতটা ঘোচাতে হবে নির্বোধ।

পঞ্চক। সহজেই ঘোচে যদি তোমাদেরটাকেই আমার মতো করে নাও। নইলে আমি তো পারব না।

মহাপঞ্চক। পারবে না কী! পারতেই হবে।

পঞ্চক। তা হলে আর-একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে দেখি— একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক। আচ্ছা বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট

স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসন্তানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়— আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক। আবার দাদা। মন্ত্রটা শেষ করো বলছি।

পঞ্চক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— এ মন্ত্রটার ফল কী?

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক। রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়— দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।

মহাপঞ্চক। আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পঞ্চক। লজ্জার তো কোনো কারণ নেই দাদা।

মহাপঞ্চক। কারণ নেই?

পঞ্চক। না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

মহাপঞ্চক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখো পঞ্চক, তুমি তো আর বালক নও— তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে।

পঞ্চক। তাই তো বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তার উলটো দিকে চলে, অথচ তার জন্য যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি— আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না?

পঞ্চক। সচেষ্ট করবার তো কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার তো কিছুমাত্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না।

[প্রস্থান

গান

পঞ্চক।

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না॥

ছাত্রদলের প্রবেশ

প্রথম ছাত্র। ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক। না ভাই, আমাকে বিরক্ত কোরো না।

দ্বিতীয় ছাত্র। কেন? হল কী তোমার?

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় ছাত্র। এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘুচল না? ও যে আমাদের কোন্ কালে শেষ হয়ে গেছে তা মনেও আনতে পারি নে।

প্রথম ছাত্র। না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও; নইলে ওর কী গতি হবে! এখনো ও বেচারা তট তট করে মরছে— আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে!

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা পঞ্চক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখ নি?

পঞ্চক। না।

তৃতীয় ছাত্র। মরীচি?

পঞ্চক। না।

প্রথম ছাত্র। মহামরীচি?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পর্ণশবরী?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা বলো দেখি, হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি—

পঞ্চক। আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখি নি তো তার নখাগ্রের ধূলিকণা!

প্রথম ছাত্র। হরেত পক্ষী তো আমরাও কেউ দেখি নি। শুনেছি, সে দধিসমুদ্রের পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে। কিন্তু এ-সমস্ত তো জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে তো চলবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাছে তো কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন— এগুলো তো জানা চাইই; নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবে কোন্ লজ্জায়?

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বম্ভর, আমরা যাই। ও একটু পড়ুক।

গমনোদ্যত

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর। তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর। কেন। আবার ডাকো কেন?

পঞ্চক। সঞ্জীব, জয়োত্তম, তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব। কী হয়েছে? পড়ো-না!

পঞ্চক। দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়ো না। ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে, জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রলাপ নয়।

জয়োত্তম। না হে, মহাপঞ্চক বড়ো রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পঞ্চক। আমি যে কারও কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই অকৃতার্থ হতে পারি, দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না, এতেই আমি বড়ো দুঃখিত হই। আচ্ছা ভাই, তোমরা ঐখানে একটু তফাতে বসে কথাবার্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম। আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বসছি।

সঞ্জীব। বিশ্বম্ভর, তুমি যে বললে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আসবেন, সেটা শুনলে কার কাছ থেকে?

বিশ্বম্ভর। কী জানি, কারা সব বলা-কওয়া করছিল। কেমন করে চারি দিকেই রটে গিয়েছে যে, চাতুর্মাস্যের সময় গুরু আসবেন।

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি ? আমাদের গুরু আসবেন নাকি ?

সঞ্জীব। আবার পঞ্চক ! তোমার কাজ তুমি করো-না।

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। কিন্তু অধ্যাপকদের কারও কাছে শুনেছ কি ? মহাপঞ্চক কী বলেন ?

বিশ্বম্ভর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। মহাপঞ্চক কারও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন— তাঁর কাছে ঘেঁষে কে !

পঞ্চক। চলো-না ভাই, আচার্যদেবের কাছে যাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম। আবার ! ফের !

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আমার তো উনিশ বছর বয়স হল— এর মধ্যে একবারও আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেন নি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারি নে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতরো হল হে জয়োত্তম ? উনিশ বছর আসেন নি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে ?

বিশ্বম্ভর। তা হলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে তো উনিশ পর্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পারে না।

সঞ্জীব। শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্তে ঘটে নি তা ও মুহূর্তেই বা ঘটে কী করে।

জয়োত্তম। আরে, ঐটেই তো আমার তর্ক। কে বললে ঘটে ? যা পূর্বে ঘটে নি তা কিছুতেই পরে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এসো, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পঞ্চক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ ? এই দেখো প্রমাণ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আঃ পঞ্চক ! কর কী ! নাবো বলছি— আঃ নাবো।

পঞ্চক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই নাবছি নে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, তুমি বড়ো উৎপাত করছ।

পঞ্চক। দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট—

মহাপঞ্চক। তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ জুটলেই তোমাকে সংবরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর। দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।

মহাপঞ্চক। আসবেন কি না তা নিয়ে আন্দোলন না করে যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক। তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এ দিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হতে গেলে হয়তো মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক। ভারি বুদ্ধিমানের মতোই কথা বললে !

পঞ্চক। অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগোয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে— এ তো সোজা কথা। আমার ভয় হয়, গুরু এসে হয়তো দেখবেন, আমরা যে দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সে দিকটা উলটো। সেইজন্যে আমি কিছু করি নে।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, আবার তর্ক?

পঞ্চক। তর্ক করতে পারি নে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগ'!

মহাপঞ্চক। যাও তুমি।

পঞ্চক। যাচ্ছি, কিন্তু বলো-না, গুরু কি সত্যই আসবেন?

মহাপঞ্চক। তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন। [প্রস্থান

সঞ্জীব। মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনোই শুনি নি।

জয়োত্তম। কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয়; আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক। সেইজন্যেই উপাধ্যায়মশায় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও, কিন্তু আমি একেবারে মূক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম। কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল তাতেই—

পঞ্চক। হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না।

বিশ্বম্ভর। দেখো পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তা হলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব। আটান্ন প্রকার আচমনবিধির মধ্যে পঞ্চক বড়োজোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে।

পঞ্চক। সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না। অত্যুক্তি করছ।

সঞ্জীব। অত্যুক্তি!

পঞ্চক। অত্যুক্তি নয় তো কী! তুমি বলছ পাঁচটা শিখেছি। আমি দুটোর বেশি একটাও শিখি নি। তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্ পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবোতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসছ কেন? বিশ্বাস করছ না বুঝি?

জয়োত্তম। বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাঁকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুললেন, আমার আর এগোল না।

বিশ্বম্ভর। না পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পঞ্চক। পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে জন্মেছে তেমনি অপ্রস্তুত হয়েই মরবে; ওর ঐ একটি মহদ্‌গুণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না।

সঞ্জীব। তোমার সেই গুণে উপাধ্যায়মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেছ তা তো বোধ হয় না।

পঞ্চক। আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে, বিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই— ঐ যাকে বল ধ্রুবনক্ষত্র— তাতে সুবিধা এই যে, এখানকার ছাত্ররা কে কতদূর এগোল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

জয়োত্তম। তোমার আশ্চর্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায়মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক। না, কিছু না— তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর যে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরো পাকা হল।

সঞ্জীব। আমরা যদি উপাধ্যায়মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তা হলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক। তার মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে, সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুশি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতোই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই, এমনি তোমরা হতভাগ্য।

জয়োত্তম। যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকো না। আমরা চললুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়ো।

[তিনজনের প্রস্থান

পঞ্চক। হবে না, আমার কিছুই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না

গান

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

ও কী ও ! কান্না শুনি যে ! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে !

[প্রস্থান

বালক সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্, কী হয়েছে বল্।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস ? কী পাপ ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না ! ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে !

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের ?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি ?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি !

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস ? শুনে লোভ হচ্ছে যে !

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না— একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে ?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে। আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত ; আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম বালক। অ্যাঁ, সুভদ্র ! তুমি বুঝি এখানে ?

দ্বিতীয় বালক। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে ?

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই সুভদ্র। কাঁদছিস কেন ভাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম বালক। (চুপি চুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অমন সাহস আছে ?

দ্বিতীয় বালক। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

তৃতীয় বালক। সে দিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক, শুনিই-না।

তৃতীয় বালক। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন্ বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে। কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়াল কাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল।

পঞ্চক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম বালক। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয় বালক। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কিরকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তা হলে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।

প্রথম বালক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পঞ্চক। সেটাও আমাকে একবার খুলে দেখতে হবে স্থির করেছি।

সুভদ্র। তুমিও খুলে দেখবে?

পঞ্চক। হাঁ ভাই সুভদ্র, তা হলে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম বালক। না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পঞ্চক। কেন রে, তোদের তাতে ভয় কী?

দ্বিতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। ভয়ানক না হলে মজা কিসের?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক পাপ।

প্রথম বালক। মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়; কেননা উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক। মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম, সেই মজাটা কিরকম দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম বালক। তোমার ভয় করবে না?

পঞ্চক। কিছু না। ভাই সুভদ্র, তুই কী দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয় বালক। না না, বলিস নে।

তৃতীয় বালক। না, সে আমরা শুনতে পারব না— কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। আচ্ছা, একটু, খুব একটুখানি বল্‌ ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম— সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা ! না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল্‌ চল্‌—আর না।

পঞ্চক। কেন। এখন তোমাদের কী।

প্রথম বালক। বেশ, তাও জান না বুঝি। আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী।

দ্বিতীয় বালক। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত-কোণে ঢোঁড়াসাপের খোলস খুঁজতে হবে না ?

পঞ্চক। কেন রে ?

প্রথম বালক। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা ! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয় বালক। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না ?

প্রথম বালক। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

উপাধ্যায়। পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক। এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড়ো হলেই আর তখন—

উপাধ্যায়। কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠছে। সেদিন পটুবর্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে, শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্চক। তা দিয়েছে বটে। আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়। সে আমি অনুমানেই বুঝেছি, নইলে এতবড়ো আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন। শুনেছি, তুমি নাকি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পটুবর্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশো বার হাই তুলতে বলেছিলে ?

পঞ্চক। আপনি ভুল শুনেছেন।

উপাধ্যায়। ভুল শুনেছি ?

পঞ্চক। একলা পটুবর্মকে নয়, সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম— পক্ষপাত করি নি।

উপাধ্যায়। প্রত্যেককেই ডেকেছিলে ?

পঞ্চক। প্রত্যেককেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে জানবেন। কেউ সাহস করে এগোল না। তারা হিসেব করে দেখলে, পনেরো জন ছেলেতে মিলে দেড়শো হাই তুললে তাতে আমার সমস্ত আয়ু ক্ষয় হয়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্‌বৃত্তটাকে নিয়ে যে কী হবে তাই স্থির করতে না পেরে তারা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই তো আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়। দেখো, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এতদিন অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর চলবে না। আমাদের গুরু আসছেন শুনেছ ?

পঞ্চক। গুরু আসছেন ? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন ?

উপাধ্যায়। হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের তো কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক। আমারই তো গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে, পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনছি, এখন বিরক্ত করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন। সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সে দিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি।— কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে— তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশাই, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী! আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে।

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী। বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই, আচার্যদেবকে জানাই গে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি— কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। দ্বিধা? তা দ্বিধা হচ্ছে সে কথা স্বীকার করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখো সূতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছি নে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেইদিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি নে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে— বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।

উপাচার্য। আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা?

আচার্য। সূতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি? কত বছর হবে?

উপাচার্য। সময় ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার তো মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য। দেখো সূতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু-একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল— আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ, কী পেয়েছিস। কিছু না কিছু না, সূতসোম। আজ দেখছি— এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে— কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

উপাচার্য। বোলো না, বোলো না, এমন কথা বোলো না। আচার্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল!

আচার্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো এক মুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কিছুই ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। না না, তবে আমি ভুল করছিলুম সূতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে এই ঠিক, এইই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই তো অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরোনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে— শান্তি চলে যায়।

আচার্য। ঠিক, ঠিক—ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়— তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না কিছু আঘাত কোরো না— চারি দিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের। আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল— প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে— আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই— আমাদের আর সময় নেই।

উপাচার্য। আচার্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত।

আচার্য। আজ আমার একটু একটু মনে পড়ছে বহুপূর্বে সব প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই— তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম— এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চলছে— কিন্তু—

উপাচার্য। ঠিক আছে, ঠিক চলছে আচার্যদেব, ভয় নেই। প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্বনাশ! সেই ছায়া!

আচার্য। সর্বনাশই তো!

উপাচার্য। তা হলে হবে কী! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে?

আচার্য। আমি তো তাই সামনে দেখছি। সে কি আমার স্বপ্ন! অথচ আমার তো মনে হচ্ছে এই-সমস্তই স্বপ্ন— এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই-সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি— সমস্তই স্বপ্ন।

উপাচার্য। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়! এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন-একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেল না। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দিয়ো।

আচার্য। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক। করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জানো, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে-খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য। নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দুর্গতি ঘটতে দেব কেন?

পঞ্চক। আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তা হলে পালন করব। আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানি নে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য। আদেশ করব— তোমাকে! সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পঞ্চক। কেন আদেশ করবেন না প্রভু।

আচার্য। কেন? বলব বৎস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু-জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান?

আচার্য। না না, থাক্, বোলো না। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে।

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে— তুমি ভুল করো গে— আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আসছেন পঞ্চক— তাঁর কাছে তোমার মতো বালক হয়ে যদি বসতে পারি— তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দু-হাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন!

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন— বোধ করি কাজের কথা আছে— বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হবেন— কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য। উপাধ্যায়, কথাটা বলে ফেলো। এ দিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রহাচার্য বলছেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা-কিছু করবার সময়— সেটা অতিক্রম করলেই গোপরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে

বিপ্র, অর্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি— সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপঞ্চক আসছে— যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম ; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই—তুমিই বলতে পারো।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না— একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই ?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন ! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই— সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয় ? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল 'জল জল' করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই।— এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়!

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান!

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতনধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

উপাচার্য। সে কি হয়! যিনি একবার আচার্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত—

মহাপঞ্চক। উপাচার্যমশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য। নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়। আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য। ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার করো। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য হবার অধিকার।

উপাচার্য। মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ!

[প্রস্থান

মহাপঞ্চক। চলো উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড়-মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক-পানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস?

প্রথম শোণপাংশু। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা-দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় শোণপাংশু। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম শোণপাংশু। সত্যি নাকি! তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো— একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোণপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে— তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশু। সেইজন্যেই তো ও-জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে!

তৃতীয় শোণপাংশু। কিন্তু শোণপাংশু ব'লে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না; সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে— কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস— সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব ক'ষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে!
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরই সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

পঞ্চক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশু। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে ! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম শোণপাংশু। কেন নিষেধ ?

পঞ্চক। শোনো একবার ! নিষেধ, তার আবার কেন ! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ ! এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন ? ওটা কি তোমরা খাও না ?

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই— কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন ?

পঞ্চক। ফের কেন ! তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-খবর রাখিস নে বুঝি ?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন ?

পঞ্চক। আবার কেন ! তোরা যে ঐ এক কেন'র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় শোণপাংশু। আর, খেঁসারির ডাল ?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল ; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল ; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল্ দেখি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের কথা বল কেন ? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস্— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস ?

প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম ! রাম ! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি, কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো—সে তো হতেই পারে না !

তৃতীয় শোণপাংশু। আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

গান

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে !
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো, তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ওই জগৎ জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় একঘর ছাত্রের সামনে বললেন শোণপাংশু জাতটা এমনই বিশ্রী যে, তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বললুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করে নি সে আমি জানি— এমন-কি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে

তৈরি তাও ঐ মূর্খেরা জানে না, আবার সে কথা বলতে গেলে মারতে আসে— তাই ব'লে ভালোমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে, লোহার কাজ নিজের হাতে করবে। আজ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, যার যে বংশে জন্ম তার সেইরকম বুদ্ধিই হয়।

প্রথম শোণপাংশু। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে।

পঞ্চক। আরে, ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কি— এই বুঝে নে-না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজা করে! যা হোক ভাই, তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য করে দিলি রে। তোরা তো খেঁসারিডাল চাষ করছিস আবার লোহাও পিটোচ্ছিস, এখনো তোরা কোনো দিক থেকে কোনো পাঁচ-চোখ কিংবা সাত-মাথাওয়ালার কোপে পড়িস নি?

প্রথম শোণপাংশু। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড়ো কম নয়।

পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র— তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশু। ওর মানে কী!

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মরীচি?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী।

তৃতীয় শোণপাংশু। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া-নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় শোণপাংশু। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তা হলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাত-মান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশুগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।

দেখি, খুঁজি বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাইবা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে— আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা-দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্ দিন আমিও লোহা পিটব রে, লোহা পিটব— কিন্তু খেঁসারির ডাল— না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস নে, পড়ব ব'লে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ও কী পুঁথি দাদা? ওতে কী আছে?

পঞ্চক। এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা—এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে।

প্রথম শোণপাংশু। কিরকম?

পঞ্চক। দশটা দিকের দশরকম রঙ গন্ধ আর স্বাদ আছে কি না এতে তার সমস্ত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণ দিকের রঙটা হচ্ছে রুইমাছের পেটের মতো, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি; পুব দিকের রঙটা হচ্ছে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতির মতো, স্বাদটা বকুলের ফলের মতো কষা— নৈর্ঋত কোণের—

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর বলতে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে তো আমরা এ-সব রঙ গন্ধ দেখতে পাই নে।

পঞ্চক। দেখতে পেলে তো দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখত। এ-সব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায়, জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশু। তা হলে দাদা তুমি পুঁথিই পড়ো, আমরা চললুম।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এদের মতো চোখকান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তা হলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশু। চল্ ভাই, ঘুরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েছি। নদীর ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে।

[প্রস্থান

পঞ্চক। এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখতেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেছে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশুদের দেখছি ওরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না— ওরা নিজের গোলমালটা শোনে সেইজন্যে এত গোল করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুন্ গুন্ করে বেড়াচ্ছে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,

এলো সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে ;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

শোণপাংশুদলের পুনঃপ্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী রে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় শোণপাংশু। কিছু চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে।

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

গান

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো নানা কাজে,
এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো হাসির দলে,
এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।

এই তো ঘরে ঘরে,
এই তো বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম শোণপাংশু। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো-সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, আয় ভাই, আমাদের কাজগুলো সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একটু বসুক।

[প্রস্থান

পঞ্চক। ঐ শোণপাংশুগুলো গেছে, এইবার তোমার পায়ের ধুলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখলে হেসে অস্থির হত তাই ওদের সামনে কিছু করি নে।

দাদাঠাকুর। দরকার কী ভাই পায়ের ধুলোয়।

পঞ্চক। নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে ওঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে— ভক্তি না করে যে বাঁচি নে।

দাদাঠাকুর। ভাই, আমিও থাকতে পারি নে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরে না, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পঞ্চক। অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তাতে নিজেকেই কেবল ছোটো করেছি, বড়োকে পাই নি।

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার বাড়া বড়োর মধ্যে এসে যখন বসি তখন যা করি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই-যে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্বাদ করছে— এও আমার প্রণাম।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, তোমার দুই চোখ দিয়ে এই-যে তুমি কেবল সেই বড়োকে দেখছ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখাটিকেও আমি যেন পাই। তখন পশুপাখি গাছপালা আমার কাছে আর কিছুই ছোটো থাকে না। এমন-কি, তখন ঐ শোণপাংশুদের সঙ্গে মাতামাতি করতেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর। আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।

পঞ্চক। তোমার কাছে সবই বড়ো হয়ে গিয়েছে।

দাদাঠাকুর। না ভাই, বড়ো হয় নি, সত্য হয়ে উঠেছে— সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা।

পঞ্চক। তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে। এমন হাসতে খেলতে, মিলতে মিশতে, কাজ করতে, কাজ ছাড়তে কে পারে! তোমার ঐ ভাব দেখে আমার মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। ঐ-যে কী-একটা আছে— চরম, না পরম, না কী, তা কে বলবে— তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন কেমন করে। থেকে থেকে এক-একবার চমকে উঠি, আর ভাবি এইবার বুঝি হল, বুঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসবেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্ছে না?

পঞ্চক। আমার ভয় সব চেয়ে কম—আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর। হবে না?

পঞ্চক। একেবারে কিছুই জানি নে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে থাকব।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো।

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন— হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপটা হয়ে যাই।

দাদাঠাকুর। তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান-না কেন, তার নীচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে আনতে পারব।

পঞ্চক। তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখো ঠাকুর, একটা কথা তোমাকে বলি— অচলায়তনের মধ্যে ঐ-যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেইজন্যে বড়ো নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারও একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারও মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ-যে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিনবার সাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতের হুঁ ফট স্বাহা" এর কারণটা কী— তা হলে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর এক মাষা সোনা হাতে করে যাও তখনই মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মানো, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে এই যে-জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপঞ্চকদাদার টিকি দেখবার জো নেই— বাঁধা জবাব পাই কার কাছে। সব কথারই বারো-আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে—তার পর?

দাদাঠাকুর। তার পরে?

গান

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।

পঞ্চক। এতবড়ো ভরসা তুমি কেমন করে দিচ্ছ ঠাকুর! তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখতে দেবে না, অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যুভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়ছি, শত্রুভয়ের জন্যে মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহমাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ংকরী, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে বজ্রগান্ধারী, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয় নি।

পঞ্চক। সে কী রকম?

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আলো চাই ?' ছেলে বলে, 'তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।'

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি, কিন্তু তোমার ঐ বন্ধু পর্যন্ত যেতে সাহস করতে পারছি নে।

দাদাঠাকুর। কেন, তোমার ভয় কিসের ?

পঞ্চক। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর্ দুর্ করে, ভাবে, 'বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে'। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখি নি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর। তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্ধুক বন্ধ করে রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর— কিন্তু সিন্ধুকে-যে আছে কী তার খোঁজ রাখ না।

পঞ্চক। আমার দাদা বলে, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকে দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিসকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই করছি— আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব— সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্ছে না।

দাদাঠাকুর। তোমার দাদা তো ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনই আসল জিনিসকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারি নে— দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না ?

পঞ্চক। আমি জানি যে আমাদের আচার্য জানেন। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয় নি— তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না, আমিও বলি নে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কী ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর। সেদিন আমারও শুভদিন হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড়ো অস্থির করে তুলেছ। এক-এক সময় ভয় হয় বুঝি কোনোদিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর। আমিই কি স্থির আছি ভাই ? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলছি।

পঞ্চক। কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশুরা বলে তোমার কাছে তারা খুব শান্তি পায়, কই, শান্তি কোথায় ! আমি তো দেখি নে।

দাদাঠাকুর। ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায় ?

দাদাঠাকুর। এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে খ্যাপায়, কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক। ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছি নে— তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়— তুমি জোর দাও— তুমি জোর দাও— তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না।

গান

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে।
তুমি ডাকো এমনি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে।
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে ;
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরান কেঁদে উঠে।

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না ? তুমি যাঁর কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন ?

দাদাঠাকুর। তিনি চোখের জল মোছান, কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক। কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি, ওরা চোখের জল ফেলতে শেখে নি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

দাদাঠাকুর। যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদেরও রসের দরকার হবে, তখন দূর থেকে বয়ে আনবে। কিন্তু দেখেছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐরকমই ওদের স্বভাব।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে— মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।

গান

দাদাঠাকুর। বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ !
এবার ধর্‌ দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারি নে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।

গান

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো।

যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

শুনছ দাদা, ঐ কাঁসর বাজছে।

দাদাঠাকুর। হাঁ বাজছে।

পঞ্চক। আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর। কেন।

পঞ্চক। আজ আমাদের দীপকেতন পূজা।

দাদাঠাকুর। কী করতে হবে।

পঞ্চক। আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তার পরে সেই মাটিতে ছোটো ছোটো মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর। ফল কী হবে।

পঞ্চক। প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পঞ্চক। তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চললুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানি নে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চললুম— এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে— এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধন আলগা করে দেবে। ঐ আসছে শোণপাংশুর দল— আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভালো লাগছে না, ওরা ছট্‌ফট্ করছে। তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়— করুক, ওরাই ধন্য, ওরা দিনরাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর। হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়। কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও কী ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়?

পঞ্চক। আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। বাঃ, সে কি হয়? আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়ছি নে।

পঞ্চক। না ভাই, সে হবে না— ঐ কাঁসর বাজছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিসের কাঁসর বাজছে?

পঞ্চক। তোরা বুঝবি নে। আজ দীপকেতন পূজা— আজ ছেলেমানুষি না। আমি চললুম। (কিছুদুর গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

গান

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা
যেমন বাঁধনহারা

বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্য সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু। বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তা হলে চলো আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক। বেশ, চলো। (একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া) কিন্তু ভাই, ঐ বন পর্যন্তই যাব, ভোজন পর্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। সে কি হয়! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের!

পঞ্চক। না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন চলবে না? চালালেই চলবে।

পঞ্চক। চালালেই চলে এমন কোনো জিনিস আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না তা জানিস? মারলে চলে না, ঠেললে চলে না, দশটা হাতি জুড়ে দিলে চলে না, আর তুই বলিস কিনা চালালেই চলবে!

তৃতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, ভাই, কাজ কী। তুমি বনেই চলো, আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হবে না।

পঞ্চক। খুব হবে রে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই— আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব— আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব— পুড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব। দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবে না?

দাদাঠাকুর। আমি রোজই খাই।

পঞ্চক। তবে তুমি আমাকে খেতে বলছ না কেন।

দাদাঠাকুর। আমি কাউকে বলি নে ভাই, নিজে বসে যাই।

পঞ্চক। না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবে না। আমাকে তুমি হুকুম করো, তা হলে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলই তর্ক করে মরতে পারি নে।

দাদাঠাকুর। অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেব না পঞ্চক। যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেইদিন আমি হুকুম করব।

একদল শোণপাংশুর প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম শোণপাংশু। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু

করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু। আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম শোণপাংশু। কোথায়।

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এখনই।

সকলে। ওরে, চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে— ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে। চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার!

দাদাঠাকুর। এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু। চলো পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

পঞ্চক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর। আয় রে, তবে যাত্রা করি।

৩

অচলায়তন

মহাপঞ্চক উপাধ্যায় সঞ্জীব বিশ্বম্ভর জয়োত্তম

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন, কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

একটি ছাত্রের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কী হে তৃণাঞ্জন।

তৃণাঞ্জন। আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কী করব, আমাদের আচার্য যে কে তার তো কোনো ঠিক হল না— আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বসল এর কী করা যায়!

মহাপঞ্চক। সে তো আমি তোমাদের বলে রেখেছি— এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্ছে, সমস্তই নিষ্ফল হচ্ছে।

উপাধ্যায়। শুধু নিষ্ফল হচ্ছে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠছে।

সঞ্জীব। এ যে বড়ো সর্বনেশে কথা।

জয়োত্তম। কিন্তু আমাদের গুরু আসবার তো দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে।

সঞ্জীব। আরে রাখো তোমার তর্ক। অনিষ্ট হতে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী।

অধ্যেতা। তোমরা তো আমাকে বলে এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে— কিন্তু বসায় কার সাধ্য।

মহাপঞ্চক। কেন, কী বিঘ্ন ঘটেছে।

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই!

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পঞ্চক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি! স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন। আচার্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য।

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী। এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। যে স্নাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিন্ন করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাকে নাহয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী! মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন। কেন পারব না। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলেই—

জয়োত্তম। কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক। শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর ভাবনা কী?

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর দেরি করেন কেন। এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

জয়োত্তম। দেখো তৃণাঞ্জন, আঁস্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্তটা ভরিয়ে দিতে হবে। একটু থামো না।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম ; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে! অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও!

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে— 'আজ নৃত্য কর্‌ রে নৃত্য কর্‌'।

গান

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে!
সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে!

প্রথম জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্‌ বলছি, থাম্‌!

গান

পঞ্চক। ওরে, আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে ; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ্‌ রে ও ভাই, নাচ্‌ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌ রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় আজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে!

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম, কখন জেগে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায় এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে

আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে ? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে!

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই— আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে— লোক থাকলে যে পাপ হবে!

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না— এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক্। তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন— তাঁরও আর দেখা নেই।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। রাজা আসছে।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো ?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা ?

রাজা। ঐ-যে শোণপাংশুরা।

মহাপঞ্চক। শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন ?

মহাপঞ্চক। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব তো আমাদের প্রাচীর রক্ষা করছেন।

রাজা। তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র-উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্ছে, তোমাদের ক্রিয়াপদ্ধতিতে স্খলন হচ্ছে, নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত।

মহাপঞ্চক। আপনি সত্যই অনুমান করেছেন মহারাজ।

সঞ্জীব। একজটা দেবীর শাপ তো আর ব্যর্থ হতে পারে না।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ।

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

তৃণাঞ্জন। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। তবে তো মিথ্যা আমি সৈন্য জড়ো করতে বলে এলুম! দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাহিরে নয়— কী জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আমার পরামর্শ এই যে, আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ-কয়দিন সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটবে। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব— তারও সেইখানে গতি।

রাজা। দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক। কোনো ভয় করবেন না।

৪

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি। কিন্তু এখনো মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বার করতে পারছি নে কেন!

গান

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।
তোরা আমায় বলে দে, ভাই, বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরান-মাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেছে রে।
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

দর্ভকদলের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। দাদাঠাকুর!

পঞ্চক। ও কী ও। দাদাঠাকুর বলছিস কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গেছে নাকি?

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্যে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্‌ তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভকজাত— আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলা পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্‌ তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নামগান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি— তোরা আমাকেও হাসাবি! শুনেও মন খুশি হয়। আমি যে কী মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাস নি বলে এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস। কিছু ভাবিস নে— নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে— গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধূ!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
ও ভিখারির ধন, ও অবলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আমাদের গান?

পঞ্চক। হাঁ রে হাঁ, ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই তো আমার পড়াশুনা কিছু হল না, আমার ক্রিয়াকর্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল! ও ভাই, আর-একটা শোনা— অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।

সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। সার্থক হল আমার নির্বাসন।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব। এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব! সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই, চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।
[প্রস্থান

আচার্য। দেখো পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক। আমি তো কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য। যখন এইরকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?
নামবে কি সব বোঝা এবার, ঘুচবে কি সব দায়?

শুনতে শুনতে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কী ভার বয়েই বেড়িয়েছি! কিন্তু কতই সহজ সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা!

পঞ্চক। আমি দেখছি দর্ভক জাতের একটা গুণ— ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি দশা হয়েছে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। আচার্যদেব, কেবল ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু গলা খোলে না যে— রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু। এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায়।

আচার্য। সেইজন্যেই তো ভাবছি আমাদের গুরু আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন— হাতে করে ধরে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক, শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে

দেবতা করে দিতুম— কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে-ঘরে বসালুম সে-ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম— তাঁকে আর দেখতে পাই নে— তবু তিনি সেখানে বসে আছেন।

গান

সকল জনম ভ'রে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া!
আছ হৃদয়মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমার সাজে
ও মোর দরদিয়া!
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া!
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা;
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।

উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। একি সূতসোম! আমার কী সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি এখানে এলে যে?

উপাচার্য। আর কোথা যাব বলো। তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কী কঠিন হয়ে উঠল, কী শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারি নে। এখন এসো একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য। আমাকে ছুঁয়ো না— কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করি নি।

উপাচার্য। তা হোক, তা হোক। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও।

কোলাকুলি

পঞ্চক। উপাচার্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে-সমস্ত ক্ষমা করে নাও।

উপাচার্য। এসো বৎস, এসো।

আলিঙ্গন

আচার্য। সূতসোম, গুরু তো শীঘ্রই আসছেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কী করে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই চলে এলুম। গুরু আসছেন, তুমি নেই! আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে নেবে— এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে! ঐ শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জিতঘোষ-সুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুমিত এসেও বলেন তবু আমি মানতে পারব না।

পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল! শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে!

আচার্য। ঐ-যে নেমে এল বৃষ্টি— পৃথিবীর কত দিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি— অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা— এই যে কালো মাটি— এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ

আচার্য। বাবা, তোমাদের এ কী সমারোহ! আজ এ কী কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাই নে, আজ পেয়েছি।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমরা তো শাস্ত্র কিছুই জানি নে— তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক। কিন্তু আজ দেবতা কী মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন।

প্রথম দর্ভক। তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার 'পরে।

আচার্য। পঞ্চক, আমাদেরও এমনি করে ডাকতে হবে— বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও— আর দেরি কোরো না।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় শরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে,
সুখদুঃখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

সকলে। উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এলে ঘরে।

চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক। ঐ আবার বজ্র।

আচার্য। দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য। আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে।

৫

অচলায়তন

মহাপঞ্চক তৃণাঞ্জন সঞ্জীব বিশ্বম্ভর জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন! কোনো ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তার জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাই-বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে। আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ-যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসবার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কী করা যায়! ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কতদূর।

উপাধ্যায়। কতদূর কী! এসে পড়েছে যে!

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁক বাজালে না।

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী! দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার নেই।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো।
ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!
সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক!
তৃণাঞ্জন। আমি তো তখনই বলেছিলুম এ-সব কাজ এই কাঁচাবয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্বদের দিয়ে হবার নয়।
বিশ্বম্ভর। কিন্তু এখন করা যায় কী?
তৃণাঞ্জন। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।
সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।
উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।
মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।
উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।
তৃণাঞ্জন। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।
সঞ্জীব। শুনছ— ঐ শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।
ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে।
তৃণাঞ্জন। ধরো মহাপঞ্চককে। বাঁধো ওকে। একজটা দেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চলো।
মহাপঞ্চক। সেই কথাই ভালো। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চলো। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে, তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?
প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল!
উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?
দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে— সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।
তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।
প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।
দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।
প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?
মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।
প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?
মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।
সকলে। ওরে কী মজা রে মজা!
দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্‌ক্তিধৌতির দরকার নেই?
মহাপঞ্চক। না।
সকলে। ওরে কী মজা! আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর। এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল্ দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি— আমাদের ছুটি।

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবলই আমরা গেয়ে বেড়াচ্ছি।

জয়োত্তম। কোন্ গান?

প্রথম বালক। সেই যে—

গান

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে— ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে— ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা— ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি— ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই— নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন।

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে! তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে।

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব।

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী— এরা শোণপাংশু।

সকলে। শোণপাংশু!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর। এসো তো, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও। এদের কর্মকাণ্ড কী রকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গি।
এই জন্মমরণ-খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়
এই দুঃখসুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে
সাগরগিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখন ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে!

প্রথম শোণপাংশু। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা ? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।
দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।
দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে ! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু ?
দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।
সকলে। আমরা প্রণাম করি।
দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।
প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে।
দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।
সকলে। খেলবে !
দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের।
সকলে। কোথায় খেলবে ?
দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।
প্রথম বালক। মস্ত। এই ঘরের মতো মস্ত ?
দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।
দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো ? ঐ আঙিনাটার মতো ?
দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।
দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো ! উঃ কী ভয়ানক !
প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না ?
দাদাঠাকুর। কিসের পাপ।
দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না ?
দাদাঠাকুর। না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।
সকলে। কখন নিয়ে যাবে।
দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।
জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।
বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।
সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো-না !
মহাপঞ্চক। না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী

গান

পঞ্চক। আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।
পালে আমার লাগল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।

সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।
পাগলামি আজ লাগল পাখায়,
পাখি কি আর থাকবে শাখায় ?
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

আচার্যের প্রবেশ

পঞ্চক। দূরে থেকে নানাপ্রকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আচার্যদেব ! অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চলছে।

আচার্য। সময় তো হয়েছে। কালই তো তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একবার সুতসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক। তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বেরিয়েছেন।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের ? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি ?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন ! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন ! সে কী রকম হল !

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল্ তো ?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল ! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে ?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, সকলেই তো বলছে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। ওরে কী আনন্দ রে কী আনন্দ !

আচার্য। একি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এরকম উন্মত্ত হয়ে উঠলে কেন ?

পঞ্চক। প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তা হলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে !

আচার্য। পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে। তুমি দাদাঠাকুর বলছ কাকে ?

পঞ্চক। আচার্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বলব না প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন তা হলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর ?

পঞ্চক। হাঁ, লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক ! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে !

পঞ্চক। আমার প্রাণ ডাকছে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু। যেন কেবলই স্বপ্ন দেখছি— আর যতই জোর করছি কিছুতেই জাগতে পারছি নে। কেবল এমন বসে বসে হবে না দেব ! একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাটবে না।

গান

আর নহে আর নয়।
আমি করি নে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন,
হল বাঁধন ক্ষয়।
ওই আকাশে ওই ডাকে,
আমায় আর কে ধরে রাখে।
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ
যাব সকলময়।
ওরা বসে বসে মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কী যে গোনে ঘরের কোণে
আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
করবে ভুবন জয়।

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী ! গুরু ? তিনি এখানে আসছেন ? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায় !

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাকে একটু শোধন করে নাও— আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়— সে এ পাড়ায় আসবে কেন ! এ যে আমাদের গোঁসাই !

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই ?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি! একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর্।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগ্‌গির দুয়ে আনো দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কী! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাইঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস নাকি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই, পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল্ ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ?

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি— আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর! তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারি দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায় নি বলেই মনে করে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিনরাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি।

দাদাঠাকুর। তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের

মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ। কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না!

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশু না, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে! আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়ো না। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেছে— তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখি নি।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। আমি বলছি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, একলা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো— আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।

পঞ্চক। শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর। হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।

পঞ্চক। ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছটফট করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর। ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেইরকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে— কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক। তা হলে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি ঐখানেই—

দাদাঠাকুর। হাঁ ঐখানেই বৈকি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে-মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য। আর এই চির-অপরাধীর কী বিধান করলে প্রভু?

দাদাঠাকুর। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে— আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাই নে— আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই— আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে— তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারি দিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক— আজ দুর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক-না— আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা?

সুভদ্র। আমি যে-পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না!

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে, সে আর কোনোদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব।

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানলাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

উপাচার্য। (প্রবেশ করিয়া) তৃণ পাওয়া গেল না— কোথাও তৃণ পাওয়া গেল না।

আচার্য। সূতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে?

উপাচার্য। হাঁ, ইন্দ্রতৃণ, সে তো কোথাও পাওয়া গেল না। হায় হায়! এখন আমি করি কী! এমন

জায়গাতেও মানুষ বাস করে!

আচার্য। থাক্ তোমার তৃণ। এ দিকে একবার চেয়ে দেখো।

উপাচার্য। এ কী! এ যে আমাদের গুরু! এখানে! এই দর্ভকদের পাড়ায়! এখন উপায় কী! ওঁকে কোথায়—

দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। গোঁসাই, এই-সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পরশু পিঠে তৈরি করেছিল, তারই কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য। আরে আরে, সর্বনাশ করলে রে! করিস কী! উনি যে আমাদের গুরু।

দ্বিতীয় দর্ভক। তোমাদের গুরু আবার কোথায়? এ তো আমাদের গোঁসাই।

দাদাঠাকুর। দে ভাই, আর কিছু এনেছিস?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক। কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ্। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপুণ্য— নতুন আচার্য আর পুরাতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপর ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। গুরু!

দাদাঠাকুর। এসো বাছা, তোমরা এসো।

প্রথম বালক। কখন আমরা বের হব?

দাদাঠাকুর। আর দেরি নেই— এখনই বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বালক। এখন কী করব?

দাদাঠাকুর। এই-যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে।

প্রথম বালক। ও ভাই, এই-যে জাম— কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। ওরে ভাই, খেজুর— কী মজা।

তৃতীয় বালক। গুরু, এতে কোনো পাপ নেই?

দাদাঠাকুর। কিছু না—পুণ্য আছে।

প্রথম বালক। সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এইখানেই।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর তো পারি নে। দেয়াল তো একটাও বাকি রাখি নি। এখন কী করব? বসে বসে পা ধরে গেল যে।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই রে। শুধু শুধু বসিয়ে রাখব না। তোদের কাজ দেব।

সকলে। কী কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর। আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি।

দাদাঠাকুর। ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে। হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।

সকলে। তাই লাগব। পঞ্চকদাদা, তা হলে তোমাকে উঠতে হচ্ছে, অমন করে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ত্বরা করো। আর দেরি না।

পঞ্চক। প্রস্তুত আছি। গুরু তবে প্রণাম করি। আচার্যদেব আশীর্বাদ করো।

—

ডাকঘর

ডাকঘর

১

মাধব দত্ত। মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না— কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল ; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না। কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ। ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে ; কিন্তু আয়ুর্বেদে যেরকম লিখছে তাতে তো—

মাধব দত্ত। বলেন কী!

কবিরাজ। শাস্ত্রে বলছেন, পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্ভবান্—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনি আর ঐ শ্লোকগুলো আওড়াবেন না— ওতে আরো আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কী করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ। (নস্য লইয়া) খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধব দত্ত। সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ। আমি তো পূর্বেই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত। ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ। তা কী করবেন বলেন। এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ— কারণ কিনা শাস্ত্রে বলছে, অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে— অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ। কিছু না, কারণ, পবনে তপনে চৈব—

মাধব দত্ত। আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্-না— কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দুঃখ ও-বেচারা চুপ করে সহ্য করে— কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ। সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি— তাই তো মহর্ষি চ্যবন বলেছেন, ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশুফলপ্রদং। আজ তবে উঠি দত্তমশায়!

[প্রস্থান

ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধব দত্ত। ঐ রে ঠাকুরদা এসেছে! সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা। কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত। তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।

ঠাকুরদা। তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই— তোমার খেপবার বয়সও গেছে— তোমার ভাবনা কী।

মাধব দত্ত। ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা। সে কিরকম।

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল।

ঠাকুরদা। সে তো অনেকদিন থেকে শুনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না।

মাধব দত্ত। জান তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুরদা। তাই এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ, ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।

মাধব দত্ত। আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল— না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করছি, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

ঠাকুরদা। বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা। আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব দত্ত। কবিরাজ বলছে তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যেরকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনোরকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা— তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা। মিছে বল নি— একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম একটু সেরে আসি, তার পরে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে নেব।

[প্রস্থান

অমল গুপ্তের প্রবেশ

অমল। পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। কী অমল?

অমল। আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো-না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে— ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত। কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল। কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত। বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে!

অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধব দত্ত। বেশ! তাও বুঝি জান না!

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়ি নি—তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো— তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না?

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে— আর-কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে— বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না— পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।

মাধব দত্ত। সে কী কথা অমল! যদি পণ্ডিত হতে পারতুম, তা হলে আমি তো বেঁচে যেতুম।

অমল। আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত। শোনো একবার! দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?

অমল। আমাদের জানলার কাছে বসে সেই-যে দূরে পাহাড় দেখা যায়— আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধব দত্ত। কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ— নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এতবড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল!

অমল। পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ঐ ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না?

মাধব দত্ত। তারা তো তোমার মতো খেপা নয়— তারা শুনতে চায়ও না।

অমল। আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব দত্ত। সত্যি নাকি? কী রকম শুনি।

অমল। তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরাজুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয়?

মাধব দত্ত। হয় বৈকি। কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল। বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধব দত্ত। খুঁজে যদি না পাও?

অমল। খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব। তার পরে সেই নাগরাজুতোপরা লোকটা চলে গেল— আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুরগাছের তলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে— তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে— পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত। পিসিমা কী বললে?

অমল। পিসিমা বললেন, তুমি ভালো হও, তার পর তোমাকে ঐ ঝরনার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভালো হব?

মাধব দত্ত। আর তো দেরি নেই বাবা!

অমল। দেরি নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধব দত্ত। কোথায় যাবে?

অমল। কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব— দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধব দত্ত। আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি—

অমল। তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। তুমি কী হতে চাও বলো।

অমল। এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না— আচ্ছা আমি ভেবে বলব।

মাধব দত্ত। কিন্তু তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল। বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

অমল। তা হলে তো সে বেশ হত। কিন্তু আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না— সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। আমার কাজ আছে, আমি চললুম— কিন্তু বাবা দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল। যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

২

দইওআলা। দই— দই— ভালো দই!

অমল। দইওআলা, দইওআলা, ও দইওআলা!

দইওআলা। ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল। কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল। আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওআলা। আমার সঙ্গে!

অমল। হাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা। (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওআলা। আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল। আমি জানি নে। আমি তো কিচ্ছু পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওআলা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল। তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল। পাঁচমুড়া পাহাড়— শামলী নদী— কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি— কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনোকালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম— একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওআলা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা। কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়— তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওআলা। বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়— কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল। সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা। যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল। আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে— ঐরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা। মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই— ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা। হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল। না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়— তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল— কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওআলা। বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল। আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। না না না না— পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল। তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওআলা। কিচ্ছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

[প্রস্থান

অমল। (সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই। দই, দই, দই—ই, ভালো দই! এই-যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও-না প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল। কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল। কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী। একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল। রাজার কাছে ? নিয়ে যাও-না আমাকে। কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না— আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।

প্রহরী। কবিরাজ বারণ করেছে ? আহা, তাই বটে— তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।

অমল। তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী ?

প্রহরী। এখনো সময় হয় নি।

অমল। কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে ?

প্রহরী। সে কি হয় ! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা— আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে— দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়— পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনে ঐ কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে— তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে— ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে ?

প্রহরী। ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল। কোথায় চলে যাচ্ছে ? কোন্ দেশে ?

প্রহরী। সে কথা কেউ জানে না।

অমল। সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি ? আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই—যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী। সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা !

অমল। আমাকেও যেতে হবে ?

প্রহরী। হবে বৈকি !

অমল। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী। কোন্‌দিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন !

অমল। না না, তুমি তাকে জান না, সে কেবলই ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী। তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল। আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন ? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

প্রহরী। অমন কথা বলতে নেই বাবা !

অমল। না— আমি তো বসেই আছি— যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমি তো বেরোই নে— কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আর আমার মন-কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী !

প্রহরী। কী বাবা ?

অমল। আচ্ছা, ঐ-যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে—ওখানে কী হয়েছে ?

প্রহরী। ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল। ডাকঘর ? কার ডাকঘর ?

প্রহরী। ডাকঘর আর কার হবে ? রাজার ডাকঘর।— এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে ?

প্রহরী। আসে বৈকি। দেখো, একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল। আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলেমানুষ।

প্রহরী। ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকু-টুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল। বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী। তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অতবড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন?— ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে।

অমল। আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী। রাজার যে অনেক ডাক-হরকরা আছে— দেখ নি বুকে গোল গোল সোনার তক্‌মা প'রে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অমল। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।— এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।

অমল। বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।

প্রহরী। হা হা হা হা! ডাক-হরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই বৃষ্টি নেই, গরিব নেই বড়োমানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো—সে খুব জবর কাজ!

অমল। তুমি হাসছ কেন! আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগছে। না না, তোমার কাজও খুব ভালো— দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আবার এক-এক দিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্‌ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

প্রহরী। ঐ যে মোড়ল আসছে— আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তা হলেই মুশকিল বাধাবে।

অমল। কই মোড়ল, কই, কই?

প্রহরী। ঐ যে, অনেক দূরে। মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল। ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে?

প্রহরী। আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যাবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্ছে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব।

[প্রস্থান

অমল। রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়— এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু আমি তো পড়তে পারি নে! কে পড়ে দেবে? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পড়ব। কিন্তু ডাক-হরকরা যদি আমাকে না চেনে! মোড়লমশায়, ও মোড়লমশায়— একটা কথা শুনে যাও।

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল। তুমি মোড়লমশায়, তোমাকে তো সবাই মানে।

মোড়ল। (খুশি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বৈকি। খুব মানে।

অমল। রাজার ডাক-হরকরা তোমার কথা শোনে?

মোড়ল। না শুনে তার প্রাণ বাঁচে? বাস রে, সাধ্য কী!

অমল। তুমি ডাক-হরকরাকে বলে দেবে আমারই নাম অমল— আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল। কেন বলো দেখি।

অমল। আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল। তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখবে?

অমল। রাজা যদি চিঠি লেখে তা হলে—

মোড়ল। হা হা হা হা! এ ছেলেটা তো কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তাঁর পরম বন্ধু! কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়তো আজই আসে কি কালই আসে।

অমল। মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মোড়ল। বাস রে। তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!— মাধব দত্তের বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দু-পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসো-না, ওকে মজা দেখাচ্ছি। ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।

অমল। না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল। কেন রে? তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব— তিনি তা হলে আর দেরি করতে পারবেন না— তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনই পাইক পাঠিয়ে দেবেন!— না, মাধব দত্তর ভারি আস্পর্ধা— রাজার কানে একবার উঠলে দুরস্ত হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

অমল। কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ—একটু দাঁড়াও-না ভাই।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। আমার কি দাঁড়াবার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।

অমল। তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না— আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।

বালিকা। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকালবেলাকার তারা— তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল। জানি নে কী হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা। আহা, তবে বেরিয়ো না— কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়— দুরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল। না, না, বন্ধ কোরো না— এখানে আমার আর-সব বন্ধ কেবল এইটুকু খোলা। তুমি কে বলো-না— আমি তো তোমাকে চিনি নে!

বালিকা। আমি সুধা।

অমল। সুধা?

সুধা। জান না? আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল। তুমি কী কর?

সুধা। সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুলতে চলেছি।

অমল। ফুল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে— যতই চলেছ, মল বাজছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তা হলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা। তাই বৈকি! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি নাকি বেশি জান!

অমল। জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয়, আমাকে

যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুলদিদি হবে?

সুধা। কী বুদ্ধি তোমার! পারুলদিদি আমি কী করে হব! আমি যে সুধা— আমি শশী মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম তা হলে কেমন মজা হত!

অমল। তা হলে সমস্ত দিন কী করতে?

সুধা। আমার বেনে-বউ পুতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম। আমার পুষি মেনি আছে, তাকে নিয়ে— যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না।

অমল। আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো-না, আমার খুব ভালো লাগছে।

সুধা। আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল। আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা। ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল। আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ঐ ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা। আচ্ছা বেশ।

অমল। তুমি তা হলে ফুল তুলে আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা। না, ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে। [প্রস্থান

ছেলের দলের প্রবেশ

অমল। ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একটুখানি এইখানে দাঁড়াও-না।

ছেলেরা। আমরা খেলতে চলেছি।

অমল। কী খেলবে তোমরা ভাই?

ছেলেরা। আমরা চাষ-খেলা খেলব।

প্রথম। (লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

দ্বিতীয়। আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল। সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা। হাঁ, সমস্ত দি—ন।

অমল। তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা। হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল। আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

ছেলেরা। তুমি বেরিয়ে এসো-না, খেলবে চলো।

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা। কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি! চল্ ভাই চল্, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অমল। না ভাই, তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করো— আমি একটু দেখি।

ছেলেরা। এখেনে কী নিয়ে খেলব ?

অমল। এই যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে— এ-সব তোমরাই নাও ভাই— ঘরের ভিতরে একলা খেলতে ভালো লাগে না— এ-সব ধুলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে— এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা। বা, বা, বা, কী চমৎকার খেলনা ! এ যে জাহাজ ! এ যে জটাইবুড়ি ! দেখছিস ভাই ? কেমন সুন্দর সেপাই !— এ-সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে ? তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

অমল। না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, সব তোমাদের দিলুম।

ছেলেরা। আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল। না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা। কেউ তো বকবে না ?

অমল। কেউ না, কেউ না। কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোনো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা। বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা— আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই ? ঐ-যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে— ঐটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ !

অমল। হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আসছে। জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে— আমার পিঠ ব্যথা করছে।

ছেলেরা। এখন যে সবে এক প্রহর বেলা— এখনই তোমার ঘুম পায় কেন ? ঐ শোনো এক প্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

অমল। হাঁ, ঐ যে বাজছে ঢং ঢং ঢং— আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।

ছেলেরা। তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসব।

অমল। যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই। তোমরা তো বাইরে থাক, তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন ?

ছেলেরা। হাঁ চিনি বৈকি, খুব চিনি।

অমল। কে তারা, নাম কী ?

ছেলেরা। একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ— আরো কত আছে।

অমল। আচ্ছা, আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে ?

ছেলেরা। কেন পারবে না ? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল। কাল সকালে যখন আসবে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো-না।

ছেলেরা। আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল। পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না ? কবিরাজ বারণ করেছে ?

মাধব দত্ত। হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ বসে থেকেই তো তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।

অমল। না পিসেমশায়, না— আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধব দত্ত। সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ— আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে যায়— এতেও কি কখনো শরীর টেকে! দেখো দেখি, আজ তোমার মুখখানা কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

অমল। পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে যাবে।

মাধব দত্ত। তোমার আবার ফকির কে?

অমল। সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশবিদেশের কথা বলে যায়— শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। কই আমি তো কোনো ফকিরকে জানি নে।

অমল। এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে— তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো-না, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে।

ফকিরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল। এই-যে, এই-যে ফকির— এসো আমার বিছানায় এসে বসো।

মাধব দত্ত। এ কী। এ যে—

ঠাকুরদা। (চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধব দত্ত। তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে!

অমল। এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির?

ফকির। আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম—সেইখান থেকেই এইমাত্র আসছি।

মাধব দত্ত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে?

ফকির। এতে আশ্চর্য হও কেন? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ? আমার তো যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।

অমল। (হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা। আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির?

ঠাকুরদা। খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব দত্ত। এ-সব কী পাগলের মতো কথা হচ্ছে তোমাদের!

ঠাকুরদা। বাবা অমল, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্রকে ভয় করি নে— কিন্তু তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তা হলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।

অমল। না, না, পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না।— এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব না— কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব— নদী-পাহাড়-সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধব দত্ত। ছি, বাবা, কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই— শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল। ক্রৌঞ্চদ্বীপ কিরকম দ্বীপ আমাকে বলো-না ফকির!

ঠাকুরদা। সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ— সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।

অমল। বাঃ, কী চমৎকার! সমুদ্রের ধারে?

ঠাকুরদা। সমুদ্রের ধারে বৈকি।

অমল। সব নীল রঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুরদা। নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো

এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে— সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল। পাহাড়ে ঝরনা আছে ?

ঠাকুরদা। বিলক্ষণ ! ঝরনা না থাকলে কি চলে ! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কী নৃত্য ! নুড়িগুলোকে ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল। আমি যদি পাখি হতুম তা হলে—

ঠাকুরদা। তা হলে একটা ভারি মুশকিল হত। শুনলুম, তুমি নাকি দইওআলাকে বলে রেখেছ বড়ো হলে তুমি দই বিক্রি করবে— পাখিদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যাবসাটা তেমন বেশ জমত না। বোধ হয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত।

মাধব দত্ত। আর তো আমার চলল না। আমাকে সুদ্ধ তোমরা খেপিয়ে দেবে দেখছি। আমি চললুম।

অমল। পিসেমশায়, আমার দইওআলা এসে চলে গেছে ?

মাধব দত্ত। গেছে বৈকি। তোমার ঐ শখের ফকিরের তলপি বয়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখির বাসায় উড়ে বেড়ালে তার তো পেট চলে না। সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে, তাদের গ্রামে তার বোনঝির বিয়ে— তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাশ দিতে যাচ্ছে— তাই বড়ো ব্যস্ত আছে।

অমল। সে যে বলেছিল, আমার সঙ্গে তার ছোটো বোনঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুরদা। তবে তো বড়ো মুশকিল দেখছি।

অমল। বলেছিল, সে আমার টুকটুকে বউ হবে— তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকালবেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুরদা। বা, বা, খাসা বউ তো ! আমি যে ফকির মানুষ আমারই লোভ হয়। তা বাবা ভয় নেই, এবারকার মতো বিয়ে দিক-না, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বোনঝির অভাব হবে না।

মাধব দত্ত। যাও, যাও। আর তো পারা যায় না।

[প্রস্থান

অমল। ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন— এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা। শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।

অমল। পথে ? কোন্ পথে ! সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে ?

ঠাকুরদা। তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল। আমি সব জানি ফকির !

ঠাকুরদা। তাই তো দেখতে পাচ্ছি— কেমন করে জানলে ?

অমল। তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই— মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি— সে অনেকদিন আগে— কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব ? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে— বাঁ হাতে তার

লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে— নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবল আসছে— তার পরে আখের খেত— সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে— রাতদিন একলাটি চলে আসছে ; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে— নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে— আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা। অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান ?

ঠাকুরদা। জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল। সে তো বেশ ! আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে ?

ঠাকুরদা। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল। না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক বলে ভিক্ষা চাইব— অমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে, না ?

ঠাকুরদা। সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে ?

অমল। আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুরদা। কে বলো দেখি ?

অমল। ছিদাম।

ঠাকুরদা। কোন্ ছিদাম ?

অমল। সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে। ঠিক আমার মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুরদা। সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল। সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানা-ই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না—সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ঐটুকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না— তা ওকে কানা বল আর না-ই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে।

অমল। ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বল সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই— যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হালকা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায় ?

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল। ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতেই পাবে না— ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে

হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল— আমি ওকে বললুম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা। বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ ?

অমল। না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে— এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে— একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছোবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা। তা না-ই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে— তা হলেই হল।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মাধব দত্ত। তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফেসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি ?

ঠাকুরদা। কেন, হয়েছে কী ?

মাধব দত্ত। শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা। তাতে হয়েছে কী ?

মাধব দত্ত। আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কানে ওঠে, সে কি আমরা জানি নে ?

মাধব দত্ত। তবে সামলে চল-না কেন। রাজাবাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আনো কেন ? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুশকিলে ফেলবে।

অমল। ফকির, রাজা কি রাগ করবে ?

ঠাকুরদা। অমনি বললেই হল ! রাগ করবে ! কেমন রাগ করে দেখি-না। আমার মতো ফকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ ক'রে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।

অমল। দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে ; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না ? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়— যদি—

ঠাকুরদা। (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ। আজ কেমন ঠেকছে ?

অমল। কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ। (জনান্তিকে মাধব দত্তের প্রতি) ঐ হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ঐ-যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধরদত্ত বলছেন—

মাধব দত্ত। দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধরদত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন ব্যাপারখানা কী।

কবিরাজ। বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত। না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খুব করেই চারি দিক থেকে আগলে সামলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই নে— দরজা তো প্রায়ই বন্ধ রাখি।

কবিরাজ। হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে— আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। না-হয় দিন দুই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই



'ডাকঘর'-অভিনয়ের শেষ দৃশ্য

গগনেন্দ্রনাথ সরূপা নরেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ, ক্রোড়ে আশামুকুল রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ

থাক্‌-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন— কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখলুম, তাকে ভালোবাসলুম, এখন বুঝি আর তাকে রাখতে পারব না।

কবিরাজ। ওকি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে! এ কী উৎপাত! আমি আসি ভাই! কিন্তু তুমি যাও, এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি— সেইটে খাইয়ে দেখো— যদি রাখবার হয় তো সেইটেতেই টেনে রাখতে পারবে।

[মাধব দত্ত ও কবিরাজের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কী রে ছোঁড়া!

ঠাকুরদা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আরে আরে, চুপ চুপ!

অমল। না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মোড়ল। ওহে মাধব দত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধব দত্ত। বলেন কী, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল। তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত। ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল। না-না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেইজন্যেই দেখছ-না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে? ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল। (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি!

মোড়ল। এ কি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল। আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো-না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি?

ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল। কিন্তু, আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে— আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে! মোড়লমশায়, বলে দাও-না, এ-চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল। রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো— রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

মাধব দত্ত। (হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করিবেন না।

ঠাকুরদা। পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর!

মাধব। আরে! ঠাকুরদা, তুমিও খেপে গেলে নাকি!

ঠাকুরদা। হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।

ফাল্গুনী

উৎসর্গ

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের
এবং সেইসঙ্গে
সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী
শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে
এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো
সমর্পণ করিলাম

১৫ ফাল্গুন ১৩২২

পাত্রগণ

রাজা
মন্ত্রী
শ্রুতিভূষণ
কবিশেখর
নববসন্তের দূতগণ
শীত
নবযৌবনের দল

চন্দ্রহাস	...	উক্ত দলের প্রিয়সখা
দাদা	...	উক্ত দলের প্রবীণ যুবক
জীবন সর্দার	...	উক্ত দলের নেতা

অন্ধ বাউল
মাঝি
কোটাল
অনাথ কলু ইত্যাদি

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সূচনা

রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্‌ তোরা।
কেন, কী হয়েছে।
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।
সর্বনাশ!
কে রে। কে বাজায় বাঁশি।
কেন ভাই, কী হয়েছে।
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।
সর্বনাশ!
ছেলেগুলো দাপাদাপি করছে কার।
আমাদের মণ্ডলদের।
মণ্ডলকে সাবধান করে দে। ছেলেগুলোকে ঠেকাক।
মন্ত্রী কোথায় গেলেন।
এই যে এখানেই আছি।
খবর পেয়েছেন কি।
কী বলো দেখি।
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।
কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেছে যে।
যুদ্ধ চলুক কিন্তু তার সংবাদটা এখন চলবে না।
চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন।
অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।
ঐ-যে মহারাজ আসছেন।
জয় হোক মহারাজের!
মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল।
যাবার সময় হল বৈকি, কিন্তু সভায় যাবার নয়।
সে কি কথা মহারাজ!
সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেছে শুনতে পেয়েছি।
কই, আমরা তো কেউ—
তোমরা শুনবে কী করে। ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েছে।
এতবড়ো স্পর্ধা কার হতে পারে।
মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্ছে।
মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।
এই চেয়ে দেখো—
মহারাজের চুল—
ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্ছ না?
দাসের সঙ্গে পরিহাস?
পরিহাস আমার নয় মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত

রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চমকে উঠে বললেন, এ কী মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখছি যে!

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না— রাজবৈদ্য আছেন, তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কি করতে পেরেছিলেন। —মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, আমি বললুম, কী হবে, রানী। যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য করাই গেল। এখন তা হলে—

যে আজ্ঞা, এখন তা হলে রাজকার্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য। রাজকার্যের সময় নেই— শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো।

সেনাপতি বিজয়বর্মা—

না, বিজয়বর্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এ দিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড়ো সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন— ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেছে, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি আমার শ্বশুর নন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে। আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কারা গোল করছে, বারণ করো, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার তো সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তারা বলছে তাদের সময় আরো অনেক অল্প— তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেছে— তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে। ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তা হলে মহারাজ ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক কালই হোক সে টেনে তুলবেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তা হলে দুর্ভিক্ষ—

দেখো মন্ত্রী, ভিক্ষা তো অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ— কী রাজার কী প্রজার— কে কাকে রক্ষা করবে।

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করছেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে— তবে কেন মিছে গলা ভাঙা। এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম।

শুভমস্তু।

শ্রুতিভূষণমশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে অবসাদগ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কী বলছেন।

উনি বলছেন লক্ষ্মীর স্বভাবসম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কী।

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন মূঢ় শুন।

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য বলেছেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং।

মহারাজ, আশার কথা যদি তুললেন তবে বারিধি থেকে আর-একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে-বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী। শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনই— ও কি মন্ত্রী, আবার কারা গোল করছে।

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হতে বলো।

তা হলে মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন-না— আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারছি নে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখছেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান,
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রভু কি তা হলে—

না, আমি সহস্র মুদ্রা চাই নে।

দিন দিন, একটু পদধূলি দিন। সহস্র মুদ্রা চান না! এতবড়ো কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন-কিছু চাই। গোধনসমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্র দান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব ; কারণ বৈরাগ্যবারিধি বলছেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন— আবার কী, বার বার কেন চীৎকার করছে।

চীৎকারটা বার বার করছে বটে কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বলতে বলেছেন তিনি তাঁর সর্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত

করতে চান কিন্তু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়োই ক্ষীণ হয়ে বাজছে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিত্তবিক্ষেপ হয়। অতএব রাজশিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে নির্মাণ করে দেয় তা হলে তার তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্যসাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এ বৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে তো প্রতি বৎসরেই শুনে আসছি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার। এই দুইয়ে মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারি নে। উনি দেখছেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখছি আপনার পরমার্থ, সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অভাব আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখছেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তা হলে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক।

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েছেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনি আবার ফিরে আসছি।

আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান।

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না— এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য। এক্ষণে তবে আসি। মন্ত্রী, চলো চলো।

ঐ যে কবিশেখর আসছে— আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি! ওকে ভয় করি। ওরে পাকাচুল কান ঢেকে থাক্ রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়।

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান।

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল।

ঠিক আমার কানের উপর। চেয়ে দেখো।

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগবে।

কই, রঙের আভাস তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ চুপ, চুপ করো, কবি চুপ করো।

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক-না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন— নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, তুমি দেখছি বিপদ বাধাবে কবি। যাও যাও তুমি যাও— ওরে, শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে

ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন মহারাজ!

বৈরাগ্য সাধন করব।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি!

হাঁ মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে— বেড়িয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয়তো কী মহারাজ! সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী, সে-ই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।

তা হলে শান্তি পাব কী করে।

শান্তির উপরে তো আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি তো পাওয়া চাই।

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কী কথা।— বিপদ বাধাবে দেখছি। ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্।

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলই ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানি নে।

এ তোমার কিরকম কথা।

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি— তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।

ঐ শোনো কবিশেখর, কান্না শোনো। ঐ তো তোমার সংসার!

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কী কবি। সংসারের প্রজা ওরা। এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেছি। তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো।

মহারাজ, এ দুঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন ক'রে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখ-দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

যাক গে শ্রুতিভূষণ। ওহে কবিশেখর, আমার কী মুশকিল হয়েছে জানো। তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি নে, অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উলটো ; তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে— ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে— কিন্তু সুরটা— সে কী আর বলব।

মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজবার জন্যে হয়েছে।

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো কবি।

মহারাজ, ঐ-যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ-সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী করবে।

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর-একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে ব'লে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি ব'লে কাজ করি— এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব।

কিন্তু জিতটা হল কার।

আমাদের, মহারাজ, আমাদের।

তার প্রমাণ ?

পৃথিবীতে যা-কিছু সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে-মুছে ফেলতে পার তা হলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলখেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা। মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ-যে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে— সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ওহে কবি, তা হলে তুমি আমাকে কী করতে বল।

উঠতে বলি মহারাজ, চলতে বলি। ঐ-যে কান্না, ও-যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা— কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্তব্য হল ব'লে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি ব'লে।

কিন্তু মরবই যে কবিশেখর, আজ হোক আর কাল হোক।

কে বললে মহারাজ, মিথ্যা কথা। যখন দেখছি বেঁচে আছি তখন জানছি যে বাঁচবই ; যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সে-ই বলে মরব— সে-ই বলে "নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং।"

কী বল হে কবি, জীবন চপল নয় ?

চপল বৈকি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে করতেই চলবে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ ক'রে মরবার পালা অভিনয় আরম্ভ করতে বসেছ।

ঠিক বলছ কবি ? আমরা বাঁচবই ?

বাঁচবই।

যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে— কী বল।

হাঁ, মহারাজ।

প্রতিহারী !

কী মহারাজ।

ডাকো, ডাকো, মন্ত্রীকে এখনই ডাকো।

কী মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন।

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে।

বিজয়বর্মাকে বিদায় করে দিতে।

কী মুশকিল। বিদায় করবে কেন। যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে।

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের।

মহারাজের তো দর্শন হবে না, তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য করলে দেখছি— রাজকার্য কি এমনি করেই চলবে। হঠাৎ তোমার হল কী।

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান করছিলুম— আর তো কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙনাগের বংশে যাঁরা অলংকারের আর ব্যাকরণশাস্ত্রের টোল খুলেছেন তাঁরা দলে দলে শাবল হাতে ছুটে আসছেন।

সর্বনাশ ! মন্ত্রী, পাগল হলে নাকি। কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে ?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেছেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন।

কী বিপদ। সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন। না, না, সে হবে না।

আর-একটা কাজ ছিল— শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ওহো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েছে বুঝি ? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কী কথা মহারাজ। আমার পুরস্কার তো জনপদ নয়— আমরা জনপদের সেবা তো কখনো করি নি— তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করি নে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যই থাক্।

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেছি।

মন্ত্রী, আজ দেখছি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটছে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ !

কী প্রতিহারী।

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেছেন।

সর্বনাশ করলে! ফেরাও তাকে ফেরাও। মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে। আমার দুর্বল মন, হয়তো সামলাতে পারব না, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না— প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো— একটা যা-হয়-কিছু করো— যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি-তাই করছে তেমনিতরো। হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিংবা প্রকরণ, কিংবা রূপক, কিংবা ভান, কিংবা—

তৈরি আছে— কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভান তা ঠিক বলতে পারব না।

যা রচনা করেছ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব।

না মহারাজ। রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি তো বলেছি আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কী হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না।

তবে তোমার ও-রচনাটা বলছে কী।

ও বলছে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল-স্থল-আকাশ তাকে চার দিক থেকে ব'লে উঠেছে— "আমি আছি।"— তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে— "আমি আছি।" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।

তার বেশি আর কিচ্ছু না?

কিচ্ছু না। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয়— এই আমি-আছির জয়, জয়— এই আনন্দময় আমি-আছির জয়।

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাকলে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না।

সে কথা সত্য মহারাজ। আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান!

তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়। আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি।

না মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে। নতুন-শিং-ওঠা হরিণশিশুর মতো ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়।

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে।

সে কী কথা কবি।

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।

ওহে কবি, তবে তো এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েছে। বিজয়বর্মাকেও ডাকা যাক।

ডাকুন।

চীন-সম্রাটের দূতকে?

ডাকুন।

আমার শ্বশুর এসেছেন শুনছি—

তাঁকে ডাকতে পারেন— কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।
তাই ব'লে শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না কবি।
আমি ভুললেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।
আর শ্রুতিভূষণকে ?
না মহারাজ, তাঁর প্রতি তো আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব।
কবি, তা হলে প্রস্তুত হও গে।
না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।
চিত্রপট—
চিত্রপটে প্রয়োজন নেই— আমার দরকার চিত্তপট— সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।
এ নাটকে গান আছে নাকি।
হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।
গানের বিষয়টা কী।
শীতের বস্ত্রহরণ।
এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।
বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।
এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা ?
বাকিটা প্রাণের কথা।
সে কী রকম।
যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—
তখন কী দেখলে।
কী দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।
কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।
না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।
তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।
এক হচ্ছে সর্দার।
সে কে।
যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।
সে কে।
যাকে আমরা ভালোবাসি— আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করেছে।
আর কে আছে।
দাদা— প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।
আর কেউ আছে ?
আর আছে এক অন্ধ বাউল।
অন্ধ ?
হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না ব'লেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।
তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে।

আপনি আছেন।

আমি!

হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তা হলে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় ক'রে ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তা হলে মহারাজের আর মুক্তির আশা নেই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মানবেন— ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।

ফাল্গুনী

প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের আবির্ভাব

১

বেণুবনের গান

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে-কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে॥

২

পাখির নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভরল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হল রঙিন তানে।
দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস।
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে ॥

৩

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে
আপন-হারা।
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা ॥

প্রথম দৃশ্য

সূত্রপাত

পথ

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই   ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
  আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
  মর্মরে মোর মনে মনে।
  ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার   মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে   কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছে রে ভাই, গুণ আছে।

বুঝলি কী করে।

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে।

তাই তো— দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো— ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে কাগজ-কলমের উলটো মুখে উজিয়ে চলেছে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগুনের গুণ নয় রে। আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে, কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রহাস। তাই তো, আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগল না!

দাদা। আহা, কী মুশকিল। বয়েস হয়েছে যে।

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখছ, আর এই চেয়ে দেখো, সমস্ত জল স্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করছে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে কবিতা লেখ কী করে।

দাদা। আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শৌখিন কাব্যের ফুলের চাষ

নয় যে কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি—

ঐ রে দাদা এবার চৌপদী বের করবে।

এল রে এল চৌপদী এল। আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী। কেউ না টিকতে পারে আমি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকব। আমি ওদের মতো কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুনব।

যেমন করে পারি শুনবই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুনব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে তো বুকে লাগবে, পিঠে লাগবে না।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা। তার বেশি নয়।

দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যেহেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর-একটু ধৈর্য ধরো ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী—তার উপর আবার মানে।

দাদা। একটু বুঝিয়ে দিই— অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজত তা হলে—

না, আমরা বুঝব না।

কোনোমতেই বুঝব না।

কার সাধ্য আমাদের বোঝায়।

আমরা কিচ্ছু বুঝব না ব'লেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর ক'রে বোঝাতে চায় তা হলে আমরা জোর ক'রে ভুল বুঝব।

দাদা। ও শ্লোকটার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে? তবে বিশ্ব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

দাদা। ঐ কথাটাকেই আর-একটু স্পষ্ট করে বলেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে।
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে।
মর্তে এলে কর্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে, তবে আমাদের কথাটাকেও আর-একটু পষ্ট ক'রে বলতে হল দেখছি। ধরো, দাদাকে ধরো— ওকে আড়কোলা ক'রে নিয়ে চলো ওর কোটরে।

দাদা। তোরা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বল্ তো। বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা। কাজটা কী শুনি।

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।
দাদা। খেলা ? দিনরাতই খেলা ?

গান

সকলে। মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দার আসছে ভাই।
আমাদের সর্দার!
সর্দার। কী রে, ভারি গোল বাধিয়েছিস যে।
চন্দ্রহাস। তাই বুঝি থাকতে পারলে না ?
সর্দার। বেরিয়ে আসতে হল।
ঐ জন্যেই গোল করি।
সর্দার। ঘরে বুঝি টিকতে দিবি নে ?
তুমি ঘরে টিকলে আমরা বাইরে টিকি কী করে।
চন্দ্রহাস। এতবড়ো বাইরেটা পত্তন করতে তো চন্দ্র সূর্য তারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।
সর্দার। তোদের কথাটা কী হচ্ছে বল্ তো।
কথাটা হচ্ছে এই—
মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।

সর্দার। খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল,
খেলতে খেলতে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে।
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে যে হয় ছাই।

সকলে। মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই॥

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।
দাদা। কেন আপত্তি করি বলব ? শুনবি ?
বলতে পারো দাদা, কিন্তু শুনব কি না তা বলতে পারি নে।
দাদা। সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভুরি ভুরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বল কী তুমি দাদা। সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য।

দাদা। তা হলে কাজটা?

চন্দ্রহাস। চলার বেগে যে ধুলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ।

দাদা। আচ্ছা সর্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে দাও।

সর্দার। আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি— ঐ আমার সর্দারি।

দাদা। সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলই ছেলেমানুষি!

তার কারণ, আমরা যে কেবলই ছেলেমানুষ! সব জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমানুষির সীমা নেই।

দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য

দাদা। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না।

না, হবে না বয়েস, হবে না।

বুড়ো হয়ে মরব, তবু বয়েস হবে না।

বয়েস হলেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগবে না ভাই— তার মাথাভরা টাক!

গান

আমাদের পাকবে না চুল গো—মোদের
পাকবে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো—মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে।
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো—মোদের
ঘুচবে না ভুল।

সর্দার। আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান,
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান।
খুঁজব না জ্ঞান,
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগরপানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের
মিলবে না কূল॥

এই উঠতি বয়সেই দাদার যেরকম মতিগতি, তাতে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন— আর দেরি নেই।

সর্দার। কোন্ বুড়ো রে।

চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না।

সর্দার। তার খবর তোরা পেলি কোথা থেকে।

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে।

পুঁথিতে তার কথা লেখা আছে।

সর্দার। তার চেহারাটা কী রকম।

কেউ বলে, সে সাদা, মড়ার মাথার খুলির মতো; কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো।

কেন, তুমি কি তার খবর রাখ না সর্দার।

সর্দার। আমি তাকে বিশ্বাস করি নে।

বাঃ, তুমি যে উলটো কথা বললে। সেই বুড়োই তো সব চেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তার কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়।

সর্দার। সর্বনাশ করলে দেখছি। তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা শুরু করেছিস নাকি।

তাতে ক্ষতি কী সর্দার।

সর্দার। পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যাবি। কার্তিকমাসের সাদা কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রঙ থাকবে না। আচ্ছা, এক কাজ কর্। তোরা খেলার কথা ভাবছিলি?

হাঁ সর্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দার। একটা নতুন খেলা বলতে পারি।

বলো, বলো, বলো।

সর্দার। তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কি না জানি নে।

সর্দার। আমি বলছি, এ তোরা পারবি নে।

পারব না? বল কী। নিশ্চয়ই পারব।

সর্দার। কখনো পারবি নে।

আচ্ছা যদি পারি?

সর্দার। তা হলে গুরু ব'লে আমি তোদের মানব।

গুরু! সর্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে?

সর্দার। তবে কী চাস্ বল্।

তোমার সর্দারি আমরা কেড়ে নেব।

সর্দার। তা হলে তো বাঁচি রে! তোদের সর্দারি কি সোজা কাজ। এমনই অস্থির করে রেখেছিস যে হাড়গুলো সুদ্ধ উলটো-পালটা হয়ে গেছে।—তা হলে রইল কথা?

চন্দ্রহাস। হাঁ, রইল কথা। দোলপূর্ণিমার দিনে তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

কিন্তু তাকে নিয়ে কী করবে সর্দার।

সর্দার। বসন্ত-উৎসব করব।

বল কী। তা হলে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হয়ে যাবে।

আর কোকিলগুলো পেঁচা হয়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাকবে।

সর্দার। আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনই বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্বনাশ !

সর্দার। আর ঐ ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে তেমনই তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাত ধরবে।

সর্বনাশ !

সর্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হয়ে নিজের কান মলতে থাকবি।

সর্বনাশ !

সর্দার। আর—

আর কাজ কী সর্দার। থাক্ বুড়োধরা খেলা। ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দার। তোদের দেখছি আগে থাকতেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন, কী লক্ষণটা দেখলে।

সর্দার। উৎসাহ নেই ? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি ? দেখ্ই-না কী হয়।

আচ্ছা বেশ। রাজি।

চল্ রে, সব চল্।

বুড়োর খোঁজে চল্।

যেখানে পাই তাকে পাকা চুলটার মতো পট্ করে উপড়ে আনব।

শুনেছি উপড়ে আনার কাজে তারই হাত পাকা। নিড়ুনি তার প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্। খেলতেই যখন বেরলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি, এ-সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে।
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে।
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে—
আমাদের ভয় কাহারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের দ্বিধা

১

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথি ।
ভোর না হতে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারা রাতি ।
আমরা ডাকি পাখির গলায়,
আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি ।

মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে ।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধার-পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি ॥

২

শীতের বিদায়-গান

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো ।
বিদায়-বেলায় এ কী হাসি,
ধরলি আগমনীর বাঁশি ।
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো ।

সবাই আপনপানে
আমায় আবার কেন টানে ।
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন-করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো ॥

৩

নবযৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাবছ বুঝি।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার 'পর।

তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো॥

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড়্‌ গো আমায় ছাড়্‌ গো—
আমি চলব সাগর-পার গো।
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ওই সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস নে ভাই, আর গো॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধান

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।
মাঝি। কেন গো, তোমরা কাকে চাও।
আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।
মাঝি। কোন্‌ বুড়োকে।
চন্দ্রহাস। কোন্‌-বুড়োকে না। বুড়োকে।
মাঝি। তিনি কে।

চন্দ্রহাস। আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।
মাঝি। ও, বুঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কী।
বসন্ত-উৎসব করব।
মাঝি। বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব! পাগল হয়েছ?
পাগল হঠাৎ হই নি। গোড়া থেকেই এই দশা।
আর অন্তিম পর্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে।
ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ খেপামির নেশায় পাওয়া।
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে।

মাঝি। ওহে, তোমাদের হাওয়ার জোর আছে— দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।
এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।
মাঝি। সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে ব'সে চরকা কাটে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?
জিজ্ঞাসা করেছিলুম— সে বলে, সামনে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি।
ও যে একই জায়গায় ব'সে থাকে, ও কারও ঠিকানা জানে না।
মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেছ, তুমি নিশ্চয় বলতে পার কোথায় সেই—
মাঝি। ভাই, আমার ব্যাবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা— কাদের পথ, কিসের পথ, সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।
আচ্ছা চলো তো, পথগুলো পরখ করে দেখা যাক।

গান

কোন্ খেপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর।
সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি। ঐ যে কোটাল আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়— আমি পথের খবর জানি, ও পথিকের খবর জানে।
ওহে কোটাল হে, কোটাল হে।
কোটাল। কে গো, তোমরা কে।
আমাদের যা দেখছ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।
কোটাল। কী চাই।
চন্দ্রহাস। বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।
কোটাল। কোন্ বুড়োকে।
সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল। তোমরা খোঁজ তাকে ? সে-ই তো তোমাদের খোঁজ করছে।

চন্দ্রহাস। কেন বলো তো।

কোটাল। সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের 'পরে তার বড়ো লোভ।

চন্দ্রহাস। আমরা তাকে কষে গরম করে দেব, সে-ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তাকে দেখেছ ?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা — দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝি নে। কিন্তু বাপু, তাকেই সকলে বলে ছেলেধরা, উলটে তোমরা তাকে ধরতে চাও— এটা যে পুরো পাগলামি।

দেখেছ ? ধরা পড়েছি। পাগলামিই তো। চিনতে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চলতি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁদের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখলেই চোখে ঠেকে।

ঐ শোনো! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে— আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বৈকি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমান্‌ষি করছ।

ঐ রে, আবার ধরা পড়েছি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমান্‌ষিই করছি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হয়ে গেছি।

চন্দ্রহাস। আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলেমান্‌ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হুহু করে চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁশ নেই।

কোটাল। আর তোমরা ?

আমরা সব বয়সের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল!

মাঝি। বাপু, এখন তোমরা কী করবে।

চন্দ্রহাস। আমরা যাব।

কোটাল। কোথায়।

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করি নি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক কর নি ?

চন্দ্রহাস। সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কোটাল। তার মানে কী হল।

তার মানে হচ্ছে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও ?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট ?

চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে সুর আছে কিনা।

গান

পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে ॥

কোটাল। কোনো সহজ মানুষকে তো কথা বলতে বলতে গান গাইতে শুনি নি।

আবার ধরা পড়ে গেছি রে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম নেই বুঝি ?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল। কেন বলো তো।

চন্দ্রহাস। পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল। এটা তো বোঝা গেল না।

ঐ দেখো— তা হলে আবার গান ধরতে হল।

কোটাল। না, তার দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখি নে।

সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল। এমন হলে তোমাদের চলবে কী করে।

চন্দ্রহাস। আর তো কিছুই চলবার দরকার নেই— শুধু আমরাই চলি।

কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আসছে।

কী দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন।

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই ; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ— মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্ছি।

চন্দ্রহাস। না, না, এখন থাক্ দাদা। আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চলবার বেলা এতবড়ো খোঁড়া জন্তু জগতে দেখতে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে।

মাঝি। আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা। আর আপনি ?

কোটাল। আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা। তা উত্তম হল— আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না— কাজের কথা।

মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন।

কোটাল। আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা

যে-মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুনতে পারে তাকেই শাবাশ। ওটা ভাগ্যের কথা কিনা। তা, বলো ঠাকুর, বলো।

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখলুম, রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেছে। শুনলুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তার টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে তাকে ধরেছে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে এই শ্লোকটি রচনা করেছি। দেখো বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখি নে। আমি যা লিখব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কী লিখেছ শুনি।

দাদা।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল ব'লে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেছ ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তাকে তো কেউ মারে না।

কোটাল। ওহে মাঝি, খাসা লিখেছে হে !

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শুনলে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে।

সর্বনাশ করলে রে !

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে বললে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জমলে তো আর—

মাঝি। আরে রসুন মশায়, পাগলামি রেখে দিন। ঠাকুরকে পেয়েছি, দুটো ভালো কথা শুনে নিই— বয়েস হয়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেইজন্যেই তো বলছি, আমাদের সঙ্গ পেয়েছ, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

(বাহির হইতে) ওগো কোটাল, কোটাল, কোটাল !

কে রে ! অনাথ কলু দেখছি। কী হয়েছে।

কলু। সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম, তাকে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা।

কলু। সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস। বুড়ো ? বলিস কী রে।

কলু। আপনারা অত খুশি হন কেন।

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুশি হয়ে উঠি।

কোটাল। পাগল ! একেবারে উন্মাদ পাগল !

চন্দ্রহাস। তাকে তুমি দেখেছ হে ?

কলু। বোধ হয় কাল রাত্রে তাকেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কী রকম চেহারাটা।

কলু। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দুটো চক্ষু জোনাক-পোকার মতো জ্বলছে।

ওহে, বসন্ত-উৎসবে তো মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কী। তেমন যদি দেখি তবে এবার নাহয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে অমাবস্যায়

করা যাবে। অমাবস্যার বুকে তো চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ করছ না।

না, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

আবার ধরা পড়েছি রে, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

কী করব, অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালোমানুষ নই।

কোটাল। এ কি ঠাট্টা পেয়েছ। এতে বিপদ আছে।

বিপদ ? সেইটেই তো ঠাট্টা।

গান

ভালোমানুষ নই রে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ওই আমাদের
গুণের মধ্যে ওই।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কই নে মোরা
উলটো কথা কই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দারের কথা বলছিলে, সে গেল কোথায়। সে সঙ্গে থাকলে যে তোমাদের সামলাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়।

কোটাল। এ তার কেমনতরো সর্দারি।

চন্দ্রহাস। সর্দারি করে না বলেই তাকে সর্দার করেছি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি তো সে পেয়েছে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দারি করা সহজ, সর্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখি নে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বৈ॥

দাদা, চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল। না না, ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে।

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে। এ-সব কথা শোনা ভালো।

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি নড়ছি নে।

তা হলে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।

ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে, মউমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো। তোমরাই পাঠ করবে নাকি।

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করি নে।

ঐ পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

পাড়ার লোক। এরা বলে কী রে। হেঁয়ালি নাকি।

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি ; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বলবে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে মনে হবে।

একজন বালকের প্রবেশ

বালক। আমি পারলুম না। কিছুতে তাকে ধরতে পারলুম না।

কাকে ভাই।

বালক। ঐ তোমরা যে-বুড়োর খোঁজ করছিলে তাকে।

তাকে দেখেছ নাকি।

বালক। সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।

কোন্ দিকে।

বালক। কিছুই ঠাওরাতে পারলুম না। কিন্তু তার চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনো ধুলো উড়ছে।

চল্ তবে চল্।

শুকনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।

[প্রস্থান

কোটাল। পাগল ! উন্মাদ পাগল !

তৃতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

১

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে।
এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক-না চিনে,
সবাই মিলে-সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব-ভুলের বিষম ফেরে।

কেড়ে নে ওর থলি-থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে ॥

২

আসন্ন মিলনের গান

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগলা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি।

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুনছ না কি জলে স্থলে
জাদুকরের বাজল ভেরি।
দেখছ না কি এই আলোকে
খেলছে হাসি রবির চোখে,
সাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

সন্দেহ

মাঠ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ— তার পরে চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শুধু ধুলো আর শুকনো পাতা।

তার রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দিক ভুল হয়ে যায়। এই ভাবি পুবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে সমস্ত দিন ধুলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হয়ে গেলুম। বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল!

সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্ছে ততই মনে ভয় ঢুকছে।

মনে হচ্ছে, ভুল করেছি।

সকালবেলাকার আলো কানে কানে বললে, শাবাশ, এগিয়ে চলো— বিকেলবেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করছে।

ঠকলুম বুঝি রে!

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়ছে।

ভয় হচ্ছে আমরাও চৌপদী লিখতে বসে যাব— বড়ো দেরি নেই।

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বসবে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হতে থাকবে যে, তারা এক পা নড়বে না।
আমরা রাত্রিবেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকব।
আর তারা আমাদের চার দিকে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে জমবে।
ও ভাই, আমাদের সর্দার এ-সব কথা শুনলে বলবে কী।
ওরে, আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে সর্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দার।
ফিরে চল্‌ রে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়ব।
বলব, আমরা চলব না— দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বসব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।
হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখব।
পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামনেটাকে নিয়ে।
শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিত হয়ে পড়্‌, চিত হয়ে পড়্‌।
কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর— পড়তেই হয় চিত হয়ে।
গোড়াতেই যদি চিতপাত দিয়ে শুরু করা যেত তা হলে মাঝখানে উৎপাত থাকত না রে।
আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।
সেদিন মনে হয়েছিল, সে বলছে, চল্‌, চল্‌, চল্‌— আজ মনে হচ্ছে ভুল শুনেছিলুম, সে বলছে, ছল, ছল, ছল। সংসারটা সবই ছল রে!
সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।
এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।
পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়।
কী ভুলটাই করেছিলুম। ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি। কিন্তু না-চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উলটো। সেটাই তো তেজের কথা হল।
ওরে বীর, কোমর বাঁধ্‌ রে— আমরা চলব না।
ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে পড়্‌, আমরা চলব না।
চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং— আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই; আমরা চলব না।
চলজ্জীবনযৌবনং— আমাদের জীবনও থাক্‌, যৌবনও থাক্‌, আমরা চলব না।
যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি ফিরে চল্‌।
না রে, সেখানে ফিরতে হলেও চলতে হবে।
তবে?
তবে আর কী। যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি।
মনে করি এইখানেই বরাবর বসে আছি।
জন্মাবার ঢের আগে থেকে।
মরার ঢের পরে পর্যন্ত।
ঠিক বলেছিস্‌, তা হলে মনটা স্থির থাকবে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জানলেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছটফট করে।
আর-কোথাওটা বড়ো সর্বনেশে দেশ রে!
সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তার পথগুলো চলে।
কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না।
সূর্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে মরুক যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই-না জ্বালা
জ্বলব না।
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর-জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
টলব না॥

ওরে হাসি রে হাসি!

ঐ হাসি শোনা যাচ্ছে।

বাঁচা গেল, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল।

যেন গুমোটের ঘোমটা খুলে গেল।

এ যেন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি।

কার হাসি ভাই।

শুনেই বুঝতে পারছিস নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি?

কী আশ্চর্য হাসি ওর।

যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।

যেন সূর্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।

যাক, আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাটল। এবার উঠে পড়্।

এবার কাজ ছাড়া কথা নেই— চরাচরমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কী রকম কথা হল। ঈশানকে এখনো চৌপদীর ভূত ছাড়ে নি।

কীর্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে। কীর্তি তো আমাদের ফেনা— ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।

এসো ভাই চন্দ্রহাস এসো, তোমার হাসিমুখ যে!

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে।

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ও কী। ও যে অন্ধ!

চন্দ্রহাস। সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখতে পায়।

কী হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে তো?

বাউল। ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন ক'রে।

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কান তো আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল। আমি যে সব দিয়ে শুনি— শুধু কান দিয়ে না।

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করি নে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তা হলে এখন চলো। ঐ তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাই নে।

সে কী কথা হে।

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়— সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানি নে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্যগভীরে।

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্তসমীরে॥

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কে গো তুমি।— আমি বকুল;
কে গো তুমি।— আমি পারুল;

তোমরা কে বা।— আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে।
অফুরানের আঁচল ভ'রে
মরব মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো।— আমি শিমুল ;
তুমি কে গো।— কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা।— আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

২

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

বাঁশিতে গান উঠবে পুরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর
উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

৩

বোঝাপড়ার গান

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
জেনেছি।

আবরণকে বরণ করে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?
এনেছি।
এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধুলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ ?
হেনেছি ॥

৪

নবীন রূপের গান

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুনে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার
গান শুনে।
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে ॥

চতুর্থ দৃশ্য

প্রকাশ

গুহাদ্বার

দেখ্ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল।
ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে।
বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চ'লে বিশ্রাম করে।
অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে গেছে।

আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাকলে মনে হয় কিছু হোক বা না হোক তবু মজা আছে। এমন-কি, বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করছে।

দেখছিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতরো ?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বলছিল চল্ চল্, তারা এখানে বলছে যাই যাই।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্ছে, তবু লাগছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনো আমরা দেখি নি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে; চার পাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চলে চলে না যেত তা হলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়ত।

চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তা হলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি, জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না— সঙ্গে সঙ্গেই বলছে, ছাড়ব, ছাড়ব।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে রে— তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আনলে ভাই।

ঐ তারাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

ফুলগুলোর মধ্যে কারা বলছে মনে রেখো, মনে রেখো। তাদের নাম তো মনে নেই, কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেছিস কারে। (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে। (মন, মন রে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে। (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে ॥ (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে।

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়েছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।

প্রিয়া, এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই— আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

চাচ্ছে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ও যে কিছু পায় কিছু পায় না, এইজন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না।

গান

আমি যাব না গো অমনি চলে।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুনশেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে।
কিছু হল, অনেক বাকি ;
ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে, সুর আসে নাই
হল না যে শোনানো তাই,
সে-সুর আমার রইল ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে ॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্ছে।

আরে, গেল গেল গেল, এ ছাড়া আর তো কিছুই বোধ হচ্ছে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল।

নিয়ে চলো পথিক, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কাকে ধরে আনবার জন্যে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হল।

বাউলের প্রবেশ

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেছ, এখানে সমস্ত পথিক-জগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগছে— সমস্ত তারাগুলোর।

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কী তা ভুলেই গেছি।

আমরা তাকেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বললে সে ভয়ংকর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তার একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বলছে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে— তার পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও। রাত কত হল কে জানে। হয়তো বা ভোর হয়ে এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেছি, ভয় করি নি,
এখনো ভয় করব না রে,
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে-কুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম করে
সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপনাকে ভাই ফুরিয়ে দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি ॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এল না কেন।

বাউল। সে যে গেছে, তা জানো না?

গেছে? কোথায় গেছে।

বাউল। সে বললে, আমি তাকে জয় করে আনব।

কাকে।

বাউল। যাকে সবাই ভয় করে। সে বললে, নইলে আমার কিসের যৌবন।

বাঃ, এ তো বেশ কথা! দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল। সে বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।

তারই ঢেউ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর।

বাউল। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— "আমরা পথের বিচার করি নি— আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি— আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা কী হত।"

চন্দ্রহাস তাই বুঝি খেপে উঠেছে?

বাউল। সে বললে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ওই কেঁদে মরে,

মরণ এবার আনল আমার
বরণ-ডালা।
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তার
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা,
আরাম বলে, "এল আমার
যাবার পালা।"

কিন্তু সে গেল কোথায়।

বাউল। সে বললে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে।

বাউল। সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে।

সে কী কথা। সে যে ঘোর অন্ধকার।

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন।

তুইও যেমন! সে কি আর ফিরবে।

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কী।

আমাদের সর্দারের কাছে কী জবাব দেব।

এবার সর্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কী বলে গেল সে।

বাউল। বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব।

ফিরে আসবে? কেমন করে জানব।

বাউল। সে তো বললে, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।

তা হলে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাকব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাউল। এই-যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আসছে এরই মুখের কাছে।

ঐ গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল। ওখানে যে কালো খাঁড়ার মতো অন্ধকার।

বাউল। রাত্রের পাখিগুলোর ডানার শব্দ ধরে গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন।

বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন গেছে বলো তো।

বাউল। অনেকক্ষণ—রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে— গা সির্ সির্ করছে।

দেখ্ ভাই, স্বপ্ন দেখেছি যেন তিন জন মেয়েমানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে। ভালো লাগছে না।

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেকছে।

পেঁচাটা ডাকছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয় নি— কিন্তু—
মাঠের ওপারে কুকুরটা কী রকম বিশ্রী সুরে চেঁচাচ্ছে শুনছিস!
ঠিক যেন তার পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হয়ে তাকে চাবকাচ্ছে।
যদি ফেরবার হত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।
রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়।
শোন্ রে ভাই, ঐ মেয়েমানুষের কান্না!
ওরা তো কাঁদছেই—কেবল কাঁদছেই, অথচ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না।
নাঃ, আর পারা যায় না—চুপ করে বসে থাকলেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।
চল্ আমরাও যাই—পথ চললেই ভয় থাকে না।
পথ দেখাবে কে।
ঐ যে বাউল আছে।
কী হে, তুমি পথ দেখাতে পারো?
বাউল। পারি।
বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে?
তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে। যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।
ফিরে যদি না আসে তা হলে কিন্তু—
চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালোবাসতুম তা জানতুম না।
এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা-খুশি তাই করেছি।
যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।
এবার যদি সে ফেরে, তাকে মুহূর্তের জন্যে অনাদর করব না।
আমার মনে হচ্ছে আমরা কেবলই তাকে দুঃখ দিয়েছি।
তার ভালোবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।
সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়ে নি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক-না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

ঐ বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগছে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ।
যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।
দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে দাও।
না, না, ও বসে আছে তবু একটা ভরসা আছে।
দেখছ না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই।
মনে হচ্ছে ওর কপালে যেন কী সব খবর আসছে।
ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।
ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।
ঐ দেখো, জোড়হাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে।
পুবের দিকে মুখ করে কাকে প্রণাম করছে।
ওখানে তো কিচ্ছুই নেই— একটু আলোর রেখাও না।
একবার জিজ্ঞাসাই করো-না, ও কী দেখছে— কাকে দেখছে।
না, না, এখন ওকে কিছু বোলো না।
আমার কী মনে হচ্ছে জান ? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।
যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া-নৌকোটির মতো এসে ঠেকেছে।
ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।
এখনই যেন পাখির গানের ঝড় উঠবে— তার আগে সমস্ত থম্‌থমে।
ঐ-যে একটু একটু একতারাতে ঝংকার দিচ্ছে, ওর মন গান গাচ্ছে।
চুপ করো চুপ করো, ঐ গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক
হোক অভ্যুদয় রে ॥

ঐ-যে !
চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস !
রোস্‌ রোস্‌, ব্যস্ত হোস্‌ নে— এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।
না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।
বাঁচলুম, বাঁচলুম।
এসো এসো চন্দ্রহাস।
এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কী করলে ভাই বলো।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তাকে ধরতে পেরেছ?
চন্দ্রহাস। ধরেছি, তাকে ধরেছি।
কই, তাকে তো দেখছি নে।
চন্দ্রহাস। সে আসছে— এখনই আসছে।
কী তুমি দেখলে আমাকে বলো ভাই।
চন্দ্রহাস। সে তো আমি বলতে পারব না।
কেন।
চন্দ্রহাস। সে তো আমি চোখ দিয়ে দেখি নি।
তবে?
চন্দ্রহাস। আমার সব দিয়ে দেখেছিলুম।
তা হোক-না, বলো-না ভাই।
চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হত বলতে পারত।
কাকে তুমি ধরেছ তাও কি বুঝতে পারলে না।
জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে?
যে-বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায়?
সেই যে ভয়ংকর? যে অন্ধকারের মতো? যার বুকে চোখ?
যার পা উলটো দিকে? যে পিছনে হেঁটে চলে?
নরমুণ্ড যার গলায়? শ্মশানে যার বাস?
চন্দ্রহাস। আমি তো বলতে পারি নে। সে আসছে, এখনই তাকে দেখতে পাব।
ভাই বাউল, তুমি দেখেছ তাকে?
বাউল। হাঁ, এই তো দেখছি।
কই।
বাউল। এই-যে।
ঐ-যে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল।
ঐ-যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।
আশ্চর্য! আশ্চর্য!
চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি!
তুমি! সেই আমাদের সর্দার!
আমাদের সর্দার রে!
বুড়ো কোথায়।
সর্দার। কোথাও তো নেই।
কোথাও না?
সর্দার। না।
তবে সে কী।
সর্দার। সে স্বপ্ন।
চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?
সর্দার। হাঁ।
চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?
সর্দার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।
তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।
তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক।
যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।
চন্দ্রহাস। এ তো বড়ো আশ্চর্য! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।
ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।
চন্দ্রহাস। আর দেরি না—এবার উৎসব শুরু হোক। সূর্য উঠেছে।
ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে থাক তা হলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। একটা গান ধরো।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।

ওগো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।

আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন,
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ওই হাসি রে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন,
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

ঐ-যে গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্ছে।
শুনছি বটে।
ও তো মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।
তা হলে দাদা আসছে চৌপদী নিয়ে।
দাদা। সর্দার নাকি।
সর্দার। কী, দাদা।
দাদা। ভালোই হয়েছে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।
না, না, গুলো নয়, গুলো নয়। একটা।

দাদা। আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য এল পূর্বদ্বারে তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার ॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না, এখানে অর্থাৎ চলবে না।

দাদা। এর মানে—

না, মানে না। মানে বুঝব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা। এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা। উৎসব নাকি। তা হলে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্ছি নে।

দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি।

আছে।

দাদা। আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং অর্থ না থাকলে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।

অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।

কোটাল তোমাকে বলবে অবোধ।

পণ্ডিত বলবে অর্বাচীন।

ঘরের লোক বলবে অনাবশ্যক।

বাইরের লোক বলবে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নব মল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝবে না।

সকলে মিলিয়া

উৎসবের গান

আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছনপানের বাঁধন হতে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

২০ ফাল্গুন ১৩২১

উপন্যাস ও গল্প

দুই বোন

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
করকমলে

দুই বোন

শর্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শান্ত চোখ ; ধীর গভীর চাহনি ; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল ; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা ; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত ; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যন্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারেব ভার স্ত্রীর 'পরে। স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক-এক পাটি এক-এক পায়ে পরে বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে পড়েছে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে বলে, "আর তো পারি নে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না !" যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হল, দুপুর হল, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, "ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।"

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে ? মাঠাকরুনের ভয়, পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা লণ্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, "আহা, একা অরক্ষিত পুরুষমানুষ।" বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্নিগ্ধ ভাষায় না শান্ত ভঙ্গিতে। শর্মিলা চুপ করে ভর্ৎসনা মেনে নেয়। কী করবে, পারে না থাকতে। যতপ্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে,এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেছে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো ছোটো চিরকুট আসছে, "মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল? আজ সকাল সকাল খেতে এসো।" রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, "দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিন্নীর মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়াবাড়ি করো দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্বল।"

শর্মিলা বললে, "হায় হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা।"

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলংকার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অত্যুক্তিতে শর্মিলা যেমন অনুতপ্ত তেমনি আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিতভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্ মুখে। চুপ করে মেনে যেতে হল, শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোরবেলায় অল্প একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে, শর্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হল দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনিন খায় নি, জ্বরও হয়েছিল, এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ-করা। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দিপরা দুর্জন মূর্তি ওদের বেদখল করবার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত। স্টেশনমাস্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বললে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েছে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে, হেনকালে শর্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বললে, "দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্মচারী, উপরওআলার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চলতে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে, "আহা, কাজ কী, আরো তো গাড়ি আছে"— শর্মিলা কানই দেয় না! অবশেষে জেনেরালসাহেব রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহার সমাধা করে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান কতবড়ো লোকটা।" স্ত্রী বললে, "জানার গরজ নেই। যে-গাড়িটা আমাদের, সে-গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, "যদি অপমান করত?"

শর্মিলা জবাব দিলে, "তুমি আছ কী করতে।"

শশাঙ্ক শিবপুরে পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক্ চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়োসাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি পদে যখন অ্যাকটিনি করছে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উলটো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তার সম্পর্ক ও সুপারিশ বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে, এই অর্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নীচের স্তরে থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বললে, "ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।" এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিটখিট শুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিসঘরের

এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হল চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে-রঙটা ও দু-চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়ছে বলে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নূতন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তা হলে চাকরির জালটাতে আরো একটা গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে— হয়তো বা স্বয়ং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিট-হাউসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছর্‌রা-গুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটে নি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্করই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনাল্ডসনের 'পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই, বাঁদরকে লক্ষ্য-করা গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ করে উচ্চহাস্য করেছে।

শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেছে। তার পরে কারণ বের করতে সময় লাগে নি। কনস্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্‌ফ-ডিটার্মিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বললে, "আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও।"

দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম. এসসি. ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভকর্মে বিলম্ব করেন নি— শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্যন্ত অনুভব করে নি তার অবস্থান্তর ঘটেছে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয়, বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবি অসংগত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনো দিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বললে, "চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারই।"

শর্মিলা বললে, "তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।"

শশাঙ্ক বললে, "কাজ তো করা চাই, ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্‌ পাড়ায়।"

"সে-পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা করে বল তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বেলুচিস্থান মরুপ্রদেশের ও পারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই কর না।"

"সর্বনাশ। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে। অতবড়ো দূরবীন পাই কোন্‌ বাজারে।"

"মস্ত দূরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতার বড়ো কন্‌ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।"

"ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এ পক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।"

"এ পক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন, সুদে বাড়ছে। শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবে না।"

"সে কি হয়। ও টাকা যে তোমার।" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।

শর্মিলা স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে বললে, "আমিও যে তোমারই।"

তার পর বললে, "বের করো তোমার জেব থেকে ফাউন্টেন্‌পেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্‌নেশন-পত্র। সেটা ডাকে রওনা না করে আমার শান্তি নেই।"

"আমারও শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।"

লিখলে রেজিগ্‌নেশন-পত্র।

পরদিনই শর্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বললে, "একদিনও তো বোনের খবর নাও না।"

মেয়ে-প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, 'তুমিও তো নাও না।' পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগাল না। অপরাধ মেনে নিলে। বললে, "নিশ্বাস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কি না তাই ভুল হয়ে যায়। আর, তা ছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।"

শর্মিলা বললে, "কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুশি হলুম। তখনই মনে হল মথুরদাদাকে নিজে গিয়ে কন্‌গ্রাচুলেট করে আসি।"

"একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয় নি।"

ব্যাপারখানা এই : নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষকালে প্রকাশ হল, যেরকম শর্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, "এ কখনো হতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হতেই দেব না, যাই বল তুমি।"

এর পরে লেখাপড়া হতেও দেরি হল না; মথুরদাদার হৃদয়ও বিগলিত হল।

ব্যাবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেছে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবি এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবি এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে, সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তার পরে ধীরে সুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, মোটা-সুক্‌তলা-ওআলা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা— শশাঙ্ক উঠেপড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল তখনো ইস্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেছে গরম হয়ে।

ইতিপূর্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হল দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর-একটা ঘরের দিকে। শর্মিলার বরাদ্দ পূর্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গবিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হতে থাকে। মিনতি করে বলে, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।' কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য এই, শরীরও ভাঙছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ, বিশ্রামের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপেক্ষা করে শশাঙ্ক সকালবেলায় সেকেন্ড্‌হ্যান্ড্ ফোর্ডগাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর-আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হল

জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "পরের হাতের আপদও একই জাতের দুশমন।"

একদিন কোন্ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাকবাক্সর পেরেক, হাঁসপাতালে গিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টংকারের টিকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্মিলা ; বললে, "কিছুদিন থাকো শুয়ে।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে, "কাজ।" এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্মিলা বললে, "কিন্তু"— এবার বিনা বাক্যেই ব্যান্ডেজসুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে। যুক্তিতর্ক-কাকুতিমিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা— 'কাজ আছে।' শর্মিলা অকারণে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেছে। রোদ্‌দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের— স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্‌বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া খট্‌খটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে, 'চললুম, ফিরতে দেরি হবে।' মোটরগাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওয়াটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুকনোজাতের খাবার। একটা ওডিকোলনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচররূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চার দিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে, সেও চলতে চলতে পিছু ডাকতে ডাকতে, বলতে বলতে 'ওগো শুনে যাও কথাটা।' ওদের ব্যাবসার মধ্যে শর্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে, দস্তুরমত রসিদ নিয়ে। শর্মিলা বলে, 'বাস রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।'

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে। ওর শখের জিনিস। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসছে মাথায়। শর্মিলাকে আশ্চর্য করবার চেষ্টা। শর্মিলাও বিধিমত আশ্চর্য হতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেছে, শর্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বললে, 'কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বিজ্ঞানবাহনকে বুঝি নে।' আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বললে, 'আলুর দম তৈরি করবার বারো-আনা দুঃখ যাবে কেটে।' পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলে। সুবিধা এই যে, ইটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য অটল। গোছানো-গাছানো সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলছে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানাঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না, তবু তারই ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের ; ফুলদানি একটা-আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওআলা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনো

ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস-ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিংবা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলছে। মোটা গদিওআলা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটিজোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। আপিস-ঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতি-কালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জনীয় বস্তু -ব্যূহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়-সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত।

শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্মনিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে— বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওয়াড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানিতে।

নিজের অর্ঘ্যকে পূজাবেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হল, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েছে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েছে। সেদিন উনত্রিশে কার্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হল, ঘরদুয়োর বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, "এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।"

"হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।"

"বিজ্‌নেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।"

"আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমন্তন্ন করে ফেলেছি।"

"দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না" এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্ণে লোকজন এল। বিজ্‌নেসের সর্বোচ্চ দাবি তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে বলে ধরে নিত। কিন্তু বিজ্‌নেস! আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট হল। নালুবাবু থিয়েটারের নকল করে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে। শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজ্‌নেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হল, তবু শর্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারও খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না, বন্ধুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষমানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা-অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম; তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহু-বন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্মম বেগে ছিন্ন করে যাবে বৈকি। এই নির্মমতাকে শর্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা, আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য করেই ব্যথিতমনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে 'দৃষ্টি রেখো', যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

নীরদ

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে সময়টাতে ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে সেই সময়ে শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ কোন্-এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারি। তা ছাড়া জাহাজ-তৈরির ব্যবসায়ে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেন্ট অফ ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দু-চার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত। মধ্যবয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ বলে জানতেন, শেষবয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দর গম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিশি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধরে পড়লে 'না' বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পূজার্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্যাদা প্রকাশ পেত, পূজাটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই রাজা উপাধি পেতে পারতেন ; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব হবে। গবর্মেন্ট্ হাউসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রীপূজায় শ্যাম্পেন-প্রসাদ ভুরিপরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটো মেয়ে উর্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট্। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের ঊর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য, তার চারি দিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্মন শেখা শুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অন্ত্রে কিংবা শরীরে কোন্ যন্ত্রে কী একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হল তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সন্ধান শুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারের অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদ করে যেখানটা অনাবৃত হল সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই, তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজে নি, কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত কবার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্ম শোষণ করে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন-পাস-করা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্বসহাধ্যায়ী, নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তা-কাজে। বরাবর জোর করে সে বলে এসেছে, ভুল হচ্ছে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত

প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের 'পরে অযথামাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে উর্মির অকস্মাৎ মনে হল, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বললে, "দেখো তো বাবা, অল্প বয়স অথচ নিজের 'পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস আর অতবড়ো হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসংকুচিত সাহস।"

বাবা বললেন, "ডাক্তারি বিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারও কারও মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।"

এদের ভক্তির শুরু হল একটা ছোটো প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়। তার পরে প্রমাণের অপেক্ষা না করে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বললেন, "দেখ্ উর্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলই ডাকছে, বলছে, 'মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো।' স্থির করেছি তার নামে একটা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।"

উর্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাঁসপাতালের ভার নিতে পারি।"

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। বললেন, "ঐ হাঁসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়েত। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তোকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস, সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠবে।"

বনেদি ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া বলে বৃদ্ধের মনে হল না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্মের মধ্যে বুঝেছেন। তাঁর ছেলে বাঁচে নি, কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তা হলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হতে পারে। মেয়েকে বললেন, "এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তার পরে য়ুরোপে।"

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুকরো। যত দেখছেন ততই লাগছে চমৎকার। পাস করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারিবিদ্যের সাত সমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতেই টলে না মন। হালের যতকিছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করছে উল্‌টে-পাল্‌টে, পরীক্ষা করছে, আর ক্ষতি করছে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করছে তাদের যাদের পসার জমেছে। বলত, মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্য ব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেছে কোনো-একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম উর্মিকে বললেন, "ভেবে দেখলুম, আমাদের হাঁসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে, আর আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়।"

রাজারাম আর যাই পারুন হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বলত, মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা করে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনই করুন, অভিরুচি যেমনই থাক্, হেমন্তের 'পরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে, তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হল।

নীরদ মুখুজ্জের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল, অর্থাৎ প্যাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে সে বলত, ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই, কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তর সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে ঊর্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু ব্যবহারে করে নি যে তার কারণ, এ ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে, আলাপ করতে জানে না। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি-বা থাকে, তার আলোটা নেই। এইজন্যেই, যে-সব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা করেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই-সকল কারণে ওকে ঊর্মির উমেদার-শ্রেণীতে গণ্য করতে কেউ সাহস করে নি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর 'পরে ঊর্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় টেনে এনেছিল।

রাজারাম যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি খুশি হবেন তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেইসঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা করে বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বললেন, "সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।"

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয় নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্‌বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগ স্বীকার, প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি এই দুর্যোগ কথঞ্চিৎ-উপশমের উপায়-স্বরূপে শর্ত রইল যে, পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ ঊর্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নী-রূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ ঊর্মিকে বললে, "পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরি জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।"

ঊর্মি নম্রভাবে বললে, "আচ্ছা, পরীক্ষা করুন। বাধা পাবেন না।"

নীরদ বললে, "তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারি দিকে। তা হলেই তোমার জীবন অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজম্‌।"

ঊর্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর-কেউ বললে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরন আছে নীরদের। সে যাই বলুক ঊর্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য তাৎপর্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল।

রাজারাম ওঁর বড়ো জামাইকেও ডাকলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে, "ছেলেটা অসহ্য জেঠা ; ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে!"

শর্মিলা হেসে বলে, "ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।"

শশাঙ্ক বলে, "ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাঁই বদল করলে কেমন হয়।"

শর্মিলা বলে, "তা হলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচ, আমার কথা আলাদা।"

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠছে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে, 'ও তো মজুর, ও কি বৈজ্ঞানিক। হাত আছে মাথাটা কই।'

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, "এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন এল।"

"ইংরেজি মতে?"

"না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।"

"নতুন নামটা শুনি।"

"বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে! ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থটার সঙ্গে পরিচয় আছে, এবার ঘরে পড়বে বাঁধা।"

মনে মনে বলে, 'সত্যি ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় বটে।' ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। 'হায় রে, এতবড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে।' কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হতে পারত, বলা শক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হল। ঊর্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্রমনে তার পরিণতি-সাধনের ভার নিলে।

ঊর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝল্‌মল্‌ করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তার মন সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে 'ছ্যাঃ', কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস খেলে, ব্যাড্‌মিন্টন খেলায় ওস্তাদ। এ-সব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ঢিল দিয়ে, আঁট ক'রে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না; কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করছে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সংগত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে। কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকোর হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।

সবাই বলে, ঊর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। ঊর্মি জানে, ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েছে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশ কোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে। সে বলত, 'আমার যখন সময় আসবে তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।' সময় হল না, কিন্তু ঊর্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

মুশকিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। ঊর্মির জন্যে পাঠ্যপর্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বললে, "দেখো ঊর্মি, মনটাকে পথে চলতে চলতে কেবলই চলকিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছোবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।"

বলত, "তুমি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আন না। হতে হবে মউমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।"

নীরদ সম্প্রতি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বর বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে এইরকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেননা, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই। ঊর্মির সন্দেহ রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশেপাশে চলে যায়! নিজেকে কেবলই লাঞ্ছিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের— কী আশ্চর্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকলপ্রকার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা। ঊর্মির টেবিলে গল্প কিংবা হালকা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনই সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন

বিকেলবেলায় ঊর্মির তদারক করতে এসে শুনলে সে গেছে ইংরেজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর সুরে ইংরেজি ভাষায় বলেছিল, "দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরই মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।"

শুনে ঊর্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, 'এ মানুষটার কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আসছে— আমি নিজে তা বুঝতে পারি নি। ধিক্, এত চাপল্য আমার চরিত্রে।' সতর্ক হতে লাগল, কাপড়-চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হল মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্ত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সংকীর্ণ গণ্ডিতে, শুষ্ক কর্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যে-সব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধানবহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজিই হয় তার বাহন। নীরদের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে ঊর্মি তার দিদির ওখানে যায়। শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে ঊর্মির যে আত্মীয়সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর করে একদিন ঊর্মিকে বললে, "দেখো ঊর্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো, তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে, তাই কর্তব্যবোধে অপ্রিয় কথা বলতে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্রগঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

ঊর্মির চরিত্র বললে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকী দলিল নীরদেরই সিন্ধুকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হলে লোকসান নীরদেরই। নিষেধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে ঊর্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেছে। ঊর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণশোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞানতপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা ঊর্মির একরকম করে সয়ে আসছে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্বার হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন। এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে— এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য পূর্ণবিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্তব্য নির্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয়, যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেছে, যেন দেরি নেই, প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনই ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বলতে পারে না বলেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে গর্ব করে। বলে, 'সেন্টিমেন্টালিটি করা আমার কর্ম নয়।' ঊর্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিভরে মনে করে একেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্বল মনকে তখন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক-না কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্তব্য নিজের ইচ্ছায় সে গ্রহণ করেছিল কালক্রমে নিজের সেই ইচ্ছা দুর্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, "দেখো ঊর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে-সব

স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জেনে রেখো। আমি তোমাকে যা দেব তা এই-সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।"

ঊর্মি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, 'এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো থাকবে না।'

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্ণের আলো ধূসর হয়ে আসে। শহরের উঁচুনিচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানা রঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জের শিখরের ঊর্ধ্বে; অনতিস্ফুট আলোতে শহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর, সে কি এত কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস! হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে 'আমি কিচ্ছু মানি নে'।

ঊর্মিমালা

নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল সেটা সমাপ্ত হল। য়ুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিক-সমাজে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুটল— স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হল না। কেবল এই কথাটাই বার বার করে বললে যে, "আমি চলে যাচ্ছি, এখন তোমার কর্তব্যসাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।"

ঊর্মি বললে, "কোনো ভয় করবেন না।"

নীরদ বললে, "কিরকম ভাবে চলতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে, তার একটা বিস্তৃত নোট দিয়ে যাচ্ছি।"

ঊর্মি বললে, "আমি ঠিক সেই অনুসারেই চলব।"

"তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাই।"

"নিয়ে যান" বলে ঊর্মি চাবি দিল তার হাতে। সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা করে থেমে গেল।

অবশেষে নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বলতে হল, "আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ঘন ঘন হতে থাকে তা হলে তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্বল হয়ে, কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরো না আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি খুবই ভালো লোক। ব্যবসায়ে ওরকম উৎসাহ ওরকম বুদ্ধি কম বাঙালির মধ্যেই দেখেছি। ওর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলছি, ওর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।"

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠল এবং যে-সব দোষ আজ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো বয়সের সঙ্গে একে একে প্রবল আকারে প্রকাশ হয়ে পড়বে, এই অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ভাবনার কথা নীরদ চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক, তবু উনি যে খুব ভালো লোক সে কথা ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে চায় ওর সঙ্গদোষ থেকে, ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো ঊর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। ঊর্মির মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

ঊর্মি বললে, "আপনি কেন এত বেশি উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন?"

"কেন হচ্ছি শুনবে? রাগ করবে না?"

"সত্য কথা শোনবার শক্তি আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। জানি সহজ নয়, তবু সহ্য করতে পারি।"

"তবে বলি শোনো। তোমার স্বভাবের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর স্বভাবের একটা মিল আছে, এ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। তাঁর মনটা একেবারে হালকা। সেইটেই তোমাকে ভালো লাগে, ঠিক কিনা বলো।"

ঊর্মি ভাবে, লোকটা সর্বজ্ঞ নাকি। ভগ্নীপতিকে ওর খুব ভালো লাগে সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, শশাঙ্ক হো হো করে হাসতে পারে, উৎপাত করতে জানে, ঠাট্টা করে। আর ঠিকটি জানে ঊর্মি কোন্ ফুল ভালোবাসে আর কোন্ রঙের শাড়ি।

ঊর্মি বললে, "হাঁ, আমার ভালো লাগে সে কথা সত্যি।"

নীরদ বললে, "শর্মিলাদিদির ভালোবাসা স্নিগ্ধগম্ভীর, তাঁর সেবা যেন একটা পুণ্যকর্ম, কখনো কর্তব্য থেকে ছুটি নেন না। তারই প্রভাবে শশাঙ্কবাবু একমনে কাজ করতে শিখেছেন। কিন্তু যেদিন তুমি ভবানীপুরে যাও সেই দিনই ওঁর যেন মুখোশ খসে পড়ে, তোমার সঙ্গে ঝুটোপুটি বেধে যায়, চুলের কাঁটা তুলে নিয়ে খোঁপা এলিয়ে দেন, হাতে তোমার পড়বার বই দেখলে আলমারির মাথার উপর রাখেন তুলে। টেনিস খেলবার শখ হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, হাতে কাজ থাকলেও।"

ঊর্মিকে মনে মনে মানতেই হল যে, শশাঙ্কদা এইরকম দৌরাত্ম্য করেন বলেই তাঁকে ওর এত

ভালো লাগে। ওর নিজের ছেলেমানুষি তাঁর কাছে এলে ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। সেও তাঁর 'পরে কম অত্যাচার করে না। দিদি ওদের দুজনের এই দুরন্তপনা দেখে তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। কখনো বা মৃদু তিরস্কারও করেন, কিন্তু সেটা তিরস্কারের ভান।

নীরদ উপসংহারে বললে, "যেখানে তোমার নিজের স্বভাব প্রশ্রয় না পায় সেইখানেই তোমার থাকা চাই। আমি কাছে থাকলে ভাবনা থাকত না, কেননা আমার স্বভাব একেবারে তোমার বিপরীত। তোমার মন রক্ষে করতে গিয়ে তোমার মনকে মাটি করা, এ আমার দ্বারা কখনোই হতে পারত না।"

ঊর্মি মাথা নিচু করে বললে, "আপনার কথা আমি সর্বদাই স্মরণ রাখব।"

নীরদ বললে, "আমি কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি। তার যে-সব চ্যাপ্টারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ করে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগবে।"

ঊর্মির পক্ষে এই সাহায্যের দরকার ছিল। কেননা ইদানীং মাঝে মাঝে তার মনে কেবলই সন্দেহ আসছিল, ভাবছিল, 'হয়তো প্রথম উৎসাহের মুখে ভুল করেছি। হয়তো ডাক্তারি আমার ধাতের সঙ্গে মিলবে না।'

নীরদের দাগ-দেওয়া বইগুলো ওর পক্ষে শক্ত বাঁধনের কাজ করবে, ওকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে উজান-পথে।

নীরদ চলে গেলে ঊর্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার করলে শুরু। কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বদ্ধ করে রাখে। সারা দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে অধ্যয়নের শিকল জড়িয়ে আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বার বার করে মন বৃথা ঘুরে বেড়ায়, তবু হার মানতে চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই বলেই তার দূরবর্তী ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি অধিক করে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সব চেয়ে ধিক্কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলই ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকদলের মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা উপেক্ষা করেছে, কারও প্রতি ওর মনের টানও হয়েছিল। ভালোবাসা পরিণত হয় নি, কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই আপন-মনে গান গাইত গুন গুন করে, পছন্দসই কবিতা কপি করে রাখত খাতায়। মন অত্যন্ত উতলা হলে বাজাত সেতার। আজকাল এক-এক দিন সন্ধেবেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন হঠাৎ চমকে উঠে জানতে পারে যে, তার মনে ঘুরছে এমন কোনো দিনের এমন কোনো মানুষের ছবি যে দিনকে যে মানুষকে পূর্বে সে কখনোই বিশেষভাবে আমল দেয় নি। এমন-কি, সে মানুষের অবিশ্রাম আগ্রহে সেদিন তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি তার সেই আগ্রহটাই নিজের ভিতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ করে করে যাচ্ছে, প্রজাপতির ক্ষণিক হালকা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এ-সব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর করতে চায় সেই বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে ততই ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেছে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে। মনে মনে কেবলই জপ করে, 'কী প্রতিভা! কী তপস্যা! কী নির্মল চরিত্র! কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য!'

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে, সে কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে ঊর্মির বিবাহের সম্বন্ধ হলে শশাঙ্ক এবং সন্দিগ্ধমনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট্। ওর আইডিয়ালিজম্ যে গোপনে ডিম পাড়ছে ঊর্মির টাকার থলির মধ্যে, এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস করেছে বৈকি, কিন্তু যে দেবতার কাছে তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। আমরা সোজাসুজি শ্বশুরকে জানিয়ে থাকি, টাকার দরকার আছে, আর সে টাকা জলে পড়বে না, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎ

লোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। তার পরে সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জমা করবেন শ্বশুরের চেকবইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এইরকম কথাবার্তা অপরিহার্য। ঊর্মিকে বললে, 'আমার বিয়ে করার একটা শর্ত আছে ; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে।' শ্বশুর ওকে য়ুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন, ও কিছুতেই রাজি হল না। সেজন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করতেও হল। রাজারামবাবুকে জানিয়েছিল, 'হাঁসপাতাল-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন সেই হাঁসপাতালের ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।'

এই একান্ত নিস্পৃহতা দেখে ওর 'পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হল, আর ঊর্মি খুব গর্ব অনুভব করলে। এই গর্বের ন্যায্য কারণ ঘটাতেই শর্মিলার মন নীরদের 'পরে একেবারে বিরূপ হয়ে গেল। বললে, 'ইস ! দেখব দেমাক কত দিন টেঁকে !' তার পর থেকে নীরদ যখন অভ্যাসমত অত্যন্ত গভীরভাবে কথা কইত শর্মিলা আলাপের মাঝখানে হঠাৎ উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। কিছু দূর পর্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ। ঊর্মির খাতিরে কিছু বলত না, কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট তেজোত্তপ্ত ছিল।

প্রথম-প্রথম নীরদ প্রতি মেলে চিঠিপত্রে চার-পাঁচ পাতা ধরে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে এসেছে। কিছুদিন পরে চমক লাগিয়ে দিলে টেলিগ্রাম। বড়ো অঙ্কের টাকার জরুরি দাবি, অধ্যয়নের প্রয়োজনে। যে গর্ব এত দিন ঊর্মির প্রধান সম্বল ছিল তাতে যথেষ্ট ঘা লাগল বটে, কিন্তু মনে একটু সান্ত্বনাও পেলে। যত দিন যায় এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে ততই ঊর্মির পূর্বস্বভাবটা কর্তব্যের বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজে বেড়ায়। নিজেকে নানা ছলে ফাঁকিও দেয়, অনুতাপও করে। এইরকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে অর্থসাহায্য ওর পরিতপ্ত মনের সান্ত্বনাজনক।

ঊর্মি টেলিগ্রামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সসংকোচে বলে, "কাকাবাবু, টাকাটা—"

ম্যানেজারবাবু বলেন, "ধাঁধা লাগছে। আমরা তো জানতুম টাকাটা ও পক্ষে অস্পৃশ্য ছিল।"

ম্যানেজার নীরদকে পছন্দ করতেন না।

ঊর্মি বলে, "কিন্তু বিদেশে—" কথাটা শেষ করে না।

কাকাবাবু বলেন, "এ দেশের স্বভাব বিদেশের মাটিতে বদলে যেতে পারে সে জানি— কিন্তু আমরা তার সঙ্গে তাল রাখব কী করে।"

ঊর্মি বলে, "টাকাটা না পেলে হয়তো বিপদে পড়তে পারেন।"

"আচ্ছা বেশ, পাঠাচ্ছি মা, তুমি বেশি ভেবো না। বলে রাখছি এই শুরু হল, কিন্তু এই শেষ নয়।"

শেষ যে নয় অনতিকাল পরেই আরো বড়ো অঙ্কে তার প্রমাণ হল। এবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যের। ম্যানেজার গম্ভীরমুখে বললেন, "শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।"

ঊর্মি শশব্যস্ত হয়ে বললে, "আর যাই কর, দিদিরা এ খবরটা যেন না পান।"

"একলা এই দায়িত্ব নিতে ভালো লাগছে না।"

"একদিন তো টাকা তাঁর হাতেই পড়বে।"

"পড়বার আগে দেখতে হবে যেন জলে না পড়ে।"

"কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের কথা তো ভাবতে হবে।"

"অস্বাস্থ্য নানা জাতের আছে, এটা ঠিক কোন্ জাতের বুঝে উঠতে পারছি নে। এখানে ফিরে এলে হয়তো হাওয়ার বদলে সুস্থ হতে পারেন। ফিরতি প্যাসেজের ব্যবস্থা করে পাঠানো যাক।"

ফেরবার প্রস্তাবে ঊর্মি এত যে বেশি বিচলিত হয়ে উঠল, ও নিজে ভাবলে তার কারণ পাছে নীরদের উচ্চ উদ্দেশ্য মাঝখানে বাধা পায়।

কাকা বললেন, "এবারকার মতো টাকা পাঠাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে এতে ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য আরো বিগড়ে যাবে।"

রাধাগোবিন্দ ঊর্মির অনতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়। ক-কার কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজল। সন্দেহ এল মনে। ভাবতে লাগল, 'দিদিকে হয়তো বলতে হবে।' এ দিকে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, 'যথোচিত দুঃখ হচ্ছে না কেন।'

এই সময়ে শর্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়। নানা ডাক্তার লাগল নানা দিক থেকে ব্যাধির আবাসগুহাটা খুঁজে বের করতে। শর্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বললে, "সি· আই· ডি·দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বললে, "দেহটার খানাতল্লাশি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।"

এই সময়টাতেই শশাঙ্কর হাতে দুটো ভারী কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে। আর-একটা টালিগঞ্জের দিকে, মীরপুরের জমিদারের নূতন বাগানবাড়িতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিন মাসের। গোটাকতক টিউবওয়েলের কাজ ছিল নানা জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসুত ছিল না। শর্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয়, অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে।

এত দিন ওদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্মিলার হয় নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে কখনো বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে। তাই এবারকার এই রোগটার উদ্‌বেগে ছেলেমানুষের মতো ছট্‌ফট্ করছে ওর মন। কাজ কামাই করে ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে নিরুপায়ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ ?' তখনই শর্মিলা উত্তর দেয়, 'তুমি মিথ্যে ভেবো না, আমি ভালোই আছি।' সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই শশাঙ্ক অবিলম্বে বিশ্বাস করে ছুটি পায়।

শশাঙ্ক বললে, "ঢেঙ্কানলের রাজার একটা বড়ো কাজ আমার হাতে এসেছে। প্ল্যানটা নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব, ডাক্তার আসবার আগেই।"

শর্মিলা অনুযোগ করে বললে, "আমার মাথার দিব্যি রইল, তাড়াতাড়ি করে কাজ নষ্ট করতে পারবে না। বুঝতে পারছি ওদের দেশে তোমার যাবার দরকার আছে। নিশ্চয় যেয়ো, না গেলে আমি ভালো থাকব না। আমাকে দেখবার লোক ঢের আছে।"

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য গড়ে তোলবার সংকল্প দিন-রাত জাগছে শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যে নয়, বড়োত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ-জিনিসটাকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে তখনই যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনই সর্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়, তার বড়োত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্তি। শর্মিলার শিয়রে বসে শশাঙ্কর মনে যখন উদ্‌বেগ চলছে সেই মুহূর্তেই সে না ভেবে থাকতে পারে না তার কাজের সৃষ্টিতে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটছে কোন্‌খানে। শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্নতল হতে জয়স্তম্ভ ঊর্ধ্বে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষকারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্মিলা গৌরবান্বিত। তাই, স্বামী যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে ঢিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের হলেও ভালোই লাগে না। ওকে বার বার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

এ দিকে নিজের কর্তব্য নিয়ে শর্মিলার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুর-চাকররা কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্ছে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরম জল দিতে ভুলেছে, বিছানার চাদর বদল করা হয় নি, নর্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়ছে না। ও দিকে ধোবার বাড়ির কাপড় ফর্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কিরকম উলটপালট হয় সে তো জানা আছে। থাকতে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না এ কী হল!

অবশেষে ঊর্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে। বললে, "কিছুদিন তোর কলেজ থাক্, আমার

সংসারটাকে রক্ষা কর্ বোন। নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি নে।"

এই ইতিহাসটা যাঁরা পড়ছেন এই জায়গাটাতে এসে মুচকে হেসে বলবেন 'বুঝেছি'। বুঝতে অত্যন্ত বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তাই ঘটে, আর তাই যথেষ্ট। এমনও মনে করবার হেতু নেই ভাগ্যের খেলা চলবে তাসের কাগজ গোপন করে শর্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

'দিদির সেবা করতে চলেছি', বলে ঊর্মির মনে খুব একটা উৎসাহ হল। এই কর্তব্যের খাতিতে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখতেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবীকালের ডাক্তারি কাজেরই সংলগ্ন, এ তর্কও তার মনে এসেছে।

ঘটা করে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাঁটার পরিমাণটাকে রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে। ডাক্তার পাছে অনভিজ্ঞ ব'লে অবজ্ঞা করে এইজন্যে স্থির করলে দিদির রোগ সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নেবে। ওর এম· এস্‌সি· পরীক্ষার বিষয় শারীরতত্ত্ব, এইজন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না। অর্থাৎ, দিদির সেবার উপলক্ষে ওর কর্তব্যসূত্র যে ছিন্ন হবে না, বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে কঠিনতর চেষ্টায় তারই অনুসরণ করা হবে, এ কথাটা মনে সে নিশ্চিত করে নিয়ে ওর পড়বার বই আর খাতাপত্র ব্যাগে পুরে ভবানীপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটা বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেনন' বিশেষজ্ঞেরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

ঊর্মি ভাবলে, সে শাসনকর্তার কাজ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীরমুখে দিদিকে বললে, "ডাক্তারের কথা যাতে খাটে তাই দেখবার ভার আমার উপর, আমার কথা কিন্তু মেনে চলতে হবে আমি তোমাকে বলে রাখছি।"

দিদি ওর দায়িত্বের আড়ম্বর দেখে হেসে বললে, "তাই তো, হঠাৎ এত গম্ভীর হতে শিখলে কোন্ গুরুর কাছে। নতুন দীক্ষা বলেই এত বেশি উৎসাহ। আমারই কথা মেনে চলবি বলেই তোকে আমি ডেকেছি। তোর হাঁসপাতাল তো এখনো তৈরি হয় নি, আমার ঘরকন্না তৈরি হয়েই আছে। আপাতত সেই ভারটা নে, তোর দিদি একটু ছুটি পাক।"

রোগশয্যার কাছ থেকে ঊর্মিকে জোর করেই দিদি সরিয়ে দিলে।

আজ দিদির গৃহরাজ্যে প্রতিনিধিপদ ওর। সেখানে অরাজকতা ঘটছে, আশু তার প্রতিবিধান চাই। এ সংসারের সর্বোচ্চ শিখরে একটিমাত্র যে পুরুষ বিরাজ করছেন তাঁর সেবায় সামান্য কোনো ত্রুটি না হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকার এই ঘরের ছোটো বড়ো সমস্ত অধিবাসীর একটিমাত্র সাধনার বিষয়। মানুষটি নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রানির্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্মণ্য, এই সংস্কার কোনোমতেই শর্মিলার মন থেকে ঘুচতে চায় না। হাসিও পায়, অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে, যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েছে, অথচ লক্ষই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়র কাজের তাড়ায় দৌড় দিয়েছে বাইরে, ফিরে এসে দেখে মেজে জলে থই-থই করছে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্মিলা। জানত এই পুরুষটির হাতে বিছানার অদূরে ঐ কোনাটাতে প্রতিদিন জলে-স্থলে একটা পঙ্কিল অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধাকে জটিল করে তুলতেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার, নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা স্টোভ বানিয়ে বসল। তার এ দিকে দরজা, ও দিকে দরজা ; এ দিকে একটা চোঙ, ও দিকে আর-একটা ; এক দিকে আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর-এক দিকে ঢালু পথে ছাইয়ের নিঃশেষে অধঃপতন— তার পরে সেঁকবার ভাজবার সিদ্ধ-করবার জল-গরমের নানা আকারের খোপখাপ, গুহাগহ্বর, কলকৌশল। কলটাকে উৎসাহের ভঙ্গিতে ও ভাষাতেই মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্‌ভাব -রক্ষার জন্যে। প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই খেলা ! বাধা দিলে অনর্থ বাধে, অথচ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা-কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্ছে মুখে ওদের মতে সায়

দেওয়া এবং কাজে নিজের মতে চলা। এই স্বামী-পালনের দায় এত দিন আনন্দে বহন করে এসেছে শর্মিলা।

এত কাল তো কাটল। নিজেকে বিবর্জিত করে শশাঙ্কের জগৎকে শর্মিলা কল্পনাই করতে পারে না। আজ ভয় হচ্ছে মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝি বা। এমন-কি, ওর আশঙ্কা যে, মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের দৈহিক অযত্ন শর্মিলার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে ঊর্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। সে কাজও তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই যে কিরকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই ঊর্মি যখন তার সুন্দর হাতে ছুরি নিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে রাখে, কমলালেবুর কোয়াগুলিকে গুছিয়ে রাখে সাদা পাথরের থালার এক পাশে, বেদানা ভেঙে তার দানাগুলিকে যত্ন করে সাজিয়ে দেয়, তখন শর্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্বদাই কাজের ফরমাশ করছে।

ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে-না, ঊর্মি।

দেখছিস নে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই?

ঐ দেখ্, জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে। বেহারাকে সাফ করতে হুকুম করবে তার হুঁশ নেই।

বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দে-না, ভাই।

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে।

একবার আপিস-ঘরটা দেখে আসিস তো ঊর্মি, আমি নিশ্চয় বলছি ওঁর ক্যাশবাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন।

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হল, মনে থাকে যেন।

মালীকে বলিস গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে।

ঐ দেখ্ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে— এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও-না— ঊর্মি, দে তো বোন, বুরুশ ক'রে।

ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়, তবু ভারি মজা লাগছে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে সে ছিল তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজকর্ম সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকছে। এই সংসারের কর্মধারার ভিতরে ভিতরে যে উদ্‌বেগ আছে, সাধনা আছে, সে তো ওর মনে নেই— সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। তাই ওর কাছে এই কাজগুলো খেলা, একরকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্জিত উদ্‌যোগ। ও যেখানে এত দিন ছিল এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। এখানে ওর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য তর্জনী তুলে নেই; অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ, সে কাজ বিচিত্র। ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহি নেই। যদি বা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়; যেন ঊর্মির ভুলটাতেই বিশেষ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাম্ভীর্য চলে গেছে; ভুলচুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আলগা অবস্থা ঘটেছে। এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ও কৌতুকের। মনে হচ্ছে যেন পিক্‌নিক চলছে। আর, ঊর্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব-তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের নিজের মন থেকে তার গুরুভার কর্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হলেই, এমন-কি, না হলেও বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ কথা মানতেই হবে ঊর্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখা গেল, কাজ দিয়ে না হোক, নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির অনেক দিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছে— সেই অভাবটা ঠিক যে কী তা নির্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই, শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল

অবকাশমাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। বস্তুত ঊর্মির নিজের ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, দিনরাত্রিকে চঞ্চল করে রেখেছে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য কর্মক্লান্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। অপর পক্ষে শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এত কাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায় নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে এই তথ্যটি অনেক দিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

শশাঙ্কের খাওয়া-পরা অভ্যাসমত চলছে কি না, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসের জোগান হল কি হল না, সেটা এ বাড়ির প্রভুর মনে গৌণ হয়েছে আজ ; অমনিতেই, অকারণেই আছে প্রসন্ন। শর্মিলাকে সে বলে, 'তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো অসুবিধে হয় না, সে তো ভালোই লাগে।'

শশাঙ্কের মনটা এখন জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থম্‌থমে হয়ে এসেছে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুশকিল হবে, লোকসান হবে, এমনতরো উদ্‌বেগের কথা সদাসর্বদা শোনা যায় না। সেরকম কিছু প্রকাশ হলে ঊর্মি তার গাম্ভীর্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে, মুখের ভাবখানা দেখে বলে, "আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি, সেই সবুজ-পাগড়ি-পরা কোন্‌দেশী দালাল— ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, "তুমি তাকে জানলে কী করে।"

"আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ছিল। আমিই তাকে নানাকথা বলে ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তার বাড়ি বিকানীয়রে ; তার স্ত্রী মরেছে মশারিতে আগুন লেগে, আর-একটা বিয়ের সন্ধানে আছে।"

"তা হলে এখন থেকে হিসেব করে সে রোজ আসবে, যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। যত দিন স্ত্রীর ঠিকানা না মেলে ততদিন তার স্বপ্নটা জমবে।"

"আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারব।"

আজকাল শশাঙ্কের মুনফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো চলৎ অবস্থায়, তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এত কাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল ঊর্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্যন্ত যেতে হল, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি। এর আগে শর্মিলা মাঝে মাঝে মাছমাংস ফলমূল শাকসবজি কিনতে সেখানে যেত। সে জানত, এ কাজটা বিশেষভাবে তারই বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করে নি, ইচ্ছেও করে নি। কিন্তু ঊর্মি তো কিনতে যায় না, কেবল জিনিসপত্র উলটেপালটে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে হাজতে রাখে।

শশাঙ্কর কাজের দরদ ঊর্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কর কাছে তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে শশাঙ্ককে দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েছে। এক দিকে ঊর্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার, অন্য দিকে অপরিহার্য কাজের তাড়া। তাই, সংকটে পড়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে চেম্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম সেরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাহ্ণ পেরোলেই সেখানে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যেদিন বিশেষ দেরি করে সেদিন ঊর্মির অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে। এই

রুদ্ধ অশ্রুতে কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানটা ভিতরে ভিতরে শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। ভালোমানুষটির মতো বলে, 'উর্মি, কথা কইবে না এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু দোহাই ধর্ম, খেলবে না এমন পণ তো ছিল না।' তার পরে টেনিস-ব্যাট হাতে করে চলে আসে। খেলায় শশাঙ্ক জিতের কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই হারে। নষ্ট সময়ের জন্যে আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো-একটা ছুটির দিনে বিকালবেলায় শশাঙ্ক যখন ডান হাতে লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উস্কোখুস্কো করতে করতে আপিসের ডেস্কে বসে কোনো-একটা দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েছে, উর্মি এসে বলে, "তোমার সেই দালালের সঙ্গে ঠিক করেছি আজ আমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে। লক্ষ্মীটি।"

শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, "না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।"

কাজের গুরুত্বে উর্মি একটুও ভয় পায় না। বলে, "অবলা রমণীকে অরক্ষিত অবস্থায় সবুজ-পাগড়ি-ধারীর হাতে সমর্পণ করে দিতে সংকোচ নেই, এই বুঝি তোমার শিভল্‌রি!"

শেষকালে ওর টানাটানিতে শশাঙ্ক কাজ ফেলে যায় মোটর হাঁকিয়ে। এইরকম উৎপাত চলছে টের পেলে শর্মিলা বিষম বিরক্ত হয়। কেননা, ওর মতে পুরুষের সাধনার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জনীয় নয়। উর্মিকে শর্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ বলেই জেনেছে। আজও সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই বলে আপিস-ঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই, উর্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে উর্মিকে আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপতে থাকে। তাসের প্যাক দেখিয়ে ইশারা করে, ভাবখানা এই যে, 'চলে এসো, আপিস-ঘরে বসে তোমাকে পোকার খেলা শেখাব।' এখন খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও সময় ও অভিপ্রায় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় উর্মির মনে বেদনা লাগছে, এটা তাকে যেন উর্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুনয়, এমন-কি, ঈষৎ তিরস্কার করে কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু শর্মিলা যে এই নিয়ে উর্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, "তুমি ওর সব আবদার এমন করে শুনলে চলবে কেন। সময় নেই, অসময় নেই, তোমার কাজের লোকসান হয় যে।"

শশাঙ্ক বলে, "আহা ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধুলো না পেলে বাঁচবে কেন।"

এই তো গেল নানাপ্রকার ছেলেমানুষি। ও দিকে শশাঙ্ক যখন বাড়ি-তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে 'বুঝিয়ে দাও'। সহজেই বোঝে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুশি হয়ে উঠে ওকে প্রব্‌লেম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট কোম্পানির স্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধরে বসে 'আমিও যাব'। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়িতে নিয়ে আসে তা নিয়ে ওর মনে আশঙ্কা থাকে না। লাইন টানা, আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেছে। উর্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুত বেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়। উর্মির ছেলেমানুষিও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনার ত্রুটিও সস্নেহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছিল— সেখানে উর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা উর্মি, তোর কি ঐ-সব আঁকাজোখা, আঁক কষা, ট্রেস করা সত্যিই ভালো লাগে?"

"আমার ভারি ভালো লাগে, দিদি।"

শর্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বললে, "হাঁঃ ভালো লাগে! ওকে খুশি করবার জন্যই দেখাস যেন ভালো লাগে।"

নাহয় তাই হল। খাওয়ানো-পরানো সেবা-যত্নে শশাঙ্ককে খুশি করাটা তো শর্মিলার মনঃপূত। কিন্তু এই জাতের খুশিটা ওর নিজের খুশির জাতের সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বার বার ডেকে বলে, "ওকে নিয়ে সময় নষ্ট কর কেন? ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এ-সব কী বুঝবে?"

শশাঙ্ক বলে, "আমার চেয়ে কম বোঝে না।"

মনে করে এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি আনন্দ দেওয়াই হল। নির্বোধ!

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল তখন শর্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব বোধ করত। তাই, ইদানীং আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বলত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নিচু হয়ে যায়। কেননা, মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্যে, ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্যেই, সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সে কালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত। রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে। এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্মিলা বাধা দেয় নি, ইচ্ছা করেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্য-সাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। এক সময়ে তাকে ওর সেবাজালে জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ক্রমশ খর্ব করে এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে, অদৃশ্যে, নেপথ্যে।

হায় রে, আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। রোগশয্যা থেকে সব ও দেখতে পায় না, কিন্তু যথেষ্ট আভাস পায়। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে, সে যেন সর্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই কদিনেই এত বড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে। আজ স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজছে।

শশাঙ্কের আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি হচ্ছে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার বিশেষ রুচিকর সেটাই খাবার সময় হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান। তার কৈফিয়ত মেলে, কিন্তু কোনো কৈফিয়তকে এ সংসার এত দিন আমল দেয় নি। এ-সব অনবধানতা ছিল অমার্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এত বড়ো যুগান্তর ঘটেছে যে, গুরুতর ত্রুটিগুলোও প্রহসনের মতো হয়ে উঠল। দোষ দেবে কাকে! দিদির নির্দেশমত ঊর্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর বসে পাকপ্রণালীর পরিচালনকার্যে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পাচক-ঠাকরুনের পূর্বজীবনের বিবরণগুলির পর্যালোচনাও চলছে, এমন সময় শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, "ও-সব এখন থাক্।"

"কেন, কী করতে হবে?"

"আমার এ বেলা ছুটি আছে, চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিলডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

এত বড়ো প্রলোভনে কর্তব্যে ফাঁকি দিতে ঊর্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শর্মিলা জানে পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্ধানে আহার্যের উৎকর্ষ-সাধনে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ হৃদয়ের যত্নটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলংকৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুশি।

এই দিক থেকে শর্মিলার মনে এল অশান্তি। রোগশয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে

বার বার করে বলছে, 'মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারি নি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।' জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, 'আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।'

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল— শীতের দিন আসছে, গরম কাপড়গুলো রোদ্‌দুরে দেওয়া চাই। ঊর্মি তখন শশাঙ্কের সঙ্গে পিংপং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বললে, "ঊর্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।"

ঊর্মি আলমারিতে চাবি সবেমাত্র লাগিয়েছে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বললে, "ও-সব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।"

"কিন্তু দিদি—"

"আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসছি।"

দিদি ছুটি দিলে, সেইসঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাসীকে ডেকে বললে, "দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি।"

যদিও অনেক দিন পরে হঠাৎ ঊর্মি ছাড়া পেয়ে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু সহসা এক-এক দিন মনে পড়ত ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারই সঙ্গে মিলিয়ে যে বাঁধন ওকে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বেঁধেছে তার অনুশাসন আছে ওর 'পরে। ওর দৈনিক কর্তব্যের খুঁটিনাটি সেই তো স্থির করে দিয়েছে। ওর জীবনের 'পরে তার চিরকালের অধিকার, এ কথা ঊর্মি কোনোমতে অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে, অথচ কর্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্ছে। কর্তব্যবুদ্ধির অত্যাচারেই মন আরো যাচ্ছে বিগড়িয়ে। নিজের অপরাধ ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠল বলেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে শশাঙ্কের সঙ্গে খেলায় আমোদে নিজেকে সর্বক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে, যখন সময় আসবে তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন যে-কয়দিন ছুটি ও-সব কথা থাক্। আবার হঠাৎ এক-এক দিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই-খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে পুনরায় বাক্সজাত ক'রে সেই বাক্সর উপর সে চেপে বসে। ঊর্মি বলে, "শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

শশাঙ্ক বলে, "তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারও সময় নষ্ট। অতএব শোধবোধ।"

তার পরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা করে অবশেষে ঊর্মি হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে নিতান্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এইরকম বাধা পেলেও কর্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিন পাঁচ-ছয় একাদিক্রমে চলে, তার পরে আবার তার জোর কমে যায়। বলে, "শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্বল মনে কোরো না। মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেছি।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, এখানে ডিগ্রি নিয়ে য়ুরোপে যাব ডাক্তারি শিখতে।"

"তার পরে ?"

"তার পরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তার ভার নেব।"

"আর কার ভার নেবে। ঐ-যে নীরদ মুখুজ্জে বলে একটা ইনসাফারেবল্—"

শশাঙ্কের মুখ চাপা দিয়ে ঊর্মি বলে, "চুপ করো। এই-সব কথা বল যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।"

নিজেকে ঊর্মি খুব কঠিন করে বলে, 'সত্য হতে হবে আমাকে, সত্য হতে হবে।' নীরদের সঙ্গে ওর যে সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, অপর পক্ষ থেকে কোনো জোর পায় না। ঊর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিকে আঁকড়ে আছে, কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। এক-এক সময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ; মনে মনে ভাবে, এ মানুষটা চিঠির মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন।

ঊর্মি অনেক কাল কন্‌ভেন্টে পড়েছে। আর-কিছু না হোক ইংরেজিতে ওর বিদ্যে পাকা। সে কথা নীরদের জানা ছিল। সেইজন্যেই, ইংরেজি লিখে নীরদ ওকে অভিভূত করবে এই ছিল তার পণ। বাংলায় চিঠি লিখলে বিপদ বাঁচত, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেচারা জানে না যে সে ইংরেজি জানে না। ভারী ভারী শব্দ জুটিয়ে এনে, পুঁথিগত দীর্ঘপ্রস্থ বচন যোজনা ক'রে, ওর বাক্যগুলোকে করে তুলত বস্তা-বোঝাই গোরুর গাড়ির মতো। ঊর্মির হাসি আসত, কিন্তু হাসতে সে লজ্জা পেত ; নিজেকে তিরস্কার করে বলত, বাঙালির ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ।

দেশে থাকতে মোকাবিলায় যখন নীরদ ক্ষণে ক্ষণে সদুপদেশ দিয়েছে তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে। যতটা কানে শোনা যেত তার চেয়ে আন্দাজে তার ওজন হত বেশি। কিন্তু লম্বা চিঠিতে আন্দাজের জায়গা থাকে না। কোমর-বাঁধা ভারী ভারী কথা হালকা হয়ে যায়, মোটা মোটা আওয়াজেই ধরা পড়ে বলবার বিষয়ের কম্‌তি।

নীরদের যে ভাবটা কাছে থাকতে ও সয়ে গিয়েছিল সেইটে দূরের থেকে ওকে সব চেয়ে বাজে। লোকটা একেবারেই হাসতে জানে না। চিঠিতে সব চেয়ে প্রকাশ পায় সেই অভাবটা। এই নিয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে তুলনা ওর মনে আপনিই এসে পড়ে।

তুলনার একটা উপলক্ষ এই সেদিন হঠাৎ ঘটেছে। কাপড় খুঁজতে গিয়ে বাক্সের তলা থেকে বেরোল পশমে-বোনা একপাটি অসমাপ্ত জুতো। মনে পড়ে গেল চার বছর আগেকার কথা। তখন হেমন্ত ছিল বেঁচে। ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল দার্জিলিঙে। আমোদের অন্ত ছিল না। হেমন্তে আর শশাঙ্কে মিলে ঠাট্টাতামাশার পাগলা-ঝোরা বইয়ে দিয়েছিল। ঊর্মি তার এক মাসির কাছ থেকে পশমের কাজ নতুন শিখেছে। জন্মদিনে দাদাকে দেবে বলে একজোড়া জুতো বুনছিল। তা নিয়ে শশাঙ্ক ওকে কেবলই ঠাট্টা করত ; বলত, "দাদাকে আর যাই দাও, জুতো নয়। ভগবান মনু বলেছেন ওতে গুরুজনের অসম্মান হয়।"

ঊর্মি কটাক্ষ করে বলেছিল, "ভগবান মনু তবে কাকে প্রয়োগ করতে বলেন।"

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বললে, "অসম্মানের সনাতন অধিকার ভগ্নীপতির। আমার পাওনা আছে। সেটা সুদে ভারী হয়ে উঠল।"

"মনে তো পড়ছে না।"

"পড়বার কথা নয়, তখন ছিলে নিতান্ত নাবালিকা। সেই কারণেই তোমার দিদির সঙ্গে শুভলগ্নে যেদিন এই সৌভাগ্যবানের বিবাহ হয়, সেদিন বাসররজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পার নি। আর সেই কোমল করপল্লবের অরচিত কান-মলাটাই রূপ গ্রহণ করছে সেই করপল্লবরচিত জুতোযুগলে। ওটার প্রতি আমার দাবি রইল জানিয়ে রেখে দিলুম।"

দাবি শোধ হয় নি, সে জুতো যথাসময়ে প্রণামীরূপে নিবেদিত হয়েছিল দাদার চরণে। তার পর কিছুকাল পরে শশাঙ্কর কাছ থেকে ঊর্মি একখানি চিঠি পেল। পেয়ে খুব হেসেছে সে। সেই চিঠি আজও তার বাক্সে আছে। আজ খুলে সে আবার পড়লে—

কাল তো তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি পুরাতন হতে না হতে তোমার নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েছে, সেটা তোমার কাছে গোপন করা অকর্তব্য মনে করি।

আমার পায়ে একজোড়া তালতলীয় চটি অনেকেই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ্য করেছে তার ছিদ্র ভেদ করে আমার চরণনখরপঙ্‌ক্তি মেঘমুক্ত চন্দ্রমালার মতো। (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। উপমার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।) আজ সকালে আমার আপিসের বৃন্দাবন নন্দী যখন আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে তখন

আমার পদমর্যাদায় যে বিদীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তারই অগৌরব মনে আন্দোলিত হল। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেম, 'মহেশ, আমার সেই অন্য নূতন চটিজোড়াটা গতিলাভ করেছে অন্য কোন্ অনধিকারীর শ্রীচরণে।' সে মাথা চুলকিয়ে বললে, 'ও বাড়ির উর্মিমাসিদের সঙ্গে আপনিও যখন দার্জিলিঙ যান সেই সময়ে চটিজোড়াটাও গিয়েছিল। আপনি ফিরে এসেছেন সেইসঙ্গে ফিরে এসেছে তার একপাটি, আর-এক পাটি—' তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, 'ব্যস, চুপ।' সেখানে অনেক লোক ছিল। চটিজুতো-হরণ হীনকার্য। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, লোভ দুর্দম, এমন কাজ করে ফেলে, ঈশ্বর বোধ করি ক্ষমা করেন। তবু অপহরণ-কাজে বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্যের গ্লানি অনেকটা কাটে। কিন্তু একপাটি চটি !!! ধিক্ !!!

যে এ কাজ করেছে, যথাসাধ্য তার নাম আমি উহ্য রেখেছি। সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে তা হলে কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি নিয়ে চটাচটি সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি। মহেশের মতো নিন্দুকের মুখ বন্ধ এখনই করতে পার একজোড়া শিল্পকার্যখচিত চটির সাহায্যে। যেমন তার আস্পর্ধা!

পায়ের মাপ এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।

চিঠিখানা পেয়ে ঊর্মি স্মিতমুখে পশমের জুতো বুনতে বসেছিল, কিন্তু শেষ করে নি। পশমের কাজে আর তার উৎসাহ ছিল না। আজ এটা আবিষ্কার করে স্থির করলে এই অসমাপ্ত জুতোটাই দেবে শশাঙ্ককে সেই দার্জিলিঙ-যাত্রার সাম্বৎসরিক দিনে। সেদিন আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল— হায় রে, কোথায় সেই হাস্যোজ্জ্বল আকাশে হালকা পাখায় উড়ে-যাওয়া দিনগুলি! এখন থেকে সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।

আজ ২৬শে ফাল্গুন। হোলিখেলার দিন। মফঃস্বলের কাজে এ খেলায় শশাঙ্কের সময় ছিল না, এদিনের কথা তারা ভুলেই গেছে। ঊর্মি আজ তার শয্যাগত দিদির পায়ে আবীরের টিপ দিয়ে প্রণাম করেছে। তার পরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলে, শশাঙ্ক আপিস-ঘরের ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে একমনে কাজ করছে। পিছন থেকে গিয়ে দিলে তার মাথায় আবীর মাখিয়ে, রাঙিয়ে উঠল তার কাগজপত্র। মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ডেস্কে ছিল দোয়াতে লাল কালি। শশাঙ্ক দিলে ঊর্মির শাড়িতে ঢেলে। হাত চেপে ধরে তার আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে ঊর্মির মুখে দিলে ঘষে, তার পরে দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি। বেলা যায় চলে, স্নানাহারের সময় যায় পিছিয়ে, ঊর্মির উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। শেষকালে শশাঙ্কের অস্বাস্থ্য-আশঙ্কায় দূতের পরে দূত পাঠিয়ে শর্মিলা এদের নিবৃত্ত করলে।

দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ঝর্‌ঝর্ শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানলার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারিগাছের বীথিকা। ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না— ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে, কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা?

সকালে ঊর্মি যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েছে। সকালবেলাকার কাজে

ফাঁক পড়ল, ক্লান্তির কথা মনে করে শর্মিলা ওকে ক্ষমা করেছে। কিসের অনুতাপে ঊর্মি আজ অবসন্ন। কেন মনে হচ্ছে, ওর হার হতে চলল। দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তো তোমার কোনো কাজ করতেই পারি নে— বল তো বাড়ি ফিরে যাই!"

আজ তো শর্মিলা বলতে পারলে না 'না, যাস নে'। বললে, "আচ্ছা, যা তুই। তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে। যখন মাঝে মাঝে সময় পাবি দেখে-শুনে যাস।"

শশাঙ্ক তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। সেই অবকাশে সেই দিনই ঊর্মি বাড়ি চলে গেল।

শশাঙ্ক সেদিন যান্ত্রিক ছবি আঁকার এক-সেট সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফিরলে। ঊর্মিকে দেবে, কথা ছিল তাকে এই বিদ্যেটা শেখাবে। ফিরে এসে তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে শর্মিলার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "ঊর্মি গেল কোথায়।"

শর্মিলা বললে, "এখানে তার পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে বলে সে বাড়ি চলে গেছে।"

"কিছু দিন অসুবিধে করবে বলে সে তো প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। অসুবিধের কথা হঠাৎ আজই মনে উঠল কেন।"

কথার সুর শুনে শর্মিলা বুঝলে শশাঙ্ক তাকেই সন্দেহ করছে। সে সম্বন্ধে কোনো বৃথা তর্ক না করে বললে, "আমার নাম করে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।"

ঊর্মি বাড়িতে ফিরে এসে দেখলে, অনেক দিন পরে বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসে অপেক্ষা করছে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে, নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেছে। নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ত-স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছুদিন থেকে কৈফিয়তটা প্রায় এসেছে মিথ্যে হয়ে। শশাঙ্ক বিশেষ জেদ করে শর্মিলার জন্যে দিনে একজন রাত্রে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তারের বিধান-মতে রোগীর ঘরে সর্বদা আত্মীয়দের আনাগোনা তারা রোধ করে। ঊর্মি মনে জানে নীরদ দিদির রোগের কৈফিয়তটাকেও গুরুতর মনে করবে না; বলবে, 'ওটা কোনো কাজের কথা নয়।' বস্তুতই কাজের কথা নয়— 'আমাকে তো দরকার হচ্ছে না'। অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলে, 'এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। বলব, আর কখনো ত্রুটি হবে না, কিছুতে নিয়মভঙ্গ করব না।'

চিঠি খোলবার আগে অনেক দিন পরে আবার বের করলে সেই ফোটোগ্রাফখানা। টেবিলের উপর রেখে দিলে। জানে ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। তবু ঊর্মি কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে এই প্রসঙ্গটা দিদিদের বাড়িতে ও চাপা দিত। অন্যেরাও তুলত না; কেননা এ প্রসঙ্গটা ওখানকার সকলের অপ্রিয়। আজ হাত মুঠো করে ঊর্মি স্থির করলে— ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবে। কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজমেন্ট্ আংটি। সেটা বের করে পরলে। আংটিটা নিতান্তই কম দামের— নীরদ আপন অনেস্ট্ গরিবিয়ানার গর্বের দ্বারাই ঐ সস্তা আংটির দাম হীরের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবখানা এই যে, 'আংটির দামেই আমার দাম নয়, আমার দামেই আংটির দাম।'

নিজেকে যথাসাধ্য শোধন করে নিয়ে ঊর্মি অতি ধীরে লেফাফাটা খুললে।

চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছা করল নাচতে, কিন্তু নাচ ওর অভ্যাস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে সুর না বেঁধেই ঝনাঝন ঝংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপারখানা কি। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি?"

"হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।"

"কিছুতেই নড়চড় হবে না?"

"কিছুতেই না।"

"তা হলে এইবেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ?"

"তোমাকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না।"

"নিজেই সব করবে ? ধন্য বীরাঙ্গনা। আর, কনেকে আশীর্বাদ ?"

"সে আশীর্বাদের টাকাটা আমার নিজের পকেট থেকেই গেছে।"

"মাছের তেলেই মাছভাজা ? ভালো বোঝা গেল না।"

"এই নাও, বুঝে দেখো।"

বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

পড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

লিখছে : যে রিসার্চের দুরূহ কাজে নীরদ আত্মনিবেদন করতে চায় ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই ওর জীবনে আর-একটা মস্ত স্যাক্রিফাইস মেনে নিতে হল। ঊর্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। একজন য়ুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ করে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত। কিন্তু কাজটা সেই একই, ভারতবর্ষেই করা হোক আর এখানেই। রাজারামবাবু যে কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায় হবে না। তাতে মৃতব্যক্তির 'পরে সম্মান করাই হবে।

শশাঙ্ক বললে, "জীবিত ব্যক্তিটাকে কিছু কিছু দিয়ে যদি সেই দূরদেশেই দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পার তো মন্দ হয় না। টাকা বন্ধ করলে পাছে খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।"

ঊর্মি হেসে বললে, "সে ভয় যদি তোমার মনে থাকে টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।"

শশাঙ্ক বললে, "আবার তো মন বদল হবে না ? মানিনীর অভিমান তো অটল থাকবে ?"

"বদল হলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা !"

"প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে অহংকার বেড়ে যাবে, অতএব তোমার হিতের জন্যে চুপ করে রইলুম। কিন্তু ভাবছি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্।"

ঊর্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল— বহু দিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কী যে করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। ওর সেই কাজের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। গলিতে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জানলা থেকে আংটিটা ছুঁড়ে ফেললে তার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলে, "এই পেনসিলের দাগ দেওয়া মোটা বইগুলো কি কোনো হকার কিনবে।"

"নাই যদি কেনে, তার ফলাফলটা কী আগে শুনি।"

"যদি ওর মধ্যে সাবেক কালের ভূতটা বাসা করে, মাঝে মাঝে অর্ধেক রাত্রে তর্জনী তুলে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।"

"সে আশঙ্কা যদি থাকে হকারের অপেক্ষা করব না, আমি নিজেই কিনব।"

"কিনে কী করবে।"

"হিন্দুশাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টিসৎকার। গয়া পর্যন্ত যেতে রাজি, তাতে যদি তোমার মন সান্ত্বনা পায়।"

"না, অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না।"

"আচ্ছা, আমার লাইব্রেরির কোণে পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।"

"আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।"

"সমস্ত দিন ?"

"সমস্ত দিনই।"

"কী করতে হবে।"

"মোটরে করে উধাও হয়ে যাব।"

"দিদির কাছে ছুটি নিয়ে এসো গে।"

"না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন খুব বকুনি খাব। সে বকুনি সইবে।"

"আচ্ছা, আমিও তোমার দিদির বকুনি হজম করতে রাজি। টায়ার যদি ফাটে দুঃখিত হব না।

ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে দুটো-চারটে মানুষ চাপা দিয়ে একেবারে জেলখানা পর্যন্ত পৌঁছতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিন সত্যি দাও যে, মোটর-রথযাত্রা সাঙ্গ করে আমাদেরই বাড়িতে তুমি ফিরে আসবে।"

"আসব, আসব, আসব।"

মোটর-যাত্রার শেষে ভবানীপুরের বাড়িতে দুজন এল, কিন্তু ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো কিছুতেই থামতে চায় না। সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয়লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেছে যে, এটা ভালো হচ্ছে না। কাজের ক্ষতি খুব-গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকারপ্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

শশাঙ্ক

কিছুকাল এইরকম যায়। লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিল হয়ে।

নিজেকে সুস্পষ্ট বুঝতে ঊর্মির সময় লেগেছে, কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝলে।

মথুরদাদাকে ঊর্মি কী জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। সেদিন মথুর সকালে দিদির ঘরে এসে বেলা দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে গেল।

তার পরে দিদি ঊর্মিকে ডেকে পাঠালে। মুখ তার কঠোর, অথচ শান্ত। বললে, "প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস জানিস তা?"

ঊর্মি ভয় পেয়ে গেল। বললে, "কী হয়েছে দিদি।"

দিদি বললে, "মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছুদিন ধরে তোর ভগ্নীপতি নিজে কাজ একেবারে দেখেন নি। জহরলালের উপরে ভার দিয়েছিলেন ; সে মালমসলায় দুহাত চালিয়ে চুরি করেছে। বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা ; সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মাল যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। আমাদের কোম্পানির মস্ত নাম, তাই ওরা পরীক্ষা করে নি, এখন মস্ত অখ্যাতি এবং লোকসানের দায় পড়েছে ঘাড়ে। মথুরদাদা স্বতন্ত্র হবেন।"

ঊর্মির বুক ধক্ করে উঠল, মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো। এক মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় আপন মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে, ভালোমন্দ কিছুই বিচার করতে পারে নি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারই সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে ঊর্মি কেবল ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করত। কতদিন এমন ঘটেছে, শশাঙ্ক যখন স্নানে এমন সময় কাজের কথা নিয়ে লোক এসেছে ; ঊর্মি কিছু না ভেবে বলে পাঠিয়েছে, "বল গে, এখন দেখা হবে না।"

ভয়, পাছে স্নান করে এসেই শশাঙ্ক আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন করে কাজে জড়িয়ে পড়ে যে ঊর্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। তার দুরন্ত নেশার সাংঘাতিক ছবিটা সম্পূর্ণ চোখে জেগে উঠল। তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বার বার করে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলতে লাগল, "তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে আমাকে, এখনই দূর করে তাড়িয়ে দাও।"

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল, কিছুতেই ঊর্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে।

আস্তে আস্তে ঊর্মিমালার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "কিছু ভাবিস নে, যা হয় একটা উপায় হবে।"

ঊর্মি উঠে বসল। বললে, "দিদি, তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারও তো টাকা আছে।"

শর্মিলা বললে, "পাগল হয়েছিস। আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেছি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুরিয়ে দেব। আর, তোকেও বলছি, আমি যে কিছু জানতে পেরেছি এ কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান।"

"মাপ করো, দিদি, আমাকে মাপ করো" এই বলে ঊর্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

শর্মিলা চোখের জল মুছে ক্লান্ত সুরে বললে, "কে কাকে মাপ করবে, বোন। সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।"

দিদিকে ছেড়ে ঊর্মি এক মুহূর্ত নড়তে চায় না— ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো, খাওয়ানো, শোওয়ানো সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। আবার বই পড়তে আরম্ভ করেছে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

ফল হল এই যে, শশাঙ্ক বার বার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষমানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারে না ছট্‌ফটানির তাৎপর্য স্ত্রীর কাছে পড়ছে ধরা, লজ্জায় মরছে ঊর্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেন্‌সিলের দাগ দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে

চার্লি চ্যাপলিনের নাম, ফল হয় না কিছুই। ঊর্মি যখন দুর্লভ ছিল না তখনো বাধার ভিতর দিয়ে শশাঙ্ক কাজকর্ম চালাতে চেষ্টা করত। এখন অসম্ভব হয়ে এল।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর যন্ত্রণা উঠছে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের নীচে পড়ছে কালি। ঊর্মি খাওয়ার সময় কাছে বসে না, সেজন্য শশাঙ্কর খাওয়ার উৎসাহ এবং পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা ওকে দেখলে বোঝা যায়। সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্বে ওদের যে একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাত প্রায় ন্যাড়া করে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল সিকির সিকিতে। শর্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইদানীং ঊর্মির উচ্চহাস্যসংযুক্ত সংক্ষিপ্ত আপত্তি নিষ্ফল হয় নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্‌গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগসাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘটল। কিন্তু তার পর আজকাল কেশোন্নতিবিধানের অনাদরেই ধরা পড়ছে অন্তরবেদনা। এতটা বেশি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্মিলার উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্কারে তার বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে উঠছে, রোগের ব্যথাকে দিচ্ছে এগিয়ে।

ময়দানে হবে কেল্লার ফৌজদের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এল, "যাবে ঊর্মি, দেখতে? ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেছি।"

ঊর্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই শর্মিলা বলে উঠল, "যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আসবার জন্যে ও যে ছট্‌ফট্ করছে।"

প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, "সার্কাস?"

এ প্রস্তাবে ঊর্মিমালার উৎসাহই দেখা গেল।

তার পরে, "বোটানিকাল গার্ডেন?"

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে ঊর্মির মন সায় দিচ্ছে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজ্যের রাজমজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হল— সারা দিন কেবল খাটছে ধুলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রাজগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে আসা অসংগত হল না।

শর্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোওয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোওয়ানো ওর সইবে না।

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি বটে, কিন্তু চারি দিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না, কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিস্ট্ রঙিন পেন্‌সিল দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এত দিন সেটা ছিল পোর্ট্‌ফোলিয়োর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিস-ঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সামনের ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কিরকম ফুটছে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ঊর্মির হাত চেপে ধরে বললে, "তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি; আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর-কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

এ কথা দিদি বার বার করে উর্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার অবর্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে উর্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে সইতে পারত না। ব্যাবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েছে ; বলেছে, যদি ভালোবাসায় বাধা পায় তা হলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনই আবার কাজকর্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

শশাঙ্কের মন উঠেছে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খৃস্টানের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্মিলাকে গিয়ে বললে, "দেখো, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের স্টীমলঞ্চ পাওয়া গেছে— কাল রবিবার, মনে করছি ভোরে উর্মিকে নিয়ে ডায়মন্ডহারবারের কাছে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।"

শর্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠল কুঞ্চিত হয়ে। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না।

শর্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, "খাওয়াদাওয়ার কী হবে।"

শশাঙ্ক বললে, "হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছি।"

একদিন এই-সমস্ত ঠিক করবার ভার যখন ছিল শর্মিলার উপর তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্মিলা বললে, "আচ্ছা, তা যেয়ো" অমনি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বার বার করে বলতে লাগল, "আর কেন আছি বেঁচে।"

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। আজ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনো দিন ছেদ পড়ে নি। এবারেও স্বামীকে না বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর-কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের চেলি। স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে— জ্বালাবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে একটা-কিছু শখের জিনিস কিনে দিত। শর্মিলা ভেবেছিল 'এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।'

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারছে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলই বলে বলে উঠছে, "মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! কী হবে এই খেলায়?"

রাত্রে ঘুম হল না। ভোরবেলা শুনতে পেলে মোটর-গাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল। শর্মিলা ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বললে, "ঠাকুর, তুমি মিথ্যে।"

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চলল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে সেদিন শর্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে। সন্ধ্যাবেলা, ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সংকেত করলে চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে হাতে ধরে বললে, "জীবনে আমি যে বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েছে, মাপ কোরো আমাকে।"

শশাঙ্ক কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললে, "না, কিছু বোলো না। উর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাও নি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।"

নার্স বাইরে থেকে বললে, "ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

শর্মিলা বললে, "ডেকে দাও।"

কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শর্মিলার মামা যতরকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী। সম্প্রতি এক সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বললে আর-কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন, হিমালয়ের ফেরত বাবাজির ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। কোন্ তিব্বতী শিকড়ের গুঁড়ো আর প্রচুর পরিমাণে দুধ, এই হচ্ছে উপকরণ।

শশাঙ্ক কোনোরকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্মিলা বললে, "আর কোনো ফল হবে না, অন্তত মামা সান্ত্বনা পাবেন।"

দেখতে দেখতে ফল হল। নিশ্বাসের কষ্ট কমেছে, রক্ত ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, শর্মিলা উঠে বসল। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরিয়া হয়ে উঠে শেষ ঠেলায় আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

শর্মিলা বেঁচে উঠল।

তখন সে ভাবতে লাগল, 'এ কী আপদ! কী করি! শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।'

ও দিকে ঊর্মি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। এখানে তার পালা শেষ হল।

দিদি এসে বললে, "তুই যেতে পারবি নে।"

"সে কী কথা।"

"হিন্দুসমাজে বোন্-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনো দিন করে নি।"

"ছিঃ!"

"লোকনিন্দা! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা!"

শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বললে, "চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল— চেষ্টা করলেই পাবে। সে দেশে কোনো কথা উঠবে না।"

শর্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না। যাবার আয়োজন চলছে। ঊর্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়।

শশাঙ্ক তাকে বললে, "আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তা হলে কী দশা হবে ভেবে দেখো।"

ঊর্মি বললে, "আমি কিছু ভাবতে পারি নে। তোমরা দুজনে যা ঠিক করবে তাই হবে।"

গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল। তার পর সময় যখন কাছে এসেছে ঊর্মি বললে, "আর দিন-সাতেক অপেক্ষা করো, কাকাবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসি গে।"

চলে গেল ঊর্মি।

এই সময়ে মথুর এল শর্মিলার কাছে মুখ ভার করে। বললে, "তোমরা চলে যাচ্ছ ঠিক সময়েই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি আপসে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে ওর লাভলোকসানের দায় জড়িয়ে রাখি নি। সম্প্রতি কাজ গুটিয়ে নেবার উপলক্ষে শশাঙ্ক কদিন ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল। দেখা গেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেছে। তা ছাপিয়েও যা দেনা জমেছে তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে।"

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "সর্বনাশ এত দূর এগিয়ে চলেছিল— উনি জানতে পারেন নি!"

মথুর বললে, "সর্বনাশ-জিনিসটা অনেক সময় বাজ পড়ার মতো, যে মুহূর্তে মারে তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ জানান দেয় না। ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েছে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্বুদ্ধি ঘটল; ব্যাবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধরে নেবে মনে করে আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার হাটে তেজিমন্দি খেলা শুরু করলে। চড়ার বাজারে যা কিনেছে সস্তার বাজারে তাই বেচে দিতে হল। হঠাৎ আজ দেখলে হাউইয়ের মতো ওর সব গেছে উড়ে পুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের ভাবতে হবে না।"

শর্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে, অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো

বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু করে এনে দিন চালাতে পারবে, এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছুকাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ কথাটাও সসংকোচে মনে উঁকি মেরেছে যে, ঊর্মির সঙ্গে বিয়ে হলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবনযাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এত দিন ধরে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবিকেও শর্মিলা ইচ্ছে করে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল, এরই অগৌরব ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বলতে লাগল, তখনই যদি মরতুম তা হলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হল, কিন্তু দৈন্য-অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তাঁর দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে ঊর্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তা হলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে ঊর্মিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বালিয়ে মারবেন।

এ দিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেছে যে শর্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে তার ব্যবসায়ে। এ কথা শর্মিলা এত দিন তাকে জানায় নি, মিটমাট করে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, চাকরির অন্তে সে একদিন শর্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যাবসা। আজ নষ্ট ব্যাবসার অন্তে সেই শর্মিলারই ঋণ মাথায় করে চলেছে সে চাকরিতে। এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে কোনো কালে শোধ হবার রাস্তা কই।

আর দিন-দশেক বাকি আছে নেপাল-যাত্রার। সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি। ভোরবেলায় শশাঙ্ক ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানা থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপরে হঠাৎ সবলে মুষ্টিঘাত করে বলে উঠল, "যাব না নেপাল।" দৃঢ় পণ করলে, 'আমরা দুজনে ঊর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব— ভ্রূকুটিকুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর, এইখানেই ভাঙা ব্যাবসাকে আর-একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই বসে।'

যে-যে জিনিস সঙ্গে যাবে, যা রেখে যেতে হবে, শর্মিলা বসে বসে তারই ফর্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুনতে পেলে, "শর্মিলা! শর্মিলা!" তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। অকস্মাৎ অনিষ্টের আশঙ্কা করে কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে।"

বললে, "যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।"

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কী হয়েছে।"

শশাঙ্ক বললে, "কাজ আছে।"

সেই পুরাতন কথা— কাজ আছে। শর্মিলার বুক দুরুদুরু করে উঠল।

"শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পার?"

শর্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বললে, "কী হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বলো।"

শশাঙ্ক বললে, "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।"

শর্মিলা বললে, "আচ্ছা, বেশ।"

শশাঙ্ক বললে, "সেইদিনকার মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বললে, "তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। কাজ বুঝিয়ে

দিয়ো আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।"

বাইরে থেকে আওয়াজ এল "চিঠি"। উর্মির হাতের অক্ষরে দুখানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কের নামে—

আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে। বাবার আদেশমত ডাক্তারি শিখে আসব। ছয়-সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্যে ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইল মনে।

শর্মিলার চিঠি—

দিদি, শতসহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ কোরো। যদি সেটা অপরাধ না হয় তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর, সুখ যদি না হয় তো নাই হল। ভুল করতে ভয় করি।

—

মালঞ্চ

মালঞ্চ

১

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাশে তার শাঁখের মতো রঙ, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মার্‌বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই ; এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়।

পুব দিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি ; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে। বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, 'না না থাক্।' চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্রছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায়, নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিম ধারে প্রাচীন মহানিম গাছ। তারই জুড়ি আরো একটা নিমগাছ ছিল ; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে ; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে ; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত— "সত্যি বলছি ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।" কেউ-বা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, "ওগুলো কি সূর্যমুখী ?" নীরজা ভারি খুশি হয়ে হেসে উত্তর করেছে, "না না, ও তো গাঁদা।" একজন বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ একদা বলেছিল— "এতবড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী ? আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর !" সমজদারের পুরস্কার মিলল ; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত

কুঞ্জপরিক্রম— ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন— তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েৎবেল— ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। যথাঋতুতে সব-শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বলত, "কী মিষ্টি জল।" উত্তরে শুনত, "আমার বাগানের গাছের ডাব।" সবাই বলত, "ও, তাই তো বলি।"

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জিলিঙ চায়ের বাষ্পে-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায় হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙিন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন। ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট করে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী। কোন্ বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ। কোন্ বিরাট পাগল। এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পারলে কে।

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা ; মনে করেছে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ।'

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকো প্রথম যে ব্যাপার নিয়ে ধস্ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের 'ডলি' কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্বে ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হল দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন লেজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হত স্বামিনীর তর্জনী সংকেতে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করুণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটে নি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হল তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হল এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশদ্বার। মনে হল বিশ্বসংসারের কর্মকর্তা অব্যবস্থিত চিত্ত— তাঁর আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না, এমন সময় ঘটল সন্তানসম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তার পর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কেমন আছ।"

সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনই সে দেখে অভ্র ও রেশমের

কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাত-পাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারা রোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তার পরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তার পরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু ; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়ছে বুঝি, কোন্‌দিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকল, "রোশনি!"

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা-পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপরে ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার 'পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন-কি, নীরজার স্বামী পর্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "জল এনে দেব খোঁখী?"

"না, বোস্‌।" মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বললে, "আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।"

আয়া কিছু বললে না ; কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, "কবে না শোনা যায়।"

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, "সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন?"

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগল, "আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।"

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বললে, "ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে?"

নীরজা আপন মনে বলে চলল, "নিয়ু মার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেইরকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি।"

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বললে, "আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।"

আয়া উঠল গুমরিয়ে, বললে, "সেদিন নেই, এখন লুঠ চলছে দু হাতে।"

"সত্যি নাকি।"

"আমি কি মিথ্যা বলছি। কলকাতার নতুনবাজারে ক'টা ফুলই বা পৌঁছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।"

"এরা কেউ দেখে না?"

"দেখবার গরজ এত কার।"

"জামাইবাবুকে বলিস নে কেন।"

"আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো? তুমি বল না কেন। তোমারই তো সব।"

"হোক-না, হোক-না, বেশ তো। চলুক-না এমনই কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক্-না।"

"কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ঐ হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।"

হলার কাজে ঔদাসীন্যই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসংগতরূপে বেড়ে উঠছে, এই কারণটাই সব চেয়ে গুরুতর।

নীরজা বললে, "মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন। ওদের হল সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়। হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস নে কথা, চুপ করে থাক্।"

"সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"

"কেন, কী জন্যে।"

"ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্ছে। জামাইবাবু বললে, 'গোরু তাড়াস নে কেন।' ও মুখের উপর জবাব করলে, 'আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই!'"

শুনে হাসলে নীরজা, বললে, "ওর ঐরকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন হাতে তৈরি।"

"জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।"

"চুপ কর রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্ তো ওকে।"

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ কিছু আছে?"

হলা বললে, "আছে বৈকি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।"

"কী রকম, শুনি।"

"ঐ-যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, ঐখান থেকে ইঁটপাটকেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হল ওঁর হুকুম। আমি বললুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।"

"বাবুকে বলিস নে কেন।"

"বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক্। বউদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।"

"তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।"

"বউদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে

দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।"

"আচ্ছা, এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুরকি বইতে বলবে আমার নাম করে বলিস আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"দেশ থেকে চিঠি এসেছে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।" ব'লে মাথা চুলকোতে লাগল।

নীরজা বললে, "না, মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস নে।" এই বলে টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

"আবার কী।"

"বউয়ের জন্যে একখানা পুরোনো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।" এই বলে পানের ছোপে কালো-বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাসলে।

নীরজা বললে, "রোশনি, দে তো ওকে আলনার ঐ কাপড়খানা।"

রোশনি সবলে মাথা নেড়ে বললে, "সে কী কথা, ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি!"

"হোক-না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।"

রোশনি দৃঢ়মুখ করে বললে, "না, সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্ হলা, খোঁখীকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বললে, "আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।"

"কেন রে, কী হয়েছে তোর।"

"আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন দেন বাগড়া। কারও দোষ নয়, আমারই কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় প'ড়ে!"

"ভয় নেই রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।"

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।" সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন?"

"নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া। টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।"

"আজ এই প্রথম হল। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।"

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অর্কিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রঙ, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না, সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বললে, "কে আনতে বলেছে।"

"আদিতদা।"

"নিজে এলেন না যে?"

"নিয়ু মার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা খাওয়া সেরেই।"

"এত তাড়া কিসের।"

"কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা-চুরির খবর এসেছে।"

"টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও সময় দিতে পারতেন না।"

"কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।"

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, "জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত ? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী ?" বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বৈ কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, "জান এ ফুলের নাম ?"

বললেই হত, জানি নে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল, বললে, "এমারিলিস।"

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, "ভারি তো জান তুমি ; ওর নাম গ্র্যান্ডিফ্লোরা।"

সরলা মৃদুস্বরে বললে, "তা হবে।"

"তা হবে মানে কী। নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও, আমি জানি নে ?"

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাকল, "শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে।"

"অর্কিডের ঘরে।"

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, "অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার।"

"পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্যে আদিতদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।"

নীরজা বলে উঠল ধমক দেওয়ার সুরে, "আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না।"

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন-কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ আমলে ঠিকমত কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাস না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বললে, "দাও, বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।" সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি ?"

"না, কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।"

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, "মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।"

"না, দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি।"

"গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।"

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বললে, "তার সময় এই বুঝি ! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে শুনি।"

সরলা মৃদুস্বরে বললে, "মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।"

"বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।"

এল হলা মালী। নীরজা বললে, "বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে! দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি। বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।" মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে-শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরে বললে, "বউদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।"

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "এর দাম কত।"

জিভ কেটে হলা বললে, "এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-পরে যে মানুষ।"

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগনীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।"

নীরজা বললে, "আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।" হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, "রোশনি, রোশনি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।"

আয়া বললে, "ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি!"

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, "আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন। আমি কি জানি নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।"

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠল, নীরজা বললে, "থাক্ থাক্, আজ থাক্।"

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বললে, "বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আপিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।"

নীরজা হেসে বললে, "খবর দেবার ছুতো করে একদৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো! কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?"

"তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি। বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।"

"ওগো মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে। তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবুকুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।"

"কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।" এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুশি হয়ে বললে, "'অশ্রু-শিকল', এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বল তোমার কল্পনার দোসর, তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী! কী সোহাগ গো।"

রমেন হঠাৎ বললে, "আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।"

"কী কথা।"

"সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে।"

"কেন বলো তো।"

"দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন কোন্ দিকে।' ও বললে, 'যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।' আমি বললুম, 'ওটা হল হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বললে, 'সব কথারই ভাষা আছে ?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল 'কাহার বচন দিয়েছে বেদন'।"

"হয়তো তোমার দাদার বচন।"

"হতেই পারে না। দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ' এও কি সম্ভব হয়।"

"আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।"

"পুণ্যের লোভ রাখি নে, কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।"

"তা হলে বাধাটা কোথায়। ওর কি মন নেই।"

"সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেইছি তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।"

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, "কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।"

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, "বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।"

"আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।"

"আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল্ নেই।"

"এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে ?"

"না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।"

হরলিকস দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, "যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার। চিনতে পার ?"

সরলা বললে, "ও তো আমার।"

"তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জেঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।"

"এ তুমি কোথা থেকে পেলে।"

"দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে।

রমেন বললে, "তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল। অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে।"

নীরজা বললে, "ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোনো একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে— যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি-ঝরি করছে— একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো ?"

সরলা চলে যেতে উদ্যত হল, নীরজা তাকে বললে, "সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি।"

রমেন বললে, "সমস্তটাই একসঙ্গে।"

"নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো ; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।"

"তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বউদি। জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।"

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, "ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ ?"

রমেন হেসে বললে, "আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।"

"অমন-দুটি হাতের 'পরে দাবি করবে না ?"

"চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।"

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে, "একটা কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব।"

"কী, বলো।"

"আজ শুক্লাচতুর্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা— এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে-সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

সরলা সহজ সুরেই বললে, "আচ্ছা, এসো তুমি।"

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, "তবে আসি বউদি।"

"আর থাকবার দরকার কী। বউদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হল।"

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো-আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে, "আমার রঙমহলের সাকী।" দশ বছরে রঙ একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, "সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে-পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারই দু ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা।" কথায় কথায় সে বলত, "তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের

ইন্দ্রাণী।" হায় রে, যৌবন তো আজও ফুরোয় নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভরাতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়। সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকালবেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর। আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন।

"রোশনি, শুনে যা।"

"কী খোঁখী।"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত 'রঙমহলের রঙ্গিনী'। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রঙ তো এখনো ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রঙমহল?"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।"

"রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।"

"একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।"

"আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে।"

"ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়।"

"মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে। তা হলে মালীদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?"

"তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি।"

"ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ?"

"হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।"

"হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানি থেকে। সেফটিপিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।"

"থাক্ পড়ে, খাব না।"

"দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।"

"তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।"

আয়া চলে গেল।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদ্দুরের রঙ, ছায়া হেলে পড়েছে পুব দিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রঙের দেশী ল্যাবার্নম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।" শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, "মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।"

"অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো। আমার কি আর সেদিন আছে।"

"দিনের কথা হিসেব করে কী হবে। তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।"

"আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।"

"অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না ? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।"

"আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয় ?"

"ভুলতে ফুরসত দাও কই।"

"বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসত দিয়েছি যে।"

"উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।"

"সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি ?"

"কী কথা বল তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।"

"কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা-দুটো বিছানায় তোলো।"

"বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই !"

"হাঁ, বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

"মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।"

"না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে। তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্‌কার !"

"আমিই তা হলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।"

"তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।"

"যাই বল আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার 'পরে।"

"কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমার দিতে হবে না— নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।"

"দণ্ড কিসের জন্য। রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।"

"যদি কোনোদিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।"

"অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।"

আয়া ঘরে এল। বললে, "জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।" বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, "এবার তবে আমি রাগ করি ?"

"হাঁ, করো, খুব রাগ করো, যত পার রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।"

আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল, "সরলা, সরলা।"

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন ঝন করে উঠল। বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, "নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি ?" নীরজা বলে উঠল, "ওকে বকছ কেন। ওর দোষ কী। আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি, আমাকে বকো-না। সরলা তুমি যাও ; মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে।"

"যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক। হরলিকস মিল্ক তৈরি করে আনুক।"

"আহা, সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার, তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন। একটু দয়া হয় না তোমার মনে ? আয়াকে ডাকো-না।"

"আয়া কি ঠিকমত পারবে এ-সব কাজ।"

"ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া।"

"অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।"

"আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি" বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য হল, ভাবলে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্ছে।

ওষুধপথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে, সরলাদিদিকে ডেকে দাও।

"কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।"

"কাজের কথা আছে।"

"থাক্-না এখন কাজের কথা।"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো-না।"

"তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ কর প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।"

"সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে-বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে তাই তো পোড়োবাড়িতে ভূতের বাসা হল।"

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "অর্কিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?"

"হাঁ, হয়ে গেছে।"

"সবগুলো?"

"সবগুলোই।"

"আর গোলাপের কাটিং?"

"মালী তার জমি তৈরি করছে।"

"জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতন-কাঠির চাষ হবে আর কী।"

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, "সরলা, যাও তো কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।"

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে, যেমন আমরা রোজ উঠতুম?"

"হাঁ, উঠেছিলুম।"

"ঘড়িতে তেমনি এলার্মের দম দেওয়া ছিল?"

"ছিল বৈকি।"

"সেই নিমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?"

"রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।"

"দুটো চৌকিই পাতা ছিল?"

"পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রঙের চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানি ট্রে।"

"অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন!"

"ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।"

"সরলাকে কেন ডাক না তোমার চায়ের টেবিলে।"

এর উত্তরে বললেই হত, তোমার আসনে আর কাউকে ডাকতে মন যায় না। সত্যবাদী তা না বলে

বললে, "সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।"

"চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে ?"

"হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও-না কেন।"

"ঘটকালি কি আমার ব্যাবসা।"

"না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়।"

"পাত্র আছে এক দিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে-খবর নেবার ফুরসত পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।"

একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে নীরজা, "কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।"

"বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে। তুমি চেষ্টা দেখো-না।"

"কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।"

"শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্স্‌রে আর কি।"

"মিছে বকছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।"

"এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ-লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল নাকি।"

উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বললে, "কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।"

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠল, "আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা ? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না !"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, "সে কেমন কথা। নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়।"

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে, "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।"

"বল কী ! সরলা জানে না ? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জেঠামশায়। তুমি তো জান তাঁরই বাগানে আমার হাতেখড়ি। জেঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।"

"আর তুমি ছিলে সঙ্গী।"

"ছিলেম বৈকি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।"

"সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। এমনই ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো-না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন ! মেয়েমানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।"

"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু। কী কথা বলছ। মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যাবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনই তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।"

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, "ঐখানে রেখে যাও।" রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলই না।

"সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।"

"শোনো একবার কথা! বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।"

"মনেও আসে নি? এই বুঝি তোমার কবিত্ব!"

"জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।"

"কেন, সভ্যতার অপরাধটা কী।"

"এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।"

"সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।"

"সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে-তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।"

"আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?"

"নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ যে, ওকে ভালোবাসব না! মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন-কি, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখ নি কি তুমি। ও যে ভালোবাসবার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।"

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বললে, "থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলেছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিসট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।"

"বারাসতের মেয়ে ইস্কুল? কেন, আন্ডামানও তো আছে।"

"না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো, কিন্তু ঐ অর্কিড-ঘরের কাজ দিতে পারবে না।"

"কেন, হয়েছে কী।"

"আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।"

"আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ ছিল অর্কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি, চীন থেকে অর্কিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।"

কথাটা নীরজা জানে, সেইজন্যে কথাটা তার অসহ্য।

"আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে, এমন-কি, তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও-না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপালদোষে না হয় আজ আছি বিছানায় প'ড়ে, তাই বলে—" কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে

মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার। বুঝতে পারল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে দিনে, আদিত্য জানতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। এমন নির্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি। বিশেষত ঋতুর হিসাব করে বাছাই-করা ফুলে কেয়ারি সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, একদিন যখন কোনো উপলক্ষে সরলার প্রশংসা করে ও বলেছিল, "কামিনীর বেড়া এমন মানানসই করে আমি তো লাগাতে পারতুম না", তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, "ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।" আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনোমতে সরলার একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম ; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল ; "ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলা মালীও বলতে পারত।"

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তার পরে হাত ধরে বললে, "কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি।"

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "কিছু চাই নে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারই বাগান। তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো আমার তাতে কী।"

"নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান ? তোমার নয় ? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে।"

"যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর-সমস্ত-কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার সামনে। আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি ?"

"নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবি লেবুর সঙ্গে কলম্বা লেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।"

"তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে, ও এত জানে, ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এ-সব কথা কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে। আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন। মাপে সমান হব কী নিয়ে।"

"নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা-সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর-কেউ।"

"না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এত দিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সব চেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন। তুমি তো জান আমার দিন-রাতের সাধনা। জান কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।"

"জানি বৈকি। আমার সব-কিছুকে নিয়েই যে তুমি।"

"ও-সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে,

আর-কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে। আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়। আমি হলে কি এমন করতে পারতুম।"

"কী করতে তুমি।"

"বলব কী করতুম ? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যাবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে, বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে— সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার ? এমনটা কেন হতে পারল, বলব ?"

"বলো।"

"তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তার পরে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, "নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্নারির পাশে যে জাপানি ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।"

৫

দিঘির ও পারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রুপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল, "আসতে পারি কি।"

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, "এসো।" রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে, "কোথায় বসলে রমেনদাদা, উপরে এসো।"

রমেন বললে, "জান দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে ? পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতি মতে।"

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বললে, "সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।"

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

"এ আবার কী।"

"জান না আজ দোলপূর্ণিমা ? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রঙটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।"

"তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।"

"কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।"

পাশে এসে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে, "রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।"

"জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিকতে দিল না।"

"না, আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।"

"ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।"

"বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিতদার মুখখানা দেখতে পেতে।"

"আভাসে কিছু দেখেছি।"

"আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে, দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে ; রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিতদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে ; মালীরা কাজ করে যাচ্ছে, তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সব দিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি ; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনই হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'ক্যাটালগ দেখছ বুঝি ?' আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনই কী একটা বলাই চাই। আবার তখনই পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দেখেছ সরি, কতবড়ো ন্যাসটার্শিয়াম।' কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তার পর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, 'যাবে না বাগানে ?' আদিতদা বললেন, 'না ভাই, বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে' বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

"আদিতদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন ; কী আন্দাজ কর তুমি।"

"বলতে এসেছিলেন, আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।"

"তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।"

সরলা ম্লান হেসে বললে, "তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি। সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলসা রাখবেন।"

"তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে। এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।"

"কী করবে তুমি।"

"তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন-কি, কালাপানির পার পর্যন্ত !"

"তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছুদিন থেকে। আর সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।"

"না বললে মনে করব।"

"ছেলেবেলা থেকে আদিতদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাই-এর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু-তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে। জেঠামশাইয়ের মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে-বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ ক'রে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিতদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ

সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।"

"তার পরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিতদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই— আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তার পর থেকে আদিতদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে-বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।"

"কথাটা শেষ করে ফেলো।"

"হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা. আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি।"

"তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।"

"আমি কী করব বলো। নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।" বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বললে, "যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।"

"অন্যায় কার উপরে।"

"বউদির উপরে।"

"দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের ; তখন কোথায় ছিল বউদি।"

"কী বলছ রমেনদা ! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা। আদিতদার কথাও তো ভাবতে হবে।"

"হবে বৈকি। তুমি কি ভাবছ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগে নি।"

"রমেন নাকি।" পিছন থেকে শোনা গেল।

"হাঁ দাদা।" রমেন উঠে পড়ল।

"তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।"

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনই উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে, "যেয়ো না সরি, একটু বোসো।" আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্মরত আপনা-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবলই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বললে, "আমরা দুজনে এ সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি।"

"অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিতদা।"

"সে-ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জান কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের 'পরে।"

"জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।"

"সইতে পারবে সরি ?"

"সইতেই হবে।"

"মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।"

"তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য, এ ছাড়া আর তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।"

"তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।"—ব'লে মুঠো শক্ত করে আকাশে কোন্ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হল।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে, "ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব।"

"তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সে চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের 'পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনই জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে, 'মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে ?' ব'লে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ কচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন, 'এ কী কাণ্ড।' তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, 'বড়ো গরম লাগে।' তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জেঠামশায়!"

সরলা হেসে বললে, "তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয় ? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।"

"খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে—"

"থাক্ আর বলতে হবে না আদিতদা" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, "সে-সব দিন আর আসবে না" বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে, "না যেয়ো না, এখনই যেয়ো না, কখন এক সময়ে যাবার দিন আসবে তখন—"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠল, "কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা! আজ দশ বৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হল, তারই এই পরিণাম ? কী নিয়ে ঈর্ষা। তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।"

"তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি। সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী। তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠল, "অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

"কথা বোলো না আদিতদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।"

"ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনো রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে। তোমার কথা বলতে পারি নে সরি, আমার তো সাধ্য নেই।"

"পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।"

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে, "উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।"

"চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।"

"সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে। তুমি তো কর নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি।"

"জেঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয়তো—"

"না না— তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা।"

"থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে। কী হবে মিথ্যে ছটফট করে। কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।"

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, "আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব ? এই এনেছি সেফটিপিন।"

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, "কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।"

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদির 'পরে। চাকর এসে খবর দিল "খাবার এসেছে।" আদিত্য বলল, "আজ আমি খাব না।"

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "বউদি, ডেকেছ কি।" নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, "এসো।"

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর, বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানলার বাইরে। সেদিকে অর্কিডের ঘর

পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে থালায় বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার। রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখির চলেছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মানতে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছনার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতিমুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জেঠামশায়ের প্রসাদে ; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল-সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জেঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অর্কিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এতবড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরানিগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা ? এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার 'পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।"

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, "কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।"

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, "অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে।"

"কী করছ বউদি। শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।"

"এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের। তার 'পরে আমার অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে। এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস! সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'মালিনী', কখনো বলতেন 'বনলক্ষ্মী'! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন। আমার কি একটাই নাম ছিল। কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো-বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।"

"বউদি, আবার তুমি সেরে উঠবে, তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।"

"মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।"

"দরকার কী বউদি। আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি। যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়। যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে-গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন। এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।"

"বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম করেও জ্বলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।"

"সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি, তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষমুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টামাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বললে, "আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।"

"হুকুম করো বউদি।"

"বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।"

"তুমি তো জান বউদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।"

"ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে. সামলাতে পারছি নে।"

“বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার— ‘দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি’— সব ভার যাবে একমুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনই বলো— ‘দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব-কিছুই দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে’।”

“আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা-কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার— আর দেরি নয়, এখনই। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।”

“আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।”

“না, না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানি ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না— এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।”

“সময় হয় নি বউদি, আজ থাক্।”

“সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষনি ডেকে আনো।” পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে বললে, “বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো, একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না।”

“কী বলো।”

“একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।”

“আচ্ছা, যাও, আপত্তি করব না।”

“আয়া!”

“কী খোঁখী।”

“ঠাকুরঘরে নিয়ে চল্ আমাকে।”

“সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—”

“ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?”

“আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও, ভয় নেই, ভালোই হবে।”

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময়ে আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, “এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন।”

“এখনই আসবেন, তিনি ঠাকুরঘরে গেছেন।”

“ঠাকুরঘরে! ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।”

“শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।”

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জানত না যে, অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে-লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথম ও সরলাকে বলতে এসেছিল— আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরল উলটো কথা। তার পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসে বসে বার বার করে বলেছে— জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু।

অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির ; ফলাফল যা হয় তা হোক। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

"রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান আমি জানি।"

"হাঁ, জানি।"

"আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পর্দা ফেলব উঠিয়ে।"

"তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ও দিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।"

"তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মান তো?"

"মানি বৈকি।"

"সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ।"

"কে বলে দোষ।"

"আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।"

"গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন। বউদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।"

নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বললে, "মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।" আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, "নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।" নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।"

"তুমি তো জান নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে।"

"এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন। এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে।"

"অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।"

"কী বল তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল।— ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন।"

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক্ করে ঘা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনোক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বললে, "রাত হয়েছে, এখন থাক্।" এমন সময় নীরজা বলে উঠল, "ঐ শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।"

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে, "এসো বোন, আমার কাছে এসো।"

সরলার হাত ধরে বিছানায় বসাল। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে, "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় 'পরে থেকো শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।"

"অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।"

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে, "ঐ মালাটা আমাকে দাও-না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারও কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।"

নীরজা বললে, "আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনোমতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

"ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।"

"সে কী কথা।"

"আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনেই বলছি। ভাগ্য যে-দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম, আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু বেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।"

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না, সেও গেল চলে।

"ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও।"

"এইজন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।"

"কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না।"

"বুঝেছে বৈকি। বুঝেছে যে, মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।"

"কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন! এত মার খেয়েও! কে বিশুদ্ধ করে দেবে। ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও-না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি।"

"আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।"

"ঘুমোব কেমন করে। এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।"

"চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।"

"যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

৭

আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বললে, "কেন এলে। ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।"

"তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে আমাদের হাত নেই।"

"সে-সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও, রোগীকে শান্ত করো গে।"

"আমাদের এই বাগানের আর-একটা শাখা বাড়াব সেই কথাটা—"

"আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।"

রমেন এসে বললে, "যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।"

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বললে, "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?"

"আছে।"

"তুমি যাবে না?"

"যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হল না।"

"কেন।"

"সে কথা তোমাকে বলে কী হবে।"

"তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।"

"যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বৈকি।"

"তা হলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।"

"আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।"

"আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।"

"বুঝেছি।"

"পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।"

"আচ্ছা বাধা দেব না।"

"এই রইল কথা?"

"রইল।"

"আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।"

"হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।"

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, "ও কী, এখনই এলে যে বড়ো!"

"দুই-একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।"

রমেন বললে, "আমার কাজ আছে, চললুম।"

সরলা হেসে বললে, "বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।"

"কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।" এই বলে সে চলে গেল।

৮

সরলা বসে ছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।"

"কিচ্ছু বলব না, ভয় নেই।"

"আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই তুমি শোনো। বলো, কথা রাখবে।"

"অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জান।"

"বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।"

"আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।"

"না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার। কক্ষনো না, আমি তোমাকে জানি।"

আদিত্যের হাত ধরে বললে, "আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা দাও ভাই।"

"দেব, কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো রাখবে।"

"তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।"

"না, হবে না।"

"আচ্ছা, বলো।"

"যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ক্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে।"

"জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।"

"বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি। সেই কথাটা বলো আগে।"

"কেন আমাকে দুঃখ দাও। তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।"

"আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।"

"আর ফিরে তাকাবে না এখন?"

"না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার সীলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।"

"যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায়।"

"সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।"

"রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে! সে-লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি।"

"ভয় নেই তোমার। পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।"

"আমি জানতে পারব তো?"

"নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি ; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।"

"তোমারও মন ব্যস্ত হবে না ?"

"যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে ?"

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

৯

"রোশনি !"

"কী খোঁখী।"

"কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন।"

"সে কী কথা, জান না, সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে ?"

"কেন, কী করেছিল।"

"দারোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।"

"কী করতে।"

"মহারানীর সীলমোহর থাকে যে-বাক্সয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা !"

"লাভ কী।"

"ঐ শোনো ! সেটা পেলেই তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।"

"আর ঠাকুরপো ?"

"সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানী রঙের দামি শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, 'তোমার ছেলের বউকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো ?"

"ভয় নেই তোর। কিন্তু শিগগির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে, নিয়ে আয়।"

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য হল, আদিত্য তাকে এতবড়ো খবরটাও দেয় নি। এ কি অশ্রদ্ধা ক'রে। জেলে গিয়ে জিতল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতে পারতুম।

"রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি ? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে—"

আয়া বললে, "মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোরডাকাতের বাড়া। ছি ছি !"

"ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।"

আয়ার মনে পড়ল জাফরানী রঙের শাড়ির কথা। বললে, "কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ।"

কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিল। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, "ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে কত যেন নিচু হয়ে গেছি। ছি ছি, নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।"

আয়া চলে গেলে ও পেনসিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, "চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?"

গণেশ গাঙ্গুলির কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে, "পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিসের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।"

নীরজা পড়ে শোনালে, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।"

গণেশ বললে, "ঐ যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।"

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।"

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, "এ আবার কী।"

আদিত্য বললে, "ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

"ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না! নাহয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও-না, যদি মনে এতই উদ্‌বেগ থাকে।"

"সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন।"

"তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"হোক-না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তার পরে সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।"

"সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।"

"লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।"

"অমন করে আক্ষেপ করছ কেন। বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।"

"পাখাটা কি চালিয়ে দেব।"

"বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ-সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম ক'রে দিন কাটাতে চাও তোমাদের তো হর্টিকালচরিস্‌ট্ ক্লাব আছে।"

"তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজেছিলুম, একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।"

"কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুকনো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে সরষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।"

"তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।"

"বলতে ওর রুচবে কেন। ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ। কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানিকে যেরকম গ্রাহ্য করে না সেইরকম আর কি।"

"হলা মালীর সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

"আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দু দিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রিটা। আমি

ম্যাপে পেনসিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।"

"আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না ?"

"না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমারই ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি রাস্তার ধারের ঐ বট্‌ল-পাম্‌গুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্‌টা আমি রাখব না, ওখানে মারবেলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।"

"বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে। একটু যেন— যাকে বলে সস্তা নবাবি।"

"চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তার পরে সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।"

"আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব।"

"তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো ; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।"

"তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ ?"

"হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই, এখন আমি কেবল আর-একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি, তাতে লাভ কী।"

"আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনই আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্যে গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।" ব'লে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাত ধরে বললে, "না, যেয়ো না, একটু বোসো।" ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে বললে, "জান এ ফুলের নাম ?"

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুশি হবে, তাই মিথ্যে করে বললে, "না, জানি নে।"

"আমি জানি। বলব ? পেট্যুনিয়া। তুমি মনে কর আমি কিচ্ছু জানি নে, মুর্খু আমি!"

আদিত্য হেসে বললে, "সহধর্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।"

"সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ-যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ঐ-যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।" আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, "একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না ? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।"

"যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর ! যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোই নি।"

"বলো-না, তুমি কী মনে কর। একটুও থাকব না ? এতটুকুও না ?"

"এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।"

"নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস এখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে ?"

আদিত্যকে বলতে হল, "হাঁ, মনে করব।" কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

বিছানায় শুয়ে ছিল নীরজা ; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল, বললে, "আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক'রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব ?" নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বললে, "নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।"

"যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত-কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না," বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হলে পর বললে, "সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।"

আদিত্য বললে. "শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।"

"শোনো বলি। কালি রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বার বার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিন গুনছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'।" বালিশের নীচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বলল, "চিঠি", ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড় ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়টি কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কী খবর।"

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরল না কিছুক্ষণ। তার পরে খুব জোর করে বললে, "তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।"

"ও কী। কী হল। নীরু ! নার্স, ডাক্তার আছেন ?"

"আছেন বাইরের ঘরে।"

"এখনই নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার ! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

ডাক্তার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে, "ডাক্তার, আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না, ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করব তাকে— শেষ আশীর্বাদ।"

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হল, বলে উঠল, "ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।"

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, "কখন আসবে সরলা।"

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, "রোশনি !"

আয়া বলে, "কী খোঁখী।"

"ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুনি।" একবার আপনি বলে উঠল, "কী হবে আমার ঠাকুরপো ! দেব দেব দেব, সব দেব।"

রাত্রি তখন ন'টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্ছে আশঙ্কা ক'রে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখলে ঠোঁট নড়ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে, "সরলা এসেছে।" চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, "তুমি যাও"— একবার ডেকে উঠল, "ঠাকুরপো !" কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে।

ভাঙা গলায় বলে উঠল, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।"

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে— চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।"

হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

—

প্রবন্ধ

স্বদেশ

স্বদেশ

নূতন ও পুরাতন

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয় ; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর-সকলে কার্যে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি : আমরা আমাদের পুরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্মে ইস্তফা দিয়ে পেন্সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বহুকালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নূতন রাজার রাজত্বে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যেরকম খেটে মরছে এবং খাজনা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতিকে হঠাৎ নূতন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে।

অতএব চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো ; ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য নিয়ে থাকলে আর চলবে না ; কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো, পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নব-মানব রাজার রাজস্ব দাও ; কালেজে পড়ো, হোটেলে খাও এবং আপিসে চাকরি করো।

হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে। আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ করে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গতিশীল নিখিল-সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসেছিলুম। এমন সময় কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত ছারখার করে দিলে। পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।

মনে করো আমাদের চতুর্দিকে হিমাদ্রি এবং সমুদ্রের বাধা যদি আরো দুর্গম হত তা হলে এক-দল মানুষ একটি অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে স্থির-শান্ত-ভাবে একপ্রকার সংকীর্ণ পরিপূর্ণতা লাভের অবসর পেত। পৃথিবীর সংবাদ তারা বড়ো একটা জানতে পেত না এবং ভূগোলবিবরণ সম্বন্ধে তাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ ধারণা থাকত ; কেবল তাদের কাব্য, তাদের সমাজতন্ত্র, তাদের ধর্মশাস্ত্র, তাদের দর্শনতত্ত্ব অপূর্ব শোভা সুষমা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পেত ; তারা যেন পৃথিবী-ছাড়া আর-একটি ছোটো গ্রহের মধ্যে বাস করত ; তাদের ইতিহাস, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুখ-সম্পদ তাদের মধ্যেই পর্যাপ্ত থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে মৃত্তিকাস্তরে রুদ্ধ হয়ে যেমন একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয় ; সে কেবল নিস্তরঙ্গভাবে প্রভাতসন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং অন্ধকার রাত্রে স্তিমিত নক্ষত্রালোকে স্তম্ভিতভাবে চিররহস্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকে।

কালের বেগবান প্রবাহে, পরিবর্তন-কোলাহলের কেন্দ্রস্থলে, প্রকৃতির সহস্র শক্তির রণরঙ্গভূমির মাঝখানে সংক্ষুব্ধ হয়ে খুব একটা শক্ত-রকম শিক্ষা এবং সভ্যতা লাভ হয় সত্য বটে ; কিন্তু নির্জনতা নিস্তব্ধতা গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে যে কোনো রত্ন সঞ্চয় করা যায় না তা কেমন করে বলব।

এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্‌ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে আছে সেইখানে পড়েই আছে, এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেউ অলস ভক্তিভরে হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই-ই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থবিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করছে।

এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার স্থান! এখানকার ভগ্ন ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবের কারাগার নির্মাণের যোগ্য। তোমাদের অস্থির উদ্যমের বেগে এর প্রাচীন ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করে দিতে পার বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতিপ্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই নিশ্চেষ্ট নিবিড় মহানগরারণ্য ভেঙে গেলে সহস্র মৃত বৎসরের যে একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্য এখানে চিরনিভৃত আবাস গ্রহণ করেছিল সেও যে সহসা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে।

এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি, সে অভ্যাস এদের নেই, এদের সমধিক চিন্তাশীলগণের সেই এক মহৎ গর্ব। তারা যে কথা নিয়ে লেখনীপুচ্ছ আস্ফালন করে সে কথা অতি সত্য, তার প্রতিবাদ করা কারও সাধ্য নয়। বাস্তবিকই অতিপ্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি। কালক্রমে অনেক অবস্থা-বৈসাদৃশ্য, অনেক নূতন সুবিধা-অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে মৃতকে এবং জীবিতকে, সুবিধা এবং অসুবিধাকে প্রাণপণে সেই পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। অসুবিধার খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিতভাবে স্বহস্তে নূতন গৃহ নির্মাণ বা পুরাতন গৃহসংস্কার করেছে এমন গ্লানি এদের শত্রুপক্ষের মুখেও শোনা যায় না। যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র প্রকাশ পেয়েছে সেখানে অযত্নসম্ভূত বটের শাখা কদাচিৎ ছায়া দিয়েছে, কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে কথঞ্চিৎ ছিদ্ররোধ করেছে।

এই বনলক্ষ্মীহীন ঘন বনে, এই পুরলক্ষ্মীহীন ভগ্ন পুরীর মধ্যে, আমরা ধুতিটি চাদরটি পরে অত্যন্ত মৃদুমন্দভাবে বিচরণ করি, আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিই, ছায়ায় বসে তাস-পাশা খেলি, যা-কিছু অসম্ভব এবং সাংসারিক কাজের বাহির তাকেই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, যা-কিছু কার্যোপযোগী এবং দৃষ্টিগোচর তার প্রতি মনের অবিশ্বাস কিছুতে সম্যক দূর হয় না, এবং এরই উপর কোনো ছেলে যদি সিকিমাত্রা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তা হলে আমরা সকলে মিলে মাথা নেড়ে বলি: সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্।

এমন সময় তোমরা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের জীর্ণ পঞ্জরে গোটা দুই-তিন প্রবল খোঁচা দিয়ে বলছ: ওঠো ওঠো; তোমাদের শয়নশালায় আমরা আপিস স্থাপন করতে চাই। তোমরা ঘুমচ্ছিলে বলে যে সমস্ত সংসার ঘুমচ্ছিল তা নয়। ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঐ ঘণ্টা বাজছে, এখন পৃথিবীর মধ্যাহ্নকাল, এখন কর্মের সময়।

তাই শুনে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধড়্‌ফড়্ করে উঠে 'কোথায় কর্ম' 'কোথায় কর্ম' করে গৃহের চার কোণে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে এবং ওরই মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় স্ফীত স্বভাবের লোক তারা পাশমোড়া দিয়ে বলছে: কে হে! কর্মের কথা কে বলে! তা, আমরা কি কর্মের লোক নই বলতে চাও। ভারি ভ্রম। ভারতবর্ষ ছাড়া কর্মস্থান কোথাও নেই। দেখো-না কেন, মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে এইখানেই আর্য-বর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে; এইখানেই কত রাজ্যপত্তন, কত নীতিধর্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে। অতএব কেবলমাত্র আমরাই কর্মের লোক, অতএব আমাদের আর কর্ম করতে বোলো না। যদি অবিশ্বাস হয় তবে তোমরা বরং এক কাজ করো— তোমাদের তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদালখানা দিয়ে ভারতভূমির যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির স্তর উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে কোথায় আমাদের হস্তচিহ্ন আছে। আমরা ততক্ষণ অমনি আর-একবার ঘুমিয়ে নিই।

এইরকম করে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্ধ-অচেতন জড় মূঢ় দাম্ভিক -ভাবে ঈষৎ-উন্মীলিত নিদ্রাকষায়িত নেত্রে আলস্যবিজড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠহুংকারে জগতের দিবালোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

করছে, এবং কেউ কেউ গভীর আত্মগ্লানি-সহকারে শিথিলস্নায়ু অসাড় উদ্যমকে ভূয়োভূয় আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে। এবং যারা জাগ্রতস্বপ্নের লোক, যারা কর্ম ও চিন্তার মধ্যে অস্থিরচিত্তে দোদুল্যমান, যারা পুরাতনের জীর্ণতা দেখতে পায় এবং নূতনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করে, সেই হতভাগ্যেরা বারংবার মুণ্ড আন্দোলন করে বলছে : হে নূতন লোকেরা, তোমরা যে নূতন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তো তার শেষ হয় নি, এখনো তো তার সমস্ত সত্যমিথ্যা স্থির হয় নি, মানব-অদৃষ্টের চিরন্তন সমস্যার তো কোনোটারই মীমাংসা হয় নি।

তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি। আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ। তোমরা যে নিত্য নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকেই সমস্ত জীবনের কর্তা করে উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তোমরা কি স্পষ্ট জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেছি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে, দূর ও নিকট সম্পর্কীয়ে, অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি। যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না, এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না।

ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে। এখন আর তার কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমাদের যখন একদিন কাজ বন্ধ করতে হবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে। আমাদের মতো এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি। উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগাহন করে, সেইরকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি। না, কল যেরকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যেরকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়, সেইরকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?

যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ— অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও আমাদের গৃহে আমরা থাকি, এই কথাই ভালো।

কিন্তু মানুষ থাকতে দেয় কই? তুমি যখন বিশ্রাম করতে চাও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে তখন অশ্রান্ত। গৃহস্থ যখন নিদ্রায় কাতর, গৃহছাড়ারা যে তখন নানা ভাবে পথে পথে বিচরণ করছে।

তা ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও— পৃথিবীর এইরকম নিয়ম।

অতএব আমরা যে জগতের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে আছি তাতে কারও কিছু বলবার নেই। তবে, সে সম্বন্ধে যখন বিলাপ করি তখন এইরকম ভাবে করি যে, পূর্বে যে নিয়মের উল্লেখ করা হল সেটা সাধারণত খাটে বটে, কিন্তু আমরা ওরই মধ্যে এমন একটু সুযোগ করে নিয়েছিলুম যে আমাদের সম্বন্ধে

অনেক দিন খাটে নি। যেমন মোটের উপরে বলা যায় জরামৃত্যু জগতের নিয়ম, কিন্তু আমাদের যোগীরা জীবনীশক্তিকে নিরুদ্ধ করে মৃতবৎ হয়ে বেঁচে থাকবার এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমাধি-অবস্থায় তাঁদের যেমন বৃদ্ধি ছিল না তেমনি হ্রাসও ছিল না। জীবনের গতিরোধ করলেই মৃত্যু আসে, কিন্তু জীবনের গতিকে রুদ্ধ করেই তাঁরা চিরজীবন লাভ করতেন।

আমাদের জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা খাটে। অন্য জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায়স্বরূপ করে দীর্ঘজীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা বহু যত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্‌যোগ করেছিলুম।

মনে হয়, যেন কতকটা ফললাভও হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যেখানে আপনি থেমে আসে সময়কেও কৌশলপূর্বক সেইখানে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জীবনকে অনেকটা পরিমাণে নির্বাসিত করে এমন-একটা মধ্য-আকাশে তুলে রাখা গিয়েছিল যেখানে পৃথিবীর ধুলো বড়ো পৌঁছত না, সর্বদাই সে নির্লিপ্ত নির্মল নিরাপদ থাকত।

কিন্তু একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কিছুকাল হল নিকটবর্তী কোন্-এক অরণ্য থেকে এক দীর্ঘজীবী যোগমগ্ন যোগীকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল। এখানে বহু উপদ্রবে তার সমাধি ভঙ্গ করাতে তার মৃত্যু হয়। আমাদের জাতীয় যোগনিদ্রাও তেমনি বাহিরের লোক বহু উপদ্রবে ভেঙে দিয়েছে। এখন অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার আর-কোনো প্রভেদ নেই; কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, বহুদিন বহির্বিষয়ে নিরুদ্যম থেকে জীবনচেষ্টায় সে অনভ্যস্ত হয়ে গেছে। যোগের মধ্যে থেকে একেবারে গোলযোগের মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু কী করা যাবে। এখন উপস্থিতমত সাধারণ নিয়মে প্রচলিত প্রথায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘ জটা ও নখ কেটে ফেলে নিয়মিত স্নানাহার-পূর্বক কথঞ্চিত বেশভূষা করে হস্তপদচালনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এইরকম হয়েছে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি বটে, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের লোকের সঙ্গে মিশতেও আরম্ভ করেছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করতে পারি নি। এখনো আমরা বলি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা শুদ্ধমাত্র হরীতকী সেবন করে নগ্নদেহে মহত্বলাভ করেছিলেন, অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহারবিহার চালচলনের এত সমাদর কেন। এই বলে আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তার-পূর্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে কর্মক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাত-পূর্বক বায়ু সেবন করি।

এটা আমাদের স্মরণ নেই যে, যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।

তোমার-আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করি নে, হবিষ্যও খাই নে, জুতোমোজা পরে ট্রামে চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই; যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গৌতম জরৎকারু বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ছাত্রবৃন্দ— যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ-পর্যন্ত কারও ভ্রম হয় নি, একদিন তিন সন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিংবা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এরকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্‌যোগপরায়ণ মান্যজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীট্‌কার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসংগত, হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।

বিশেষ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পালোয়ান লেংটি পরে, মাটি মেখে ছাতি ফুলিয়ে চলে বেড়ায়, রাস্তার লোক বাহবা-বাহবা করে— তার ছেলেটি নিতান্ত কাহিল এবং বেচারা, এবং এন্‌ট্রেন্স পর্যন্ত পড়ে আজ পাঁচ বৎসর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস, সেও যদি লেংটি পরে,

ধুলো মাখে এবং উঠতে বসতে তাল ঠোকে এবং ভদ্রলোক কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে 'আমার বাবা পালোয়ান', তবে অন্য লোকের যেমনি আমোদ বোধ হোক, আত্মীয়বন্ধুরা তার জন্যে সবিশেষ উদ্‌বিগ্ন না হয়ে থাকতে পারে না। অতএব হয় সত্যই তপস্যা করো নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।

পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের প্রতি একটি বিশেষ কার্যভার ছিল। সেই কার্যের বিশেষ উপযোগী হবার জন্যে তাঁরা আপনাদের চারি দিকে কতকগুলি আচরণ-অনুষ্ঠানের সীমারেখা অঙ্কিত করেছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁরা আপনার চিত্তকে সেই সীমার বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে দিতেন না। সকল কাজেরই এইরূপ একটা উপযোগী সীমা আছে যা অন্য কাজের পক্ষে বাধামাত্র। ময়রার দোকানের মধ্যে অ্যাটর্নি নিজের ব্যবসায় চালাতে গেলে সহস্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হয়ে থাকতে পারেন না এবং ভূতপূর্ব অ্যাটর্নির আপিসে যদি বিশেষ কারণ-বশত ময়রার দোকান খুলতে হয় তা হলে কি চৌকিটেবিল কাগজপত্র এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ল-রিপোর্টের প্রতি মমতা প্রকাশ করলে চলে।

বর্তমান কালে ব্রাহ্মণের সেই বিশেষত্ব আর নেই। কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং ধর্মালোচনায় তাঁরা নিযুক্ত নন। তাঁরা অধিকাংশই চাকরি করেন, তপস্যা করতে কাউকে দেখি নে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, ব্রাহ্মণেতর জাতির কোনো কার্যবৈষম্য দেখা যায় না. এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকার কোনো সুবিধা কিংবা সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কিন্তু সম্প্রতি এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম যে কেবল ব্রাহ্মণকেই বদ্ধ করেছে তা নয়। শূদ্র, শাস্ত্রের বন্ধন যাঁদের কাছে কোনো কালেই দৃঢ় ছিল না তাঁরাও, কোনো এক অবসরে পূর্বোক্ত গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন ; এখন আর কিছুতেই স্থান ছাড়তে চান না।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের অধিকার গ্রহণ করাতে স্বভাবতই শূদ্রের প্রতি সমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কাজের ভার ছিল, সুতরাং তাঁদের উপর থেকে আচারবিচার মন্ত্রতন্ত্রের সহস্র বন্ধনপাশ প্রত্যাহরণ করে নিয়ে তাঁদের গতিবিধি অনেকটা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এখন ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড লূতাতন্তুজালের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই হস্তপদবদ্ধ হয়ে মৃতবৎ নিশ্চল পড়ে আছেন। না তাঁরা পৃথিবীর কাজ করছেন, না পারমার্থিক যোগসাধন করছেন। পূর্বে যে-সকল কাজ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি যে কাজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাকেও পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

অতএব বোঝা উচিত, এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারবিচার নিয়ে খুঁত খুঁত করে বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধ'রে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত ক'রে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না— যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, পবিত্র ব্যক্তির কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থ-ভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার ক'রে, মহামান্য আপনাটিকে সর্বদা ধুয়েমেজে ঢেকেঢুকে, অন্য সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করে আমরা যেরকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে— এইরকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্মণ্য ও বন্ধ্য হয়ে আসে।

জড়পদার্থকেই কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায়। জীবকেও যদি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখবার জন্য নির্মল স্ফটিক-আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা যায় তা হলে ধূলি রোধ করা হয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যও রোধ করা হয়, মলিনতা এবং জীবন দুটোকেই যথাসম্ভব হ্রাস করে দেওয়া হয়।

আমাদের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, আমরা যে একটি আশ্চর্য আর্য-পবিত্রতা লাভ করেছি তা বহু সাধনার ধন, তা অতিযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য ; সেইজন্যই আমরা ম্লেচ্ছ যবনদের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করে থাকি।

এ সম্বন্ধে দুটি কথা বলবার আছে। প্রথমত আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চা করে থাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ অন্যায় বিচার, অমূলক

অহংকার, পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানবঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা অম্লানমুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি! আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। শাস্ত্রে কী আছে এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী দাঁড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্তু আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই থাক্ তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতই মানবঘৃণার উৎপত্তি হয় কি না, এবং কোনো-একটি জাতির আপামর সাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করবার অধিকারী কি না, তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর-একটি কথা, জড়পদার্থই বাহ্য মলিনতায় কলঙ্কিত হয়। শখের পোশাকটি পরে যখন বেড়াই তখন অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। পাছে ধুলো লাগে, জল লাগে, কোনোরকম দাগ লাগে, অনেক সাবধানে আসন গ্রহণ করতে হয়। পবিত্রতা যদি পোশাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় পাছে এর ছোঁওয়া লাগলে কালো হয়ে যায়, ওর হাওয়া লাগলে চিহ্ন পড়ে। এমন একটি পোশাকি পবিত্রতা নিয়ে সংসারে বাস করা কী বিষম বিপদ। জনসমাজের রণক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে এবং রঙ্গভূমিতে ঐ অতি পরিপাটি পবিত্রতাকে সামলে চলা অত্যন্ত কঠিন হয় বলে শুচিবায়ুগ্রস্ত দুর্ভাগা জীব আপন বিচরণ-ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ করে আনে, আপনাকে কাপড়টা-চোপড়টার মতো সর্বদা সিন্দুকের মধ্যে তুলে রাখে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

আত্মার আন্তরিক পবিত্রতার প্রভাবে বাহ্য মলিনতাকে কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষা না করলে চলে না। অত্যন্ত রূপপ্রয়াসী ব্যক্তি বর্ণবিকারের ভয়ে পৃথিবীর ধুলামাটি জলরৌদ্র বাতাসকে সর্বদা ভয় করে চলে এবং ননির পুতুলটি হয়ে নিরাপদ স্থানে বিরাজ করে। ভুলে যায় যে, বর্ণসৌকুমার্য সৌন্দর্যের একটি বাহ্য উপাদান, কিন্তু স্বাস্থ্য তার একটি প্রধান আভ্যন্তরিক প্রতিষ্ঠাভূমি— জড়ের পক্ষে এই স্বাস্থ্য অনাবশ্যক, সুতরাং তাকে ঢেকে রাখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আত্মাকে যদি মৃত জ্ঞান না কর তবে কিয়ৎপরিমাণে মলিনতার আশঙ্কা থাকলেও তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে, তার বল উপার্জনের উদ্দেশে, তাকে সাধারণ জগতের সংস্রবে আনা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা কথাটা কেন ব্যবহার করেছিলুম এইখানে তা বুঝা যাবে। অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতাপ্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। একটু খাওয়াটি শোওয়াটি বসাটির ইদিক ওদিক হলেই যে সুকুমার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তা বাবুয়ানার অঙ্গ। এবং সকলপ্রকার বাবুয়ানাই মনুষ্যত্বের বলবীর্যনাশক।

সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়, সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দু'ই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন করে আহার কমিয়ে দিয়ে দুই বেলা চাবুকের ভয় দেখানো হয় তা হলে একদল চলৎশক্তিরহিত অতিনিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়, জীবস্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়; দেখে বোধ হয় ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্মাণ করেছেন, জীবের আবাসভূমি করেন নি।

কিন্তু সমাজের যে-সকল প্রাচীন ধাত্রী আছেন তাঁরা মনে করেন সুস্থ ছেলে দুরন্ত হয় এবং দুরন্ত ছেলে কখনো কাঁদে, কখনো ছুটোছুটি করে, কখনো বাইরে যেতে চায়, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট, অতএব তার মুখে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়ে তাকে যদি মৃতপ্রায় করে রাখা যায় তা হলেই বেশ নির্ভাবনায় গৃহকার্য করা যেতে পারে।

সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতই বেড়ে উঠতে থাকে। যদি আমরা বলি, আমরা এতটা পেরে উঠব না, আমাদের এত উদ্যম নেই, শক্তি নেই— যদি আমাদের পিতামাতারা বলে, পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে আমরা অশক্ত, কিন্তু মানুষের পক্ষে যত সত্বর সম্ভব (এমন-কি, অসম্ভব বললেও হয়) আমরা পিতামাতা হতে প্রস্তুত

আছি— যদি আমাদের ছাত্রবৃন্দ বলে, সংযম আমাদের পক্ষে অসাধ্য, শরীরের সম্পূর্ণতা -লাভের জন্য প্রতীক্ষা করতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ, অকালে অপবিত্র দাম্পত্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং হিঁদুয়ানিরও সেই বিধান— আমরা চাই নে উন্নতি, চাই নে ঝঞ্ঝাট— আমাদের এইরকম ভাবেই বেশ চলে যাবে— তবে নিরুত্তর হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এ কথাটুকু বলতেই হয় যে, হীনতাকে হীনতা বলে অনুভব করাও ভালো, কিন্তু বুদ্ধিবলে নির্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতা বলে প্রতিপন্ন করলে সদ্‌গতির পথ একেবারে আটেঘাটে বন্ধ করা হয়।

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে এত কথা ওঠে না। তা হলে কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।

আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্‌বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত-দেশে আমরা সেই ভারতসভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মতো দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লিটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল— আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলই শান দিতেন— তাকে একেবারে কর্মাতীত অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা— সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহু দিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে. আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র। আমাদের অবয়ব-সাদৃশ্যের উপর ভর করে আমরা মনে করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাতে ক্ষিত্যপ্‌তেজের সংস্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো-একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।

সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি, আমরা সেই সভ্য জাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য; আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব; সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে, ভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত করে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দুনামের সার্থকতা সাধন করব।

কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় করে

উন্নতমস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি, যদি সংগীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে— দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে— পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ করে এবং মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে আপনাকে চারি দিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি, তা হলে আমি যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিকবে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্য সাধন করতে পারব।

এইখানে আমার একটি তুলনা মনে উদয় হচ্ছে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো। এক কালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি-আদানপ্রদানের নিয়ম বর্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্ত-বর্ষার সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্পপল্লবের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই, গতি নেই বলে যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহু যুগের উত্তাপ ও আলোক নিহিতভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের কাছে তা অন্ধকারময় শীতল। আমরা তার থেকে কেবল খেলাচ্ছলে ঘনকৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তম্ভ নির্মাণ করছি। কারণ নিজের হাতে যদি অগ্নিশিখা না থাকে তবে কেবলমাত্র গবেষণা দ্বারা পুরাকালের তলে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ডসংগ্রহ করে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। তাও যে নিজে সংগ্রহ করছি তাও নয়। ইংরেজের রানীগঞ্জের বাণিজ্যশালা থেকে কিনে আনছি। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু করছি কী। আগুন নেই, কেবলই ফুঁ দিচ্ছি, কাগজ নেড়ে বাতাস করছি এবং কেউ বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে, নিজের ব্যবহারে আনতে পারা যায়।

মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখানকারই। জীবিত মনুষ্য দশ দিকের কেন্দ্রস্থলে। সে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতুস্থাপন করে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে ; এক দিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।

১২৯৮

সমাজভেদ

গত জানুয়ারি মাসে 'কন্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রে ডাক্তার ডিলন 'ব্যাঘ্র চীন এবং মেষশাবক য়ুরোপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধ-উপলক্ষে চীনবাসীদের প্রতি য়ুরোপের অকথ্য অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং প্রভৃতি লোকশক্রদিগের ইতিহাসবিখ্যাত নিদারুণ কীর্তি সভ্য য়ুরোপের উন্মত্ত বর্বরতার নিকট নতশির হইল।

য়ুরোপ নিজের দয়াধর্মপ্রবণ সভ্যতার গৌরব করিয়া এশিয়াকে সর্বদাই ধিক্কার দিয়া থাকে, তাহার জবাব দিবার উপলক্ষ পাইয়া আমাদের কোনো সুখ নাই। কারণ, অপবাদ রটনা করিয়া দুর্বল সবলের কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু সবল দুর্বলের নামে যে অপবাদ ঘোষণা করে তাহা দুর্বলের পক্ষে কোনো-না-কোনো সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

সাধারণত এশিয়া-চরিত্রের ক্রূরতা বর্বরতা দুর্জ্ঞেয়তা য়ুরোপীয় সমাজে একটা প্রবাদবাক্যের মতো। এইজন্য এশিয়াকে য়ুরোপের আদর্শে বিচার করা কর্তব্য নহে, এই একটা ধুয়া আজকাল খৃস্টান-সমাজে বেশি করিয়া উঠিয়াছে।

আমরা যখন য়ুরোপের শিক্ষা প্রথম পাইলাম তখন 'মানুষে মানুষে অভেদ' এই ধুয়াটাই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমাদের নূতন শিক্ষকটির সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রভেদ যাহাতে ঘুচিয়া যায় আমরা সেইভাবেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় মাস্টারমশায় তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বন্ধ করিয়া বলিলেন, পূর্ব-পশ্চিমে এমন প্রভেদ যে সে আর লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

আচ্ছা বেশ, প্রভেদ আছে, প্রভেদ থাক্। বৈচিত্র্যই সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। পৃথিবীতে শীতাতপ সব জায়গায় সমান নহে বলিয়াই বায়ু চলাচল করে। সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাক্; তাহা হইলে সেই স্বাতন্ত্র্যে পরস্পরের নিকট শিক্ষার আদানপ্রদান হইতে পারে।

এখন তো দেখিতেছি, গালাগালি গোলাগুলির আদান-প্রদান চলিয়াছে। নূতন খৃস্টান শতাব্দী এমনি করিয়া আরম্ভ হইল।

ভেদ আছে স্বীকার করিয়া লইয়া বুদ্ধির সহিত, প্রীতির সহিত, সহৃদয় বিনয়ের সহিত, তাহার অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে খৃস্টীয় শিক্ষায় উনিশ শত বৎসর কী কাজ করিল? কামানের গোলায় প্রাচ্য দুর্গের দেয়াল ভাঙিয়া একাকার করিবে, না চাবি দিয়া তাহার সিংহদ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে?

মিশনারিদের প্রতি চীনবাসীদের আক্রমণ হইতে চীনে বর্তমান বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। য়ুরোপ এ কথা সহজেই মনে করিতে পারে যে, ধর্মপ্রচার বা শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য চীনের বর্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। মিশনারি তো চীন রাজত্ব জয় করিতে যায় নাই।

এইখানে পূর্ব-পশ্চিমে ভেদ আছে এবং সেই ভেদ য়ুরোপ শ্রদ্ধার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করে না; কারণ, তাহার গায়ের জোর আছে।

চীনের রাজত্ব চীনের রাজার। যদি কেহ রাজ্য আক্রমণ করে তবে রাজায় রাজায় লড়াই বাধে, তাহাতে প্রজাদের যে ক্ষতি হয় তাহা সাংঘাতিক নহে। কিন্তু য়ুরোপের রাজত্ব রাজার নহে, তাহা সমস্ত রাজ্যের। রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর; এই কলেবরটিকে আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না। সুতরাং অন্য কোনোপ্রকার আঘাতের গুরুত্ব তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্তপ্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র। জিব্রল্টরের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলন্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, কিন্তু খৃস্টান ধর্ম সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।

পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই। শিথিল রাজশক্তি বিপুল চীনের সর্বত্র আপনাকে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না। রাজধানী হইতে সুদূরবর্তী দেশগুলিতে রাজার আজ্ঞা পৌঁছে, রাজপ্রতাপ পৌঁছে না; কিন্তু তথাপি সেখানে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, সভ্যতা আছে। ডাক্তার ডিলন ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পই বল ব্যয় করিয়া এত বড়ো রাজ্য সংযত রাখা সহজ কথা নহে।

কিন্তু বিপুল চীনদেশ শস্ত্রশাসনে সংযত হইয়া নাই, ধর্মশাসনেই সে নিয়মিত। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনী স্বামীস্ত্রী প্রতিবেশী-পল্লীবাসী রাজাপ্রজা যাজক-যজমানকে লইয়া এই ধর্ম। বাহিরে যতই বিপ্লব হউক, রাজাসনে যে-কেহই অধিরোহণ করুক, এই ধর্ম বিপুল চীনদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া অখণ্ড নিয়মে এই প্রকাণ্ড জনসমাজকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। তখন কে তাহাকে ঠেকাইবে। তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে। তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তে আমার কথা পরিষ্কার হইবে। ইংরেজপরিবার ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের পরিবার কুলের অঙ্গ। এইটুকু প্রভেদে সমস্তই তফাত হইয়া যায়।

ইংরেজ এই প্রভেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে হিন্দুপরিবারের দরদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞাপরায়ণ হইয়া উঠিবে। কুলসূত্রে হিন্দুপরিবারে জীবিত মৃত ও ভাবী অজাতগণ পরস্পর সংযুক্ত। অতএব, হিন্দুপরিবারের মধ্য হইতে কেহ যদি কুলত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা পরিবারের পক্ষে কিরূপ গুরুতর আঘাত, ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ, ইংরেজ-পরিবারে দাম্পত্যবন্ধন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না। কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোনো সজীব অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দুপরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিক্ষত করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই শ্রেয়োজ্ঞান করে। কারণ, প্রেমসঞ্চারের উপযুক্ত বয়স হইলেই স্ত্রীপুরুষে মিলন হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের সঙ্গে একীভূত হইবার বয়স বাল্যকাল।

বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্য দিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে গিয়া ইংরেজকে যেমন ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও জিব্রল্টার মাল্টা সুয়েজ এবং এডেন রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুকে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও এই-সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।

এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিবার ও সমাজ গঠন ভালো কি না সে তর্ক ইংরেজ তুলিতে পারে। আমরা বলি রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তা-সাধন ভালো কি না সেও তর্কের বিষয়। দেশের জন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব করিয়া সৈনিকগঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে, সৈন্যসম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়। নিহিলিস্ট্‌দের অগ্ন্যুৎপাতে, না পরস্পরের প্রলয়সংঘর্ষে ? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না তাহারও পরীক্ষা বাকি আছে।

যাহাই হউক, পূর্ব ও পশ্চিমের এই-সকল প্রভেদ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া দেখিবার বিষয়। য়ুরোপের প্রথাগুলিকে যখন বিচার করিতে হয় তখন য়ুরোপের সমাজতন্ত্রের সহিত তাহাকে মিলাইয়া বিচার না করিলে, আমাদের মনেও অনেক সময় অন্যায় অবজ্ঞার সঞ্চার হয়। তাহার সাক্ষী, বিলাতি সমাজে কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি ; আমাদের নিকট এ প্রথা অভ্যস্ত নহে বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ বালবিধবাকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক, সে কথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। কুমারীর বেলায় আমরা বলি মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্বল, অথচ বিধবার বেলায় বলি শিক্ষাসাধনায় প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। কিন্তু আসল কথা, এ-সকল নিয়ম কোনো নীতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, প্রয়োজনের তাড়নে দাঁড়াইয়া গেছে। অল্প বয়সে কুমারীর বিবাহ হিন্দুসমাজের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, চিরবৈধব্যও সেইরূপ। সেইজন্যই আশঙ্কাসত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হয় না এবং অনিষ্ট-অসুবিধাসত্ত্বেও কুমারীর বাল্যবিবাহ হয়। আবশ্যকের নিয়মেই য়ুরোপে অধিক বয়সে কুমারীর বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন সম্ভবপর নহে, সেখানে বিধবা কোনো পরিবারের আশ্রয় পায় না বলিয়া তাহার পক্ষে অনেক সময়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্ররক্ষার অনুকূল বলিয়াই মুখ্যত ভালো, ইহার অন্য ভালো যাহা-কিছু আছে তাহা আকস্মিক, তাহা অবান্তর।

সমাজে আবশ্যকের অনুরোধে যাহা প্রচলিত হয়, ক্রমে তাহার সহিত ভাবের সৌন্দর্য জড়িত হইয়া পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার-কুমারীর স্বাধীন প্রেমাবেগের সৌন্দর্য য়ুরোপীয় চিত্তে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা য়ুরোপের সাহিত্য পড়িলেই প্রতীতি হইবে। সেই প্রেমের আদর্শকে য়ুরোপীয় কবিরা দিব্যভাবে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পতিব্রতা-গৃহিণীর কল্যাণপরায়ণ ভাবটিই মধুর হইয়া হিন্দুচিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সেই ভাবের সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যে অন্য-সকল সৌন্দর্যের উচ্চে স্থান পাইয়াছে। সে আলোচনা আমরা অন্য প্রবন্ধে করিব।

কিন্তু তাই বলিয়া যে স্বাধীন প্রেমের সৌন্দর্যে সমস্ত য়ুরোপীয় সমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে অনাদর করিলে আমাদের অন্ধতা ও মূঢ়তা প্রকাশ হইবে। বস্তুত তাহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। যদি না করিত তবে ইংরেজি কাব্য উপন্যাস আমাদের পক্ষে মিথ্যা হইত। সৌন্দর্য হিন্দু বা ইংরেজের মধ্যে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলে না। ইংরেজি সমাজের আদর্শগত সৌন্দর্যকে সাহিত্য যখন পরিস্ফুট করিয়া দেখায় তখন তাহা আমাদের জাতীয় সংস্কারকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ে দীপ্যমান হয়। তেমনি আমাদের হিন্দু পারিবারিক আদর্শের মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী সৌন্দর্যশ্রী আছে, তাহা যদি ইংরেজ দেখিতে না পায়, তবে ইংরেজ সেই অংশে বর্বর।

য়ুরোপীয় সমাজ অনেক মহাত্মা লোকের সৃষ্টি করিয়াছে ; সেখানে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান প্রত্যহ উন্নতিলাভ করিয়া চলিতেছে ; এ সমাজ নিজের মহিমা নিজে পদে পদে প্রমাণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে ; ইহার নিজের অশ্ব উন্মত্ত হইয়া না উঠিলে ইহার রথকে বাহির হইতে কেহ প্রতিরোধ করিবে এমন কল্পনাই করিতে পারি না। এমনতরো গৌরবান্বিত সমাজকে শ্রদ্ধার সহিত পর্যবেক্ষণ না করিয়া ইহাকে যাহারা ব্যঙ্গ করে, বাংলাদেশের সেই-সকল সুলভ লেখক অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতিই বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

অপর পক্ষে বহুশত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিসাৎ করিতে পারে নাই, সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দয়াধর্ম-ক্রিয়াকর্তব্যের মধ্যে সংযত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে, রসাতলের মধ্যে নামিতে দেয় নাই, যে সমাজ হিন্দুজাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সতর্কতার সহিত এমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে যে বাহির হইতে উপকরণ পাইলেই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, যে সমাজ মূঢ় অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকেও পদে পদে প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও সমাজের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই সমাজকে যে মিশনারি শ্রদ্ধার সহিত না দেখেন তিনিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন। তাঁহার এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ন্যায় ; আবশ্যক হইলেও, ইহার কোনো-এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে ; সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় তাহা বর্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায় অবিচার নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ কী। সেই সভ্যতা যাহাকে অধিকার করিয়াছে, স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ : তিনি সকলকে জানেন ও সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বদাই উপহাস করে ও ধিক্কার দেয় তাহা হিঁদুয়ানি, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা নহে। তেমনি যাহা প্রাচ্যসভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ তাহা আদর্শই নহে।

সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেইজন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।

১৩০৮

ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত

অন্যত্র[১] বলিয়াছি কোনো ইংরেজ অধ্যাপক এ দেশে জুরির বিচার সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছিলেন যে, যে দেশের অর্ধসভ্য লোক প্রাণের মাহাত্ম্য (Sanctity of Life) বোঝে না, তাহাদের হাতে জুরি-বিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায়।

প্রাণের মাহাত্ম্য ইংরেজ আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, সে কথা নাহয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। অতএব সেই ইংরেজ যখন প্রাণ হনন করে তখন তাহার অপরাধের গুরুত্ব আমাদের চেয়ে বেশি। অথচ দেখিতে পাই দেশীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজ খুনি ইংরেজ জজ ও ইংরেজ জুরির বিচারে ফাঁসি যায় নাই। প্রাণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাহাদের বোধশক্তি যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইংরেজ অপরাধী হয়তো তাহার প্রমাণ পায়, কিন্তু সে প্রমাণ দেশীয় লোকদের কাছে কিছু অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে।

এইরূপ বিচার আমাদিগকে দুই দিক হইতে আঘাত করে। প্রাণ যা যাবার সে তো যায়ই, ও দিকে মানও নষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহা আমাদের সকলেরই গায়ে বাজে।

ইংলন্ডে গ্লোব বলিয়া একটি সংবাদপত্র আছে। সেটা সেখানকার ভদ্রলোকেরই কাগজ। তাহাতে লিখিয়াছে— টমি অ্যাট্‌কিন (অর্থাৎ পল্টনের গোরা) দেশী লোককে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া মারে না, কিন্তু মার খাইলেই দেশী লোকগুলা মরিয়া যায়; এইজন্য টমি-বেচারার লঘু দণ্ড হইলেই দেশী খবরের কাগজগুলা চীৎকার করিয়া মরে।

টমি অ্যাট্‌কিনের প্রতি দরদ খুব দেখিতেছি, কিন্তু 'স্যাঙ্কটিটি অফ লাইফ' কোন্‌খানে। যে পাশব আঘাতে আমাদের পিলা ফাটে এই ভদ্রকাগজের কয় ছত্রের মধ্যেও কি সেই আঘাতেরই বেগ নাই। স্বজাতিকৃত খুনকে কোমল স্নেহের সহিত দেখিয়া হত ব্যক্তির আত্মীয়সম্প্রদায়ের বিলাপকে যাহারা বিরক্তির সহিত ধিক্‌কার দেয় তাহারাও কি খুন পোষণ করিতেছে না।

কিছুকাল হইতে আমরা দেখিতেছি, যুরোপীয় সভ্যতায় ধর্মনীতির আদর্শ সাধারণত অভ্যাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবোধশক্তি এই সভ্যতার অন্তঃকরণের মধ্যে উদ্‌ভাসিত হয় নাই। এইজন্য অভ্যাসের গণ্ডির বাহিরে এই আদর্শ পথ খুঁজিয়া পায় না, অনেক সময় বিপথে মারা যায়।

যুরোপীয় সমাজে ঘরে ঘরে কাটাকাটি-খুনাখুনি হইতে পারে না, এরূপ ব্যবহার সেখানকার সাধারণ স্বার্থের বিরোধী। বিষপ্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাতের দ্বারা খুন করাটা যুরোপের পক্ষে কয়েক শতাব্দী হইতে ক্রমশ অনভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু খুন বিনা অস্ত্রাঘাতে বিনা রক্তপাতে হইতে পারে। ধর্মবোধ যদি অকৃত্রিম আভ্যন্তরিক হয়, তবে সেরূপ খুনও নিন্দনীয় এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া তোলা যাক।

হেনরি স্যাভেজ ল্যান্ডর একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তিব্বতের তীর্থস্থান লাসায় যাইবার জন্য তাঁহার দুর্নিবার ঔৎসুক্য জন্মে। সকলেই জানেন, তিব্বতিরা যুরোপীয় ভ্রমণকারী ও মিশনারি প্রভৃতিকে সন্দেহ করিয়া থাকে। তাহাদের দুর্গম পথঘাট বিদেশীর কাছে পরিচিত নহে, ইহাই তাহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র; সেই অস্ত্রটি যদি তাহারা জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অন্যে তাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহারও নিষেধ মানিবে না, যুরোপের এই ধর্ম। কোনো প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, শুদ্ধমাত্র বিপদ লঙ্ঘন করিয়া বাহাদুরি করিলে যুরোপে এত বাহবা মিলে যে অনেকের পক্ষে সে একটা প্রলোভন। যুরোপের বাহাদুর লোকেরা দেশ-বিদেশে বিপদ সন্ধান

১ দ্রষ্টব্য 'অপমানের প্রতিকার', রবীন্দ্র-রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ পঞ্চম খণ্ড, পৃ· ৬৪২

করিয়া ফেরে। যে-কোনো উপায়ে হোক, লাসায় যে য়ুরোপীয় পদার্পণ করিবে সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না।

অতএব তুষারগিরি ও তিব্বতির নিষেধকে ফাঁকি দিয়া লাসায় যাইতে হইবে। ল্যান্ডর সাহেব কুমায়ুনে আলমোড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে এক হিন্দু চাকর আসিয়া জুটিল, তাহার নাম চন্দন সিং।

কুমায়ুনের প্রান্তে তিব্বতের সীমানায় বৃটিশ রাজ্যে শোকা বলিয়া এক পাহাড়ি জাত আছে। তিব্বতিদের ভয়ে ও উপদ্রবে তাহারা কম্পমান। বৃটিশরাজ তিব্বতিদের পীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া ল্যান্ডর সাহেব বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শোকাদের মধ্য হইতে সাহেবকে কুলি মজুর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বহুকষ্টে ত্রিশজন কুলি জুটিল।

ইহার পর হইতে যাত্রাকালে সাহেবের এক প্রধান চিন্তা ও চেষ্টা, কিসে কুলিরা না পালায়। তাহাদের পালাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ল্যান্ডর তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের পঁচিশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

এই বাহকদল যখন নিঃশব্দ গম্ভীরভাবে বোঝা পিঠে লইয়া করুণাজনক শ্বাসকষ্টের সহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতেছিল তখন এই ভয় মনে হইতেছিল, ইহাদের মধ্যে কয়জনই বা কোনো কালে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এ শঙ্কা যখন তোমার মনে আছে তখন এই অনিচ্ছুক হতভাগ্যদিগকে মৃত্যুমুখে তাড়না করিয়া লইয়া যাওয়াকে কী নাম দেওয়া যাইতে পারে। তুমি পাইবে গৌরব এবং তাহার সঙ্গে অর্থলাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। তুমি তাহার প্রত্যাশায় প্রাণপণ করিতে পার, কিন্তু ইহাদের সম্মুখে কোন্ প্রলোভন আছে?

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবচ্ছেদ (vivisection) লইয়া য়ুরোপে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। সজীব জন্তুদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে যন্ত্রণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবার ঔচিত্যও আলোচিত হয়। কিন্তু বাহাদুরি করিয়া বাহবা লইবার উদ্দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিচ্ছুক মানুষদের উপরে যে অসহ্য পীড়ন চলে ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ হয়, সমালোচকেরা করতালি দেন, সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, হাজার হাজার পাঠক ও পাঠিকা এই-সকল বর্ণনা বিস্ময়ের সহিত পাঠ ও আনন্দের সহিত আলোচনা করেন। দুর্গম তুষারপথে নিরীহ শোকা বাহকদল দিবারাত্র যে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহার পরিণাম কী। ল্যান্ডর সাহেব নাহয় লাসায় পৌঁছিলেন, তাহাতে জগতের এমন কী উপকার হওয়া সম্ভব যাহাতে এই-সকল ভীত পীড়িত পলায়নেচ্ছু মানুষদিগকে অহরহ এত কষ্ট দিয়া মৃত্যুর পথে তাড়না করা লেশমাত্র বিহিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু কই, এজন্য তো লেখকের সংকোচ নাই, পাঠকের অনুকম্পা নাই!

তিব্বতিরা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও হত্যা করিতে পারে, শোকারা সেই কারণে তিব্বতিদিগকে কিরূপ ভয় করে, তাহাদিগকে তিব্বতিদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বৃটিশরাজ কিরূপ অক্ষম, তাহা ল্যান্ডর জানিতেন। ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহার মধ্যে যে উৎসাহ উত্তেজনা ও প্রলোভন কাজ করিতেছে, শোকাদের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। তৎসত্ত্বেও ল্যান্ডর তাঁহার গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় যে ভাবে তাঁহার বাহকদের ভয়দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তর্জমা করিয়া দিলাম—

তাহারা প্রত্যেকে হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। কাচির দুই গাল বাহিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, দোলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এবং ডাকু ও অন্য যে-একটি তিব্বতি আমার কাজ লইয়াছিল— যাহারা ভয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিল— তাহারা তাহাদের বোঝার পশ্চাতে লুকাইয়া বসিয়া ছিল। আমাদের অবস্থা যদিও সংকটাপন্ন ছিল তবু আমাদের লোকজনদের এই আতুর দশা দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইহার পরে এই দুর্ভাগারা পলায়নের চেষ্টা করিলে ল্যান্ডর তাহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করেন যে, যে-কেহ পলায়নের বা বিদ্রোহের চেষ্টা করিবে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।

কিরূপ তুচ্ছ কারণেই ল্যান্ডর সাহেবের গুলি করিবার উত্তেজনা জন্মে অন্যত্র তাহার পরিচয় পাওয়া

গেছে। তিব্বতি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ল্যান্ডর যখন প্রথম নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি ভান করিলেন যেন ফিরিয়া যাইতেছেন। একটা উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া দূরবীন কষিয়া দেখিলেন, পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর হইতে প্রায় ত্রিশটা মাথা পাথরের আড়ালে উঁকি মারিতেছে। সাহেব লিখিতেছেন—

আমার বড়ো বিরক্তি বোধ হইল। যদি ইচ্ছা হয় তো ইহারা প্রকাশ্যভাবেই আমাদের অনুসরণ করে না কেন। দূর হইতে পাহারা দিবার দরকার কী। অতএব আমি আমার আটশো-গজি রাইফেল লইয়া মাটিতে চ্যাপটা হইয়া শুইলাম এবং যে মাথাটাকে অন্যদের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল তাহার প্রতি লক্ষ স্থির করিলাম।

এই 'অতএব'-এর বাহার আছে। লুকাচুরিকে ল্যান্ডর সাহেব কী ঘৃণাই করেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গের আর-একটা মিশনারি সাহেব নিজেদের হিন্দু তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, প্রকাশ্যে ভারতবর্ষে ফিরিবার ভান করিয়া গোপনে লাসায় যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, কিন্তু পরের লুকাচুরি ইহার এতই অসহ্য যে, ভূমিতে চ্যাপটা হইয়া আত্মগোপনপূর্বক তৎক্ষণাৎ আটশো-গজি রাইফেল বাগাইয়া কহিলেন : I only wish to teach these cowards a lesson। 'আমি এই কাপুরুষদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি'। দূর হইতে লুকাইয়া রাইফেল-চালনায় সাহেব যে পৌরুষের পরিচয় দিতেছিলেন তাহার বিচার করিবার কেহ ছিল না। আমাদের ওরিয়েন্টাল্‌দের অনেক দুর্বলতার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু চালুনি হইয়া ছুঁচকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদের মতো আমাদের নাই। আসল কথা, গায়ের জোর থাকিলে বিচারাসনের দখল একচেটে করিয়া লওয়া যায়। তখন অন্যকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসটাই বদ্ধমূল হইয়া যায়, নিজেকে বিচার করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

আশিয়ায় আফ্রিকায় ভ্রমণকারীরা অনিচ্ছুক ভৃত্য বাহকদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনায় ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগকে যে করিয়া বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যান, তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ Sanctity of Life সম্বন্ধে এই-সকল পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বোধশক্তি অত্যন্ত সুতীব্র হইলেও কোথাও কোনো আপত্তি শুনিতে পাই না। তাহার কারণ, ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে ; স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিকৃত হইতে থাকে। এমন-কি, সে গণ্ডির মধ্যেও যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ্ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ! যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের সর্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিবার বিরুদ্ধে কথা কহা 'সেন্টিমেন্টালিটি'। য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। গ্লাডস্টোনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দক্ষিণ-আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ আচরণ চলিতেছে তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত 'পোস্ট' সংবাদপত্র হইতে গত ২রা জুলাই তারিখের বিলাতি 'ডেলি নিউস'-এ সংকলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রীপুরুষকে পুলিসকোর্টে হাজির করা হয় ; সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গেরা শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক লৌহশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সকলপ্রকার উপায়ে তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে তো চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে দ্বৈধব্য (bigamy)- অপরাধে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছিল। হাজতে থাকার সময় একজন ব্যারিস্টার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করে। কিন্তু কোনো বিচার না হইয়াই নির্দোষ বলিয়া এই স্ত্রীলোকটি খালাস পায়। ব্যারিস্টার ফি'য়ের দাবি করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্তে এই নিগ্রো স্ত্রীলোকটিকে ম্যাক্রি ক্যাম্পে চৌদ্দ মাস কাজ করিবার জন্য পাঠায়। সেখানে তাহাকে নয় মাস চাবি তালা দিয়া বন্ধ করিয়া

খাটানো হইয়াছে, জোর করিয়া আর-এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমার বৈধস্বামীর সহিত তোমার কোনো কালে মিলন হইবে না। পলায়নের আশঙ্কা করিয়া তাহার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রভু ম্যাক্রিরা তাহাকে নিজের হাতে চাবুক মারিয়াছে এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, খালাস পাইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে সে মাসে পাঁচ ডলার করিয়া বেতন পাইত।

ডেলি নিউস বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা দুরূহ হইয়াছে।

After all, no great power is entirely innocent of the charge of treating with barbarous harshness the alien races which are subject to its rule.

আমাদের দেশে ধর্মের যে আদর্শ আছে তাহা অন্তরের সামগ্রী, তাহা বাহিরে গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে। আমরা যদি Sanctity of Life একবার স্বীকার করি তবে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কোথাও তাহার সীমাস্থাপন করি না। ভারতবর্ষ একসময়ে মাংসাশী ছিল ; মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাশী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, জগতে বোধ হয় ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ভারতবর্ষে দেখিতে পাই অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যাহা উপার্জন করে তাহা দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থেরও যে একটা ন্যায্য অধিকার আছে, এ কথাটাকে আমরা সর্বপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়া যত দূর সম্ভব খর্ব করিয়াছি। আমাদের দেশে বলে, যুদ্ধে ধর্মরক্ষা করিতে হইবে ! নিরস্ত্র, পলাতক, শরণাগত শত্রুর প্রতি আমাদের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ ব্যবহার ধর্মবিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে য়ুরোপে তাহা হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার একমাত্র কারণ, ধর্মকে আমরা অন্তরের ধন করিতে চাহিয়াছিলাম। স্বার্থের প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের ধর্মকে গড়িয়া তোলে নাই, ধর্মের নিয়মই আমাদের স্বার্থকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্য আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্বল হইয়া থাকি, সেইজন্যই বহিঃশত্রুর কাছে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরবলাভ করিয়াছি তাহা কখনোই ব্যর্থ হইবে না— একদিন তাহারও দিন আসিবে।

১৩১০

সমাজ

আচারের অত্যাচার

"ইংরেজিতে পাউন্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে— আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।... ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয় ; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না... হিন্দু বলেন যে ধর্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।"

—সাহিত্য, ৩য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা

সকল দিক সমানভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্য মানুষকে কোনো-না-কোনো বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি থিয়োরি লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা তো এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্মহিসাবী, দন্তি কাক পর্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিসাবী বলিতে পারেন, কাকে গিয়াই বা থামিব কেন। বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের দিকে টানিতে হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না— তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার জো নাই— কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, জোড়হস্তে বিনীতস্বরে আমরা বলি, "প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই, সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ ; ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ ; এবং এই-সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি-দন্তিকাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে তো হিন্দুকে সংসারের কোনো প্রকৃত কাজে, মানবের কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে তো তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কষিতে হয়। তুমি যে শোভাসৌন্দর্যবৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে-পৃথিবী তো পর্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক্ পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান, সে তো অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানবপ্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গণিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ

লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাহনকে কড়াকড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র 'হিঁদু' হইব, মানুষ হইব না।"

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, "পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ"— বাংলায় তাহার তর্জমা করা যাইতে পারে, "কড়ায় কড়া কাহনে কানা।" অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। তাহার ফল হয়, "বজ্র আঁটন ফসকা গিরো"— প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা-আচারবিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একজন লোক গোরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এইজন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন ; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে। আমি যদি অস্পৃশ্য নীচজাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তিহিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন। প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান তপ বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না।

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনই যেখানে-সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোটোবড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টিসৎকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময় কুলায় না ; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটোবড়ো সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফসকা গিরো।

এইরূপে পাপপুণ্য যে মনের ধর্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ, মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভলোকসান ব্যাবসাবাণিজ্য ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়, যদি ওঠাবসা মেলামেশা ছোঁওয়াখাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপপুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম মনে

করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতিসূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর করা যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ, মানুষ ঠেকিয়া শেখে— কিন্তু তিলমাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানোই যুক্তিসংগত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়াবয়স পর্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানোই ভালো। তাহা হইলে তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। কী রাখিলাম আর কী হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবিকঙ্কণে বাণিজ্যবিনিময়ে আছে—

শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে-স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য-উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সে-ই আমাদের যথার্থ লাভ ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলিকর্দমের উপর দিয়া, আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়া, পতনপরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে-বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী। মাটিতে পদার্পণমাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র পুণ্যশয্যায় শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতিনিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়— কিন্তু সে-হিসাব কী। একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়াক্রান্তি-কাকদন্তির গোল হয় এইজন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁত সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতিসম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয়, তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে।

জন্তুদের জীবনের পরিসর সংকীর্ণ, তাহারা অল্পদূর গিয়াই উন্নতি শেষ করে— এইজন্য আরম্ভকাল হইতেই তাহারা শক্তসমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এইজন্য বহুকাল পর্যন্ত সে অপরিণত দুর্বল।

জন্তুরা যে-স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরেজিতে তাহাকে বলে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌, বাংলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ-সংস্কার। সহজ-সংস্কার, অশিক্ষিতপটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ-সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ-সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

আবশ্যকের আকর্ষণ চতুষ্পার্শ্ব বাঁচাইয়া, পথঘাট দেখিয়া, ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়া সুবিধার পথ দিয়া আমাদিগকে স্বার্থপরতার সীমা পর্যন্ত লইয়া যায় ; প্রেমের আকর্ষণ আমাদিগকে সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া, আত্মবিসর্জন করাইয়া, কখনো ভূতলশায়ী কখনো অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে। আবশ্যকের সীমা

আপনার মধ্যে, প্রেমের সীমা কোথায় কেহ জানে না। তেমনই, পূর্ব হইতে সমস্ত নির্দিষ্ট করিয়া, সমস্ত পতন সমস্ত গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া একটি নিরতিশয় সমতল সমাজের মধ্যে নিরাপদে জীবন চালনা করিলে, সে-জীবনের পরিসর নিতান্ত সামান্য হয়।

আমরা মানবসন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা ; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদিগের শিক্ষা করিতে যায়— আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সে-ই আমাদের সৌভাগ্য, সে-ই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, এখনো আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের মতো অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না ; অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয়, তবে আমরা একান্ত দুর্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়াক্রান্তি কাকদন্তি চোখবাঁধা ঘানির বলদের জন্য ; সে তাহার পূর্ববর্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোলচক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈলনিষ্পেষণ-নামক একটি বিশেষনির্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবননির্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়— কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস এবং কচ্ছপ নামক একটি ন্যায়ের কুতর্ক আছে। তদ্‌দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একিলিস যতই দ্রুতগামী হউক, মন্দগতি কচ্ছপ যদি একত্রে চলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে, তবে একিলিস তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন— কড়াক্রান্তি-দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্তী থাকিবে। কিন্তু এ দিকে প্রকৃত কর্মভূমিতে একিলিস এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি-দন্তিকাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। তেমনই আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, কড়াক্রান্তি-দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে ; কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক-এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুল চেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমত চলিতে আরম্ভ করা যাক। আর তা যদি না চাই, তবে অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময়যাপনের একটা উপায় বটে। তাহাতে আমাদের পুণ্য প্রমাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু নৈপুণ্য প্রমাণ হয়।

১২৯৯

সমুদ্রযাত্রা

বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ তাহা লইয়া কোনো কথা নহে। কারণ, যাহা অন্য হিসাবে ভালো অথবা যাহাতে কোনো মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভালো না হইতে পারে, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে

পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম, অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভালো এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক্-না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়ো, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকল সময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে-সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনোরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না; তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্তব্যের নিয়ামক কে। শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে। লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে, ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষত যে-লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রান্ত গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে তো আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরেজের আইনেও বাহির হইতে আষ্টেপৃষ্টে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্বকালে তাঁহারা সে-কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরেজ আমাদের সমাজকে যে-অবস্থায় হাতে পাইয়াছে, ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোনো নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোনো নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন্‌টা বৈধ কোন্‌টা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোনো সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট জড় কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণপথে তিলার্ধমাত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কী করেন। তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাঁহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।

তাঁহাদের আর-একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্য সময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বর্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহুপ্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার কোনো বাধা ছিল না। বর্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে; ইহার কোনো উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে আর-এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে, সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোনো ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতিপথের ব্যাঘাত-স্বরূপ আপন পাষাণমস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবিধি ছিল কি না। যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল ; আর যদি দৈবাৎ অনুস্বারবিসর্গবিশিষ্ট একটা বচনার্ধ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনি নিরুপায় যে, সমাজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য করিয়া বহন করিব, এমন-কি, তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব। দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।

আমরা কি নিজের কর্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না— পূর্বে কী ছিল এবং এখন কী আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব। আমাদের শুভাশুভ জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণসংহিতা আগম-নিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইবে— সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্ক লোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোনো দেশে প্রচলিত আছে কি।

আমাদের ধর্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যে-লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সংগতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা মাদ্রাজ সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জাতি লইয়া কোনো কথা উঠিতেছে না, এ দিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্য পান করিতেছে, কেহ সে দিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড়ো শঙ্কিত। কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ-সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবারও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড়পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে তো মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণমাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্তমান লোকাচারের অসংগতিদোষ দেখানো হয়। বলা হয়, এক দিকে আমরা বাধ্য হইয়া অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্য দিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াক্কড়। কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি, কাহাকে সে-কথাগুলা বলা হইতেছে। শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে। সে নিজেও এমন মহা অপরাধ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি।

সমাজের মধ্যে যে-কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিনা যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রায় উপকার আছে ; মনুর যে-নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চিরকালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক, দেশে-বিদেশে গিয়া জ্ঞান-অর্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোনো প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না ; যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন— তবে

আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না— তবে কোনো শ্লোকখণ্ড আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোনো লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাঁধও ভাঙিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে, এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশিদিন কেহ ভয় করিবে না। যে-সমাজ মিথ্যাকে কপটতাকে মার্জনা করে, অর্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া-শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোনো নৈতিক কারণ কোনো যৌক্তিক সংগতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড়ো দুরূহ হইত।

যাঁহারা শুভবুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোনো যুক্তি নাই; সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙিতে গেলে আর-একটা ভাঙিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রীশিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে।

সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্তমান সমাজ রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোনো প্রকার স্বাধীনতার কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট নিশ্চল অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোনো ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত পল্লবিত বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না। আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে। যেখানেই কালক্রমে একটি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে, সেইখানেই পুনর্বার নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত।

স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজশিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে-চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।

সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শ লাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধনমুক্তি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে-সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনো কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে-সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ।

বাহ্যত ম্লেচ্ছসংসর্গ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে, কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়াই যথার্থ লোকাচারবিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়, আমরা সমুদ্র পার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এ দেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরেজি-শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কী। আমরা যেন ইংলন্ডে না গেলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সে-ই তো ভাঙিয়াছে। আজ যে এত বাকচাতুরী, এত শাস্ত্রসন্ধানের ধুম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে তো তাহার কোনো আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে, সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত নাই। অতি-বড়ো পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরেজি শিখাইতেছে ; এমন-কি, মাতৃভাষা শিখাইতেছে না ; এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষার প্রস্তাব উঠিতেছে, তখন স্বদেশের লোকেই তো তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরানীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাস করিতেই হইবে। পাস না করিলে চাকরি চুলায় যাক, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরেজি-শিক্ষার মর্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কী ভ্রম, এ কী দুরাশা। ইংরেজি-শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করিবে না। এ কি কখনো সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে ; পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরেজি-শিক্ষা কেবল যে মোটা মোটা চাকরি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালি সমুদ্র পার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

১২৯৯

বিলাসের ফাঁস

ইংরেজ আত্মপরিতৃপ্তির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে, ইহা লইয়া ইংরেজি কাগজে আলোচনা দেখা যাইতেছে। এ কথা তাহাদের অনেকেই বলিতেছে যে, বেতনের ও মজুরির হার আজকাল উচ্চতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রা এখনকার দিনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ হইয়াছে। কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে, আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ইংলন্ড এবং ওয়েল্‌সে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক লোক দেনা শোধ করিতে না পারায় আদালতে হাজির হয়। এই-সকল দেনার অধিকাংশই আড়ম্বরের ফল। পূর্বে অল্প আয়ের লোকে সাজে সজ্জায় যত বেশি খরচ করিত, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি করে। বিশেষত মেয়েদের পোশাকের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ফতুর হইতেছে। যে-স্ত্রীলোক মুদির দোকানে কাজ করে, ছুটির দিনে তাহার কাপড় দেখিয়া তাহাকে আমীর-ঘরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এমন ঘটনা দুর্লভ নহে। বৃহৎ ভূসম্পত্তি হইতে যে-সকল ড্যুকের বিপুল আয় আছে, বহুব্যয়সাধ্য নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে তাহাদেরও টানাটানি পড়িয়াছে, যাহাদের অল্প আয় তাহাদের তো কথাই নাই।

ইহাতে লোকের বিবাহে অপ্রবৃত্তি হইয়া তাহার বহুবিধ কুফল ফলিতেছে।

এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা কাহারও অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের অপেক্ষা সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়। দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে যে-সকল আয়োজন আবশ্যক, অর্থাভাবে আমাদের দেশে তাহা সমস্তই অসম্পূর্ণ।

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্বকালে অল্প ছিল, সে কথা মানিতে পারি না। তখনো লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতোই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই, তখন খ্যাতির পথ এক দিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্য দিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম, পূজাপার্বণ ও পূর্তকার্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতিলাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গেছে।

কিন্তু, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসা তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা সাধারণত নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে করো, যে-ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশি হউক না অতিথিরা যে-আহার পাইতেন তাহাতে বিলাসিতার চর্চা হইত না। বিবাহাদি কর্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চালচলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদেরই চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি এ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল ; এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গেছে অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সংকুচিত হয় নাই, এইজন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম করে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম নির্বাহ করো-না কেন।" সে বলিল, তাহার কোনো উপায় নাই, গ্রামের লোক ও আত্মীয়কুটুম্বমণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবি সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গেছে। পূর্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা শহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সংগতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষিজীবী গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরি দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস কেন।" সে কহিল, "বাবু, একদিন ছিল যখন জমিজমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমিজমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই।" আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল্ তো।" সে উত্তর করিল, "আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে। পূর্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়াগুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতি র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারী করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি, ছেলেরা বিলাতি জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।"

কেহ কেহ বলিবেন, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহুবন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ-সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। হিন্দু সমাজতন্ত্রে কতকগুলি লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে, এই উভয় পন্থাতেই ভালো মন্দ দুইই আছে। য়ুরোপীয় পন্থাই যদি একমাত্র শ্রেয় বলিয়া সপ্রমাণ হইত তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। য়ুরোপের মনীষীগণের কথায় অবধান করিলে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে-অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর-কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে-আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল। এই কারণে আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল। তখন ধনোপার্জন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। তখন সমাজে ধনের মর্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনই সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলিয়া গণ্য ছিল না। ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহাও নহে। এই কারণে, ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন-একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে আমি ধনী। বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।

মুসলমানসমাজে বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা হিন্দুসমাজকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবী বলিত। অল্প লোকেরই সে নবাবী চাল ছিল। এখনকার দিনে বিলাসিতাকে বাবুগিরি বলে, দেশে বাবুর অভাব নাই।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কত দিক হইতে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো। এক দিকে আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্য দিকে পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভার বহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কা বোধ করে। এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কী আছে। পণের পরিমাণও

জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শ অনুসারে যে বাড়িয়া যাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য নাই। এই পণ-লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক আলোচনা চলিতেছে ; বস্তুত ইহাতে বাঙালি গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই, কন্যার বিবাহ লইয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া নাই এমন কন্যার পিতা আজ বাংলাদেশে অল্পই আছে। অথচ, এজন্য আমাদের বর্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। এক দিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপর দিকে কন্যামাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা— এমন দুঃসহ নীচতা যে-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে-সমাজের কল্যাণ নাই, সে-সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কী। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব করুন, তবেই লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙক্ষাই সর্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, সেই গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

একবার ভাবিয়া দেখো, আজ চাকরি সমস্ত বাঙালি ভদ্রসমাজের গলায় কী ফাঁসই টানিয়া দিয়াছে। এই চাকরি যতই দুর্লভ হইতে থাক্, ইহার প্রাপ্য যতই স্বল্প হইতে থাক্, ইহার অপমান যতই দুঃসহ হইতে থাক্, আমরা ইহারই কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছি। এই দেশব্যাপী চাকরির তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালিজাতি দুর্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকরির মায়ায় বাংলার বহুতর সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকেই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা দেশের সহিত ধর্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে। আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখো। বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন বিমুখ কারা। তখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা। তখন ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা। তখন বালকদের অতি পবিত্র গুরুসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে অপমান ও নির্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা। যারা চাকরির ফাঁস গলায় পরিয়াছে। তারা যে কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়, তাহারা নিজেকে ভুলাইতেছে, তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে দেশের লোক ভুল করিতেছে। বলো দেখি, দেশের যোগ্যতম শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কণ্ঠে এই-যে চাকরি-শিকলের টান, ইহা কী প্রাণান্তকর টান। এই টানকে আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া তুলিতেছি কী করিয়া। নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানাকে প্রত্যহই উগ্রতর করিয়া মনকে বিলাসের অধীন করিয়া আপন দাসখতের মেয়াদ এবং কড়ার বাড়াইয়া চলিয়াছি।

জীবনযাত্রাকে লঘু করিবা মাত্র দেশব্যাপী এই চাকরির ফাঁসি এক মুহূর্তে আলগা হইয়া যাইবে। তখন চাষবাস বা সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইবে না। তখন এত অকাতরে অপমান সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকা সহজ হইবে না।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে-অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য

হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে-দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে-দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া, কোঠাবাড়ি গাড়িঘোড়া সাজসরঞ্জাম আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই ; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে— কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে-ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য চারি দিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে বন্ধুস্থানকে জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া, কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

১৩১২

কোট বা চাপকান

আজকাল একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতি পোশাক পরেন, স্ত্রীগণকে তাঁহারা শাড়ি পরাইয়া বাহির করিতে কুণ্ঠিত হন না। একাসনে গাড়ির দক্ষিণভাগে হ্যাট কোট, বামভাগে বোম্বাই শাড়ি। নব্য বাংলার আদর্শে হরগৌরীরূপ যদি কোনো চিত্রকর চিত্রিত করেন, তবে তাহা যদিবা "সাব্লাইম" না হয়, অন্তত সাব্লাইমের অদূরবর্তী আর-একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।

পশুপক্ষীর রাজ্যে প্রকৃতি অনেক সময় স্ত্রীপুরুষের সাজের এত প্রভেদ করেন যে, দম্পতীকে একজাতীয় বলিয়া চেনা বিশেষ অভিজ্ঞতাসাধ্য হইয়া পড়ে। কেশরের অভাবে সিংহীকে সিংহের পত্নী বলিয়া চেনা কঠিন এবং কলাপের অভাবে ময়ূরের সহিত ময়ূরীর কুটুম্বিতানির্ণয় দুরূহ।

বাংলাতেও যদি প্রকৃতি তেমন একটা বিধান করিয়া দিতেন, স্বামী যদি তাঁহার নিজের পেখম বিস্তার করিয়া সহধর্মিণীর উপরে টেক্কা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথাই উঠিত না। কিন্তু গৃহকর্তা যদি পরের পেখম পুচ্ছে গুঁজিয়া ঘরের মধ্যে অনৈক্য বিস্তার করেন, তাহা হইলে সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপসোসের বিষয় হয় তাহা নহে, পরের চক্ষে হাস্যেরও বিষয় হইয়া ওঠে।

যাহা হউক, ব্যাপারটা যতই অসংগত হউক, যখন ঘটিয়াছে তখন ইহার মধ্যে সংগত কারণ একটুকু আছেই।

আমরা যে-কারণটি নির্ণয় করিয়াছি তাহার মধ্যে আমাদের মনের কতকটা সান্ত্বনা আছে। অন্তত সেইজন্যই আশা করি এইটেই যথার্থ কারণ। সে কারণ নির্দেশ করিবার পূর্বে বিষয়টা একটু বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করা যাক।

ইংরেজি কাপড়ের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তাহার ফ্যাশানের উৎস ইংলন্ডে। সেখানে কী কারণবশত কিরূপ পরিবর্তন চলিতেছে আমরা তাহা জানি না, তাহার সহিত আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রবমাত্র নাই। আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া খবর লইতে এবং সাবধানে অনুকরণ করিতে হয়। যাঁহারা নূতন বিলাত হইতে আসেন তাঁহারা সাবেক দলের কলার এবং প্যান্টলুনের ছাঁট দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন, এবং সাবেকদলেরা নব্যদলের সাজসজ্জার নব্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে "ফ্যাশানেব্‌ল" বলিয়া হাস্য করিতে ত্রুটি করেন না।

ফ্যাশানের কথা ছাড়িয়া দেও। সকল দেশেরই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে। যে-দেশে

কাপড় না পরিয়া উলকি পরে সেখানেও উলকির ইতরবিশেষে ভদ্র অভদ্র চিহ্নিত হয়। ইংরেজি ভদ্রকাপড়ের সেই আদর্শ আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিব। তাহা আমাদের ঘরের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে নাই। সে-আদর্শ আমরা নিজের ভদ্রতাগৌরবে আমাদের নিজের সুরুচি ও সুবিচারের দ্বারা, আমাদের আপনাদের ভদ্রমণ্ডলীর সাহায্যে স্বাধীনভাবে গঠিত করিতে পারি না। আমাদিগকে ভদ্র সাজিতে হয় পরের ভদ্রতা-আদর্শ অনুসন্ধান করিয়া লইয়া।

যাহাদের নিকট হইতে অনুসন্ধান এবং ধার করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের সমাজে আমাদের গতিবিধি নাই। তাহাদের দোকান হইতে আমরা ঈভনিং কোর্তা কিনি, কিন্তু তাহাদের নিমন্ত্রণে সেটা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাই না।

এমন অবস্থায় ক্রমে দোকানে-কেনা আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। ক্রমে কলারের শুভ্রতায় টাইয়ের বন্ধনে প্যান্টলুনের পরিধিতে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। শুনিতে পাই ইংরেজিবেশী বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায় দেখা যায়।

একে বিলাতি সাজ স্বভাবতই বাঙালিদেহে অসংগত, তাহার উপরে যদি তাহাতে ভদ্রোচিত পারিপাট্য না থাকে, তবে তাহাতে হাসিও আসে অবজ্ঞাও আনে। এ কথা সহজেই মুখে আসে যে, যদি পরিতে না জান এবং শক্তি না থাকে, তবে পরের কাপড়ে সাজিয়া বেড়াইবার দরকার কী ছিল।

ইংরেজি কাপড়ে 'খেলো' হইলে যত খেলো এবং যত দীন দেখিতে হয়, এমন দেশী কাপড়ে নয়। তাহার একটা কারণ ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে। ইংরেজি কাপড় যদি গায়ে ফিট না হইল, যদি তাহাতে টানাটানি প্রকাশ পাইল, তবে তাহা ভদ্রতার পক্ষে অত্যন্ত বেআবরু হইয়া পড়ে ; কারণ, ইংরেজি কাপড়ের আগাগোড়ায় গায়ে ফিট করিবার চরম উদ্দেশ্য, দেহটাকে খোসার মতো মুড়িয়া ফেলিবার সযত্ন চেষ্টা সর্বদা বর্তমান। সুতরাং প্যান্টলুন যদি একটু খাটো হয়, কোট যদি একটু উঠিয়া পড়ে, তবে নিজেকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়, সেইটুকুতেই আত্মসম্মানের লাঘব হইতে থাকে— যে-ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অজ্ঞতাসুখে অচেতন, অন্যলোকে তাহার হইয়া লজ্জা বোধ করে।

যাঁহারা আজকাল ইংরেজি বস্ত্র ধরিয়াছেন লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন, তাঁহাদিগকে কখনো যেন চাঁদনিতে ঢুকিতে না হয়। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা সকলেই যে র‍্যানকিনের বাড়ি গতিবিধি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। অথচ পৈতৃক বেশের সহিত পৈতৃক দুর্বলতাটুকুও যদি তাহারা পায়, সাহেবিয়ানা পরিহার করিবার শক্তি যদি তাহাদের না থাকে, তবে তাহাদের সম্মুখে দারুণ চুনাগলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না।

যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা বিলাতি বসনভূষণের অন্ধিসন্ধি কতকটা বুঝিয়া চলিতে পারেন ; যাঁহারা যান নাই তাঁহারা অনেক সময় অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তাঁহারা দার্জিলিঙের প্রকাশ্যপথে ড্রেসিংগাউন পরিয়া বেড়ান, এবং ছোটো কন্যাকে মলিন সাদা ফুলমোজার উপরে বিলাতি ফ্রক এবং টুপি উলটা করিয়া পরাইয়া সভায় লইয়া আসেন।

এ সম্বন্ধে দুটো কথা আছে। প্রথমে ঠিক দস্তুর-মতো ফ্যাশান-মতো কাপড় পরিতেই হইবে, এমন কী মাথার দিব্য আছে। এ কথাটা খুব বড়োলোকের, খুব স্বাধীনচেতার মতো কথা বটে। দশের দাসত্ব, প্রথার গোলামি, এ-সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ধিক্। কিন্তু এ স্বাধীনতার কথা তাহাকে শোভা পায় না যে-লোক গোড়াতেই বিলাতি সাজ পরিয়া অনুকরণের দাসখত আপাদমস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছে। পাঁঠা যদি নিজের হয়, তবে তাহাকে কাটা সম্বন্ধেও স্বাধীনতা থাকে ; নিজেদের ফ্যাশানে যদি চলি, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াও মহত্ত্ব দেখাইতে পারি। পরের পথেও চলিব, আবার সে-পথ কলুষিতও করিব, এমন বীরত্বের মহত্ত্ব বোঝা যায় না।

আর-একটা কথা এই যে; যেমন ব্রাহ্মণের পইতা তেমনই বিলাতফেরতের বিলাতি কাপড়, ওটা সাম্প্রদায়িক লক্ষণরূপে স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। কিন্তু সে বিধান চলিবে না। গোড়ায় সেই-মতোই ছিল বটে, কিন্তু আজকাল সমুদ্র পার না হইয়াও অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন। আমাদের

উর্বর দেশে ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি যে-কোনো ব্যাধি আসিয়াছে, ব্যাপ্ত না হইয়া ছাড়ে নাই ; বিলাতি কাপড়েরও দিন আসিয়াছে ; ইহাকে দেশের কোনো অংশবিশেষে পৃথক্করণ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলন্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহার দৈন্য কী বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে। আজ যাহা কেবলমাত্র শোকাবহ আছে সেদিন তাহা কী নিষ্ঠুর হাস্যজনক হইয়া উঠিবে। আজ যাহা বিরল-বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সংবৃত সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্তার ছিদ্রপথে অর্ধাবরণের ইতরতায় কী নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে। চুনাগলি যেদিন বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আসিবে, সেদিন যেন ভারতবর্ষ একটি পা মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহারই সমুদ্রের ঘাটে তাঁহার মলিন প্যান্টলুনের ছিন্ন প্রান্ত হইতে ভাঙা টুপির মাথাটা পর্যন্ত নীলাম্বুরাশির মধ্যে নিলীন করিয়া নারায়ণের অনন্তশয়নের অংশ লাভ করেন।

কিন্তু এ হল সেন্টিমেন্ট, ভাবুকতা— প্রকৃতিস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না। ইহা সেন্টিমেন্ট বটে। মরিব তবু অপমান সহিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। যাঁহারা আমাদিগকে ক্রিয়াকর্মে আমোদপ্রমোদ-সামাজিকতায় সর্বতোভাবে বাহিরে ঠেলিয়া রাখে, আমরা তাহাদিগকে পূজার উৎসবে ছেলের বিবাহে বাপের অন্ত্যেষ্টিসংকারে ডাকিয়া আনিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। বিলাতি কাপড় ইংরেজের জাতীয় গৌরবচিহ্ন বলিয়া সেই ছদ্মবেশে স্বদেশকে অপমানিত করিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। এই-সমস্ত সেন্টিমেন্টেই দেশের যথার্থ বল, দেশের যথার্থ গৌরব ; অর্থে নহে, রাজপদে নহে, ডাক্তারির নৈপুণ্য অথবা আইন-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে নহে।

আশা করিতেছি এই সেন্টিমেন্টের কিঞ্চিৎ আভাস আছে বলিয়াই বিলাতি বেশধারীগণ অত্যন্ত অসংগত হইলেও তাঁহাদের অর্ধাঙ্গিনীদের শাড়ি রক্ষা করিয়াছেন।

পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য ভাবগৌরবকে বলিদান দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু স্ত্রীগণ যেখানে আছেন সেখানে সৌন্দর্য এবং ভাবুকতার রাহুরূপী কর্ম আজিও আসিয়া প্রবেশ করে নাই। সেইখানে একটু ভাবরক্ষার জায়গা রহিয়াছে, সেখানে আর স্ফীতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু গ্রাস করিয়া যায় নাই।

সাহেবিয়ানাকেই যদি চরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে স্ত্রীকে বিবি না সাজাইয়া সে-গৌরব অর্ধেক অসম্পূর্ণ থাকে। তাহা যখন সাজাই নাই, তখন শাড়িপরা স্ত্রীকে বামে বসাইয়া এ কথা প্রকাশ্যে কবুল করিতেছি যে, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সুবিধার খাতিরে— দেখো, ভাবের খাতির রক্ষা করিয়াছি আমার ঘরের মধ্যে, আমার স্ত্রীগণের পবিত্র দেহে।

কিন্তু আমরা আশঙ্কা করিতেছি, ইহাদের অনেকেই এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিবেন। বলিবেন, পুরুষের উপযোগী জাতীয় পরিচ্ছদ তোমাদের আছে কোথায় যে আমরা পরিব ? ইহাকেই বলে আঘাতের উপরে অবমাননা। একে তো পরিবার বেলা ইচ্ছাসুখেই বিলাতি কাপড় পরিলেন, তাহার পর বলিবার বেলা সুর ধরিলেন যে, তোমাদের কোনো কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদিগকে এই বেশ ধরিতে হইয়াছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে, কিন্তু তোমাদের কোনো কাপড়ই নাই— সে আরো খারাপ।

বাঙালি সাহেবেরা ব্যঙ্গসুরে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিতে গেলে পায়ে চটি, হাঁটুর উপরে ধুতি এবং কাঁধের উপরে একখানা চাদর পরিতে হয় ; সে আমরা কিছুতেই পারিব না। শুনিয়া ক্ষোভে নিরুত্তর হইয়া থাকি।

যদিও কাপড়ের উপর মানুষ নির্ভর করে না, মানুষের উপর কাপড় নির্ভর করে ; এবং সে হিসাবে মোটা ধুতি চাদর লেশমাত্র লজ্জাকর নহে। বিদ্যাসাগর, একা বিদ্যাসাগর নহেন, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মোটা চাদরধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত গৌরবে গাম্ভীর্যে কোর্তাগ্রস্ত কোনো বিলাতফেরতই তুলনীয় হইতে পারেন না। যে-ব্রাহ্মণেরা এককালে ভারতবর্ষকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বসনের একান্ত বিরলতা জগদ্‌বিখ্যাত। কিন্তু সে-সকল তর্ক তুলিতে

চাহি না। কারণ সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তনের একেবারে বিপরীতমুখে চলিতে গেলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলাদেশে যে-ভাবে ধুতি চাদর পরা হয়, তাহা আধুনিক কাজকর্ম এবং আপিস-আদালতের উপযোগী নয়। কিন্তু আচকান-চাপকানের প্রতি সে-দোষারোপ করা যায় না।

সাহেবি বেশধারীরা বলেন, ওটাও তো বিদেশী সাজ। বলেন বটে, কিন্তু সে একটা জেদের তর্ক মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বলিয়া চাপকান তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, সাহেব সাজিবার একটা কোনো বিশেষ প্রলোভন আছে বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন।

কারণ যদি চাপকান এবং কোট দুটোই তাঁহার নিকট সমান নূতন হইত, যদি তাঁহাকে আপিসে প্রবেশ ও রেলগাড়িতে পদার্পণ করিবার দিন দুটোর মধ্যে একটা প্রথম বাছিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে এ-সকল তর্কের উত্থাপন হইতে পারিত। চাপকান তাঁহার গায়েই ছিল, তিনি সেটা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়া যেদিন কালো কুর্তির মধ্যে প্রবেশপূর্বক গলায় টাই বাঁধিলেন, সেদিন আনন্দে এবং গৌরবে এ তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তোলাও সহজ নহে, কারণ চাপকানের ইতিবৃত্ত ঠিক তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কেননা মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দু মুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে-সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে। এখনো পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন রাজাধিকারে চাপকানের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায় ; সে-বৈচিত্র্যে যে একমাত্র মুসলমানের কর্তৃত্ব তাহা নহে, তাহার মধ্যে হিন্দুরও স্বাধীনতা আছে।

যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয়জাতীয় গুণীরই হাত আছে ; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।

তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই ; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত, এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই ; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।

অতএব এই মিশ্রণের মধ্যে চাপকানের খাঁটি মুসলমানত্ব যিনি গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাকে এই কথা বলিতে হয় যে, তোমার যখন গায়ের এতই জোর, তখন কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া ঐ গায়ের জোরেই হ্যাটকোট অবলম্বন করো ; আমরা মনের আক্ষেপ নীরবে মনের মধ্যে পরিপাক করি।

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে— আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে-বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দু মুসলমানের বেশ।

যদি সত্য হয়, চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্‌ভাবিত সজ্জা, তথাপি এ কথা যখন

স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণাপ্রতাপ রণজিৎসিংহ এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তখন মিস্টার ঘোষ-বোস-মিত্র, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের এ বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে, চাপকান পায়জামা দেখিতে অতি কুশ্রী। তর্ক যখন এইখানে আসিয়া ঠেকে তখন মানে মানে চুপ করিয়া যাওয়া শ্রেয়। কারণ রুচির তর্কের, শেষকালে প্রায় বাহুবলে আসিয়াই মীমাংসা হয়।

১৩০৫

নকলের নাকাল

ইংরেজিতে একটি বচন আছে, সাব্লাইম হইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে। সংস্কৃত অলংকারে অদ্ভুতরস ইংরেজি সাব্‌লিমিটির প্রতিশব্দ। কিন্তু অদ্ভুত দুই রকমেরই আছে— হাস্যকর অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত।

দুইদিনের জন্য দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র দেখা গেল। এক দিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ, আর-এক দিকে বিলাতি-কাপড়-পরা বাঙালি। সাব্লাইম এবং হাস্যকর একেবারে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন।

ইংরেজি কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে কথা আমি বলি না— বাঙালির ইংরেজি কাপড় পরাটাই যে হাস্যকর, সে-প্রসঙ্গও আমি তুলিতে চাহি না। কিন্তু বাঙালির গায়ে বিসদৃশ রকমের বিলাতি কাপড় যদি করুণরসাত্মক না হয়, তবে নিঃসন্দেহই হাস্যকর। আশা করি, এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইবে না।

হয়তো কাপড় একরকমের, টুপি একরকমের, হয়তো কলার আছে টাই নাই, হয়তো যে-রঙটা ইংরেজের চক্ষে বিভীষিকা সেই রঙের কুর্তি ; হয়তো যে-অঙ্গাবরণকে ঘরের বাহিরে ইংরেজ বিবসন বলিয়া গণ্য করে, সেই অসংগত অঙ্গচ্ছদ। এমনতরো অজ্ঞানকৃত সঙসজ্জা কেন।

যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোঁচা দিয়া কোনো ইংরেজ বাঙালিটোলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে-ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা করিতে পারে না। আমাদের যে বাঙালি ভ্রাতারা অদ্ভুত বিলাতি সাজ পরিয়া গিরিরাজের রাজসভায় ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিয়া ইংরেজ দর্শকের কৌতুকবিধান করিয়া থাকেন।

বেচারা কী আর করিবে। ইংরেজ-দস্তুর সে জানিবে কী করিয়া। যে বিলাত-ফেরত বাঙালি দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের এই বেশবিভ্রমে তিনিই সব চেয়ে লজ্জাবোধ করেন। তিনিই সব চেয়ে তীব্রস্বরে বলিয়া থাকেন, যদি না জানে তবে পরে কেন। আমাদের সুদ্ধ ইংরেজের কাছে অপদস্থ করে।

না পরিবে কেন। তুমি যদি পর, এবং পরিয়া দেশীপরিচ্ছদধারীর চেয়ে নিজেকে বড়ো মনে কর, তবে সে-গর্ব হইতে সেই-বা বঞ্চিত হইবে কেন। তোমার যদি মত হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোশাকই গ্রাহ্য, তবে দলপুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

তুমি বলিবে, বিলাতি সাজ পরিতে চাও পরো, কিন্তু কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা অভদ্র কোন্‌টা সংগত কোন্‌টা অদ্ভুত, সে-খবরটা লও।

কিন্তু সে কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। যাহারা ইংরেজিসমাজে নাই, যাহাদের আত্মীয়স্বজন বাঙালি, তাহারা ইংরেজি দস্তুরের আদর্শ কোথায় পাইবে।

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা র‍্যাঙ্কিন-হার্মানের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মসমর্পণ করে, এবং বড়ো বড়ো চেকে সই করিয়া দেয়, মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করে, নিশ্চয়ই আর কিছু না হউক আমাকে

দেখিয়া অন্তত ভদ্র ফিরিঙ্গি বলিয়া লোকে আন্দাজ করিবে— ইংরেজি কায়দা জানে না, এমন মূর্ছাকর অপবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু পনেরো-আনা বাঙালিরই অর্থাভাব, এবং চাঁদনিই তাহাদের বাঙালি সজ্জার চরম মোক্ষস্থান। অতএব উলটা-পালটা ভুলচুক হইতেই হইবে। এমন স্থলে পরের সাজ পরিতে গেলে অধিকাংশ লোকেরই সঙসাজা বৈ গতি নাই।

স্বজাতিকে কেন এমন করিয়া অপদস্থ করা। এমন কাজ কেন কর, যাহার দৃষ্টান্তে দেশের লোক হাস্যকর হইয়া উঠে। দুই-চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিতেও পারে, কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না, কারণ ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই, এমন অবস্থায় সমস্ত কাকসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সংবরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা হইতে, ইংরেজিয়ানার এই বিকার হইতে, স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কি সক্ষম নকলকারীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে পারি না, কারণ, তাঁহারা সক্ষম, আর-সকলে অক্ষম। এমন-কি, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাও অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহারা যখন ফিরিঙ্গিলীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আবর্জনার মতো পড়িয়া থাকিবে, তখন কি র‍্যাঙ্কিনবিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে।

দরিদ্র কোনোমতেই পরের নকল ভদ্ররকমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহাকে নকল করিতে হইবে, সর্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়, দরিদ্রের পক্ষে সেইটেই সর্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে-অবস্থায় নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাঙালির পক্ষে খাটো ধুতি পরা লজ্জাকর নহে, কিন্তু খাটো প্যান্টলুন পরা লজ্জাজনক। কারণ, খাটো প্যান্টলুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝায় না, তাহাতে পর সাজিবার যে-চেষ্টা যে-স্পর্ধা প্রকাশ পায়, তাহা দারিদ্র্যের সহিত কিছুতেই সুসংগত নহে।

আজকাল ইংরেজি সাজ কিরূপ চলতি হইয়া আসিতেছে, এবং যতই চলতি হইতেছে ততই তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে, দার্জিলিঙের মতো জায়গায় আসিলে অল্পকালের মধ্যেই তাহা অনুভব করা যায়। বাঙালির দুরদৃষ্ট বাঙালিকে অনেক দুঃখ দিয়াছে— পেটে প্লীহা, হাড়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া, দেহে কৃশতা, চর্মে কালিমা, ভাণ্ডারে দৈন্য ; অবশেষে তাহাকে কি অদ্ভুত সাজে সাজাইয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিবে। চিত্তদৌর্বল্যে যখন হাস্যকর করিয়া তোলে, তখন ধরণী দ্বিধা হওয়া ছাড়া লজ্জানিবারণের আর উপায় থাকে না।

আচারব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মতো, তাহাকে উপড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতি বেশভূষা-আদবকায়দার মাটি এখানে কোথায়। সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে। ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আমদানি করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্ন সচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনোমতে খাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে কেবল দুই-চারিজন শৌখিনের দ্বারাই সাধ্য।

যাহাকে পালন করিতে, সজীব রাখিতে পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার ? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলাদেশেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্তন হইবে না। যেখানে যাহা আছে, চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে।

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তিস্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অতএব রেলওয়ে-ভ্রমণের জন্য, আপিসে বাহির হইবার জন্য, নূতন প্রয়োজনের জন্য ছাঁটা-কাটা

কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্বাপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত করো। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ ভাববিরুদ্ধ সংগতিবিরুদ্ধ অনুকরণের প্রতি হতবুদ্ধির ন্যায় ধাবিত হইয়ো না।

পুরাতনের পরিবর্তন ও নূতনের নির্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতিকেই সর্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনোই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয়তো একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বাহুল্য। তাহার ছাঁটা কোর্তা হয়তো দৌড়ধাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েস্টকোট হয়তো অনাবশ্যক এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয়তো খপ্ করিয়া মাথায় পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই-কলার বাঁধিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

যেখানে পরিবর্তন ও নূতন নির্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত, সেইখানেই অনুকরণ মার্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে-কথা কোনোক্রমেই খাটে না।

বিশেষত বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না, তাহাতে ভদ্রাভদ্র, দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরেজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরেজ জানে। আমাদের ভদ্রলোকদের অধিকাংশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। জানিতে গেলেও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি-বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার জন্যই বিলাতি কাপড়ের প্রয়োজন হয়।

এ কথা বলিতে যাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে, পরের বাড়িতে ছদ্মবেশে সম্বন্ধী সাজিয়া গেলে আদর পাওয়া যাইতে পারে, তবু যাহার কিছুমাত্র তেজ ও ভদ্রতাজ্ঞান আছে, সেই আদরকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে। রেলওয়ের ফিরিঙ্গি গার্ড ফিরিঙ্গিভ্রাতা মনে করিয়া যে-আদর করে তাহার প্রলোভন সংবরণ করাই ভালো। কোনো কোনো রেল-লাইনে দেশী-বিলাতির স্বতন্ত্র গাড়ি আছে, কোনো কোনো হোটেলে দেশী লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না, সেজন্য রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে তবে সে-কষ্ট স্বীকার করো, কিন্তু জন্ম ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলে সম্মানের যে কী বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন।

পরিবর্তন কোন্ পর্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে।

যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা ; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

মোজা পরিলে কোট পরা অনিবার্য হয় না, ধুতির সঙ্গে মোজা বিকল্পে চলিয়া যায় কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না। সাধু ইংরেজিভাষার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসি মিশাল চলে, তাহা ইংরেজি-পাঠকেরা জানেন। কিন্তু কী-পর্যন্ত চলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে, সে-নিয়ম বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শেখানো বাহুল্য। তথাপি তার্কিক বলিতে পারে, তুমি যদি অতটা দূরে গেলে, আমি না-হয় আরো কিছুদূর গেলাম, কে আমাকে নিবারণ করিবে। সে তো ঠিক কথা। তোমার রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না করে, তবে কাহার পিতৃপুরুষের সাধ্য তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখে।

বেশভূষাতেও সেই তর্ক চলে। যিনি আগাগোড়া বিলাতি ধরিয়াছেন তিনি সমালোচককে বলেন, তুমি কেন চাপকানের সঙ্গে প্যান্টলুন পরিয়াছ। অবশেষে তর্কটা ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়ায়।

সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অন্যায় হইয়া থাকে, নিন্দা করো, সংশোধন করো, প্যান্টলুনের পরিবর্তে অন্য কোনোপ্রকার পায়জামা যদি কার্যকর ও সুসংগত হয় তবে তাহার প্রবর্তন করো— তাই বলিয়া-তুমি আগাগোড়া দেশীবস্ত্র পরিহার করিবে কেন। একজন এক কান কাটিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয়

ব্যক্তি খামকা দুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহার বাহাদুরিটা কোথায় বুঝিতে পারি না।

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে তাহার সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলির পরে পরস্পর আপসে সীমানা পাকা হইয়া আসে। সেই অনিবার্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পুরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

কারণ, আলস্য সংক্রামক। পরের তৈরি জিনিসের লোভে নিজের সমস্ত চেষ্টা বিসর্জন দিবার নজির পাইলে, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভুলিয়া যায়, পরের জিনিস কখনোই আপনার করা যায় না। ভুলিয়া যায়, পরের কাপড় পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

জড়ত্ব যাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম। আজ যদি বলি, কে অত ভাবে, তার চেয়ে বিলিতি দোকানে গিয়া একসুট অর্ডার দিয়া আসি— তবে কাল বলিব, প্যান্টলুনটা খাটো হইয়া গেছে, কে এত হাঙ্গাম করে, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে।

কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালি-সমাজে বিলাতি কাপড়ের অসংগতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাতফেরতদের মধ্যেও বিলাতি সাজ সম্বন্ধে ঢিলাভাব দেখা যায়; সস্তার চেষ্টায় বা আলস্যের গতিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশবিন্যাস করেন, যাহা বিধিমত অভদ্র।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে বাঙালি-ভদ্রলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতি ভদ্রতার নিয়মে নিমন্ত্রণ সাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজ্জা সম্বন্ধে কোন্‌টা বিহিত, কোন্‌টা অবিহিত, সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অতীত হইয়া যাইতেছেন। ইংরেজি সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে ফিরিতে পান না। দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন— সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান নিজের বিধান, সুবিধার বিধান; সে বিধানে আলস্য-ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই-সকল ছাড়া-কাপড় ইঁহাদের পরপুরুষের গাত্রে কিরূপ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচারব্যবহারে এ-সকল কথা আরো অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচারব্যবহারকে সদাচার-সদ্‌ব্যবহারের সীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে। যে-ইংরেজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা বলপূর্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলিতে পারে, বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে, তাহার পরে চলিবে কিসে।

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসমাজের ত্যাজ্যপুত্র, এবং চেষ্টাসত্ত্বেও পরসমাজের পোষ্যপুত্র নহেন, তাঁহারা স্বভাবতই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া সুখটুকু লইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে।

ইঁহাদের একরকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা কী করিবে, এবং যাহারা নকলের নকল করে, তাহাদের কী দুরবস্থা হইবে।

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতি-সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালি-সাহেব কেবলমাত্র ধনসম্পদ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির ঊর্ধ্বে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবের পুত্রটি সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতনলব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই। তখন সে কে।

কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না, ইহা নিশ্চয়, এবং যে-দুর্বলচিত্তগণ ইঁহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই।

যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপে গৌরব অনুভব করিতে বসিলে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া। যিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ববোধ করেন তিনি বস্তুত সাহেবির অনুকরণ করিতেছেন। সাহেবির অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব। যদি সাহেবের অনুকরণ করিবার শক্তি তাঁহার থাকিত, তবে সাহেবির অনুকরণ কখনোই করিতেন না। অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অন্য কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লম্ফঝম্ফ না করাই শ্রেয়।

১৩০৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কেবল দেখলুম, জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লামেন্ট চলছে— সকলেই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

দেখে আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে বিস্ময়-সহকারে বলে— হাঁ, এরাই রাজার জাত বটে। আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চন দারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও মানুষের শক্তি আপন পেশী ও স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে খেটে মরছে।

জাহাজে বসে ভাবতুম এই যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ-বা বিশ্রামসুখে, কেউ-বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত; কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে সংক্ষিপ্ত করছে সেখানে কী অসহ্য চেষ্টা কী দুঃসাধ্য পরিশ্রম, মানবজীবনের কী নির্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চলেছে। কিন্তু কী করা যাবে। আমাদের মানব-রাজা চলেছেন; কোথাও তিনি থামতে চান না; অনর্থক কাল নষ্ট কিংবা পথকষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে কেবলমাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে, যেমন ঐশ্বর্যে থাকেন, পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চান না। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত, ভোজনশালা, সংগীতমণ্ডপ সুসজ্জিত. স্বর্ণচিত্রিত শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহারকালে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্য কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালার গৃহে সর্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশ দিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তকালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সংবৎসরকাল চেষ্টা চলছে।

এ-রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার শৌখিনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্বহ

ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood-রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপসংগীত।

খুব সম্ভব দুর্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামিড অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয়, এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্যও অপূর্ব চমৎকার; তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারও চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসাব জমা হচ্ছে। প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায়, তা হলে সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ধ্বংস করে ফেলে।

স্মরণ হচ্ছে য়ুরোপের কোনো এক বড়োলোক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেছেন যে, এক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক, কিন্তু আশ্চর্য কী। কারণ আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে রয়েছে, কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে বিপদ সেইখানে বসে গোপনে বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি। মানব-নবাবের নবাবি যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈশান কোণ থেকেই ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।

এইসঙ্গে আর-একটা কথা মনে হয়; যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোনো কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা, কিন্তু বাহির হতে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয়, য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে-পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে-পরিমাণে আকর্ষণ করে আনতে পারছে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাববৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকাসংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে চলতে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না। স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পাত্রের অপেক্ষায় কুমারী দীর্ঘকাল বসে থাকে, স্বামী কার্যোপলক্ষে চলে যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকাসংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজনিয়ম তার প্রতিকূলতা করছে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্তির যে-চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এইরকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাইহিলিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে আপাতত আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে য়ুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়মূর্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, অসমর্থ পুরুষই বল আর অবলা রমণীই বল, দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবলই গতি চাই; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এইজন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে, আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয়, আমাদের বলও আছে। অতএব 'আমি কি

ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে'। হায়, আমরা ইংরেজ-শাসিত বাঙালিরাও সেইভাবেই বলছি, 'নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে।'

এই তো অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলন্ডে আমাদের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ হয়, তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্ছে বলে মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরেজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খল সম্বন্ধে কথাটি কবার জো নেই। ইংরেজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়ে ঝুড়ে ধুয়ে নিঙড়ে ভাঁজ করে পাট করে ইস্ত্রি করে নিজের বাক্সর মধ্যে পুরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে আছে। আমরা ইংরেজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি ; যদি কোনো কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার, নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর অবজ্ঞাবিহীন অনুকূল প্রসন্নভাবের। আমরা উপকার অনেক পাই, কিন্তু দয়া কিছুই পাই নে। অতএব যখন এই দুর্লভ করুণার অস্থানে অপব্যয় দেখি, তখন ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা প'রে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো-বা ভালোবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে ; কিন্তু রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান পৃথিবীর সর্বত্রই আছে ; বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংলন্ডেও তার অভাব নেই। যা হোক, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখী আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন।

পরস্পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতই অত্যন্ত ভুল করে থাকেন। মৎস্য যদি উত্তরোত্তর সভ্যতার বিকাশে সহসা মানবহিতৈষী হয়ে ওঠে, তা হলে সমস্ত মানবজাতিকে একটা শৈবালবহুল গভীর সরোবরের মধ্যে নিমগ্ন না করে কিছুতে কি তার করুণ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দূর হয়। তোমরা বাহিরে সুখী, আমরা গৃহে সুখী, এখন আমাদের সুখ তোমাদের বোঝাই কী করে।

একজন লেডি-ডফারিন্-স্ত্রী-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে, অপরিচ্ছন্ন ছোটো কুঠরি— ছোটো ছোটো জানলা, বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্টস্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রে দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন— তখন সে মনে করে কী সর্বনাশ, কী ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কী স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে। জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রস্কিন পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হলে অভিমানিনী সহধর্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি।

কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু আমরা নিতান্ত অধম নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই বললেই হয়, কিন্তু তবুও তো আমাদের দয়ামায়া ভালোবাসা আছে। তক্তপোশের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় এক হাতে তাকিয়া আঁকড়ে ধরে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও তো অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই ; ভাঙা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে থাকি, তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদেরই মতো বিশ্বাসবিহীন হয়ে আসছে।

আমরাও আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারি নে। কৌচ-কেদারা খেলাধুলা তোমরা এত ভালোবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও তোমাদের বেশ চলে যায়। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে

ভালোবাসা ; আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহজীবনে কিছুতেই আর আরামের জোগাড় হয়ে ওঠে না।

অতএব আমরা যখন বলি, আমরা যে বিবাহ করে থাকি সেটা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ রেখে পারত্রিক মুক্তিসাধনের জন্য, কথাটা খুব জাঁকালো শুনতে হয় কিন্তু তবু সেটা মুখের কথা মাত্র, এবং তার প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের বর্তমান সমাজ পরিত্যাগ করে প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে প্রবেশপূর্বক ব্যস্তভাবে গবেষণা করে বেড়াতে হয়। প্রকৃত সত্য কথাটা হচ্ছে, ও না হলে আমাদের চলে না, আমরা থাকতে পারি নে। আমরা শুশুকের মতো কর্মতরঙ্গের মধ্যে দিগ্‌বাজি খেলে বেড়াই বটে, কিন্তু চট্ করে অমনি যখন-তখন অন্তঃপুরের মধ্যে হুস করে হাঁফ ছেড়ে না এলে আমরা বাঁচি নে। যিনি যা-ই বলুন, সেটা পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্যে নয়।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভালো হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, সে কথা এখানে বিচার্য নয়, সে কথা নিয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যেরকম গঠন, তাতে সমাজের ভালোমন্দ যা-ই হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে। ইংরেজেরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।

আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব। এইজন্যে একজন ইংরেজ-মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্যহৃদয় ক্রমশ নীরস হয়ে আসে কেবল কুকুরশাবক পালন করে এবং সাধারণ-হিতার্থে সভা পোষণ ক'রে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করে। যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সঞ্চিত স্তন্য কৃত্রিম উপায়ে নিষ্ক্রান্ত করে দেওয়া তার স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, তেমনি য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারীহৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদের আত্মার প্রকৃত পরিতৃপ্তি হতে পারে না।

ইংরেজ old maid-এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবার তুলনা বোধ হয় অন্যায় হয় না। সংখ্যায় বোধ করি ইংরেজ কুমারী এবং আমাদের বালবিধবা সমান হবে কিংবা কিছু যদি কমবেশি হয়। বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সামনে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো-একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনবার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোটো ছোটো ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্‌বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।

এই-সকল কারণে, তোমাদের যে-সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো-একটা কুকুরশাবক এবং চারটে-পাঁচটা সভা কোলে করে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী, এ কথা আমার মনে লয় না। ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির মধ্যে অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।

আমরা আর যা-ই হই, আমরা গৃহস্থ জাতি। অতএব বিচার করে দেখতে গেলে, আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি ; তাঁরাই আমাদের সর্বদা বহু যত্ন আদর করে রেখে দিয়েছেন। এমনই আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু'দিন টিকতে পারি নে ; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে করে নারীরা অসুখী হয় না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাদের শরীরমনের সুখসাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন-কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করানোকে আমাদের দেশের পরিহাসরসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন ; কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায়, আমাদের স্ত্রীকন্যারা সর্বদাই বিভীষিকারাজ্যে বাস করছেন না এবং তাঁরা সুখী।

তাঁদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত। আমরা কি একরকম কাঁচা-পাকা জোড়া-তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই। আমাদের কি পর্যবেক্ষণশক্তির, বিচারশক্তি এবং ধারণাশক্তির বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে। আমরা কি সর্বদাই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে ফেলি নে, এবং অন্ধসংস্কার কি আমাদের যুক্তিরাজ্যসিংহাসনের অর্ধেক অধিকার করে সর্বদাই অটল এবং দাম্ভিকভাবে বসে থাকে না। আমাদের এইরকম দুর্বল শিক্ষা এবং দুর্বল চরিত্রের জন্য সর্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসংগতি দেখা যায় না। আমাদের বাঙালিদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি একপ্রকার শৃঙ্খলাসংযমহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না।

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখতে শিখি নি, ভাবতে শিখি নি, কাজ করতে শিখি নি, সেইজন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই— আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মতো মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মতো ঝরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেইজন্য আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের 'এসে'র মতো, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে, জীবনের ব্যবহারের জন্যে নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা তো আমাদের স্ত্রীলোকদের কতই-বা শিক্ষা হবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের যে-অন্তরের স্থান অধিকার করে থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও তাই দেখা যায়। অতএব আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশলাভের পূর্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তা হলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বলতেই হয় ইংরেজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণস্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হতেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনই অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে, নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারও কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেকগুলায় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব করে রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মতো হয়ে যায়, তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোনো-একজনের মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে এ দেশে জাতি হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মে নি— পরিবারকেই আমরা সংসার বলে থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর-এক কাণ্ড দেখা যাচ্ছে। য়ুরোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে

তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিংবা মানবহিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি আর-এক দিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্ছেন ; এক দিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর-এক দিকেও তেমনি বাধাবিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার বাড়ছে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়ছে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্ধেক, ইংরেজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্ধাঙ্গ ; আমরা বলি সন্তানে গৃহ পরিবৃত না হলে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরেজ বলেন আসবাব অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনই প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার জো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এ দেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সর্বাগ্রেই জুড়ি গাড়ি এবং বড়ো বাড়ির আবশ্যক ; এইজন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাঁদর পরে পালকি অবলম্বনপূর্বক যাতায়াত করেন তাতে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার যদি গাড়ি ঘোড়া ঘড়ি ঘড়ির-চেনকে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক-সুশ্রুত-ধন্বন্তরীর সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সূত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্বদাই আমাদের কর্তা হয়ে উঠে। এইজন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল করে মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য দেখা দেয়, অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেইরকম প্রবল নদী বলে এক-একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন-সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতি বর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে। আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ করে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘনশৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো-বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে ; গৃহ, যা মানুষের স্নেহপ্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চিরউৎসভূমি, পৃথিবীর আর-সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক, স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেইখানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে ফেলছে, হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠছে।

নতুবা যে-সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল, সে-সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্-নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়। সোশ্যালিজ্‌ম্ কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে। যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী স্বার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনই সন্ধ্যাবেলায় এই শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।

যা হোক, আমার মতো অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের তত্ত্ব নেওয়ার মতো হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে-কোনো অনুমানই ব্যক্ত করি-না কেন, তার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে, ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড-পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ-সকল কথা যিনি যেভাবেই নিন আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক

সম্বন্ধে যে-কথাটা বলছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে আমার বোধ হয় না।

যে-দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে; যে-যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, easy chair-টি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, চুরটের পাইপটি, এবং জুয়াখেলার ক্লাবটি নিয়ে নির্বিঘ্নে আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙে গেছে। পূর্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞী-মক্ষিকারা কর্তৃত্ব করতেন, এখন স্বার্থপরগণ যে-যার নিজের নিজের চাক ভাড়া করে সকালে মধু উপার্জনপূর্বক সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানী-মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধুদান এবং মধুপান করবার আর সময় নেই। বর্তমান অবস্থা এখনো তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে যায় নি; এইজন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে তাঁরা ইতস্তত ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছেন। আমরা আমাদের মহারানীদের রাজত্বে বেশ আছি এবং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুর অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক সমাজের মর্মস্থানটি অধিকার করে সকল কটিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

কিন্তু সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটছে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেইসঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাপরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিতসমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর-একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এইজন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওআটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এইজন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারও বক্তৃতায় নয়, কর্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশ করে সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সংবরণ করে পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব, আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই-না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরেজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলন্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, বাইবল যদিও বহুকাল হতে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ আপন অসহিষ্ণু দুর্দান্ত ভাব রক্ষা করে এসেছে, বাইবলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনো তাদের অন্তরকে গলাতে পারে নি।

আমার তো বোধ হয় য়ুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, য়ুরোপ বাল্যকাল হতে এমন-একটি শিক্ষা পাচ্ছে যা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার এনে দিচ্ছে, এবং সর্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্ত্বের পথে জাগ্রত করে রাখছে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত তা হলে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হত না। তা হলে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাকত না, তা হলে একই উদারক্ষেত্রে

এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না। খৃস্টধর্ম সর্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে রেখেছে।

খৃস্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করছে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না। য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবলসহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের হৃদয়ে স্থান লাভ করে সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য বিকাশ করেছে ; উপদেশের দ্বারায় নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে-শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এইজন্যে আশা করছি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, নব জীবনহিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনোপ্রকার ভালো কখনোই পরস্পরের প্রতিযোগী নয় তাহা সহযোগী। অবস্থাবশত আমরা কেহ একটাকে কেহ আর-একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে দেওয়া যায় না। এমন-কি, সকল ভালোর মধ্যেই এমন-একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে, একজনকে দূর করলেই আর-একজন দুর্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশ আপনার গতি বন্ধ করে সংসারপথপার্শ্বে একস্থানে স্থিতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতির চূড়ান্ত পরিণাম বলে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিংবা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তা হলে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পারে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ করেই আমি বাঁচব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভূমি থেকে আমাকে ক্রমশই আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, অতএব আমরা নব্যতরুসম্প্রদায়েরা একটা সভা করে এই সততচঞ্চল পরিবর্তনশীল রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পরিহারপূর্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভূমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব।

কিংবা সে এমন তর্কও করতে পারে যে, ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল, হেয় এবং নিম্নবর্তী, অতএব তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতক পক্ষীর মতো কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাকব— দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষের পক্ষে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনি বর্তমান কালে যাঁরা বলেন, আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে বসে থাকব, কিংবা যাঁরা বলেন, হঠাৎ-শিক্ষার বলে আমরা আতশবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করছেন।

কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচব না এবং যে-ইংরেজিশিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো-একটা বজ্রও পড়তে পারে এবং কেবলই যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়। তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করছে।

অতএব ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের কী হবে। আমরা ইংরেজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব, তবে এখন যেমন "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে বিষয়ে আমাদের

চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিংবা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষণীয় বলে ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব-পশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে-সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিংবা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে। আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক -জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থসামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ-আইডিয়ালটা আশানুরূপ উচ্চ না মনে হতেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সংগত বোধ হয়। এমন-কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট কিংবা পিরামিড আইডিয়াল নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে তোলা যায় তাকে আকৃতির উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনি মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যরহিত একটা হঠাৎ গগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সম্যক স্ফূর্তি সাধন করে আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আমরা গৃহকোণে বসে রুদ্র আর্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিশ গণ্ডা দুই পাইকে একঘরে করে কল্পনা করি পৃথিবীর মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক ; পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানি নে ; এবং যদি থাকে তো কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে আছে তাও বলতে পারি নে ; আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখি নে, সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে রেখে দিই কোথাও-না-কোথাও আছে, নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক, আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক, বর্তমানের মধ্যেই হোক আর অতীতের মধ্যেই হোক, অর্থাৎ আছেই হোক আর ছিলই হোক, ও একই কথা।

ধনীর ছেলে যেমন মনে করে আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোনো আবশ্যক নেই, এমন-কি, চাকরি-পিপাসুদের মতো কলেজে পাস দেওয়া আমার বংশমর্যাদার হানিজনক তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে বিশেষ বড়ো, অতএব আমাদের আর-কিছু না করলেও চলে এমন-কি, কিছু না করাই কর্তব্য।

এ দিকে হয়তো আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয়তো তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই কেবল এই কীটদষ্ট চেকবইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র অপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ঐ বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড়ো বড়ো অঙ্কপাতপূর্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরি করে সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

অতএব আপাতত আমাদের কোনো বিশেষ মহত্ত্বে কাজ নেই। আমরা যে ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর করে আমরা যদি পুরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা কুর্তি পরে চতুর্দিকে লড়াই করে করে বেড়াই কিংবা আধ্যাত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিংবা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে রেখে দিই সে পরের কথা।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্ছি। এখনো আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান ; তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অমিশ্চিত ছায়ার মতো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ; কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য আশ্রয়টি উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশা-ভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

১২৯৮

অযোগ্য ভক্তি

ইষ্টি আর পুরোহিত
যাহা হতে সর্বস্থিত
তারা যদি আসে বাড়ি পরে,
শুধু হাতে প্রণামেতে
ভার হয়ে যান তাতে
মুখে হাসি অন্তরে বেজার।
তিন টাকা নগদে দিলে
চরণ তুলি মাথা পরে
প্রসন্ন বদনে দেন বর।

উল্লিখিত শ্লোক তিনটি টাকা সম্বন্ধীয় একটি ছড়া হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার ছন্দ মিল এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো জবাবদিহি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই।

কেবল দেখিবার বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে যে-সত্যটুকু বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

টাকার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা তাহারই অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমাদের অখ্যাতনামা কবি উপরের দৃষ্টান্তটিও নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্তে টাকার ক্ষমতা অপেক্ষা মানুষের মনের সেই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে যাহার প্রভাবে সে একই সময়ে একই লোককে যুগপৎ ভক্তি এবং অশ্রদ্ধা করিতে পারে।

সাধারণত গুরুপুরোহিত যে সাধুপুরুষ নহেন, সামান্য বৈষয়িকদের মতো পয়সার প্রতি তাঁহার যে বিলক্ষণ লোভ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই, তথাপি তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি কেননা গুরু ব্রহ্ম। এরূপ ভক্তি দ্বারা আমরা যে নিজেকে অপমানিত করি, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করাই যে আত্মসম্মান এ কথা আমরা মনেই করি না।

কিন্তু অন্ধ ভক্তি অন্ধ মানুষের মতো অভ্যাসের পথ দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সকল দেশেই ইহার নজির আছে। বিলাতে একজন লর্ডের ছেলে সর্বতোভাবে অপদার্থ হইলেও অতি সহজেই যোগ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যাহাকে অনেকদিন অনেকে পূজা করিয়া আসিতেছে তাহাকে ভক্তি করিবার জন্য কোনো ভক্তিজনক গুণ বা ক্ষমতাবিচারের প্রয়োজনই হয় না। এমন-কি, সে-স্থলে অভক্তির প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও তাহার পদমূলে অর্ঘ্য আপনি আসিয়া আকৃষ্ট হয়।

এইরূপ আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম আছে। সেই কারণে আমাদের মন অভ্যাসের গড়ানো পথে মোহের আকর্ষণে আপনিই পাথরের মতো গড়াইয়া পড়ে, যুক্তি তাহার মাঝখানে বাধা দিতে আসিলে যুক্তি চূর্ণ হইয়া যায়।

সভ্যতার মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে

প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে ; যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের পর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়, যাহা এইরূপে ক্রমশই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড়বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

এই অশ্রান্ত সভ্যতাশক্তির উত্তেজনাতেই য়ুরোপখণ্ডে ভক্তিবৃত্তির জড়ত্বকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। ইংরেজ একজন লর্ডকে সুদ্ধমাত্র লর্ড বলিয়াই বিশেষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না এবং সেইসঙ্গে এইরূপ অযোগ্য ভক্তিকে "স্নবিসনেস" বলিয়া লাঞ্ছিত করে। ক্রমশ ইহার ফল দুই দিকেই ফলে— অর্থাৎ আভিজাত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অসংগত ভক্তি শিথিল হয় এবং অভিজাতগণও এই বরাদ্দ ভক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোনো নিন্দনীয় কাজ করিতে সাহস করেন না।

এই শক্তির বলে অন্ধ রাজভক্তির মোহপাশ ছেদন করিয়া য়ুরোপ কেমন করিয়া আপনি রাজা হইয়া উঠিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। পুরোহিতের প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধেও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিদ্রোহী শক্তি কাজ করিতেছে।

জনসমাজের স্বাধীন ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি য়ুরোপে টাকার থলি একটা পূজার বেদী অধিকার করিবার উপক্রম করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে তাহা সর্বদা উপহসিত। কার্লাইল প্রভৃতি মনস্বীগণ ইহার বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছেন।

যে ক্ষমতার কাছে মস্তক নত করিলে মস্তকের অপমান হয়, যেমন টাকা, পদবী, গায়ের জোর এবং অমূলক প্রথা— যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি নিষ্ফলা হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার না ঘটিয়া কেবল সংকোচ ঘটে তাহার দুর্দান্ত শাসন হইতে মনকে স্বাধীন ও ভক্তিকে মুক্ত করা মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রধান সাধনা।

ভক্তির দ্বারা যে-বিনতি আনয়ন করে সে-বিনতি সকল ক্ষেত্রেই শোভন নহে। এই বিনতি, কেবল গ্রহণ করিবার শিক্ষা করিবার, মাহাত্ম্যপ্রভাবের নিকট আপনার প্রকৃতিকে সাষ্টাঙ্গে অনুকূল করিবার জন্য। কিন্তু অমূলক বিনতি, অস্থানে বিনতি সেই কারণেই দুর্গতি আনয়ন করে। তাহা হীনকে ভক্তি করিয়া হীনতা লাভ করে, তাহা অযোগ্যের নিকট নত হইয়া অযোগ্যতার জন্য আপনাকে অনুকূল করিয়া রাখে।

ভক্তি আমাদিগকে ভক্তিভাজনের আদর্শের প্রতি স্বতঃ আকর্ষণ করে বলিয়াই সজীব সভ্যসমাজে কতকগুলি কঠিন বিচার প্রচলিত আছে। সেখানে যে-লোকের এমন কোনো ক্ষমতা আছে যাহা সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহাকে সমাজ সকল বিষয়েই নিষ্কলঙ্ক হইতে প্রত্যাশা করে। যে লোক রাজনীতিতে শ্রদ্ধেয় সে লোক ধর্মনীতিতে হেয় হইলে সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশি নিন্দনীয় হইতে হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যায় আছে। কারণ, ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না, রাষ্ট্রনীতিতে যাহার বিচক্ষণতা, তাহার ক্ষমতা এবং চরিত্রের অপর অংশ সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে উন্নত হইবেই এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, অতএব সাধারণ লোককে যে-আদর্শে বিচার করি, রাষ্ট্রনীতিতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনীতি ব্যতীত অন্য অংশে সেই আদর্শে বিচার করাই উচিত। কিন্তু সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবিচার করিতে বাধ্য।

কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তির দ্বারা মন গ্রহণ করিবার অনুকূল অবস্থায় উপনীত হয়। এক অংশ লইব এবং অপর অংশ লইব না এমন বিচারশক্তি তখন তাহার থাকে না। কোনো সূত্রে যে-লোক আমার ভক্তি আকর্ষণ করে, অলক্ষ্যে, নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাহার অনুকরণ করিতে থাকি। ভক্তির ধর্মই এই।

কিন্তু যে-বিষয়ে কোনো লোক অসাধারণ, ঠিক সেই বিষয়েই সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য। সুতরাং যে-অংশে সে সাধারণ লোকের অপেক্ষা উচ্চ নহে, এমন-কি, যে-অংশে

তাহার দুর্বলতা, সেই অংশেরই অনুকরণ দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত এবং সফল হইয়া উঠে। এইজন্য যে-লোক এক বিষয়ে মহৎ সে-লোক অন্য বিষয়ে হীন হইলে সমাজ প্রথমত তাহার এক বিষয়ের মহত্ত্বও অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে যদি কৃতকার্য না হয় তবে তাহার হীনতার প্রতি সাধারণ হীনতা অপেক্ষা গাঢ়তর কলঙ্ক আরোপ করে। আত্মরক্ষার জন্য সভ্যসমাজের এইরূপ চেষ্টা। যে লোক অসাধারণ, তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য ততটা নহে, কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক তাহাদিগকে ভক্তির কুফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য।

অহংকারের কুফল সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রমাত্রেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া রাখে। অহংকারে লোকের পতন হয় কেন। প্রথম কারণ, নিজের বড়োত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস থাকাতে সে পরকে ঠিকমত জানিতে পারে না ; যে-সংসারে পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ও কাজ করিতে হয় সেখানে নিজের তুলনায় অন্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলে তবেই সকল বিষয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব। চীনদেশ আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহার এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল। জার্মানির সহিত যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আর অতিদর্পে হতা লঙ্কা, এ কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানই বল। কী গৃহে কী কর্মক্ষেত্রে পরের সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল। অহংকার সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করিয়া আমাদের দুর্বলতার প্রধান কারণ হইয়া থাকে।

অহংকারের আর-এক বিপদ, তাহা সংসারকে আমাদের প্রতিকূলে দাঁড় করায়। যিনি যত বড়ো লোকই হোন-না কেন, সংসারের কাছে নানা বিষয়ে ঋণী ; যে-লোক সবিনয়ে সেই ঋণ স্বীকার করিতে না চাহে তাহার পক্ষে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ আর-একটি আছে। বড়োকে বড়ো বলিয়া জানায় একটি আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে-আনন্দ। অহংকার আমাদিগকে নিজের সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে ; যাহার ভক্তি নাই, সে জানে না অহংকারের অধিকার কত সংকীর্ণ ; যাহার ভক্তি আছে সেই জানে আপনার বাহিরে যে-বৃহত্ত্ব যে-মহত্ত্ব তাহাই অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।

এইজন্য বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় হিসাবেই অহংকারের এত নিন্দা।

কিন্তু অযথা ভক্তিও যে অহংকারের মতো সর্বতোভাবে দূষ্য, নীতিশাস্ত্রে সে কথার উল্লেখ থাকা উচিত। অন্ধ ভক্তিও পরের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ হয়। এবং অযোগ্য ভক্তিতে আমাদিগকে যদি আপনার সমকক্ষ অথবা আপনার অপেক্ষা হীনের নিকট নত করে, তবে তাহাতে যে দীনতা উপস্থিত করে তাহা অহংকারের সংকীর্ণতা অপেক্ষা অল্প হেয় নহে।

এইজন্য ইংরেজসমাজে অভিমানকে অহংকারের মতো নিন্দনীয় বলে না। অভিমান না থাকিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়, এ কথা তাহারা স্বীকার করে।

যাহার মনুষ্যত্বের অভিমান আছে, সে কখনোই অযোগ্য স্থানে আপনাকে নত করিতে পারে না। তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায় তবে সে যেখানে-সেখানে লুটাইয়া পড়ে না— সে যথোচিত সন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা যথার্থ ভক্তিভাজনকে বাহির করে।

কিন্তু আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি ; কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

আমাদের সৎপ্রবৃত্তিরও পথ যদি অত্যন্ত অবাধ হয়, তাহাতে ভালো ফল হয় না। তাহার বল, তাহার সচেষ্টতা, তাহার আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা রক্ষার জন্য, তাহাকে অমোঘ হইবার জন্য, বাধার সহিত তাহার সংগ্রাম আবশ্যক।

যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহাকে পদে পদে সংশয়ের দ্বারা বাধা দিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসাধারণের কাছে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া খ্যাত, তাহাকেও কঠিন প্রমাণের দ্বারা বারংবার বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে লোক অতিব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইতে চায় তাহার উত্তর জানিবার ব্যাকুলতা সহজে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু

অধিকাংশ স্থলেই সে ভুল উত্তর পায়। বৈজ্ঞানিকের ব্যাকুলতা সহজে নিবৃত্ত হইতে পায় না, কিন্তু বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সে যে-উত্তরটুকু পায় তাহা খাঁটি। এখানে যে-কোনো প্রকারে হউক জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, সত্যনির্ণয়ই জিজ্ঞাসার প্রকৃত পরিণাম।

তেমনি, তাড়াতাড়ি কোনো প্রকারে ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনই ভক্তির সার্থকতা নহে। বরঞ্চ কোনোমতে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিবার অতিমাত্র আগ্রহে সে আপনাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। এইরূপে সে মিথ্যা দেবতা, আত্মাবমান ও সহজ সাধনার সৃষ্টি করিতে থাকে। মহত্ত্বের ধারণাই ভক্তির লক্ষ্য তা সে যতই কঠিন হউক ; আত্ম-পরিতৃপ্তি নহে, তা সে যতই সহজ ও সুখকর হউক।

জিজ্ঞাসাবৃত্তির পথে বুদ্ধিবিচারই প্রধান আবশ্যক বাধা। সেইসঙ্গে একটা অভিমানও আছে। অভিমান বলে, আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি এমন অপদার্থ নহি। যাহা-তাহাকে আমি সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। আগে আমার সমস্ত সংশয়কে পরাস্ত করো, তবেই আমি সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ভক্তিপথেও সেই বুদ্ধিবিচার ও অভিমানই অত্যাবশ্যক বাধা। সেই বাধা থাকিলে তবেই যথার্থ ভক্তিভাজনকে আশ্রয় করিয়া ভক্তি আপনাকে চরিতার্থ করে। অভিমান সহজে মাথা নত হইতে দেয় না। যখন সে আত্মসমর্পণ করে তখন ভক্তিভাজনের পরীক্ষা হইয়া গেছে, রামচন্দ্র তখন ধনুক ভাঙিয়া তবে তাঁহার বলের প্রমাণ দিয়াছেন। সেই বাধা না থাকিলে ভক্তি অলস হইয়া যায়, অন্ধ হইয়া যায়, কলের পুতুলের মতো নির্বিচারে ক্ষণে ক্ষণে মাথা নত করিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এইরূপে ভক্তি অধ্যাত্মশক্তি হইতে মোহে পরিণত হয়।

অনেক সময় আমরা ভুল বুঝিয়া ভক্তি করি। যাহাকে মহৎ মনে করি সে হয়তো মহৎ নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কল্পনায় সে মহৎ, ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি করিলে ক্ষতির কারণ অল্পই আছে।

ক্ষতির কারণ কিছু নাই তাহা নয়। পূর্বেই বলিয়াছি যাহাকে মহৎ বলিয়া ভক্তি করি, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। যে-লোক প্রকৃত মহৎ নহে, কেবল আমাদের কল্পনায় ও বিশ্বাসে মহৎ, অন্ধভাবে তাহার আচরণের অনুকরণ আমাদের পক্ষে উন্নতিকর নহে।

কিন্তু আমাদের দেশে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি, তাহার পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে ব্যগ্র হই। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা কল্পনা করা যায় না।

সৈন্যগণকে যেমন মরিবার মুখে লইয়া যাইতে হইলে বহুদিনের কঠিন চর্চায় যন্ত্রবৎ বশ্যতা অভ্যাস করাইয়া লইতে হয় তেমনি পদে পদে আমাদের জাতিকে বিনাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র আমাদের আচার আমাদিগকে বিশ্ব-জগতের কাছে নত এবং বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুরোহিতের পবিত্র এবং দেবচরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে-মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে-পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে-লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্তও জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের জন্যও কুণ্ঠাবোধ হয় না, এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে-সকল দেবতার পুরাণ-বর্ণিত আচরণ লক্ষ করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেক স্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি, সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।

সুতরাং এ স্থলে সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, কেন পূজা করি। তাহার এক উত্তর এই যে, অভ্যাসবশত অর্থাৎ মনের জড়ত্ববশত ; দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ভক্তিজনক গুণের জন্য নহে, পরন্তু শক্তি কল্পনা করিয়া এবং সেই শক্তি হইতে ফল কামনা করিয়া।

আমাদের উদ্‌ধৃত শ্লোকের প্রথমেই আছে, "ইষ্ট আর পুরোহিত যাহা হতে সর্বস্থিত।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে গুরু ও পুরোহিতের মধ্যে আমরা একটা গূঢ় শক্তি কল্পনা করিয়া থাকি ; তাঁহাদের

শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণ যেমনই হউক তাঁহারা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলের প্রধান কারণ এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতে লাভ ও অভক্তিতে লোকসান আছে, এই বিশ্বাস আমাদের মাথাকে তাঁহাদের পায়ের কাছে নত করিয়া রাখিয়াছে। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে, তাঁহারা গৃহধর্মনীতির সুস্পষ্ট ব্যভিচার দ্বারাও গুরুভক্তিকে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দেবতা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। দেবচরিত্র আমাদের আদর্শ চরিত্র হইবে, এমন আবশ্যক নাই। দেবভক্তিতে ফল আছে, কারণ দেবতা শক্তিমান।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র নরাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজ্য। ব্রাহ্মণের কতকগুলি নিগূঢ় শক্তি আছে। তাঁহাদের প্রসাদে ও বিরাগে আমাদের ভালো মন্দ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তিপাত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে না, দেনা-পাওনার সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধে ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না এবং ভক্তও নীচতা লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেবভক্তি সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত অনেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তর্ক করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যখন সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী তখন ঈশ্বর বলিয়া আমরা যাঁহাকেই পূজা করি, ঈশ্বরই সে-পূজা গ্রহণ করেন। অতএব এরূপ ভক্তি নিষ্ফল নহে।

পূজা যেন খাজনা দেওয়ার মতো ; স্বয়ং রাজার হস্তেই দিই আর তাঁহার তহসিলদারের হস্তেই দিই, একই রাজভাণ্ডারে গিয়া জমা হয়।

দেবতার সহিত দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আমাদের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, পূজার দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটা বিশেষ উপকার করিলাম এবং তাহার পরিবর্তে একটা প্রত্যুপকার আমার পাওনা রহিল, ইহাই ভুলিতে না পারিয়া আমরা দেবভক্তি সম্বন্ধে এমন দোকানদারির কথা বলিয়া থাকি। পূজাটা দেবতার হস্তগত হওয়াই যখন বিষয়, এবং সেটা ঠিকমত তাঁহার ঠিকানায় পৌঁছিলেই যখন আমার কিঞ্চিৎ লাভ আছে, তখন যত অল্প ব্যয়ে অল্প চেষ্টায় সেটা চালান করা যায় ধর্ম-ব্যবসায়ে ততই আমার জিত। দরকার কী ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণার চেষ্টায়, দরকার কী কঠোর সত্যানুসন্ধানে ; সম্মুখে কাষ্ঠ প্রস্তর যাহা উপস্থিত থাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা নিবেদন করিয়া দিলে যাঁহার পূজা তিনি আপনি ব্যগ্র হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া লইবেন।

আমাদের পুরাণে ও প্রচলিত কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয় যেন দেবতারা আপনাদের পূজা গ্রহণের জন্য মৃতদেহের উপর শকুনি-গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছেন। অতএব আমাদের নিকট হইতে ভক্তিগ্রহণের লোলুপতা যে ঈশ্বরেরই, এ কথা আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনেও অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু কী মনুষ্যপূজায় এবং কী দেবপূজায়, ভক্তি ভক্তেরই লাভ। যাঁহাকে ভক্তি করি তিনি না জানিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহাকেই আমার জানা চাই, তবেই আমার ভক্তির সার্থকতা। পূজ্য ব্যক্তির আদর্শকে আমাদের প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিশাইয়া লইতে চাহিলে ভক্তি ছাড়া আর কোনো উপায়ই নাই। আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকেই যদি বস্তুত চাই তবে তাঁহার প্রকৃতির আদর্শ তাঁহার সত্যস্বরূপ একান্ত ভক্তিযোগে হৃদয়ে স্থাপনা করিতে হয়। সেরূপ অবস্থায় ফাঁকি দিতে স্বতই প্রবৃত্তি হয় না ; তাঁহার সহিত বৈসাদৃশ্য ও দূরত্ব যতই দীনত্বের সহিত অনুভব করি, ততই ভক্তি বাড়িয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র আপনাকে তাঁহার সহিত লীন করিবার চেষ্টা করে।

ইহাই ভক্তির গৌরব। ভক্তিরস সেই আধ্যাত্মিক রসায়নশক্তি যাহা ক্ষুদ্রকে বিগলিত করিয়া মহতের সহিত মিশ্রিত করিতে পারে।

অতএব ঈশ্বরকে যখন ভক্তি করি তখন তদ্দ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য বাড়ে না, আমরাই সেই রসস্বরূপের রাসায়নিক মিলন লাভ করি। আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ যত মহৎ মিলনের আনন্দ ততই প্রগাঢ়, এবং তদ্দ্বারা আত্মার প্রসার ততই বিপুল হইবে।

ভক্তি আমরা যাঁহাকে করি, তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাই না। যদি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি করি, তবে সে গুরুর আদর্শই আমাদের মনে অঙ্কিত হয়। ভক্তির প্রবলতায় সেই গুরুর মানস আদর্শ

তাঁহার স্বাভাবিক আদর্শ অপেক্ষা কতকটা পরিমাণে আপনি বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

অস্থানে ভক্তি করিবার একটা মহৎ পাপ এই যে, যিনি যথার্থ পূজ্য, অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ থাকে না।

আমাদের দেশে এই অন্যায় মিশ্রণ সকল দিকেই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে অনাচার এবং পাপ এক কোঠায় পড়িয়া গেছে। ইতর জাতিকে স্পর্শ করাও পাপ, ইতর জাতিকে হত্যা করাও পাপ। নরহত্যা করিয়া সমাজে নিষ্কৃতি আছে কিন্তু গোহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি নাই। অন্যায় করিয়া যবনের অন্ন মারিলে ক্ষমা আছে কিন্তু তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে পাতক।

প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও তেমনি। তিলক রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন— সেখানে অনিবার্য রাজদণ্ডের বিধানে তাঁহাকে দূষিত অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; মাথা মুড়াইয়া গোঁফ কামাইয়া কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সমাজ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিলক যে সত্য রাজদ্রোহী এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না এবং যদি-বা করিত সেজন্য তাঁহাকে দণ্ডনীয় করিত না— কিন্তু যে অনিচ্ছাকৃত অনাচারে তাঁহার সাধু চরিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই তাহাই তাঁহার পক্ষে পাপ, এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন।

যে-সমস্ত পাপ অনাচার মাত্র নহে— যাহা মিথ্যাচরণ, চৌর্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি চরিত্রের মূলগত পাপ তাহারও খণ্ডন তিথিবিশেষে গঙ্গাস্নানে তীর্থযাত্রায়।

অনাচার আচারের ত্রুটি এবং ধর্মনিয়মের লঙ্ঘনকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরা এমনই একটি ঘোরতর জড়বাদ, এমনই নিগূঢ় নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছি।

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ মিশ্রণ ঘটাইয়া আমরা ভক্তির আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিয়াছি। সেইজন্যই আমরা বরঞ্চ সাধু শূদ্রকে ভক্তি করি না, কিন্তু অসাধু ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি। আমরা প্রভাতসূর্যালোকিত হিমাদ্রিশিখরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতে পারি কিন্তু সিন্দূরলিপ্ত উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সত্য এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা এইরূপ একটা জটা পাকাইয়াছি। সমুদ্রযাত্রা উচিত কি না তাহা নির্ণয় করিতে ইহাই দেখা কর্তব্য যে, নূতন দেশ ও নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় কি না, আমাদের সংকীর্ণতা দূর হয় কি না, ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কোনো জ্ঞানপিপাসু উন্নতি-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বলপূর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিবার ন্যায্য অধিকার কাহারও আছে কি না। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আমরা দেখিব, পরাশর সমুদ্র পার হইতে বলিয়াছেন কি না এবং অত্রি কী বলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

বালবিধবাকে চিরকুমারী করিয়া রাখা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিদারুণ ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কি না ইহা আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় নহে কিন্তু বহু প্রাচীনকালে সমাজের শিক্ষা আচার ও অবস্থার একান্ত পার্থক্যের সময় কোন্ বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।

এমন বিপরীত বিকৃতি কেন ঘটিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্বাধীনতাতেই যে-সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বদ্ধ করা হইয়াছে।

অভ্যাস বা পরের নির্দেশবশত নহে, পরন্তু স্বাধীন বোধশক্তি যোগে ভক্তিবলে আমরা মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাহাই সার্থক ভক্তি।

কিন্তু আশঙ্কা এই যে, যদি বোধশক্তি তোমার না থাকে। অতএব নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া গেল, অমুক সম্প্রদায়কে এই প্রণালীতে ভক্তি করিতেই হইবে। না করিলে সাংসারিক ক্ষতি ও পুরুষানুক্রমে নরকবাস।

যে-ভক্তি স্বাধীন হৃদয়ের তাহাকে মৃত শাস্ত্রে রাখা হইল ; যে-ভক্তির প্রকৃত লাভ-ক্ষতি আমাদের অন্তঃকরণে আমাদের অন্তরাত্মায় তাহা সংসারের খাতায় ও চিত্রগুপ্তের কাল্পনিক খতিয়ানে লিখিত হইল।

গাছ মাটিতে রোপণ করিলে তাহাকে গোরুতে খাইতে পারে, তাহাকে পথিকে দলন করিতে পারে, এই ভয়ে তাহাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ রাখা হইল। সেখানে সে নিরাপদে রহিল, কিন্তু তাহাতে ফল ধরিল না ; সজীব গাছ মৃত কাষ্ঠ হইয়া গেল।

মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ কিন্তু যদি সে ভুল করে, অতএব তাহাকে বাঁধো ; আমি বুদ্ধিমান যে-ঘানিগাছ রোপণ করিলাম চোখে ঠুলি দিয়া সেইটেকে সে নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করিতে থাক্। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনোদিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না— আমি ঠিক করিয়া দিলাম কোন্ তিথিতে মুলা খাইলে তাহার নরক এবং চিঁড়া খাইলে তাহার অক্ষয় ফল। তোমার মুলা ছাড়িয়া চিঁড়া খাইয়া তাহার কী উপকার হইল তাহার কোনো প্রমাণ নাই, কিন্তু যাহা অপকার হইল ইতিহাসে তাহা উত্তরোত্তর পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

একটি সামান্য উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যাহারা রেশমকীটের চাষ করে তাহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, নিরামিষ আহার, নিয়ম পালন ও গঙ্গাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে সর্বদা পবিত্র না রাখিলে রেশমব্যবসায়ীর সাংসারিক অমঙ্গল ঘটে।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলিয়া উঠিবেন, পাছে মলিনতা দ্বারা রেশমকীটের মধ্যে সংক্রামক রোগবীজ প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট হয় এইজন্য বুদ্ধিমান-কর্তৃক এইরূপ প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু চাষাকে প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝাইয়া দিয়া তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের মতো অন্ধ করিয়া পরিণামে বিষময় ফল হয়। চাষা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় নিজে নিয়ম পালন করে কিন্তু কীটদের সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষা করে না— স্নানপানাদির দ্বারা নিজে পবিত্র থাকে কিন্তু কীটের ঘরে এক পাতায় তিন দিন চলিতেছে, মলিনতা সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে দৃষ্টি নাই।

শোয়া বসা চলা ফিরা কোনো ক্ষুদ্র বিষয়েই যাহাকে স্বাধীন বুদ্ধি চালনা ও নিজের শুভাশুভ বিচার করিতে হয় না তাহার কাছে অদ্য বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝাইতে গিয়া মাথায় করাঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

এইরূপে নীতি, ভক্তি ও বুদ্ধি— স্বাধীনতাতেই যাহার বল, যাহার জীবন, স্বাধীনতাতেই যাহার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত ও বিকশিত হয়, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্বাভাবিক আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সযত্নে মৃত্যু ও বিকৃতির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির এমনই নিদারুণ জড়ত্ব জন্মিয়াছে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানে জানি ভক্তির অযোগ্য তাহাকেও প্রথার অভ্যাসে ভক্তি করিতে সংকোচমাত্র অনুভব করি না।

১৩০৫

পূর্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকায় আর্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে-বিচিত্র আলোকময় উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্যরা অনার্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল, তখনো অনার্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার

করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল ; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে, এ কথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে-শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে-শুভ্রতা মলিন হইয়াছে ; এবং আর্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে ; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে, অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস। হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়— ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দু-মুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে, যে-বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর-কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সব চেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু নয় মুসলমান নয় ইংরেজ নয় আর-কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান-গাড়ি করিয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার ; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া ; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে— আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে ; নিজেকেই— ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক— জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজান্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে ; পৃথিবীতে আজ সে-দম্ভের মূল্য কী। রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্‌খান্ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে— ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে-খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে-সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সে-ই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারি দিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত ; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর-কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে— এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে ; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্‌ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে ; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ— আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না

মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী— সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরো যে-কেহ আসিয়াই এক হউক-না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহংকারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে-অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থসংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া

উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে-জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে ; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ্র অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন-কি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব। তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র ? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল। এই বিরোধের তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না ; এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে যুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল ; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে ; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে-মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বিরোধে দুর্বলভাবে দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস

পোশাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্‌বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই ; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন ; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল ; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে-শক্তি নব্যভারতের আদি-অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ-ভারতবাসীর যে-বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন ; তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্‌পীয়র বায়রনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিস্ট্রেট বলো, সদাগর বলো, পুলিসের কর্তা বলো, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না— সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে-সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ

আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে ; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়— তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন, রুটির পরিবর্তে পাথরেরই মতো। সে-পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত-কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন-না-একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেইজন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই, এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে ; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারি দিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে ; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ-সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে

ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই-সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল সর্বদাই তাহাদের চারি দিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারি দিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এ দেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো-আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে ; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এইজন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে তখন আমরা হতাশ হই ; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব ; সে-বিচারের ন্যায়ধর্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে-ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি-দুর্বলতাবশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না ; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে-ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেইজন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা-কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা-কিছু দুঃখ অপমান ; এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন-কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"— পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না ; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে ; যে-ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্‌ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিব না ; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্‌বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে ; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে-মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই

দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না ; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে ; তখন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

১৩১৫

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষার হেরফের

রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত

[আমাদের বঙ্গসাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই ; দর্শন বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই ; এবং সেই কারণে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় সেজন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাতত শিশুদের পাঠ্যপুস্তক দুই চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।

কেহ-বা মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে ; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারিপূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্‌গতি হয় না। অতএব কমিটি-নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না ; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টবিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎসম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও সাধারণত বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোলবিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।]

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাস দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে

দৃক্‌পাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে। বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরেজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরেজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থ এরূপ খাস ইংরেজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি. এ. এম. এ.-দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি. এ. এম. এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনই একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিকশক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশুপাঠ্য রীডারে haymaking সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরেজ ছেলের নিকট সে-ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie এবং Katieর মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরেজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক, কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্ট্রেন্স পাস, কেহ-বা এন্ট্রেন্স ফেল,

ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি ; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal— বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরেজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়। ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো— কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূতরকম হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত অল্পবয়সে আমরা যে ইংরেজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনোপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়— কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না। মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া-বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই ; আপিসে চাকরি জোটে। সচরাচর যে-অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে ;

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়ো, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী। যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত ; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে-দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, যেখানে নানা বর্ণ নানা রূপ নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয় ; বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে-ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে। সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না। সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে। সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না।

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে— জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

তাহারা কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্ট্রেন্স এবং ফার্স্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি. এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়— তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই— সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন, যখন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণস্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে। ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়।

মালমসলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনই হাতে আসে তখনই তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ এক দিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর-এক দিকে জমা হইতেছে, খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর-এক দিকে আপনার জারকরসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে— আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলাভাঙা, কেবলই ঠেঙা লাঠি, মুখস্থ এবং একজামিন— আমাদের এই 'মানব-জনম' আবাদের পক্ষে আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে, যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর

আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে-সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না, বয়োবিকাশেরও তেমনই একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্‌ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি-একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে-সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চকচকে বিলাতি কথা লইয়া ঝলমল করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নহে, যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই

সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই ; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিযা রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যেদিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সেদিকে সভ্যতা-নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে. আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না— এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশকাল যে-শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব।

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলাভাষা, বাংলাসাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর

বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল— বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখনোই ইংরেজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরেজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়। সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জানো। ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজস্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয় তাহার গভীর মর্ম কি কখনো বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি মনে করো, আমি যখন মিল স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাস করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরেজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কী হইতে পারে। আমি যখন ইংরেজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনই আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট

হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না, আমি ওকালতি করিব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব, ইংরেজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলাভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলাগ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, "বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়। এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।" প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি ; দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, "আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।"

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলই ; এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন :

পানীমে মীন পিয়াসি
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে, এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

১২৯৯

শিক্ষা-সংস্কার

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে 'স্পীকার' নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক-পত্রে আইরিশ শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে-যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়রলণ্ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়াছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়রলণ্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনামূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মত আর কি।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃস্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লমান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস-য়ুনিভরসিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত, তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষাদ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষার পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজরা আয়রলণ্ড আক্রমণ করে, তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়রলণ্ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল, সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাসারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল, তখন আয়রলণ্ডের স্বায়ত্তবিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়রলণ্ডবাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল, তাহাদের ভাষা নিকৃষ্টসমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল ইস্কুল' প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক— টুয়ামের আর্চবিশপ জন ম্যাকহেল— এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাকসনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল ইস্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে, এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে-সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয়, তখন আয়রলণ্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানাপ্রকার কঠিন শাস্তিদ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল ; আইরিশ ভূবৃত্তান্তও ভালো করিয়া শেখানো হইত না। ছেলেরা বিদেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত।

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

আইরিশ-ভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা (Intermediate Education)। আটাশ বৎসর ধরিয়া আয়রলন্ডে সেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরখ করা হইয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা সেখানে একেবারে দলিত হইয়া গেল। পরীক্ষাফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া করিয়া কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না, কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অতিশ্রমের দ্বারা অকালে তাহাদের মন জীর্ণ হইয়া যায় এবং বিদ্যার প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকে না।

এই বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশ জাতি কী প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা বিপ্লব বাধাইতে চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়। ব্যয়ের জন্যও কর্তৃপক্ষকে বেশি ভাবিতে হইবে না। শিক্ষাব্যয়ের জন্য আয়রলন্ডের যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহা অতি যৎসামান্য। ইংলন্ডে পুলিস এবং আদালতে যে খরচ হয় তাহার প্রত্যেক পাউন্ডের হারে বিদ্যাশিক্ষায় আট পাউন্ড খরচ হইয়া থাকে। আর আয়রলন্ডে যেখানে অপরাধের সংখ্যা তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে প্রত্যেক পুলিস ও আদালতের বরাদ্দের প্রত্যেক পাউন্ডের অনুপাতে বিদ্যাশিক্ষায় তেরো শিলিং চার পেন্স মাত্র ব্যয় ধরা হইয়াছে।

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশে তুলনা হইতেই পারে না। আয়রলন্ডের শিক্ষারীতি যে-ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু আয়রলন্ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না— আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে-ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি-পেটা এবং কুলুপ-খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো-চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া। প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে। আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্য চর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে। যাহা গ্রহণ করি, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। Key মুখস্থ করিয়া শেখা এবং লেখা, দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে-বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায়, সে-বয়সের লাভ পুরালাভ নহে। যে-কাঁচাবয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে, তখনই সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে-মাঠ শস্যশূন্য অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে।

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্‌ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের

ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায় ; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোনো-না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ক্রটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাকসন করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাকমিলান কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে-পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী, তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন। ইংলণ্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চা যথেষ্ট দেখা যায়— এমন-কি, আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজে জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলন্ডের যখন সুদিন ছিল, তখন ইংলন্ডও কোনো জাতিসম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না— ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে ; এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নইলে এ দেশের দুর্গতি কিসের। অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ

করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্‌ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব— অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব— ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার— বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমানকালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্‌স্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করি।

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government, but consciously avoding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo educational establishment which it controls ; schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Duronovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on this struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

১৩১৩

শিক্ষাসমস্যা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ এই পরিষদের ইস্কুল-বিভাগের একটি গঠন-পত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ— বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল

যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন "জাতীয়" ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়। "জাতীয়" শব্দটার কোনো সীমা নির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্টা জাতীয় এবং কোন্টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি এ কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই— কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের 'পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি, যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত নিজের অভাব বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে-ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে— আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল "পস্টারিটি" অর্থাৎ কোনো একটা অনির্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্‌গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাস-লাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়— এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না— তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য

করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে— সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে— সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে-বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে— তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল সেইপ্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি, বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে-ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়— তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই একগোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শ বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুশকিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতি মনে করে যে, লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি— দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই— বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেন্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেনসিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সে-ও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন ; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা ; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময় অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে— যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে ; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের

অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দ লাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্যপালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ— ইহা একটা বরাদ্দ ; শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়, নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎকথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর কিছুই নয়— অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের সৃষ্টি হয়, এবং নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়— উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্যভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে ; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইটকাঠপাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই, তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না— তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতিদিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠসংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড়-উদ্ভিদ-চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না ; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা. যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের লোকেরা এ-সকল কথা মিস্টিসিজম বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি, খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে ; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল নানাবর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই ; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও— তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে নয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেজন্য সে কি অপরাধী। তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে ? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা -বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই। শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল। সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।

হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো— মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না, তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক্, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে ; এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই— পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে-পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই ; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো-একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো-আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায় অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে- দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া

হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে স্লেট-পেনসিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশকিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল ; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না ; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ-স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর কিছু না হউক হাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি— মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা— এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা— বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা ; বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে— নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা ; এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নইলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে, পা-কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে, আমাদের পিতা-পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে— সে-মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে। প্রথমেই জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে, তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয় ; আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায় ; একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে— ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্‌বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যাবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন— এইখানে ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন— সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য গুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন— যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন— তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত ; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন্‌স্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না।

কিন্তু এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো-একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো-জোর একটা প্রাইভেট টিউটর রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি হয়। কামার কুমার তাঁতী প্রভৃতি শিল্পীগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে, তাহার কারণ তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়, তখন এ কথা কেহ বলে না যে, বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় ; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরো যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকে না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি, তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং স্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইঁহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা-কিছু লইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল, গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে, ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে

বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই তো বদ্ধডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে হাত-পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই ; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই ; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে-হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না, ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জগতে এতবড়ো বন্দী এতবড়ো পঙ্গু আর কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে, এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী। যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়— কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধুলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব— সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়— অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে— Mamma Mamma, look, lots of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে। বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি -বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে।

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন, এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না— কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে।

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন,

তাঁহারা সন্তানদের যে কোনোপ্রকার অভ্যাসদোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন ; তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারও অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানাপ্রকার রোষ দ্বেষ অন্যায় পক্ষপাত বিবাদ বিরোধ নিন্দা গ্লানি কুঅভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারই মধ্যে আর কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ— খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য, আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চার দিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে— বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না, এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়, জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি— সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে— কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না— বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেকদিন হইতেই সে-আদর্শহীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানি সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি— তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না— কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্য দেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই, অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে— এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি ; এ ভুল যে সভাস্থলে কোনো একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পার না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা 'জাতীয়' শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরো একটা ছাঁচেঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতির ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে-শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে এইরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না ; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয়, সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে, শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না ; বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি ; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর ; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত ; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক ; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

১৩১৩

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর কোনো প্রয়োজন আছে।

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেই প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে, অভাব আছে এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিক্সের তালিকাযোগে লাভ, সুবিধা, প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে, এ কথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না-বোঝা দুই-ই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি, দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেন্টের ; অতএব আমাদের অভাব কী আছে না আছে তাহা বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর

হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন-কি, অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে পথ সেইখানেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না করা সে অন্যের হাত— তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ, আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত-বড়ো অনুকূল, তাহা নহে কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত-বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয়, বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয়বিদ্যাব্যবস্থা আকার গ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন— আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘকালেও হইবার নহে— পূর্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পক্কশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে, কত অল্পসময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেকদিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত লাভ আছে, তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে, সে-ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই। আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে, আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো— তোমরা অনুভব করো, বাঙালিজাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন ; তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ।

তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজন ইহার গৌরব নহে ; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা— ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়— যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে— আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে— ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে, ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে। যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না— সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সেই ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীবসত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো— সমস্ত বাঙালিজাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো— ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো ; ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো ; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না— ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না— কেবল তোমাদের স্বদেশকে তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণ রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে-দেশে জলাশয় নাই সে-দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে— কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেনশন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া বহিয়া উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি,

বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে-শক্তি আছে সে-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় ; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালিজাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না। এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ। উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না। তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম। ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না ; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে-জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট ও চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না, কারণ ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে ; সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি ; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে-দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয়বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণসম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনো অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয়বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে, পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না— তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব, তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না, তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথও দুর্গম ; আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে, বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে-অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব, তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন ; আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি ; তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্বহ দুঃখ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয়বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে-ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা ; যে-পোলিটিকাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে ; সেই পড়া-বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্‌গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব— ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই

করিলাম কোথায়। আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে-ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে-ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই। আমরা কেবল :

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে— জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল— এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না— সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথস্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে ; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই ; বিদ্যারই কী আর বিষয়েরই কী, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে ; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে— নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে ; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ"— হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি ; "ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ"— হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয়বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরুবিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি, আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব— আমরা যে ইংরেজি লেকচারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত জাতীয়বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে— তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়, দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে, তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে :

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে :

ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা যাহা মহান তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে-মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন সে-মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন :

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন— স্বাহা।

সহ বীর্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য প্রকাশ করি।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু।

তেজস্বিভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

ভাদ্র ১৩১৩

আবরণ

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যেদিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম, সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল, এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল। এখন খালিপায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয় ; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর— অবশেষে মোজা, চটি, গোড়তলা জুতা, বুট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে খুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীনশক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলাকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়জুতাকে একটা অন্ধসংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল ; তাহার পরে, বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্যন্ত কাপড়জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জাবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাতফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে

অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচবোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহসম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিতলোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে-বয়স পর্যন্ত শরীরসম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়, সে-বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না— এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ এক দিন দেখিব, চৌকিটেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত, আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চাহে না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই; এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপমায়ে একজিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর দুঃখ অভিভাবকের। অকাললজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে শুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল— উলঙ্গতার একটা সুবিধা তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমান-প্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি-জল-বাতাস-আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনোকালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত— অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতিসাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে-সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে, তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবীমায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে। সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে-একটা স্বাভাবিক টান আছে— সব জায়গা হইতেই তার যে-একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়চোপড়

দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাতস্থাপন করা যায়, তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত, বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দরজির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোথা হইতে তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয়, শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে-কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন ; বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন, এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখ-সম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন, অতি অকিঞ্চিৎকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল। মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না। আমার ভালো লাগে, অতএব যেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারি দিকে কেবলই দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে।

যাই হউক, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার, তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্মল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যস্ত না থাকি তবে বিলাতের লোকের মতো শরীর সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য, ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই-সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই ; কোনোকালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা জিনিসটা যে নৈমিত্তিক— ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি-র বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্যই এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে

আমাদের কর্তা হইয়া না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে, এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালি-গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে ; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য, সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড়-জুতা-মোজা যেমন, আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসিটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র, তাহা আর আমাদের মনে হয় না ; আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে ; চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত— ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র ; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে-গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে-যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে— তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদ-শক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে-জিনিসটা আছে, সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি, জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বইপড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে, এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবুনামক জীব চাকর-বাকর জিনিসপত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বইপড়া বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারায় লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়, সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বইপড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে, আমাদের মনেরও তেমনই ঘটিয়াছে— সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না ; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার ; কিন্তু সত্যকার মানুষ যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত— এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই, তাহারা 'সভামধ্যে ন শোভন্তে'। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার বাহিরে 'ন শোভন্তে' ; তাঁহারা বইপড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে ; জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে ; নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য, কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে-পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানলাগুলাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্‌ভাবিত হইয়া দুই-চারিদিন ফ্যাশানের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে, তাহাই কেবল পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে মুখে সহস্রলোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে ; অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে ; এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে ; তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ; তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায় ; সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা

করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, প্যাট্রিয়টিজ্‌ম-নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে ; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়— সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজে সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল ; তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে ; কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই ; যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে ; সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে ; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে ; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে ; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না ; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে— কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য-মতকেও অবিচলিত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত, তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত, তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত ; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বলিয়া মনে করে ; সেজন্য সে বেতন পায় ; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে ; এই-সকল কথার একটুখানি এদিক-ওদিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদোগন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে, শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে ; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা, তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটি-দুই-তিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই ; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং

হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে ; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি ; যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই— তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি, যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি— যেন তাহা বিদেশী ইস্কুলমাস্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে, তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায়, তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে, তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্ এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর-একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন ; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমাত্র শিক্ষানামের যোগ্য, এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয়, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচার মাত্র উপস্থিত হয় না তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলামেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক। জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা, তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে, সন্দেহ নাই ; আমাদের সহিত সর্বপ্রকার-সামাজিক-যোগবিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর-একটা কারণ ; কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয় ; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে-জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায় ; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে ; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিতলোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়েন্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া

ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র এবং কতকগুলা পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল-জজ-কেরানীর অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল তখনো তপোবনে পুঁথিব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে— তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করিয়া লইতে হইবে ; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃস্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে', এই-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি— বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্বিকার ; তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে— তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানাইতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক ; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না— বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে ; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন, তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন— নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়— ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ; শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয় ; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা, তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে, সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন -বশত চিরকালের মতো হারায়, তবু ইহা বিদ্যা— কারণ ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এত ক'টা অঙ্ক, এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করিতে পারে, অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা ; আর যাহা শিক্ষানাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পারো, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন ; সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে

ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কি বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায় তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

শব্দতত্ত্ব

শব্দতত্ত্ব

বাংলা উচ্চারণ

ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙালির ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরেজি অক্ষরের নাম একরকম, তাহার কাজ আর-একরকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে u-কে মুখে বলিব ইউ, কিন্তু up-এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোনো পুরুষে ইউ নন। ও পিসি এ দিকে এসো, এই শব্দগুলো ইংরেজিতে লিখিতে হইলে উচিতমত লেখা উচিত— O pc adk so। পিসি যদি বলেন এসেচি, তবে লেখো— She ; আর পিসি যদি বলেন এইচি, তবে আরো সংক্ষেপ—he। কিন্তু কোনো ইংরেজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোনো বালাই নাই ; তাহাদের কথার নড়চড় হয় না।

এই তো গেল প্রথম নম্বর। তার পরে আবার এক অক্ষরের পাঁচ রকম উচ্চারণ। অনেক কষ্টে যখন বি এ=বে, সি এ=কে মুখস্থ হইয়াছে, তখন শুনা গেল, বি এ বি=ব্যাব্, সি এ বি=ক্যাব্। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি বি এ আর=বার্, সি এ. আর=কার্। তাও যদি বা আয়ত্ত হইল তখন শুনি, বি এ ডব্‌ল্-এল্=বল্, সি এ ডব্‌ল্-এল্=কল্। এই অকূল বানান-পাথারের মধ্যে গুরুমহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন, তাঁহার কম্পাসই বা কোথায়, তাঁহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়।

আবার এক-এক জায়গায় অক্ষর আছে অথচ তাহার উচ্চারণ নাই ; একটা কেন, এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে, বাঙালির ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর-কোনো সাধু উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। মাস্টারমশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি। পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজস্বরূপে থাকে মাত্র। বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙিন ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়— গবর্নমেন্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।

ইংরেজের কামান আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কী কম। ইহারা আমাদের ছেলেদের পাকযন্ত্রের মধ্যে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। ইংরেজের প্রজা বশীভূত করিবার এমন উপায় অতি অল্পই আছে। বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় ; আমাদের বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি, উদরের পরিপাকশক্তি বিদায়গ্রহণ করে ; তার পরে ম্যালেরিয়াকম্পিত হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরেজ-রাজ্যের সর্বত্র আছে (রক্ষা হউক আর না-ই হউক), কিন্তু ইংরেজের ফাস্টবুক-এ নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত— কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরেজি ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক, সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সংগত হয় ;

ইহাতে আজকালকার বাঙালির ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে :

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
ফাস্টবুক এল দেশে—
বানান-ভুলে মাথা খেয়েছে
একজামিন দেবো কিসে।

পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এ ছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ৯ঙঞ-গুলো কেবল সঙ সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্-না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংলন্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গি আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ্ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের একার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দে প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শ্‌শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি— ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি— গর্ধোব। লিখি 'স', পড়ি— সোজ্ঝো। এমন কত লিখিব।

আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণে কোনো তফাত নাই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয় ; কিন্তু আমাদের যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো কষ্ট শব্দ এবং ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ, দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। 'আসতে হবে' এবং 'আশ্চর্য' এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হইয়াছে। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজি z-এর মতো হয়, যেমন লুচি ভাজতে হবে, এ স্থলে ভাজতে শব্দের জ ইংরেজি z-এর মতো।

সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তঃস্থ ব-এর আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান শব্দে অন্তঃস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

আমরা লিখি 'তাঁহারা' কিন্তু উচ্চারণ করি— তাহাঁরা অথবা তাঁহাঁরা। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খান-দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই-সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকালবেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে

চাহিয়া দেখি— গোটাদশেক হলদে রঙ-করা মস্ত-খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সর মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজপত্র কোথায়। কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড়চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনই একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে, তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

কিছু কিছু মনে আছে, তাহা লিখিতেছি— অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন :

অতি কলু ঘড়ি কল্য মরু দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব-ও বলিলেও হয়।

দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থানবিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়।

১ম নিয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে ; যথা, অগ্নি অগ্রিম কপি তরু অঙ্গুলি অধুনা হনু ইত্যাদি।

২য়। যফলা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ যফলা ই এবং অ-এর যোগমাত্র। উদাহরণ; গণ্য দন্ত্য লভ্য ইত্যাদি। 'দন্ত' এবং 'দন্ত্য ন' এই দুই শব্দের উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া দেখো।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায় ; যথা, অক্ষর কক্ষ লক্ষ পক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করিয়া উচ্চারণ করেন, এমন-কি, ক্ষ-র পূর্বেও ঈষৎ ইকারের আভাস দেন। কলিকাতা অঞ্চলে 'লক্ষ টাকা' বলে, তাঁহারা বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা'।

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায় ; যেমন, হ'লে ক'রলে প'ল ম'ল ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি কোনো স্থলে অ-এর পরবর্তী ই অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে, তথাপিও পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও হইবে। হইলে-র অপভ্রংশ হ'লে, করিলে-র অপভ্রংশ ক'র্‌লে, পড়িল—→প'ল, মরিল— ম'ল। করিয়া-র অপভ্রংশ ক'রে, এইজন্য ক-এ ওকার যোগ হয়, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া 'করে' অবিকৃত থাকে। কারণ করে শব্দের মধ্যে ই নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয় ; যথা, কর্তৃক ভর্তৃ মসৃণ যকৃত বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষায় ঋফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ঠ। এবারে যে-নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর-বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধন্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার 'ও' হইয়া যায় ; যথা, বন ধন জন মন মণ পণ ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন 'ঘনো দুধ', কেহ বলেন 'ঘোনো দুধ'। কেবল গণ এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশি অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না ; যেমন, কনক গণক সন্‌সন্ কন্‌কন্। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে, সেখানেও এ নিয়ম খাটে না ; যেমন, কহেন শব্দের অপভ্রংশ ক'ন, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ হ'ন ইত্যাদি। যাহা হউক ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ 'ও' হইয়াছে। অপভ্রংশে

উকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে ; যথা, হউন— হ'ন, রহুন— র'ন, কহুন— ক'ন ইত্যাদি।

৮ম। রফলা-বিশিষ্ট বর্ণের অ লিপ্ত থাকিলে তাহা 'ও' হইয়া যায় ; যথা, শ্রবণ ভ্রম ভ্রমণ বজ্র গ্রহ ত্রস্ত প্রমাণ প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু য় পরে থাকিলে অ-এর বিকার হয় না ; যথা, ক্রয় ত্রয় শ্রয়।

দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। এমন-কি, ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ নিয়ম খাটে। এমন-কি, যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্বেও অ-এর বিকার হয়। ইকারের পক্ষে যেমন যফলা, উকারের পক্ষে তেমনই বফলা— উ-এ অ-এ মিলিয়া বফলা হয় ; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে বফলার পূর্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই-তিনটি মনে আসিতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে ; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর।

এইখানে গুটিকতক ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই উ যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না ; যথা, অকিঞ্চন অকুতোভয় অখ্যাতি অনৃত অক্ষয়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানে না, অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্তী অ 'ও' হইয়া যায় ; মন্দ মন্ত্র মন্ত্রণা নখ মঙ্গল ব্রহ্ম।

আমি এই প্রবন্ধে কেবল আদ্যক্ষরবর্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম লিখিলাম। মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই। মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। বল শব্দে ব-এর সহিত সংযুক্ত অকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কেবল শব্দের ব-এ হ্রস্ব ওকার লাগে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়মও সময়াভাবে বাহির করিতে পারি নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোনো অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমত অন্বেষণ করিয়া এই-সকল নিয়ম নির্ধারণ করিতে পারেন, তবে আমাদের বাংলা ব্যাকরণের একটি অভাব দূর হইয়া যায়।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

আশ্বিন ১২৯২

স্বরবর্ণ অ

বাংলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহারই অনুবৃত্তিক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎপরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জনা করিতে হইবে।

বাংলায় প্রধানত ই এবং উ এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণবিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে, গত শব্দের গ-এ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-এ ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণা এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখো।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্তী বর্ণে যফলা থাকিলে পূর্ববর্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলত যফলা— ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।[১]

ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্তা এবং কর্তৃ, ভর্তা এবং ভর্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনাস্থলে আনা যায়। কিন্তু বাংলায় ঋফলা উচ্চারণে ই-কার যোগ করা হয়, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না।[২]

অপভ্রংশে পরবর্তী ই অথবা উ লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে ; যেমন হইল শব্দের অপভ্রংশে হ'ল, হউন শব্দের অপভ্রংশে হ'ন [কিন্তু, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হন' উচ্চারণ হয়]। থলিয়া শব্দের অপভ্রংশে থলে, টকুয়া শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অম্ল)।

ক্ষ-র পূর্বেও অ ও হইয়া যায় ; যেমন, কক্ষ পক্ষ লক্ষ। ক্ষ-শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছি ক্ষিয়। এখনো পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষ-র যফলা যোগ করেন ; এবং তাঁহাদের দেশের যফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন ; যেমন, তাঁহারা লক্ষটাকা-কে বলেন— লৈক্ষ্য টাকা।

যাহা হউক, মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে, পূর্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ, সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে ; যেমন, অ এবং উ-র মধ্যপথে— ও, অ এবং ই-র সেতুস্বরূপ— এ ; যখন এক পক্ষে ই অথবা এ এবং অপর পক্ষে আ, তখন অ্যা তাহাদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন করে। বোধ হয় ভালো করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বাঙালিরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

আষাঢ় ১২৯৯

স্বরবর্ণ এ

বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর-একটি অ্যা। এক এবং একুশ শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় ; কেবল এ সম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।— পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ববর্তী একারের কখনোই বিকৃতি হয় না। জেঠা এবং জেঠী, বেটা এবং বেটী, একা এবং একটু— তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

১ যফলা যেমন ই এবং অ-র সংযোগ, বফলা তেমনই উ এবং অ-র সংযোগ, অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্বনিয়ম খাটে। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে-দুয়েকটি মনে পড়িতেছে তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে ; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর। কজ্জ্বল সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং বফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

২ মহারাষ্ট্রীয়েরা ঋ উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতি-কে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে ; অনেক স্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে ; যথা, তেলা (তৈলাক্ত) এবং বেলা (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ববর্তী একারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোনো পরিবর্তন হয় না ; যথা, কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য ন-এর পূর্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় ; যথা, ফেন (ভাতের) সেন (পদবী) কেন যেন হেন। মূর্ধন্য ণ-এর পূর্বেও সম্ভবত এই নিয়ম খাটে, কিন্তু প্রচলিত বাংলায় তাহার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ দিনক্ষণ-কে দিনখ্যান বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি, ন অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে, অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে— বন মন ধন জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট মঠ জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্তী চ অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে— প্যাঁচ। কিন্তু সেটা যে পেঁচ-শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে, এমন অনুমান করিবার কোনো কারণ নাই। আর-একটা বলা যায়— 'ট্যাচ'। 'ট্যাচ' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, চ-এর পূর্বে বিশুদ্ধ এ-কার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এখানে বলা আবশ্যক, আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্বনিয়মের দুটো-একটা ব্যতিক্রম আছে। কোনো পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন তো সুখী হইব। এ দিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে 'এ' স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর-একটা ব্যতিক্রম— লেজ (লাঙ্গুল)। তেজ শব্দের একার বিশুদ্ধ, লেজ শব্দের একার বিকৃত।

বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দদ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে :

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ; যথা, বড়ো-বড়ো ছোটো-ছোটো বাঁকা-বাঁকা নেচে-নেচে গেয়ে-গেয়ে হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাঁটপ্যাঁট টাঁটাঁ খিট-খিট ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ গোঁগোঁ চীঁচীঁ চ্যাঁচ্যাঁ টুকটুক পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংস্রব পাওয়া যায়, যথা ঘেউঘেউ। এইরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি ; যথা, ফ্যাঁসফ্যাঁস খ্যাঁকখ্যাঁক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্তে একার সংযুক্ত হয় ; যথা, স্যাঁৎসেঁতে ম্যাড়মেড়ে। তাহার কারণ পূর্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁৎস্যাতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্বে 'এ' উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখো, খেলা এবং গেলা (গলাধঃকরণ), ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম— সংস্কৃত মূলশব্দের ইকারের অপভ্রংশে বাংলার যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা — এইজন্য শেষোক্ত এ

অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল ; যেমন, মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচা) সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা) চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, চ অক্ষরের পূর্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এইজন্যই চ-এর পূর্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে— যে-সকল অসমাপিকা ক্রিয়া আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকারূপে যে-সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে। যথা :

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে	বিশেষ্যরূপে
কিনিয়া	কেনা
বেচিয়া	ব্যাচা
মিলিয়া	মেলা
ঠেলিয়া	ঠ্যালা
লিখিয়া	লেখা
দেখিয়া	দ্যাখা
হেলিয়া	হ্যালা
গিলিয়া	গেলা

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইবে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এইজন্য আমাদের অঞ্চলে আ কারের পূর্ববর্তী একার প্রায়ই অ্যা নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

কার্তিক ১২৯৯

টা টো টে

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির এরূপ তিন প্রকার ভেদ কেন হয়, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাংলা শব্দে যে-সকল উচ্চারণবৈষম্য আছে, মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায়, এ কথা আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাংলায় আদ্যক্ষরবর্তী অ স্বরবর্ণ কখনো কখনো বিকৃত হইয়া 'ও' হইয়া যায় ; যেমন, কলু (কোলু) কলি (কোলি) ইত্যাদি ; স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায় ; যেমন, খেলা (খ্যালা) দেখা (দ্যাখা) ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন গুটিকতক নিয়মের অনুবর্তী।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ই এবং উ স্বরবর্ণ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণবিকারের মূলীভূত কারণ ; উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। 'সে' অথবা 'এ' শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে ; যেমন, সেটা এটা। কিন্তু 'সেই' অথবা 'এই' শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে ; যেমন, এইটে সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর টা টে হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই

নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সংগত হয় না। ইকারের পরবর্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্তব্য।

হইয়া— হয়ে
লইয়া— লয়ে
পিঠা— পিঠে
চিঁড়া— চিঁড়ে
শিকা— শিকে
বিলাত— বিলেত

হিসাব— হিসেব
মাহিনা— মাইনে
ভিক্ষা— ভিক্ষে
শিক্ষা— শিক্ষে
নিন্দা— নিন্দে
বিনা— বিনে

এমন-কি, যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায়, সেখানেও এ নিয়ম খাটে। যেমন :

করিয়া— ক'রে
মরিচা— মর্চে
সরিষা— সর্ষে

আ এবং ই মিলিত হইয়া যুক্তস্বর 'ঐ' হয়। এজন্য 'ঐ' স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায় ; যেমন :

কৈলাস— কৈলেস
তৈয়ার— তোয়ের

কেবল ইহাই নহে। যফলার সহিত সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, যফলা ই এবং অ-এর যুক্তস্বর ; যথা :

অভ্যাস— অভ্যেস
কন্যা— কন্যে
বন্যা— বন্যে
হত্যা— হত্যে

আমরা অ স্বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষ-র পূর্ববর্তী অকার 'ও' হইয়া যায় ; যেমন, লক্ষ (লোক্ষ) পক্ষ (পোক্ষ) ইত্যাদি। যে-কারণবশত ক্ষ-র পূর্ববর্তী অ ওকারে পরিণত হয়, সেই কারণেই ক্ষ-সংযুক্ত আকার এ হইয়া যায় ; যথা, রক্ষা— রক্ষে। বাংলায় ক্ষা-অন্ত শব্দের উদাহরণ অধিক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

যফলা এবং ক্ষ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। যফলা ও ক্ষ-সংযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আদ্যক্ষরে এ নিয়ম খাটে না ; যেমন, ত্যাগ ন্যায় ক্ষার ক্ষালন ইত্যাদি।

বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে ছিল, করিলা খাইলা করিতা খাইতা করিবা খাইবা ; এখন হইয়াছে, করিলে খাইলে করিতে খাইতে করিবে খাইবে। পূর্ববর্তী ইকারের প্রভাবেই যে আ স্বরবর্ণের ক্রমশ এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্বে ই থাকিলে যেমন পরবর্তী আ 'এ' হইয়া যায় তেমনই পূর্বে উ থাকিলে পরবর্তী আ 'ও' হইয়া যায়, এইরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে ; যথা :

ফুটা— ফুটো
মুঠা— মুঠো
কুলা— কুলো
চুলা— চুলো
কুয়া— কুয়ো
চুমা— চুমো

ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ ঔ— অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর ; যথা :

নৌকা— নৌকো

কৌটা— কৌটো

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার দুই-একটা উচ্চারণবিকার এমনই দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হউক তাহার অন্যথা দেখা যায় না ; যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ববর্তী অ-কে আমরা সর্বত্রই 'ও' উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে-সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠা-কে মুঠো বলি, তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি ; চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ভুল করা মানবধর্ম, বিশেষত বাঙালির পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ভুল করা। সেই প্রবাদের বাকি অংশে বলে, মার্জনা করা দেবধর্ম। কিন্তু বাঙালির ইংরেজি-ভুলে ইংরেজরা সাধারণত দেবত্ব প্রকাশ করেন না।

আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে-বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজিভাষার ঠিক মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এ দেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। ইংরেজগণ তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন।

সেইজন্য আমাদেরও বড়ো ইচ্ছা করে, যে-সকল ইংরেজ এ দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া, দেশীভাষা শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সুযোগ পাইয়াও সে-ভাষা সম্বন্ধে ভুল করেন তাঁহাদের প্রতি হাস্যরস বর্ষণ করিয়া পালটা জবাবে গায়ের ঝাল মিটাই।

সন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে দুই-একটা বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বাবু-ইংরেজির আদর্শ প্রায় অশিক্ষিত দরিদ্র উমেদারদিগের দরখাস্ত হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সহিত বাংলার ভূতপূর্ব সিবিলিয়ান জন্ বীম্‌স্ সাহেবের তুলনা হয় না। বীম্‌স্ সাহেব চেষ্টা করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন ; বাংলাদেশেই তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়বয়স যাপন করিয়াছেন ; বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালি সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালি মোক্তারের আবেদন শুনিয়াছেন এবং বাঙালি সাহিত্যেরও রীতিমত চর্চা করিয়াছেন এরূপ শুনা যায়।

কেবল তাহাই নয়, বীম্‌স্ সাহেব বাংলাভাষার এক ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ রচনা স্পর্ধার বিষয় ; পেটের দায়ে দরখাস্ত রচনার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব সেই ব্যাকরণে যদি পদে পদে এমন-সকল ভুল দেখা যায়, যাহা বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত অসংগত ঠেকে, তবে সেই সাহেবি অজ্ঞাতকে পরিহাস করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত

ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলাভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্‌কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসংকুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দুটোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।

বীম্‌স্‌ সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে-সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। অতিপরিচয়-বশত ভাষার যে-সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর এবং দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়।

এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজি মুদ্রিত সাহিত্যে অনেক স্থলে বানানের সহিত উচ্চারণের সংগতি নাই। ইংরেজ লেখে একরূপ, পড়ে অন্যরূপ। বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।

ব্যয় শব্দের ব্য, অব্যয় শব্দের ব্য এবং ব্যতীত শব্দের ব্য উচ্চারণে প্রভেদ আছে ; লেখা এবং খেলা শব্দের এ কারের উচ্চারণ ভিন্নরূপ। সস্তা শব্দের দুই দন্ত্য স-এর উচ্চারণ এক নহে। শব্দ শব্দের শ-অক্ষরবর্তী অকার এবং দ-অক্ষরবর্তী অকারে প্রভেদ আছে। এমন বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এই উচ্চারণবিকারগুলি অনেক স্থলেই নিয়মবদ্ধ, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

বীম্‌স্‌ বলিতেছেন, বাংলা স্বরবর্ণ অ কোথাও বা ইংরেজি not rock প্রভৃতি শব্দের স্বরের মতো, কোথাও বা bone শব্দের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

স্থানভেদে অ স্বরের এইরূপ বিভিন্নতা বীম্‌স্‌ সাহেবের স্বদেশীয়গণ ধরিতে না পারিয়া বাংলা উচ্চারণকে অদ্ভুত করিয়া তোলেন। বাঙালি গরু-কে গোরু উচ্চারণ করেন, ইংরেজ তাহাকে যথাপঠিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোনো বাংলা ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম থাকিত যে, ইকার, উকার, ক্ষ এবং ণ ও ন-র পূর্বে প্রায় সর্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।

কিন্তু এই-সকল নিয়মের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতা আছে। আমরা বন মন ক্ষণ প্রভৃতি শব্দকে বোন মোন খোন রূপে উচ্চারণ করি, কিন্তু তিন অক্ষরের শব্দের বেলায় তাহার বিপর্যয় দেখা যায় ; তনয় জনম ক্ষণেক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

আশা করি, বাংলার এই-সকল উচ্চারণের বৈচিত্র্য ও তাহার নিয়মনির্ণয়কে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তুচ্ছজ্ঞান করিবেন না।

বীম্‌স্‌ সাহেব লিখিতেছেন, সিলেব্‌লের (syllable) শেষে অ স্বরের লোপ হইয়া হসন্ত হয়। কলসী ও ঘটকী শব্দ তিনি তাহার উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিত এবং কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে। বীম্‌সের ব্যাকরণে কোথাও বা লিখিত বাংলার কোথাও বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সাধুভাষায় লিখিত সাহিত্যে আমরা ঘটকী শব্দের ট হইতে অকার লোপ করি না। অপর পক্ষে বীম্‌স্‌ সাহেব যে-নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কী কথিত কী লিখিত কোনো বাংলাতেই সর্বত্র খাটে না ; জনরব বনবাস বলবান পরচর্চা প্রভৃতি শব্দ তাহার উদাহরণ। এ স্থলে প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এ সংযুক্ত অকারের লোপ হয় নাই ; অথচ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, জন বন বল এবং পর শব্দের শেষ অকার লুপ্ত হইয়া

থাকে। কলস দুই সিলেব্‌লে গঠিত, কল্+অস্, কিন্তু প্রথম সিলেব্‌লের পরবর্তী অকারের লোপ হয় নাই। ঘটক শব্দের দুই সিলেব্‌ল্ ঘট্+অক্, এখানেও অকার উচ্চারিত হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, বীম্‌স্ সাহেবের নিয়মকে আর-একটু সংকীর্ণ করিয়া আনিলেই তাহার সার্থকতা পাওয়া যাইতে পারে।

আঁচল এবং আঁচ্‌লা, আপন এবং আপ্‌নি, চামচ এবং চাম্‌চে, আঁচড় এবং আঁচ্‌ড়ানো, ঢোলক এবং ঢল্‌কো, পরশ এবং পর্‌শু, দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী সিলেব্‌ল্ স্বরান্ত হইলে পূর্ব সিলেব্‌লের অকার লোপ পায়, পরন্তু হসন্তের পূর্ববর্তী অকার কিছুতেই লোপ পায় না।

কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত বনবাস, জনরব বলবান প্রভৃতি শব্দে এ নিয়ম খাটে নাই। তাহাতে অকার ও আকারের পূর্ববর্তী অ লোপ পায় নাই।

অথচ, পর্‌কলা আল্‌পনা অব্‌সর (লিখিত ভাষায় নহে) প্রভৃতি প্রচলিত কথায় বীম্‌সের নিয়ম খাটে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠ্‌শালা' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভুষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলাভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।

বীম্‌স্ লিখিয়াছেন, বিশেষণ শব্দে সিলেব্‌লের অন্তর্বর্তী অকারের লোপ হয় না ; যথা, ভাল ছোট বড়।

রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন :

> গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট ; এতদ্‌ভিন্ন তাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্ পট্ রাম্ রামদাস্ উত্তম্ সুন্দর্ ইত্যাদি।

রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, তথাপি খাঁটি বাংলা শব্দেও ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা, নরম গরম।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে।

প্রথমেই মনে হয়, বিশেষণ শব্দ বিশেষরূপে অকারান্ত উচ্চারিত হইবে, এ নিয়মের কোনো সার্থকতা নাই। অতএব, ছোট বড় ভাল প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ যে সাধারণ বাংলা শব্দের ন্যায় হসন্ত হয় নাই, তাহার কারণটা ঐ শব্দগুলির মূল সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যাইবে। 'ভালো' শব্দ ভদ্র শব্দজ, 'বড়ো' বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, 'ছোটো' ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত— যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে হসন্ত বর্ণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। নৃত্য-র অপভ্রংশ নাচ, পঙ্ক— পাঁক, অঙ্ক— আঁক, রঙ্গ— রাং, ভট্ট— ভাট, হস্ত— হাত, পঞ্চ— পাঁচ ইত্যাদি।

অতএব নিশ্চয়ই বিশেষণের কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব আরো চোখে পড়ে যখন দেখা যায়, বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ, যাহা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা আকারান্ত হইয়াছে।

যথা : সহজ— সোজা, মহৎ— মোটা, রুগ্ন— রোগা, ভগ্ন— ভাঙা, শ্বেত— শাদা, অভিষিক্ত— ভিজা, খঞ্জ— খোঁড়া, কাণ— কাণা, লম্ব— লম্বা, সুগন্ধ— সোঁধা, বক্র— বাঁকা, তিক্ত— তিতা, মিষ্ট— মিঠা, নগ্ন— নাগা, তির্যক্— টেঁড়া, কঠিন— কড়া।

দ্রষ্টব্য এই যে, 'কর্ণ' হইতে বিশেষ্য শব্দ কান হইয়াছে, অথচ কান শব্দ হইতে বিশেষণ শব্দ কানা হইল। বিশেষ্য শব্দ হইল ফাঁক, বিশেষণ হইল ফাঁকা ; বাঁক শব্দ বিশেষ্য, বাঁকা শব্দ বিশেষণ।

সংস্কৃত ভাষায় ক্ত প্রত্যয়যোগে যে-সকল বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, বাংলায় তাহা প্রায়ই আকারান্ত বিশেষণ পদে পরিণত হয় ; ছিন্নবস্ত্র বাংলায়— ছেঁড়া বস্ত্র, ধূলিলিপ্ত শব্দ বাংলায়— ধুলোলেপা, কর্ণকর্তিত— কানকাটা ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বন্ধ হইতে বাঁধ, কিন্তু বিশেষণ শব্দ মন্দ হইতে হইল— মাদা। এক শব্দকে বিশেষরূপে বিশেষণে পরিণত করিলে 'একা' হয়।

এইরূপ বাংলা দুই-অক্ষরের বিশেষণ অধিকাংশই আকারান্ত। যেগুলি অকারান্ত হিন্দিতে সেগুলিও আকারান্ত ; যথা, ছোটা বড়া ভালা।

ইহার একটা কারণ আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। স্বর্গগত উমেশচন্দ্র বটব্যালের রচনা হইতে দীনেশবাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে নিম্নলিখিত ছত্রকয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ক-এর ব্যবহার কিছু বেশি। দূত স্থানে দূতক, হট্ট স্থানে হট্টিকা, বাট স্থানে বাটক, লিখিত স্থানে লিখিতক, এরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়।... সমুদায় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন :

এই ক (যথা, বৃক্ষক চারুদত্তক পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। গাথা ভাষায় এই ক-এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক ; যথা ললিতবিস্তর, একবিংশাধ্যায়ে :

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো
বসবর্ত্তী সুলক্ষণবিচিত্রিতকো। ১ ॥
বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেব নরাণবসম্ভতিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্। ২ ॥

দীনেশবাবু প্রাচীন বাংলায় এই ক প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

এই ক-এর অপভ্রংশে আকার হয় ; যেমন ঘোটক হইতে ঘোড়া, ক্ষুদ্রক হইতে ছোঁড়া, তিলক হইতে টিকা, মধুক হইতে মহুয়া, নাবিক হইতে নাইয়া, মস্তক হইতে মাথা, পিষ্টক হইতে পিঠা, শীষক হইতে শীষা, একক হইতে একা, চতুষ্ক হইতে চৌকা, ফলক হইতে ফলা, হীরক হইতে হীরা। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, লোহক হইতে লোহা, স্বর্ণক হইতে সোনা, কাংস্যক হইতে কাঁসা, তাম্রক হইতে তামা হইয়াছে।

আমরা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচকভাবে রাম-কে রামা, শ্যাম-কে শ্যামা, মধু-কে মোধো (অর্থাৎ মধুয়া), হরি-কে হরে (অর্থাৎ হরিয়া) বলিয়া থাকি ; তাহারও উৎপত্তি এইরূপে। অর্থাৎ, রামক শ্যামক মধুক হরিক শব্দ ইহার মূল। সংস্কৃতে যে হ্রস্ব-অর্থে ক প্রত্যয় হয়, বাংলায় উক্ত দৃষ্টান্তগুলি তাহার নিদর্শন।

দুই-এক স্থলে মূল শব্দের ক প্রায় অবিকৃত আছে ; যথা, হালকা, ইহা লঘুক শব্দজ। লহুক হইতে হলুক ও হলুক হইতে হালকা।

এই ক প্রত্যয় বিশেষণেই অধিক, এবং দুই-অক্ষরের ছোটো ছোটো কথাতেই ইহার প্রয়োগসম্ভাবনা বেশি। কারণ, বড়ো কথাকে ক সংযোগে বৃহত্তর করিলে তাহা ব্যবহারের পক্ষে কঠিন হয়। এইজন্যই বাংলা দুই-অক্ষরের বিশেষণ যাহা অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা অধিকাংশই আকারান্ত। যে-সকল বিশেষণ শব্দ দুই-অক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের ঈষৎ ভিন্নরূপ বিকৃতি হইয়াছে ; যথা, পাঠকক হইতে পড়ুয়া ও তাহা হইতে পোড়ো, পতিতক হইতে পড়ুয়া ও পোড়ো, মধ্যমক— মেঝুয়া মেঝো, উচ্ছিষ্টক— এঁঠুয়া এঁঠো, জলীয়ক— জলুয়া জোলো, কাষ্ঠিয়ক— কাঠুয়া কেঠো ইত্যাদি। অনুরূপ দুই-একটি বিশেষ্য পদ যাহা মনে পড়িল তাহা লিখি। কিঞ্চিলিক শব্দ হইতে কেঁচুয়া ও কেঁচো হইয়াছে। স্বল্পাক্ষরক পেচক শব্দ হইতে পেঁচা ও বহ্বক্ষরক কিঞ্চিলিক হইতে কেঁচো শব্দের উৎপত্তি তুলনা করা যাইতে পারে। দীপরক্ষক শব্দ হইতে দের্‌খুয়া ও দের্‌খো আর-একটি দৃষ্টান্ত।

বাংলা বিশেষণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

বীম্‌স্‌ সাহেব বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি বলেন, চলিত কথায় আ স্বরের পর ঈ স্বর থাকিলে সাধারণত উভয়ে সংকুচিত হইয়া এ হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে দিয়াছেন, খাইতে— খেতে, পাইতে— পেতে। এইসঙ্গে বলিয়াছেন, in less common words অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এইরূপ সংকোচ ঘটে না ; যথা, গাইতে হইতে গেতে হয় না।

গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত বলিয়া কেন গণ্য হইবে বুঝা যায় না। তাহার অপরাধের মধ্যে সে একটি নিয়মবিশেষের মধ্যে ধরা দেয় না। কিন্তু তাহার সমান অপরাধী আরো মিলিবে। বাংলায় এই-জাতীয় ক্রিয়াপদ যে-কয়টি আছে, সবগুলি একত্র করা যাক ; খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে নাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে, এই তিনটি শব্দ বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়ম পালন করে, বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে।

এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা হ লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায় ; যথা গাহিতে চাহিতে নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)।

হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া করতে চলতে হয় ; হইতে শব্দের ইকার লোপ হইয়া 'হতে' এবং লইতে শব্দের ইকার স্থানভ্রষ্ট হইয়া 'নিতে' হয়। কিন্তু, বহিতে সহিতে কহিতে শব্দের ইকার বইতে সইতে কইতে শব্দের মধ্যে টিকিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ্‌ ব্যতীত আর-কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।

লইতে শব্দ লভিতে শব্দ হইতে উৎপন্ন ; ভ হ-এ পরিণত হইয়া 'লহিতে' হয়। তদুৎপন্ন নিতে শব্দে ইকার যদিচ স্থানচ্যুত হইয়াছে তথাপি হ-এর জোরে টিকিয়া গেছে।

বীম্‌স্‌ তাঁহার উল্লিখিত নিয়মে একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার নিয়ম দুই-অক্ষরের কথায় খাটে না। হাতি শব্দে কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু হাতিয়ার শব্দের বিকারে হেতের হয়। আসি শব্দ ঠিক থাকে ; 'আসিয়া' হয়— আস্যা, পরে হয়— এসে। খাই শব্দে পরিবর্তন হয় না ; খাইয়া হয়— খায়্যা, পরে হয়— খেয়ে। এইরূপে হাঁড়িশাল হইতে হয়— হেঁশেল।

এ স্থলে এই নিয়মের চূড়ান্ত পর্যালোচনা হইল না ; আমরা কেবল পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

'এ' স্বরবর্ণ কোথাও বা ইংরেজি came শব্দস্থিত a স্বরের মতো, কোথাও বা lack শব্দের a-র মতো উচ্চারিত হয়, বীম্‌স্‌ তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। 'এ' স্বরের উচ্চারণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমরা সাধনা পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। বীম্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, যাওয়া-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণ গ্যাল হইয়াছে, গিলিবার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণে বিশুদ্ধ একার রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন, অভ্যাস ব্যতীত ইহার নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে একটি সহজ নিয়ম আছে।

যে-সকল ক্রিয়াপদের আরম্ভ-শব্দে ইকার আছে, যথা, গিল মিল ইত্যাদি, তাহারা ইকারের পরিবর্তে একার গ্রহণ করিলে একারের উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে ; যথা, গিলন হইতে গেলা, মিলন হইতে মেলা (মেলন শব্দ হইতে যে মেলা-র উৎপত্তি তাহার উচ্চারণ ম্যালা), লিখন হইতে লেখা, শিক্ষণ হইতে শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্বত্রই একারের উচ্চারণ অ্যা হইয়া যায় ; যথা, খেলন— খেলা, ঠেলন— ঠেলা, দেখন— দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ গোড়ায় যেখানে ই থাকে সেটা হয় এ, গোড়ায় যেখানে এ থাকে সেটা হয় অ্যা। গোড়ায় কোথায় এ আছে এবং কোথায় ই আছে, তাহা ইতে প্রত্যয়ের দ্বারা ধরা পড়ে ; যথা, গিলিতে মিলিতে লিখিতে শিখিতে মিটিতে পিটিতে ; অন্যত্র, খেলিতে ঠেলিতে দেখিতে ঠেকিতে বেঁকিতে মেলিতে হেলিতে ইত্যাদি।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, ও এবং য় পরে পরে আসিলে তাহার উচ্চারণ প্রায় ইংরেজি w-র মতো হয় ; যথা ওয়াশিল তল্‌ওয়ার ওয়ার্ড রেলওয়ে ইত্যাদি। একটা জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আছে, তাহা লক্ষ না করিয়া সাহেব একটি অদ্ভুত বানান করিয়াছেন ; তিনি ইংরেজি will শব্দকে উয়িল অথবা উইল না লিখিয়া ওয়িল লিখিয়াছেন। ওয় সর্বত্রই ইংরেজি w-র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, কেবল এই 'ও' ইকারের পূর্বে উ না হইয়া যায় না। ব-এর সহিত যফলা যোগে দুই-তিন রকম উচ্চারণ হয় তাহা বীম্‌স্‌ সাহেব ধরিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তে অদ্ভুত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্যবহার-এর উচ্চারণ বেভার, ব্যক্তি-র উচ্চারণ বিক্তি, এবং ব্যতীত শব্দের উচ্চারণ বিতীত।

তাহা ছাড়া, কেবল ব-এর সঙ্গে যফলা যোগেই যে উচ্চারণবৈচিত্র্য ঘটে তাহা নহে সকল বর্ণ সম্বন্ধেই এইরূপ। ব্যবহার শব্দের ব্য এবং ত্যক্ত শব্দের ত্য উভয়েই যফলার স্থলে যফলা-আকার উচ্চারণ হয়। ইকারের পূর্বে যফলার উচ্চারণ এ হইয়া যায়, ব্যক্তি এবং ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত। নব্য ভব্য প্রভৃতি মধ্য বা শেষাক্ষরবর্তী যফলা আশ্রয়বর্ণকে দ্বিগুণিত করে মাত্র। ইকারের পূর্বে যফলা যেমন একার হইয়া যায়, তেমনই ক্ষ-ও একার গ্রহণ করে ; যেমন ক্ষতি শব্দকে কথিত ভাষায় খেতি উচ্চারণ করে। ইহার প্রধান কারণ, ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণে আমরা সাধারণত যফলা যোগ করিয়া লই ; এইজন্য ক্ষমা শব্দের ইতর উচ্চারণ খ্যামা।

আমরা বীম্‌স্‌ সাহেবের ব্যাকরণধৃত উচ্চারণ-পর্যায় অনুসরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে দুই-চারিটা কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলার উচ্চারণতত্ত্ব ও বর্ণবিকারের নিয়ম বাঙালির দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই।

পৌষ ১৩০৫

বাংলা বহুবচন

সংস্কৃত ভাষায় সাত বিভক্তি প্রাকৃতে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই বলিলেই হয় এবং ষষ্ঠীর দ্বারাই প্রথমা ব্যতীত অন্য সকল বিভক্তির কার্য সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষাগুলিতে প্রাকৃতের এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়।[1]

সংস্কৃত ষষ্ঠীর স্য বিভক্তির স্থানে প্রাকৃতে শ্‌ শ হ হো হে হি বিভক্তি পাওয়া যায়। আধুনিক ভাষাগুলিতে এই বিভক্তির অনুসরণ করা যাক।

চহুবানহ পাস	—চাঁদ :	চহুবানের নিকট।
সংসারহি পারা	—কবীর :	সংসারের পার।
মুনিহিঁ দিখাঈ	—তুলসীদাস :	মুনিকে দেখাইলেন।
যুবরাজপদ রামহি দেহু	—তুলসীদাস :	যুবরাজপদ রামকে দেও।
কহ্যৌ সম খান্‌ততারহ	—চাঁদ :	তিনি খান্‌তাতারকে কহিলেন।
তত্তারহ উপরহ	—চাঁদ :	তাতারের উপরে।
আদিহিতে সব কথা সুনাঈ	—তুলসীদাস :	আদি হইতে তিনি সকল কথা শুনাইলেন।

উক্ত উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রায় সকল বিভক্তির কাজ সারিতেছে।

বাংলায় কী হয় দেখা যাক। বাংলায় যে-সকল বিভক্তিতে 'এ' যোগ হয় তাহার ইতিহাস প্রাকৃত হি-র মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত— গৃহস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত— ঘরহে, বাংলা— ঘরে। সংস্কৃত— তাম্রকস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত— তম্বঅহে, বাংলায়— তাঁবার (তাঁবাএ)।

১ প্রাকৃতের পরবর্তী সমুদয় সংস্কৃতমূলক ভারতবর্ষীয় ভাষার উল্লেখস্থলে হ্যর্নলে 'গৌড়ীয় ভাষা' নাম ব্যবহার করিয়াছেন ; আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিব।

পরবর্তী হি যে অপভ্রংশে একার হইয়া যায় বাংলায় তাহার অন্য প্রমাণ আছে। বার বার শব্দটিকে জোর দিবার সময় আমরা 'বারে বারে' বলি ; সংস্কৃত নিশ্চয়ার্থসূচক হি-যোগে ইহা নিষ্পন্ন ; বারহি বারহি— বারই বারই— বারে বারে। একেবারে শব্দটিরও ঐরূপ ব্যুৎপত্তি। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি যোগ ছিল, তাহা বাংলা কাব্যপ্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যায় :

লাজ কেন কর বধূজনে : কবিকঙ্কণ।

করণ কারকেও 'এ' বিভক্তি চলে। যথা,

পূজিলেন ভূষণে চন্দনে।

ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ।

তিলকে ললাট শোভিত।

বাংলায় সম্প্রদান কর্মের অনুরূপ। যথা,

দীনে কর দান।

গুরুজনে করো নতি।

অধিকরণের তো কথাই নাই।

যাহা হউক, সম্বন্ধের চিহ্ন লইয়া প্রায় সকল কারকের কাজ চলিয়া গেল কিন্তু স্বয়ং সম্বন্ধের বেলা কিছু গোল দেখা যায়।

বাংলায় সম্বন্ধে 'র' আসিল কোথা হইতে। পাঠকগণ বাংলা প্রাচীনকাব্যে দেখিয়া থাকিবেন, তাহার যাহার প্রভৃতি শব্দের স্থলে তাকর যাকর প্রভৃতি প্রয়োগ কোথাও দেখা যায়। এই কর শব্দের ক লোপ পাইয়া র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়।

পশ্চিমি হিন্দির অধিকাংশ শাখায় ষষ্ঠীতে কো কা কে প্রভৃতি বিভক্তি যোগ হয় ; যথা, ঘোড়েকা ঘোড়েকো ঘোড়েকৌ ঘোড়াকো।

বাংলার সহিত যাহাদের সাদৃশ্য আছে নিম্নে বিবৃত হইল ; মৈথিলী— ঘোড়াকর ঘোড়াকের ; মাগধী— ঘোড়াকের ঘোড়ক্কাকর ; মাড়োয়ারি— ঘোড়ারো ; বাংলা— ঘোড়ার।

এই তালিকা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় কর শব্দ কোনো ভাষা সমগ্র রাখিয়াছে, এবং কোনো ভাষায় উহার ক অংশ এবং কোনো ভাষায় উহার র অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায় ; যথা কস্‌স কেরকং এদং পবহণং— কাহার এই গাড়ি, তুম্মহং কেরউং ধন— তোমার ধন, জসুকেরে হুংকারউয়েঁ মুহহুঁ পড়ংতি তনাইঁ— যাহার হুংকারে মুখ হইতে তৃণ পড়িয়া যায়। ইহার সহিত চাঁদ কবির : ভীমহকরি সেন— ভীমের সৈন্য, তুলসীদাসের : জীবহুকের কলেসা— জীবগণের ক্লেশ, তুলনা করিলে উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

এই কেরক শব্দের সংস্কৃত— কৃতক, কৃত। তস্যকৃত শব্দের অর্থ তাঁহার দ্বারা কৃত। এই কৃতবাচক সম্বন্ধ ক্রমে সর্বপ্রকার সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণেই প্রমাণ হইবে।

এই স্থলে বাংলা ষষ্ঠীর বহুবচন দের দিগের শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচ্য। এ স্থলে উদ্ধৃত করি :

> বহুবচন বুঝাইতে পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু সব সকল প্রভৃতি সংযুক্ত হইত ; যথা,
>
> তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার
> কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।— চৈ· ভা
>
> ক্রমে আদি সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল ; যথা, নরোত্তম বিলাসে,
>
> শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
> শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ।।
> শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
> করিলেন নিযুক্ত শ্রীবাস আচার্যেরে ।।

আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায় ॥

এইরূপে, রামাদি জীবাদি হইতে ষষ্ঠীর র সংযোগে— রামদের জীবদের হইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তরে স্বার্থে ক যুক্ত হইয়া বৃক্ষাদিক জীবাদিক শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলত উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়; যথা, নরোত্তম বিলাসে,

"রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে ॥"

এই ক-এর গ-এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ), জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর সংযোগে দিগের এবং কর্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত কে-র সংযোগে দিগকে পদ উৎপন্ন হইয়াছে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ের কথা নহে। কারণ, দীনেশবাবু কেবল অকারান্ত পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইকার-উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ তিনি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এবং রামাদিগ হইতে রামদিগ হওয়া যত সহজ, কপ্যাদিগ হইতে কপিদিগ এবং ধেন্বাদিগ হইতে ধেনুদিগ হওয়া তত সহজ নহে।

হিন্দিভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সাধু হিন্দি— ঘোড়োঁকা, কনৌজি— ঘোড়নকো, ব্রজভাষা— ঘোড়োঁকৌ অথবা ঘোড়নিকৌ, মাড়োয়ারি— ঘোড়াঁরো, মেৱারি— ঘোড়াঁকো, গঢ়ৱালি— ঘোড়োঁকো, অৱধি— ঘোড়ৱনকর, রিৱাই— ঘঁাড়নকর, ভোজপুরি— ঘোড়নকি, মাগধী— ঘোড়নকের, মৈথিলী— ঘোড়নিক ঘোড়নিকর।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, কা কো কের কর প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্নের বহুবচন নাই। বহুবচনের চিহ্ন মূল শব্দের সহিত সানুনাসিকরূপে যুক্ত।

অপভ্রংশ প্রাকৃতে ষষ্ঠীর বহুবচনে হং হুং হিং বিভক্তি হয়। সংস্কৃত নরাণাং কৃতকঃ শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে নরহং কেরও এবং হিন্দিতে নরোঁকো হয়। সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং হিন্দিতে বিচিত্র সানুনাসিকে পরিণত হইয়াছে।

বাংলায় এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের মতে সম্পূর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। নিম্নে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। হিন্দিতে কর্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষরূপে বহুবচন বুঝাইতে হইলে লোগ্‌গণ প্রভৃতি শব্দ অনুযোজন করা হয়।

প্রাচীন বাংলারও এই দশা ছিল, পুরাতন কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে; দেখা গিয়াছে, সব সকল প্রভৃতি শব্দের অনুযোজনাদ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু হিন্দিতে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন যোগের সময় শব্দের একবচন ও বহুবচন রূপ লক্ষিত হয়; যথা, ঘোড়েকো— একটি ঘোড়াকে, ঘোড়োঁকো— অনেক ঘোড়াকে। ঘোড়ে একবচনরূপ এবং ঘোড়োঁ বহুবচনরূপ।

পূর্বে এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্ন হে হি স্থলে বাংলায় একার দেখা যায়; যথা অপভ্রংশ প্রাকৃত— ঘরহে, বাংলায় ঘরে।

হিন্দিতেও এইরূপ ঘটে। ঘোড়ে শব্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতের প্রথা অনুসারে প্রথমে গৌড়ীয় ভাষায় বিভক্তির মধ্যে ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্নই একমাত্র অবশিষ্ট ছিল; অবশেষে ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সেই ষষ্ঠীবিভক্তির সহিত সংলগ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকজ্ঞাপক শব্দযোজনা প্রবর্তিত হইল।

বাংলায় এই নিয়মের লক্ষণ একেবারে নাই তাহা নহে। 'হাতর' না বলিয়া বাংলায় হাতের বলে, 'ভাইর' না বলিয়া ভাইয়ের বলে, 'মুখতে' না বলিয়া মুখেতে এবং বিকল্পে পাতে এবং পায়েতে বলা হইয়া থাকে।

প্রথমে, হাতে ভাইয়ে মুখে পায়ে রূপ করিয়া তাহাতে র তে প্রভৃতি বিশেষ বিভক্তি যোগ হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই একার প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবাচক হি হে-র অপভ্রংশ।

আমাদের বিশ্বাস বহুবচনেও বাংলা এক সময়ে হিন্দির অনুযায়ী ছিল এবং সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং বিভক্তি যেখানে হিন্দিতে সংক্ষিপ্ত সানুনাসিকে পরিবর্তিত হইয়াছে, বাংলায় তাহা দ আকার ধারণ করিয়াছে এবং কৃত শব্দের অপভ্রংশ কের তাহার সহিত বাহুল্য প্রয়োগরূপে যুক্ত হইয়াছে।

তুলসীদাসে আছে, জীবহুকের কলেসা, এই জীবহুকের শব্দের রূপান্তর 'জীবদিগের' হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

ন হইতে দ হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন, বানর হইতে বান্দর ও বাঁদর।

কর্মকারকে জীবহুকে হইতে জীবদিগে শব্দের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের নূতন সৃষ্ট বাংলায় আমরা কর্মকারকে দিগকে লিখিয়া থাকি, কিন্তু কথিত ভাষায় মনোযোগ দিলে কর্মকারকে দিগে শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই শুনা যায়।

বোধ হয় সকলেই লক্ষ করিয়া থাকিবেন, সাধারণ লোকদের মধ্যে— আমাগের তোমাগের শব্দ প্রচলিত আছে। এরূপ প্রয়োগ বাংলার কোনো বিশেষ প্রদেশে বদ্ধ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে বারংবার শুনা গিয়াছে, ইহা নিশ্চয়। আমাগের তোমাগের শব্দের মধ্যস্থলে দ আসিবার প্রয়োজন হয় নাই ; কারণ, ম সানুনাসিক বর্ণ হওয়াতে পার্শ্ববর্তী সানুনাসিককে সহজে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। যাগের তাগের শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই।

এই মতের বিরুদ্ধে সন্দেহের একটি কারণ বর্তমান আছে। আমরা সাধারণত, নিজদের লোকদের গাছদের না বলিয়া, নিজেদের লোকেদের গাছেদের বলিয়া থাকি। জবহুকের— জীবহ্নের— জীবন্দের— জীবদের, এরূপ রূপান্তরপর্যায়ে উক্ত একারের স্থান কোথাও দেখি না।

মেওয়ারি কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির একটি প্রাচীন রূপ দেখা যায় হংদো। কাশ্মীরিতে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন হিংদ। জনহিংদ বলিতে লোকদিগের বুঝায়। বীম্‌স্ সাহেবের মতে এই হংদো ভূ ধাতুর ভবন্ত হইতে উৎপন্ন। যেমন কৃত একপ্রকারের সম্বন্ধ তেমনই ভূত আর-একপ্রকারের সম্বন্ধ।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, জনহিন্দকের জনহিন্দের শব্দের একপর্যায়গত শব্দ জনদিগের জনেদের, তাহা হইলে নিয়মে বাধে না। ঘরহি স্থলে যদি 'ঘরে' হয় তবে জনহি স্থলে 'জনে' হওয়া অসংগত নহে। বাংলার প্রতিবেশী আসামি ভাষায় হঁত শব্দ বহুবচনবাচক। মানুহহঁত অর্থে মানুষগণ বুঝায়। হঁত এবং হংদ শব্দের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হংদ সম্বন্ধবাচক বহুবচন, হঁত বহুবচন কিন্তু সম্বন্ধবাচক নহে।

পরন্তু সম্বন্ধ ও বহুবচনের মধ্যে নৈকট্য আছে। একের সহিত সম্বন্ধীয়গণই বহু। বাংলায় রামের শব্দ সম্বন্ধসূচক, রামেরা বহুবচনসূচক ; রামেরা বলিতে রামের গণ, অর্থাৎ রাম-সম্বন্ধীয়গণ বুঝায়। নরা গজা প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন বাংলায় বহুবচনে আকার প্রয়োগ দেখা যায়, রামের শব্দকে সেইরূপ আকারযোগে বহুবচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

নেপালি ভাষায় ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে স্থলে দেবেরা বলি তাহারা দেবহেরু বলে। হে এবং রু উভয় শব্দই সম্বন্ধবাচক এবং সম্বন্ধের বিভক্তি দিয়াই বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আসামি ভাষায় ইহতর শব্দের অর্থ ইহাদের, তঁহতর তোমাদের। ইহঁত-কের ইহাদিগের, তঁহত-কের তোমাদিগের, কানে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। কর্মকারকেও আসামি ইহঁতক বাংলা ইহাঁদিগের সহিত সাদৃশ্যবান।

এই হঁত শব্দ রাজপুত হংদো শব্দের ন্যায় ভবন্ত বা সন্ত শব্দানুসারী, তাহা মনে করিবার একটা কারণ আছে। আসামিতে হঁওতা শব্দের অর্থ হওয়া।

এ স্থলে এ কথাও স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, পশ্চিমি হিন্দির মধ্যে রাজপুত ভাষাতেই সাধারণপ্রচলিত সম্বন্ধকারক বাংলার অনুরূপ ; গোড়ার শব্দের মাড়োয়ারি ও মেবারি ঘোড়ারো, বহুবচনে ঘোড়াঁরো।

পাঞ্জাবি ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন দা, স্ত্রীলিঙ্গে দী। ঘোড়াদা— ঘোড়ার, যন্ত্রদীবাণী— যন্ত্রের

বাণী। প্রাচীন পাঞ্জাবিতে ছিল ডা। আমাদের দিগের শব্দের দ-কে এই পাঞ্জাবি দ-এর সহিত এক করিয়া দেখা যাইতে পারে। ঘোড়াদা-কের— ঘোড়াদিগের।

বীম্‌স্ সাহেবের মতে পাঞ্জাবি এই দা শব্দ সংস্কৃত তন শব্দের অপভ্রংশ। তন শব্দের যোগে সংস্কৃত পুরাতন সনাতন প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি। প্রাকৃতেও ষষ্ঠীবিভক্তির পরে কের এবং তণ উভয়ের ব্যবহার আছে; হেমচন্দ্রে আছে, সম্বন্ধিনঃ কেরতণৌ। মেব্বারি তণো তণুঁ এবং বহুবচনে তণাঁ ব্যবহার হইয়া থাকে। তণাঁ-র উত্তর কের শব্দ যোগ করিলে 'তণাকের' রূপে দিগের শব্দের মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যে অধিকাংশ স্থলে সব শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

এখনো বাংলায় সব শব্দের যোগ চলিত আছে। কাব্যে তাহার দৃষ্টান্ত:

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল।

কিন্তু কথিত ভাষায় উক্তপ্রকার কাব্যপ্রয়োগের সহিত নিয়মের প্রভেদ দেখা যায়। কাব্যে আমাসব, তোমাসব, পাখিসব প্রভৃতি কথায় দেখা যাইতেছে সব শব্দই বহুবচনের একমাত্র চিহ্ন, কিন্তু কথিত ভাষায় অন্য বহুবচনবিভক্তির পরে উহা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হয়— আমরা সব, তোমরা সব, পাখিরা সব; যেন, আমরা তোমরা পাখিরা 'সব' শব্দের বিশেষণ।

ইহা হইতে আমাদের পূর্বের কথা প্রমাণ হয়, রা বিভক্তি বহুবচনবাচক বটে কিন্তু উহা মূলে সম্বন্ধবাচক। 'পাখিরা সব' অর্থ পাখিসম্বন্ধীয় সমষ্টি।

ইহা হইতে আর-একটা দেখা যায়, বিভক্তির বাহুল্যপ্রয়োগ আমাদের ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। লোকেদের শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, প্রথমত লোকে শব্দের এ প্রাচীন ষষ্ঠীবাচক, তাহার পর দা শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ষষ্ঠীবিভক্তি, তাহার পর কের শব্দ সম্বন্ধবাচক বাহুল্যপ্রয়োগ।

মৈথিলীভাষায় সব শব্দ যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের প্রাচীন কাব্যের ন্যায়। নেনাসভ অর্থে বালকেরা সব, নেনিসভ— বালিকারা সব; কিন্তু এ সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না। কারণ, মৈথিলীতে অন্য কোনোপ্রকার বহুবচনবাচক বিভক্তি নাই। বাংলায় রা বিভক্তিযোগে বহুবচন সমস্ত গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, কেবল নেপালি হেরু বিভক্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু রা বিভক্তিযোগে বহুবচন কেবল সচেতন পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। আমরা বাংলায় ফলেরা পাতারা বলি না। এই কারণেই ফলেরা সব, পাতারা সব, এমন প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

মৈথিলী ভাষায় ফলসভ, কথাসভ, এরূপ ব্যবহারের বাধা নাই। বাংলায় আমরা এরূপ স্থলে ফলগুলা সব, পাতাগুলা সব, বলিয়া থাকি।

সচেতন পদার্থ বুঝাইতে লোকগুলা সব, বানরগুলা সব বলিতেও দোষ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে গুলা যোগে বাংলায় সচেতন অচেতন সর্বপ্রকার বহুবচনই সিদ্ধ হয়। এক্ষণে এই গুলা শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নেপালি বহুবচনবিভক্তি হেরু শব্দের উৎপত্তি প্রাকৃতভাষায় কেরউ হইতে। অহ্মহং কেরউ— আমাদিগের। কেরউ— কেরু— হেরু।

বাংলা রা যেমন সম্বন্ধবাচক হইতে বহুবচনবাচকে পরিণত হইয়াছে, নেপালি হেরু শব্দেরও সেই গতি।

নেপালিতে কেরু শব্দের কে হে হইয়াছে, বাংলায় তাহা গে হইয়াছে, দিগের শব্দে তাহার প্রমাণ আছে।

কেরু হইতে গেরু, গেরু হইতে গেলু, গেলু হইতে গুলু, গুলু হইতে গুলো ও গুলা হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ স্বরবর্ণবিপর্যয়ের উদাহরণ অনেক আছে; বিন্দু হইতে বুঁদ তাহার একটি, মুদ্রিকা হইতে মাদুলি অন্যপ্রকারের (এই বুঁদ শব্দ হইতে বিন্দু-আকার মিষ্টান্ন বোঁদে শব্দের উদ্ভব)।

ঘোড়াকেরু নেপালিতে হইল ঘোড়াহেরু, বাংলায় হইল ঘোড়াগুলো।

গুলি ও গুলিন্ শব্দ গুলা-র স্ত্রীলিঙ্গ। ক্ষুদ্র জিনিস বুঝাইতে এক সময়ে বঙ্গভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার

হইত তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে ; যথা বড়া বড়ি, গোলা গুলি, খোঁটা খুঁটি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, ছোরা ছুরি, জাঁতা জাঁতি, আংটা আঁটি, শিকল শিক্‌লি ইত্যাদি।

প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়, সব অপেক্ষা গণ শব্দের প্রচলন অনেক বেশি। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী দেখিলে তাহার প্রমাণ হইবে ; অন্য বাংলা প্রাচীন কাব্য এক্ষণে লেখকের হস্তে বর্তমান নাই, এইজন্য তুলনা করিবার সুযোগ হইল না।

এই গণ শব্দ হইতে গুলা হওয়াও অসম্ভব নহে। কারণ, গণ শব্দের অপভ্রংশ প্রাকৃত গণু। জানি না ধ্বনিবিকারের নিয়মে গণু হইতে গলু ও গুলো হওয়া সুসাধ্য কি না।

কিন্তু কেরু হইতেই যে গুলো হইয়াছে লেখকের বিশ্বাসের ঝোঁকটা সেই দিকে। তাহার কারণ আছে ; প্রথমত রা বিভক্তির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত নেপালি হেরু শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তৃতীয় যাহার যুক্তিপরম্পরা অপেক্ষাকৃত দুরূহ এবং যাহা প্রথম শ্রুতিমাত্রই প্রত্যয় আকর্ষণ করে না উদ্ভাবকের কল্পনা তাহার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়।

এইখানে বলা আবশ্যক, উড়িয়া ও আসামির সহিত যদিচ বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আছে তথাপি বহুবচন সম্বন্ধে বাংলার সহিত তাহার মিল পাওয়া যায় না।

উড়িয়া ভাষায় মানে শব্দযোগে বহুবচন হয়। ঘর একবচন, ঘরমানে বহুবচন। বীম্‌স্ বলেন, এই মানে শব্দ পরিমাণ হইতে উদ্ভূত ; হ্যর্নলে বলেন, মানব হইতে। প্রাচ্য হিন্দিতে মনুষ্যগণকে মনই বলে, মানে শব্দ তাহারই অনুরূপ।

হিন্দিতে কর্তৃকারক বহুবচন লোগ্ (লোক) শব্দযোগে সিদ্ধ হয় ; ঘোড়ালোগ— ঘোড়াসকল। বাংলাতেও শ্রেণীবাচক বহুবচনে লোক শব্দ ব্যবহৃত হয় ; যথা, পণ্ডিতলোক মূর্খলোক গরিবলোক ইত্যাদি।

আসামি ভাষার বিলাক হঁত এবং বোর শব্দযোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে হঁত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিলাক এবং বোর শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় সুকঠিন।

যাহাই হউক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধের বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি এবং নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার এই-সকল বহুবচন রূপের যোগ পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

সম্বন্ধের একবচনেও অপর গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার প্রভেদ আছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কেবল মাড়োয়ারি ও মেব্বারি রো বিভক্তি বাংলার র বিভক্তির সহিত সাদৃশ্যবান। এ কথাও বলা আবশ্যক উড়িয়া ও আসামি ভাষার সহিতও এ সম্বন্ধে বাংলার প্রভেদ নাই। অপরাপর গৌড়ীয় ভাষায় কা প্রভৃতি যোগে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়।

কিন্তু একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ করিবার আছে।

উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী একবচনে কী বহুবচনে প্রায় কোথাও ষষ্ঠীতে ককারের প্রয়োগ নাই, প্রায় সর্বত্রই রকার ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা, সাধুহিন্দি— একবচনে মেরা, বহুবচনে হমারা। কনৌজি— মেরো, হমারো। ব্রজভাষা— মেরৌ, হমারৌ। মাড়োয়ারি— মারো, ম্হারো। মেব্বারি— ম্হারো, হাঁররাঁরো। অব্বধি— মোর, হমার। রিব্বাই— ম্ব্বার, হম্‌হার।

মধ্যম পুরুষেও— তেরা তুম্‌হারা তোর তুমার, ত্ব্বার তুম্‌হার প্রভৃতি প্রচলিত।

কোনো কোনো ভাষায় বহুবচনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায় ; যথা, নেপালি— হামে রুকো, ভোজপুরি— হমরণকে, মাগধী— হমরণীকে, মৈথিলী— হমরাসভকে।

অন্য গৌড়ীয় ভাষায় কেবল সর্বনামের ষষ্ঠী বিভক্তিতে যে রকার বর্তমান, বাংলায় তাহা সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই বর্তমান। ইহা হইতে অনুমান করি, ককার অপেক্ষা রকার ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাচীনতর রূপ।

এখানে আর-একটি লক্ষ করিবার বিষয় আছে। একবচনে যেখানে তেরা বহুবচনে সেখানে

তুম্‌হারা, একবচনের ম্‌হার বহুবচনে হম্‌হার। নেপালি ভাষায় কর্তৃকারক বহুবচনে হেরু বিভক্তি পাওয়া যায়; এই হেরু হার এবং হরা সাদৃশ্যবান।

কিন্তু নেপালিতে হেরু নাকি কর্তৃকারক বহুবচনে ব্যবহার হয়, এইজন্য সম্বন্ধে রকারের পরে পুনশ্চ রকার-যোগ সম্ভব হয় নাই, কো শব্দযোগে ষষ্ঠী করিতে হইয়াছে। অথচ নেপালি একবচনে মেরো হইয়া থাকে।

মৈথিলী ষষ্ঠীর বহুবচনে হম্মরাসভকে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

পূর্বে বলিয়াছি বাংলায় কর্তৃকারক বহুবচনে সব শব্দের পূর্বে বহুবচনবাচক রা বিভক্তি বসে, যথা ছেলেরা সব; কিন্তু মৈথিলীতে শুদ্ধ নেনাসভ বলিতেই বালকেরা সব বুঝায়। পূর্বে এ কথাও বলিয়াছি এ সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না, কারণ, মৈথিলীতে বাংলার ন্যায় কর্তৃকারক বহুবচনের কোনো বিশেষ বিভক্তি নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে সর্বনাম উত্তম ও মধ্যম পুরুষে মৈথিলী কর্তৃকারক বহুবচনে হমরাসভ তোহরাসভ ব্যবহার হয়, এবং অন্যান্য কারকেও হমরাসভকে তোহরাসভকে প্রভৃতি প্রচলিত।

মৈথিলী সর্বনামশব্দে যে ব্যবহার, বাংলায় সর্বনাম ও বিশেষ্য সর্বত্রই সেই ব্যবহার।

ইহা হইতে দুই প্রকার অনুমান সংগত হয়। হয়, এই হমরা এককালে বাংলা ও মৈথিলী উভয় ভাষায় বহুবচনরূপ ছিল, নয় এককালে যাহা কেবল সম্বন্ধের বিভক্তি ছিল বাংলায় তাহা ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া কর্তৃকারক বহুবচন ও মৈথিলী ভাষায় তাহা কেবল সর্বনাম শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তিতে দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য আমাদের এই আলোচনাগুলি সংশয়পরিশূন্য নহে। পাঠকগণ ইহাকে অনুসন্ধানের সোপানস্বরূপে গণ্য করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে-সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্‌-সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন-সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

সম্বন্ধে কার

সংস্কৃত কৃত এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ কের শব্দ হইতে বাংলাভাষায় সম্বন্ধে র বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্বে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে— তাহার যাহার অর্থে তাকর যাকর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বর্তমানে অপ্রচলিত পুরাতন দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এখনো সম্বন্ধে বাংলায় কার শব্দপ্রয়োগ ব্যবহৃত হয়; যথা, এখনকার তখনকার ইত্যাদি।

কিন্তু এই কার শব্দের প্রয়োগ কেবল স্থলবিশেষেই বদ্ধ। কৃত শব্দের অপভ্রংশ কার কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবলমাত্র তাহার র অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে, তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।

উচ্চারণের বিশেষ নিয়মঘটিত কারণে অনেক সময়ে বিভক্তির পরিবর্তন হইয়া থাকে; যথা, অধিকরণে মাটির বেলায় আমরা বলি মাটিতে, ঘোড়ার বেলায় বলি ঘোড়ায়। কিন্তু এ স্থলে সে কথা খাটে না। লিখন শব্দের বেলায় আমরা সম্বন্ধে বলি— লিখনের, কিন্তু এখন শব্দের বেলায় এখনের বলি না, বলি— এখনকার। অথচ লিখন এবং এখন শব্দে উচ্চারণনিয়মের কোনো প্রভেদ হইবার কথা নাই।

বাংলায় কোন্ কোন্ স্থলে সম্বন্ধে কার শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইল।

এখনকার তখনকার যখনকার কখনকার।

এখানকার সেখানকার যেখানকার কোন্খানকার।

এ-বেলাকার ও-বেলাকার সে-বেলাকার।

এ-সময়কার ও-সময়কার সে-সময়কার।

সে-বছরকার ও-বছরকার এ-বছরকার।

যে-দিনকার সে-দিনকার ও-দিনকার এ-দিনকার।

এ-দিককার ও-দিককার সে-দিককার— দক্ষিণ দিককার, উত্তর দিককার, সম্মুখ দিককার, পশ্চাৎ দিককার।

আজকেকার কালকেকার পরশুকার।

এপারকার ওপারকার উপরকার নীচেকার তলাকার কোথাকার।

দিনকার রাত্রিকার।

এ-ধারকার ও-ধারকার সামনেকার পিছনকার।

এ-হপ্তাকার ও-হপ্তাকার।

আগেকার পরেকার কবেকার।

একালকার সেকালকার।

প্রথমকার শেষেকার মাঝেকার।

ভিতরকার বাহিরকার।

আগাকার গোড়াকার।

সকালকার বিকালকার।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় সময় এবং অবস্থান(position)-সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত কার বিভক্তির যোগ।

কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে, তাহারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আমরা বলি— দিনের বেলা, দিনকার বেলা বলি না। অথচ সেদিনকার শব্দ প্রচলিত আছে। সময় শব্দের সম্বন্ধে সময়ের বলি, অথচ তৎপূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম যোগ করিলে সম্বন্ধে কার বিভক্তি বিকল্পে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হয়, সময় ও দেশ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ সীমা নির্দিষ্ট হয়, সেইখানেই কার শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। সেদিনের কথা এবং সেদিনকার কথা— এ দুটা শব্দের একটি সূক্ষ্ম অর্থভেদ আছে। সেদিনের অর্থ অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, সেদিনের কথা বলিতে অতীতকালের অনেক দিনের কথা বুঝাইতে পারে, কিন্তু সেদিনকার কথা বলিতে বিশেষ একটি দিনের কথা বুঝায়। যেখানে সেই বিশেষত্বের উপর বেশি জোর দিবার প্রয়োজন, কোনোমতে দেশ বা কালের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার জো নাই, সেখানে শুদ্ধমাত্র এর বিভক্তি না দিয়া কার বিভক্তি হয়।

অতএব বিশেষার্থবোধক, সময় এবং অবস্থাসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তরে সম্বন্ধে কার প্রত্যয় হয়।

ইহার দুটি অথবা তিনটি ব্যতিক্রম চোখে পড়িতেছে। একজনকার দুইজনকার ইত্যাদি, ইহা মনুষ্যসংখ্যাবাচক, দেশকালবাচক নহে। মনুষ্যসমষ্টিবাচক— সকলকার। এবং সত্যকার। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলকার হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না (প্রাচীন বাংলায় সভাকার), সত্যকার হয় কিন্তু মিথ্যাকার হয় না। এবং মনুষ্যসংখ্যাবাচক একজন দুইজন ব্যতীত পশু বা জড়সংখ্যাবাচক একটা দুইটা-র সহিত কার শব্দের সম্পর্ক নাই।

অবস্থানবাচক যে-সকল শব্দে কার প্রত্যয় হয় তাহার অধিকাংশই বিশেষণ ; যথা, উপর নীচ সমুখ পিছন আগা গোড়া মধ্য ধার তল দক্ষিণ উত্তর ভিতর বাহির ইত্যাদি। বিশেষ্যের মধ্যে কেবল খান (স্থান) পার ও ধার শব্দ। এই তিনটি বিশেষ্যের বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহাদের পূর্বে এ সে প্রভৃতি

বিশেষার্থবোধক সর্বনাম-বিশেষণ যুক্ত না হইলে ইহাদের উত্তরে কার প্রত্যয় হয় না ; যথা সেখানকার এপারকার ওধারকার। কিন্তু, ভিতরকার বাহিরকার প্রভৃতি শব্দে সে কথা খাটে না।

সময়বাচক যে-সকল শব্দের উত্তর কার প্রত্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই বিশেষ্য ; যথা, দিন রাত্রি ক্ষণ বেলা বার বছর হপ্তা ইত্যাদি। এইরূপ সময়বাচক বিশেষ্য শব্দের পূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম-বিশেষণ না থাকিলে তদুত্তরে কার প্রয়োগ হয় না। শুদ্ধমাত্র— বারকার বেলাকার ক্ষণকার হয় না, এবেলাকার এখানকার এক্ষণকার এবারকার হয়। বিশেষণ শব্দে অন্যরূপ।

সময়বাচক বিশেষ্য শব্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাস মুহূর্ত দণ্ড ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের সহিত কার শব্দের যোগ হয় না। ইহার কারণ নির্ধারণ সুকঠিন।

যাহা হউক দেশ সম্বন্ধে একটা মোটা নিয়ম পাওয়া যায়। দেশবাচক যে-সকল শব্দে সংস্কৃতে বর্তী শব্দ হইতে পারে, বাংলায় তাহার স্থানে কার ব্যবহার হয়। উর্ধ্ববর্তী নিম্নবর্তী সম্মুখবর্তী পশ্চাদ্বর্তী অগ্রবর্তী প্রভৃতি শব্দের স্থলে বাংলায় উপরকার নীচেকার সামনেকার পিছনকার আগাকার ইত্যাদি প্রচলিত। ঋজুবর্তী বক্রবর্তী লম্ববর্তী ইত্যাদি কথা সংস্কৃতে নাই, বাংলাতেও সোজাকার বাঁকাকার লম্বাকার হইতে পারে না।

শ্রাবণ ১৩০৫

বাংলা শব্দদ্বৈত

ব্রুগ্‌মান তাঁহার ইন্ডোজর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন, একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা, পুনর্বৃত্তি(repetition), দীর্ঘকালবর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইন্ডোজর্মানীয় ভাষার অভিব্যক্তিদশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্ডোজর্মান ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া গেছে ; সংস্কৃত ভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত, মর্মর গর্গর, (ঘড়া, জলশব্দের অনুকরণে), গদ্‌গদ বর্বর (অস্পষ্টভাষী) কঙ্কণ। দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে ; যথা কর্কশ কঙ্কর ঝঞ্ঝা বম্ভর (ভ্রমর) চঞ্চল।

অসংযুক্ত ভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে, যথা, কালে কালে, জন্মজন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, পীত্বা পীত্বা, যথা যথা, যদ্‌যৎ, অহরহঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ, সুখসুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্যভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র ; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়— এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে— এগুলি পরস্পর-সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে— এগুলি নিয়তবর্তিতাবাচক, অর্থাৎ এগুলিতে সর্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া— এগুলি দীর্ঘকালীনতাবাচক।

অন্য অন্য, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুকরা টুকরা— এগুলি বিভক্ত বহুলতাবাচক।

নূতন নূতন কাপড়, বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করিয়া দেখা হয়। অনেক অনেক লোক, বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ 'অনেক লোক' বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, রকম রকম— এগুলিও পূর্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল, বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বোঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা— এগুলিও পূর্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে— এ দুইটিও ঐ প্রকার। আশায় আশায় আছি, অর্থাৎ প্রত্যেক বার আশা হইতেছে; ভয়ে ভয়ে আছি, অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক পৃথক রূপে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি, বস্তা বস্তা— এগুলিও পূর্বানুরূপ।

টাটকা টাটকা, গরম গরম, ঠিক ঠিক— এগুলি প্রকর্ষবাচক।

টাটকা টাটকা বলিলে টাটকা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার চার, তিন তিন— এগুলিও পূর্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।

গলায় গলায় (আহার) কানে কানে (কথা)— ইহাও পূর্বশ্রেণীর; অর্থাৎ অত্যন্তই গলা পর্যন্ত পূর্ণ, নিতান্তই কানের নিকটে গিয়া কথা। হাতে হাতে (ফল, বা ধরা পড়া), বোধ করি স্বতন্ত্রজাতীয়। বোধ করি তাহার অর্থ এই যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা অমনি সেই হাতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, যে-হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপনি আপনি, তখনই তখনই— পূর্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষরূপে নিজেই, আপনিই আর কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। সকাল সকাল শব্দও বোধ করি এই-জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতরূপে সকাল।

জ্বল্ জ্বল্, চুর্ চুর্, ঘুর্ ঘুর্, টল্ টল্, নড়্ নড়্— এগুলি জ্বলন চূর্ণন ঘূর্ণন টলন নর্তন শব্দজাত; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাংলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে; যথা, যাব যাব, উঠি উঠি; মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, মর্ মর্, পড়ো পড়ো, ভরা ভরা, ফাঁকা ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদো কাঁদো, হাসি হাসি।

মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন, অর্থে— মান প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা) এই-জাতীয়; অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারই নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্যভাষায় দেখা যায় না। ফরাসি ভাষায় একপ্রকার শব্দব্যবহার আছে যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসি চলিত ভাষায় কোনো জিনিসকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যথা, me-mere মে-মেয়ার্, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার অর্থে মা, মে-মেয়ার্ অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। bete বেট্ শব্দের অর্থ জন্তু, be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট পশু, আদরের পশুটি; অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্বতা বুঝাইতেছে।

আর-একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্যভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক; যেমন, জল-টল পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে

সঙ্গে আরো যে ক'টা আনুষঙ্গিক জিনিস শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচকা-বুঁচকি দড়া-দড়ি গোলা-গুলি কাটি-কুটি গুঁড়া-গাঁড়া কাপড়-চোপড়— এগুলিও প্রভৃতিবাচক বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দিষ্টতর। বোঁচকা-বুঁচকি বলিলে ছোটো বড়ো মাঝারি একজাতীয় নানাপ্রকার বোঁচকা বোঝায়, অন্যজাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রি হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাংলাভাষার সহিত তৎতৎ ভাষার শব্দদ্বৈতবিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

১৩০৭

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি ; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না।

আইঢাই আঁকুবাঁকু আনচান আমতা-আমতা।

ইলিবিলি।

উসুখস।

কচ কচাৎ কচকুচ কচাকচ কচর-কচর কচমচ কচর-মচর কট কটাৎ কটাস কটকট কটাকট কটমট কটর-মটর কড়কড় কড়াৎ কড়মড় কড়র-মড়র কনকন কপ কপাৎ কপকপ কপাকপ করকর কলকল কসকস কিচকিচ কিচমিচ কিচির-মিচির কিটকিট কিড়মিড় কিরকির কিলকিল কিলবিল কুচ কুচকুচ কুট কুটকুট কুটুর-কুটুর কুটুস কুপ কুপকুপ কুপকাপ কুলকুল কুরকুর কুঁইকুঁই কেঁইমেই কেঁউমেউ ক্যাঁ ক্যাঁক্যাঁ কোঁকোঁ কোঁৎকোঁৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচক্যাঁচ ক্যাঁচর-ক্যাঁচর ক্যাঁটক্যাঁট। কচকচে কটমটে কড়কড়ে কনকনে করকরে কিটকিটে (তেল কিটকিটে) কিরকিরে কিলবিলে কুচকুচে কুটকুটে ক্যাঁটকেঁটে ॥

খক খকখক খচখচ খচাখচ খচমচ খট খটখট খটাখট খটাস খটাৎ খটর-খটর খটমট খটর-মটর খড়খড় খড়মড় খন খনখন খপ খপাৎ খপাস খরখর খলখল খসখস খাঁ-খাঁ খিক খিকখিক খিটখিট খিটমিট খিটিমিটি খিলখিল খিসখিস খুক খুকখুক খুটখুট খুটুর-খুটুর খুটুস-খুটুস খুটখাট খুঁৎখুঁৎ খুঁৎমুৎ খুরখুর খুসখুস খেঁইখেঁই খ্যাঁক খ্যাঁকখ্যাঁক খ্যাঁচখ্যাঁচ খ্যাঁচাখেঁচি খ্যাঁৎখ্যাঁৎ খ্যানখ্যান। খটখটে খড়খড়ে খরখরে খসখসে খিটমিটে খিটখিটে খুঁৎখুঁতে খুঁৎমুতে খুসখুসে (কাশি) খ্যানখেনে ॥

গজগজ গজর-গজর গট গটগট গড়গড় গদগদ গনগন গপগপ গবগব গবাগব গমগম গরগর গলগল গসগস গাঁগাঁ গাঁইগুঁই গাঁকগাঁক গিজগিজ গিসগিস গুটগুট গুড়গুড় গুনগুন গুপগুপ গুবগাব গুম গুমগুম গুরগুর গেঁইগেঁই গোঁগোঁ গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন) গমগমে গুড়গুড়ে ॥

ঘটঘট ঘটর-ঘটর ঘড়ঘড় ঘসঘস ঘিনঘিন ঘিসঘিস ঘুটঘুট ঘুটমুট ঘুরঘুর ঘুসঘুস ঘেউঘেউ ঘোঁৎঘোঁৎ ঘেঁচ ঘেঁচঘেঁচ ঘ্যাঁচর-ঘ্যাঁচর ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানর-ঘ্যানর। ঘুরঘুরে ঘুসঘুসে (জ্বর) ঘ্যানঘেনে ॥

চকচক চকর-চকর (পশুর জলপান-শব্দ) চকমক চট চটাস চটচট চটাচট চটপট চটাপট চচ্চড় চড়াৎ চড়াস চড়াচ্চড় চন চনচন চপচপ চপাচপ চিঁচিঁ চিকচিক চিকমিক চিটচিট চিচ্চিড় চিড়িক চিড়িক-চিড়িক চিড়বিড় চিন চিনচিন চুকচুক চুকুর-চুকুর চুচ্চুর চেঁইভেঁই চেঁইমেই চোঁ চোঁচোঁ চোঁভোঁ চোঁচা চ্যাঁচ্যাঁ চ্যাঁভ্যাঁ। চকচকে চটচটে চটপটে চনচনে চিকচিকে চিটচিটে চিনচিনে চুকচুকে চুচ্চুরে ॥

ছটফট ছপছপ ছপাছপ ছপাৎ ছপাস ছমছম ছলছল ছোঁ ছোঁছোঁ ছ্যাঁক ছ্যাঁকছ্যাঁক। ছটফটে ছলছলে ছলোছলো ছ্যাঁকছেঁকে ছিপছিপে ॥

জরজর জ্যাবজ্যাব জ্যালজ্যাল। জবজবে জ্বিরজিরে জ্যালজেলে জিলজিলে ॥

ঝকঝক ঝকমক ঝটপট ঝড়াৎ ঝন ঝনঝন ঝপ ঝপঝপ ঝপাঝপ ঝমঝম ঝমাৎ ঝমাস ঝমর-ঝমর ঝমাজ্‌ঝম ঝরঝর ঝাঁ ঝাঁ-ঝাঁ ঝিকঝিক ঝিকমিক ঝিকিমিকি ঝিনঝিন ঝিরঝির ঝুনঝুন ঝুপঝুপ ঝুমঝুম। ঝকঝকে ঝরঝরে ঝিকঝিকে ॥

টক টকটক টকাটক টংটং টন টনটন টপ টপটপ টপাটপ টলটল টলমল টসটস টিকটিক টিকিস-টিকিস টিংটিং টিপটিপ টিমটিম টুকটুক টুকুস-টুকুস টুংটুং টুংটাং টুনটুন টুপ টুপটুপ টুপুস-টুপুস টুপটাপ টুসটুস টোটো ট্যাট্যা ট্যাসট্যাস ট্যাঙস-ট্যাঙস। টকটকে টনটনে টলটলে টসটসে টিংটিঙে টিপটিপে টিমটিমে টুকটুকে টুপটুপে টুসটুসে ট্যাসটেসে ॥

ঠক ঠকঠক ঠকর-ঠকর ঠংঠং ঠনঠন ঠুক ঠুকঠুক ঠুকুর-ঠুকুর ঠকাঠক ঠকাৎ ঠকাস ঠুকুস-ঠুকুস ঠুকঠাক ঠুংঠুং ঠুনঠুন ঠ্যাংঠ্যাং ঠ্যাসঠ্যাস। ঠনঠনে ঠ্যাংঠেঙে ॥

ডগডগে (লাল) ডিগডিগে।

ঢক ঢকঢক ঢকাঢক ঢকাস ঢকাৎ ঢবঢব ঢলঢল ঢুকঢুক ঢুলঢুল ঢ্যাবঢ্যাব। ঢকঢকে ঢলঢলে ঢুলঢুলে ঢুলুঢুলু ঢ্যাবঢেবে ॥

তকতক তড়তড় তড়াত্তড় তড়াক তড়াক-তড়াক তরতর তলতল তুলতুল তিড়িং তিড়িং-তিড়িং তড়াং তড়াং-তড়াং। তকতকে তলতলে তুলতুলে ॥

থকথক থপ থপাৎ থপাস থপথপ থমথম থরথর থলথল থসথস থৈ-থৈ ; থকথকে থপথপে থমথমে থলথলে থসথসে থুড়থুড়ে থ্যাসথেসে ॥

দগদগ দপদপ দবদব দমদম দমাদ্দম দরদর দড়াদ্দড় দড়াম দাউদাউ দুদ্দুড় দুদ্দাড় দুপদুপ দুপদাপ দুমদুম দুমদাম। দগদগে (রক্তবর্ণ বা অগ্নি) ॥

ধক্ ধকধক ধড়ধড় ধড়াস ধড়াস-ধড়াস ধড়াদ্ধড়, ধড়ফড় ধড়মড় ধপ ধপধপ ধপাধপ ধমাস ধবধব ধম ধমধম ধমাদ্ধম ধস ধসধস ধাঁ ধাঁ-ধাঁ ধিকি ধিকিধিকি ধিনধিন ধুকধুক ধুম ধুমধুম ধুমধাম ধুমাধুম ধুপধাপ ধূ-ধূ ধেইধেই। ধড়ফড়ে ধপধপে ধবধবে ধসধসে ॥

নড়নড় নড়বড় নড়র-বড়র নিশপিশ নিড়বিড়। নন্নড়ে নড়বড়ে নিশপিশে নিড়বিড়ে ॥

পট পটপট পটাপট পটাৎ পটাস পটাস-পটাস পচপচ পড়পড় (ছেঁড়া) প্‌ড়াস প্‌ড়াৎ প্‌ড়াং প্‌ড়াংপ্‌ড়াং প্‌ড়িংপ্‌ড়িং পিটপিট পিলপিল পিঁপি পুটি পুটপুট পোঁপোঁ প্যাঁকপ্যাঁক প্যাঁচপ্যাঁচ প্যানপ্যান প্যাঁটপাঁট পটাং পটাংপটাং। পিটপিটে পুসপুসে প্যাঁচপেঁচে প্যানপেনে ॥

ফটফট ফটাফট ফড়ফড় ফড়র-ফড়র ফটাৎ ফটাস ফড়াৎ ফড়াস ফনফন ফরফর ফস ফসফস ফসাফস ফিক ফিকফিক ফিটফাট ফিনফিন ফুটফুট ফুটফাট ফুরফুর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ফুস ফুসফুস ফুসফাস ফোঁফা ফোঁফোঁ ফোঁৎফোঁৎ ফোঁচফোঁচ ফোঁস ফোঁসফোঁস ফ্যাফ্যা ফ্যাকফ্যাক ফ্যাঁচ ফ্যাঁচফ্যাঁচ ফ্যাঁচর-ফ্যাঁচর ফ্যাটফ্যাট ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে ফিনফিনে ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যালফেলে ॥

বকবক বকর-বকর বজর-বজর বনবন বড়বড় বড়র-বড়র বিজবিজ বিজির-বিজির বিড়বিড় বিড়ির-বিড়ির বুগবুগ বোঁ বোঁ-বোঁ ব্যাজব্যাজ ॥

ভকভক ভড়ভড় ভনভন ভুকভুক ভুটভাট ভুরভুর ভুড়ুক-ভুড়ুক ভোঁ ভোঁ-ভোঁ ভ্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ ভ্যানভ্যান ভ্যানভেনে ॥

মচ মচমচ মট মটমট মড়মড় মড়াৎ মসমস মিটমিট মিটিমিটি মিনমিন মুচ মুচমুচ ম্যাড়ম্যাড় ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে মিটমিটে মিনমিনে মিসমিসে মুচমুচে ম্যাড়মেড়ে ম্যাজমেজে ॥

রী-রী রিমঝিম রিনিঝিনি রুনুঝুনু রৈরৈ রগরগে ॥

লকলক লটপট লিকলিক। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে ॥

সট সটসট সনসন সড়সড় সপসপ সপাসপ সরসর সিরসির সাঁ সাঁ-সাঁ সাঁইসাঁই সুট সুটসুট সুড়সুড়

সুড়ুং সোঁ-সোঁ স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁৎসেঁতে॥

হট হটহট হটর-হটর হড়হড় হড়াৎ হড়বড় হড়র-হড়র হনহন হলহল হড়র-বড়র হাউমাউ হা-হা হাউহাউ হাঁ-হাঁ হাঁসফাঁস হিহি হিড়হিড় হু-হু হুটহাট হুড়হুড় হুড়মুড় হুড়ুৎ হুপহাপ হুস হুসহুস হুসহাস হো হো হোহো হ্যাঁহ্যাঁ (কুকুর) হ্যাটহ্যাট হ্যাংহ্যাং হাপ্পু-হুপুস হাপুড়-হুপুড় হুড়োমুড়ি॥

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষাতেও আছে; যথা bang thud ding-dong hiss ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাংলাভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নহে, সর্বত্রই পাওয়া যায়। 'মিষ্ট' বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে মিষ্ট মুখ, মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র-জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরেজিতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সংকীর্ণ থাক্, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। মিষ্ট শব্দ মুখ্যত স্বাদকে বুঝাইলেও এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলাভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলাভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্বেই আভাস দিয়াছি, বাংলাভাষায় সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশস্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলাভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। তীরবেগে চলিয়া গেল, বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে; সাঁ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিত ভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার আর-এক সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সাঁ করিয়া গেল, এবং গটগট করিয়া গেল, উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে; অথচ উভয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচকচ করিয়া কাটা; কচাকচ কাটিয়া যাওয়া; কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাং করিয়া, কটাস করিয়া, ক্যাঁচ করিয়া, ঘ্যাচ ঘ্যাচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া, এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কাটা সম্বন্ধে যতপ্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরেজিতে গমনক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে— creep crawl sweep totter waddle ইত্যাদি। বাংলায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না; ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধান তিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। খটখট করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট

করিয়া, খুরখুর করিয়া, খুটুস খুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধদ্ধড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া— চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।

চলা কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য নহে ; কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে-সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাও বাংলাভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয় ; যেমন পাতলা জিনিসকে ফিনফিন ফুরফুর ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। পাতলা ফিনফিন করছে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোনো শব্দ করিতেছে, অথচ তদ্দ্বারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছিপছিপে কথাটাও ঐরূপ ; সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এইজন্য ছিপছিপে লোক বস্তুত কোনো শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে-সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত ; কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোনো অদ্ভুত বিশেষত্ববশত আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি ; অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি ; যথা, কটকট কনকন করকর (চোখের বালি) কুটকুট গা-ঘ্যানঘ্যান (বা গা-ঘিনঘিন) গা-চচ্চড় চিনচিন গা-ছমছম ঝিনঝিন দবদব ধকধক বুক-দুদ্দুড় ম্যাজম্যাজ সুড়সুড় সড়সড় রীরী। ইংরেজিতে এইরূপ শারীরিক বেদনাসকলকে—throbbing gnawing boring crawling cutting tearing bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাওয়া, কামড়ানো প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমত ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার জো নাই। ঐ-সকল ধ্বনির সহিত ঐ-সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, গা মাটিমাটি করা, বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে কী তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না, অথচ, গা মাটিমাটি করা, কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাববহ।

সর্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন-কি, নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়োবাড়ি হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে— এই-সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ ; ইংরেজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্তত আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য। টকটকে টুকটুকে ডগডগে দগদগে রগরগে লাল ; ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যাকফেকে ধবধবে সাদা ; মিসমিসে কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে-লাল অত্যন্ত কড়া লাল সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাতক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়। কবির কর্ণে যেমন 'silent spheres' অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সংগীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে যে-আঘাত করে, তাহার যদি কোনো শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত

করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবত গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গবশত নিজের অর্থসম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনির দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জ্বলজ্বল শব্দ তাহার অন্যতর উদাহরণ ; জ্বলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী, সেই কারণে আমরা কোনো জিনিসকে 'জ্বলজ্বল হইতেছে' বলি না—'জ্বলজ্বল করিতেছে' বলি—এই করিতেছে ক্রিয়ার পূর্বে ধ্বনি শব্দ উহ্য। বাংলাভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুলকুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে শব্দ করে বলা বাহুল্য ; সাদা ধবধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেতপদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে একপ্রকার অশব্দিত শব্দ করে। কোনো বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন বলি ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ত দেওয়া আমার কর্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক— সেখানে মলিন ম্লান প্রভৃতি আর-কিছু বলিয়া কুলায় না।

চিকচিক গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে প্রসঙ্গ এ স্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনিমাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে, তাহাকে আমরা চিকচিক বলি ; আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয় তবে তাহা নীরবে চুকচুক শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুকচুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশত তাহার জ্যোতি একবার এক দিক হইতে একবার অন্য দিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক ঝিকঝিক বা ঝলঝল না করিয়া চিকমিক ঝিকমিক ঝলমল করিতে থাকে, অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন এক দিক হইতে কট এবং আর-এক দিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা কাঠিন্যের ঐক্য যেন আরো পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে ; ধপ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষজাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা নিযুক্ত। প্রথমত ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়, অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ঐ দলে ধরা যাইতে পারে ; যথা, মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূ ধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্মী। চকচকে জিনিস স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তকতক করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জ্বলজ্বলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে হউক, তাহার আভা আছে।

বাংলাভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট হইয়া বসা, গুম হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ হইয়া যাওয়া। গট গুম এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে ; যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ-ভাবের মধ্যেও একটি আবেগের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাসবোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরো যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সংকেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সংকেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সংকেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে-অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলাভাষায় এই-সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সংকেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশত সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন কর্তন পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কি না। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত; কচ এবং কট— তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন কচ, এবং গুরু অস্ত্রে কট। এই পর্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত; কঁ্যাচ খঁ্যাচ গঁ্যাচ ঘঁ্যাচ।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্যায়বিভাগে সহায়তা করিবেন এই আশা করি।

জ্যাবড়া ধ্যাবড়া অ্যাবড়া-খ্যাবড়া হিজিবিজি হাবজা-গোবজা হোমরা-চোমরা হেজিপেঁজি ঝাপসা ভাবসা ঝুপসি ঢ্যাপসা হোঁৎকা গোমসা ধুমসো ঘুপসি, মটকা মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, মুষড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণনামূলক খাঁটি বাংলাশব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসংকলনে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

১৩০৭

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত

প্রবন্ধ-আরম্ভে বলা আবশ্যক যে-সকল বাংলাশব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সংগত।

আজ পর্যন্ত বাংলা-অভিধান বাহির হয় নাই; সুতরাং বাংলাশব্দের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার দোষ এই যে, স্মৃতি অনেক সময় অযাচিত অনুগ্রহ করে, কিন্তু প্রার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রবন্ধে পদে পদে অসম্পূর্ণতা থাকিবে। আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধীসাধারণের উপর।

আমার পক্ষে সংকোচের আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশত বাংলাশব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাংলার দুটা-একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হই নাই। এ প্রবন্ধে পাঠকেরা আনাড়ির পরিচয় পাইবেন, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে আশা করিয়াই সাহিত্য-পরিষদে এই বাংলাভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] সুতরাং জ্ঞাতসারে পাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নূতন

১ বাংলা ব্যাকরণ— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৮, প্রথম সংখ্যা

পরিভাষা নির্মাণের ক্ষমতা নাই, অথচ না করিলেও লেখা অসম্ভব।

এইখানে একটা পরিভাষার কথা বলি। সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসংগত হয়; কারণ সংস্কৃতভাষায় ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়, বাংলায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোনো অর্থ নাই। অতএব অন্য ভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়।

ণিজন্তের প্রকৃতি কী। তাহাতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত দুইটি কর্তা থাকে। ফল পাড়িলাম; পতন-ব্যাপারের অব্যবহিত কর্তা ফল, কিন্তু তাহার হেতু-কর্তা আমি: কারয়তি যঃ স হেতুঃ— যে করায় সে-ই হেতু, সে-ই ণিজন্ত ধাতুর প্রথম কর্তা, এবং যাহার উপর সেই কার্যের ফল হয় সে-ই ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় কর্তা। হেতু-র একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম।

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত বাংলা ও কোন্‌গুলি সংস্কৃত, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন্ হয় না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, কিন্তু তাহা শতৃ প্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদিরূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে-সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলা-প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত রঞ্জিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বাংলায় ত প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই, সেইজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না; অতএব ত প্রত্যয় বাংলা-প্রত্যয় নহে।

হিন্দি পারসি প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে-সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমার ঐ একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবত হিন্দি বা পারসি; কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাকসই প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ওয়ান প্রত্যয় সেরূপ নহে। গাড়োয়ান দারোয়ান পালোয়ান শব্দ আমরা হিন্দি হইতে বাংলায় পাইয়াছি, প্রত্যয়টি পাই নাই।

অর্থাৎ যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনোপ্রকার আদানপ্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।

যে-সকল কৃৎতদ্ধিতের সাহায্যে বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়, বর্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ থাকিবে। ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা, চলা বলা সাঁৎরানো বাঁচানো ইত্যাদি। পদার্থবাচক যথা, হাতি ঘোড়া জিনিসপত্র ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন হয় নাই।

অ প্রত্যয়

এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়; যথা, কট্‌মট্ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইয়া কটমট (কটমট ভাষা, কটমট দৃষ্টি), টল্‌মল্ হইতে টলমল।[1]

আসন্নপ্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে-বিশেষণ হয় তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা, পড়্ ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্ ধাতু হইতে পাক-পাক, মর্ ধাতু হইতে মর-মর, কাঁদ্

১ দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না: যথা, আমরা টকটক লাল বা খটখট রৌদ্র বা টনটন ব্যথা বলি না, সে স্থলে টক্‌টকে টন্‌টনে বলিয়া থাকি। কট্‌মট্ টল্‌মল্ জ্বল্‌জ্বল্ শব্দ হইতে বিকল্পে— কটমট কট্‌মটে, টলমল টল্‌মলে, জ্বলজ্বল জ্বল্‌জ্বলে হইয়া থাকে।

ধাতু হইতে কাঁদ-কাঁদ। অন্য অর্থে হয় না ; যথা, কাটাকাটা (কথা), পাকাপাকা ছাড়াছাড়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খাস্ বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে। বাংলা-উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে 'ভাল' শব্দ ভাল্ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা অকারান্ত উচ্চারণ করি।[১] বস্তুত বাংলায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ অতি অল্পই দেখা যায়, অধিকাংশই বিশেষণ ; যথা, বড় ছোট মাঝ (মাঝো মেঝো) ভাল কাল খাট (ক্ষুদ্র) জড় (পুঞ্জীকৃত) ইত্যাদি।

বাকি অনেকগুলা বিশেষণই আকারান্ত ; যথা, কাঁচা পাকা বাঁকা তেড়া সোজা সিধা সাদা মোটা নুলা বোবা কালা ন্যাড়া কানা তিতা মিঠা উঁচা বোকা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়

পূর্বোক্ত আকারান্ত বিশেষণগুলিকে আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া অনুমান করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাংলায় বিশেষণ হইবার সময় কানা হইল, মৃত হইতে মড়া হইল, মহৎ হইতে মোটা হইল, সিত হইতে সাদা হইল। এই আকারগুলি উচ্চারণের নিয়মে আপনি আসে নাই। বিশেষণে হলন্ত প্রয়োগ বর্জন করিবার একটা চেষ্টা বাংলায় আছে বলিয়াই যেখানে সহজে অন্য কোনো স্বরবর্ণ জোটাইতে পারে নাই, সে-সকল স্থলে আ প্রত্যয় যোগ করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার 'স্বার্থে ক' বাংলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘোটক ঘোড়া, মস্তক মাথা, পিষ্টক পিঠা, কণ্টক কাঁটা, চিপিটক চিঁড়া, গোপালক গোয়ালা, কুল্যক কুলা।

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই ; যেমন তক্ত তক্তা, বাঘ বাঘা, পাট পাটা, ল্যাজ ল্যাজা, চোঙ চোঙা, চাঁদ চাঁদা, পাত পাতা, ভাই ভাইয়া (ভায়া), বাপ বাপা, থাল থালা, কালো কালা, তল তলা, ছাগল ছাগ্‌লা, বাদল বাদ্‌লা, পাগল পাগ্‌লা, বামন বাম্‌না, বেল (ফুল) বেলা, ইলিশ ইল্‌শা (ইল্‌শে)।

এই আ প্রত্যয়যোগে অনেকস্থলে অবজ্ঞা বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করে, বিশেষত মানুষের নাম সম্বন্ধে ; যথা, রাম রামা, শাম শামা, হরি হরে (হরিয়া), মধু মোধো (মধুয়া), ফটিক ফট্‌কে (ফট্‌কিয়া)।

দ্রষ্টব্য এই যে, সকল নামে আ প্রত্যয় হয় না ; যাদবকে যাদ্‌বা, মাধবকে মাধ্‌বা বলে না। শ্রীশ, প্রিয়, পরান প্রভৃতিও এইরূপ। বাংলা নামের বিকার সম্বন্ধে কোনো পাঠক আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে আনন্দিত হইব।

স্বার্থে আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া গেছে, তাহাতে অর্থের পরিবর্তন হয় না। আবার, আ প্রত্যয়ে অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটে এমন উদাহরণও আছে ; যেমন, হাত হইতে হাতা (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা, অর্থাৎ হাতের মতো পদার্থ), ঠ্যাঙ হইতে ঠ্যাঙা (ঠ্যাঙের ন্যায় পদার্থ), ভাত হইতে ভাতা (খোরাকি), বাস হইতে বাসা, ধোব হইতে ধোবা, চাষ হইতে চাষা।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয় ; বাঁধ্ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া বাঁধা, ঝর্ ধাতুর উত্তর্ আ প্রত্যয় করিয়া ঝরা। ইহারা বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ যেমন, বাঁধা হাত ; বিশেষ্য যেমন, হাত বাঁধা।

দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ mono-syllabic ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে ; যেমন ধর্ মার্ চল্ বল্ হইতে ধরা মারা চলা বলা। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না ; যেমন, আঁচড় হইতে আঁচ্‌ড়া আছাড় হইতে আছ্‌ড়া হয় না।

১ বাংলা অ অনেকস্থলেই হ্রস্ব ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি যত, উচ্চারণ করি যতো ; লিখি বড়, উচ্চারণ করি বড়ো। উড়িয়ার বড় বাঙালির বড়-র সহিত তুলনা করিলে দুই অকারের প্রভেদ বুঝা যাইবে।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিশেষণরূপে হইতে পারে ; যেমন, ধ্যাৎলা মাংস, কোঁক্ড়া চুল, বাঘ-আঁচ্ড়া গাছ, নেই আক্ড়া লোক (ন্যায়-আঁক্ড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল। আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দুই-একটি মনে পড়িতেছে ; তাওয়া (যাহাতে রুটিতে তা দেওয়া যায়), দাওয়া (দাবি, অর্থাৎ দাও বলিবার অধিকার), আছ্ড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে)।

বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হইয়া থাকে ; যথা তেলবিশিষ্ট তেলা, বেতালবিশিষ্ট বেতালা, বেসুরবিশিষ্ট বেসুরা, জলময় জলা, নুনবিশিষ্ট নোনা (লবণাক্ত), আলোকিত আলা, রোগযুক্ত রোগা, মলযুক্ত ময়লা, চালযুক্ত চালা (ঘর), মাটিযুক্ত মাটিয়া (মেটে), বালিযুক্ত বালিয়া (বেলে), দাড়িযুক্ত দাড়িয়া (দেড়ে)।

বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয় ; যথা, হাঁড়া (ক্ষুদ্র হাঁড়ি) ; নোড়া (লোষ্ট্র হইতে ; ক্ষুদ্র, নুড়ি)।

আন্ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত : যোগান্ চাপান্ চালান্ জানান্ হেলান্ ঠেসান্ মানান্। এগুলি ছাড়া একপ্রকার বিশেষ পদবিন্যাসে এই আন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ঠকা হইতে ঠকান্ শব্দ বাংলায় সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আমরা বলি, ভারি ঠকান্ ঠকেছি, অথবা, কী ঠকান্টাই ঠকিয়েছে। সেইরূপ, কী পিটানটাই পিটিয়েছে, কী ঢলান্টাই ঢলিয়েছে, এরূপ বিস্ময়সূচক পদবিন্যাসের বাহিরে পিটান্ ঢলান্ ব্যবহার হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পদার্থবাচকের দৃষ্টান্তও আছে ; যথা, বানান্ উঠান্ উনান্ উজান্ (ঊর্ধ্ব—উঝ+আন্) ঢালান্ (জলের) মাচান্ (মঞ্চ)।

আন্+অ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ অ প্রত্যয় করিয়া বাংলায় অনেকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়।

পূর্বে দেখানো গিয়াছে, একমাত্রিক ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়াবাচক দুই-অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সিদ্ধ হয় ; যেমন, ধরা মারা ইত্যাদি।

বহুমাত্রিকে আ প্রত্যয় না হইয়া আন্ ও তদুত্তরে অ প্রত্যয় হয় ; যেমন, চুল্কান (উচ্চারণ চুলকানো) কাম্ড়ান (কামড়ানো) ছটফটান (ছটফটানো) ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত নৈমিত্তিক ক্রিয়াপদকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত করিতে আন্+অ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ; যেমন করা শব্দ হইতে নৈমিত্তিক অর্থে করান, বলা হইতে বলান।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও দেখা যায় ; যেমন পড়া হইতে নৈমিত্তিক পাড়া, চলা হইতে চালা, গলা হইতে গালা, নড়া হইতে নাড়া, জ্বলা হইতে জ্বালা, মরা হইতে মারা, বহা হইতে বাহা, জরা হইতে জারা।

কিন্তু পড়া হইতে পড়ান, নড়া হইতে নড়ান, চলা হইতে চলান, ইহাও হয়। এমন-কি, নৈমিত্তিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যশব্দ চালা নাড়া পাড়া প্রভৃতির উত্তর পুনশ্চ আন্+অ যোগ করিয়া চালান পাড়ান নাড়ান হইয়া থাকে।

কিন্তু তাকান গড়ান (বিছানায়) আঁচান প্রভৃতি অনৈমিত্তিক শব্দ সম্বন্ধে কী বুঝিতে হইবে। তাকা গড়া আঁচা, হইল না কেন।

তাহার কারণ, এইগুলির মূল ধাতু একমাত্রিক নহে। দেখ্, একমাত্রিক ধাতু, তাহা হইতে 'দেখা' হইয়াছে ; কিন্তু তাকান শব্দের মূল ধাতুটি তাক্ নহে, তাহা তাকা, সেইজন্যই উক্ত ধাতুকে বিশেষ্য করিতে আন্+অ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। নামধাতুগুলিও আন্+অ প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে ; যেমন, লাথ্ হইতে লাথান, পিঠ্ হইতে পিঠান (পিটানো), হাত হইতে হাতান।

মূল ধাতু বহুমাত্রিক কি না, তাহার পরীক্ষার অন্য উপায় আছে। অনুজ্ঞায় আমরা দেখ্ ধাতুর উত্তর

'ও' প্রত্যয় করিয়া বলি, দেখো, কিন্তু তাকো বলি না ; তাকা ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি তাকাও। গঠন করো, বলিতে হইলে গড়্ ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়ো, কিন্তু, শয়ন করো, বুঝাইতে হইলে গড়া ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়াও।

'আমাদের বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি আকারান্ত, সেইজন্য পুনশ্চ তাহার উত্তর আ প্রত্যয় না হইয়া আন্+অ প্রত্যয় হয়। মূল শব্দটি আট্‌কা বা চম্‌কা না হইলে অনুজ্ঞায় আট্‌কাও হইত না, চম্‌কাও হইত না। হিন্দিতে পাকড়্ শব্দের উত্তর ও প্রত্যয় হইয়া পাকড়ো হয় ; সেই শব্দই বাংলায় পাক্‌ড়া রূপ ধরিয়া পাকড়াও হইয়া দাঁড়ায়।

অন্ প্রত্যয়

দৃষ্টান্ত : মাতন্ চলন্ কাঁদন্ গড়ন্ (গঠনক্রিয়া) ইত্যাদি। ইহারা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ।

অন্ প্রত্যয়সিদ্ধ পদার্থবাচক শব্দের উদাহরণও মনে পড়ে ; যেমন, ঝাড়ন্ বেলুন্ (রুটি বেলিবার) মাজন্ গড়ন্ (শরীরের) ফোড়ন্ ঝোঁটন্ (ঝুঁটি হইতে) পাঁচন্।

অন+আ প্রত্যয়

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ আ প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহারা বিকল্পে বিশেষ্যও হয় ; যেমন, পাওন্ হইতে পাওনা, দেওন্ হইতে দেনা, ফেলন্ হইতে ফেল্‌না, মাগন্ হইতে মাগ্‌না, শুকন্ হইতে শুক্‌না।

পদার্থবাচক বিশেষ্যেরও দৃষ্টান্ত আছে ; যেমন, বাট্‌না কুট্‌না ওড়্‌না ঝর্‌না খেলনা বিছানা বাজ্‌না ঢাক্‌না।

ই প্রত্যয়

ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে : গোলাপি বেগুনি চালাকি চাকরি চুরি ডাক্তারি মোক্তারি ব্যারিস্টারি মাস্টারি ; খাড়াই (খাড়া পদার্থের ধর্ম) লম্বাই চৌড়াই ঠাণ্ডাই আড়ি (আড় অর্থাৎ বক্র হইবার ভাব)।

অনুকরণ অর্থে : সাহেবি নবাবি।

দক্ষ অর্থে : হিসাবদক্ষ হিসাবি, আলাপদক্ষ আলাপি, ধ্রুপদদক্ষ ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে : দামবিশিষ্ট দামি, দাগবিশিষ্ট দাগি, রাগবিশিষ্ট রাগি, ভারবিশিষ্ট ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে : হাঁড়ি পুঁটুলি কাঠি (ইহাদের বৃহৎ— হাঁড়া পোঁটলা কাঠ)।

দেশীয় অর্থে : মারাঠি গুজরাঠি আসামি পাটনাই বস্‌রাই।

স্বার্থে : হাস হাসি, ফাঁস ফাঁসি, লাথ লাথি, পাড় (পুকুরের) পাড়ি, কড়া কড়াই (কটাহ)।

দিননির্দেশ অর্থে : পাঁচই ছউই সাতই আটই নওই দশই, এরূপে আঠারই পর্যন্ত।

আ+ই প্রত্যয়

ক্রিয়াবাচক : বাছাই যাচাই দলাই-মালাই (ঘোড়াকে) খোদাই ঢালাই ধোলাই ঢোলাই বাঁধাই পালটাই।

পদার্থবাচক : মরাই (ধানের) বালাই (বালকের অকল্যাণ) মিঠাই।

মনুষ্যের নাম : বলাই কানাই নিতাই জগাই মাধাই।

ধর্ম : বড়াই (বড়ত্ব) বামনাই পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম)।

ই+আ প্রত্যয়

জাল শব্দ ই প্রত্যয়যোগে জালি, স্বার্থে আ— জালিয়া (জেলে)। এইরূপ, কোঁদলিয়া (কুঁদুলে) জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে) গোবরিয়া (গুবরে), স্যাঁৎস্যাঁতিয়া (স্যাঁৎসেঁতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়

চালু (চলনশীল) ঢালু (ঢাল-বিশিষ্ট) নিচু (নিম্নগামী) কলু (ঘানিকল-বিশিষ্ট), গাড়ু (গাগর শব্দ হইতে গাগরু) আগুপিছু (অগ্রবর্তী-পশ্চাদ্বর্তী)।

মানুষের নাম : যাদব হইতে যাদু, কালা হইতে কালু, শিব হইতে শিবু, পাঁচকড়ি হইতে পাঁচু।

উ+আ প্রত্যয়

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো) জাঁকুয়া (জেঁকো) বাতুয়া (বেতো) পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে : মাছুয়া (মেছো) বুনুয়া (বুনো) ঘরুয়া (ঘোরো) মাঠুয়া (মেঠো)।

নির্মিত অর্থে : কাঠুয়া (কেঠো) ধানুয়া (ধেনো)।

আ+ও প্রত্যয়

ঘেরাও চড়াও উধাও ফেলাও (ফলাও)।

ও+আ প্রত্যয়

বাঁচোয়া ঘরোয়া চড়োয়া ধরোয়া আগোয়া।

অন্+ই প্রত্যয়

মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় কেবল একমাত্রিক ধাতুতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; যেমন, ধর্ হইতে ধর্না (ধন্না), কাঁদ্ হইতে কাঁদনা (কান্না)। কিন্তু বহুমাত্রিক শব্দের উত্তর এরূপ হয় না। আমরা কামড়ানা কটকটানা বলি না, তাহার স্থলে কামড়ানি কটকটানি বলিয়া থাকি ; অর্থাৎ অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় না করিয়া ই প্রত্যয় করিয়া থাকি।

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর ই প্রত্যয় একমাত্রিকেও হয় ; যথা, মাতনি (মাতুনি) বাঁধনি (বাঁধুনি) জ্বলনি (জ্বলুনি) কাঁপনি (কাঁপুনি) দাপনি (দাপুনি) আঁটনি (আঁটুনি)।

মূল ধাতুটি হলন্ত কিংবা আকারান্ত, তাহা এই অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে জানা যাইতে পারে। তাকনি না হইয়া তাকানি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে মূল ধাতুটি তাকা। এইরূপ, আছড়া চট্কা কাম্ড়া ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয়ভাব ব্যক্ত করে ; যথা, বকুনি ধমকানি চমকানি হাঁপানি শাসানি টাটানি নাকানি-চোবানি কাঁদুনি জ্বলুনি কাঁপুনি ফোঁস্লানি ফোঁপানি গোঙানি ঘ্যাঙানি খ্যাঁচকানি কোঁচ্কানি (ভুরু) বাঁকানি (মুখ) খিঁচুনি (দাঁত) খ্যাকানি ঘস্ড়ানি ঘুরুনি (চোখ) চাপুনি চেঁচানি ভ্যাঙানি (মুখ) রগড়ানি রাঙানি (চোখ) লাফানি ঝাঁপানি।

ব্যতিক্রম : বাঁধুনি (কথার) শুনানি দুলুনি বুনুনি (কাপড় বা ধান) বাছনি (বাছাই)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে যেগুলি অসুখব্যঞ্জক তাহার উত্তরেই অন্+ই প্রত্যয় হয় ; যথা, দব্দবানি ঝন্ঝনানি কন্কনানি টন্টনানি ছট্ফটানি কুট্কুটুনি ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার কয়েকটি পদার্থবাচক বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয় ; দৃষ্টান্ত, ছাঁকনি নিড়নি চালুনি বিননি (চুলের) চাট্নি ছাউনি নিছনি তলানি (তরলপদার্থের তলায় যাহা জমে)।

ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ : রাঁধুনি (ব্রাহ্মণ) ঘুম-পাড়ানি পাট-পচানি ইত্যাদি।

না প্রত্যয়

না প্রত্যয়যোগে বর্ণের বিশেষ পরিবর্তন হয় না ; পাখা পাখ্না, জাব (গরুর) জাবনা, ফাতা (ছিপের) ফাৎনা, ছোট ছোটনা (ধান)।

আনা প্রত্যয়

বাবুয়ানা সাহেবিয়ানা নবাবিয়ানা মুন্সিয়ানা। ই প্রত্যয় করিয়া হিঁদুয়ানি।

ল্ প্রত্যয়

কাঁক্ড়োল (কাঁকুড় হইতে) হাবল খাবল পাগল পাকল (পাক অর্থাৎ ঘূর্ণাবিশিষ্ট) হাতল মাতল (মত্ত হইতে মাতা)।

র্ প্রত্যয়

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র্ প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায় ; যথা, গজ্‌গজ্ হইতে গজর্ গজর্, বক্‌বক্ হইতে বকর্ বকর্, নড়্‌বড়্ হইতে নড়র্ বড়র্, কট্‌মট্ হইতে কটর্ মটর্, ঘ্যান্‌ঘ্যান্ হইতে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুটকুট হইতে কুটুর্ কুটুর্।

আল্ প্রত্যয়

দয়াল্ কাঙাল্ (কাঙ্‌ক্ষালু) বাচাল্ আঁঠিয়াল্ আড়াল মিশাল।

ল+আ

মেঘলা বাদলা পাতলা শামলা আধলা ছ্যাৎলা একলা দোকলা চাকলা।

ল+ই+আ

দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে) আগলিয়া (আগ্‌লে) পাছলিয়া (পাছ্‌লে) ছুটলিয়া (ছুট্‌লে)।

আড়্

জোগাড় লাগাড় (নাগাড়) সাবাড় লেজুড় খেলোয়াড় উজাড়।

আড়্+ই+আ

বাসাড়িয়া (বাসাড়ে) জোগাড়িয়া (জোগাড়ে) মজাড়িয়া (মজাড়ে) হাতাড়িয়া (হাতুড়ে হাতড়াইয়া বেড়ায়) কাঠুরে হাটুরে ঘেসুড়ে ফাঁসুড়ে চাষাড়ে।

রা ও ড়া

টুকরা চাপড়া ঝাঁকড়া পেটরা চামড়া ছোকরা গাঁঠরা ফোঁপরা ছিবড়া থাবড়া বাগড়া খাগড়া। বহু অর্থে : রাজারাজড়া গাছগাছড়া কাঠকাঠরা।

আরি

জুয়ারি কাঁসারি চুনারি পূজারি ভিখারি।

আরু

সজারু (শল্যবিশিষ্ট জন্তু) লাফারু (কোনো কোনো প্রদেশে খরগোশকে বলে) দাবাড়ু (দাবা খেলায় মত্ত)।

ক্

মড়ক চড়ক মোড়ক বৈঠক চটক ঝলক চমক আটক।

আক্ উক্ ইক্

এই-সকল প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়ার বিশেষণগুলি হয় তাহাতে দ্রুতবেগ বুঝায় ; যথা, ফুড়ুক্ তিড়িক্ তড়াক্ চিড়িক্ ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক্+আ

মট্‌কা বোঁচ্‌কা হাল্‌কা বোঁট্‌কা হোঁৎকা উচক্‌কা। ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় করিয়া মট্‌কি, বুঁচ্‌কি ইত্যাদি হয়।

ক্+ই+আ

শুট্‌কিয়া (শুট্‌কে) পুঁটকিয়া (পুঁট্‌কে) পুঁচকিয়া (পুঁচ্‌কে) ফচ্‌কিয়া (ফচ্‌কে) ছোট্‌কিয়া (ছুট্‌কে)।

উক্

মিথ্যুক লাজুক মিশুক।

গির্+ই

গির্ প্রত্যয়টি বাংলায় চলে নাই। তাগাদ্গির প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশী। কিন্তু এই গির্ প্রত্যয়ের সহিত ই প্রত্যয় মিশিয়া গিরি প্রত্যয় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্বত্র হয় না। কামারের ব্যবসায়কে কেহ কামারি বলে না, বলে কামারগিরি। এই গির্+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়; অ্যাটর্নিগিরি স্যাকরাগিরি মুচিগিরি মুটেগিরি।

অনুকরণ অর্থে: বাবুগিরি নবাবগিরি।

দার্

দোকানদার চৌকিদার রঙদার বুটিদার জেল্লাদার যাচনদার চড়নদার ইত্যাদি।

ইহার সহিত ই প্রত্যয় যুক্ত হইয়া দোকানদারি ইত্যাদি বৃত্তিবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি হয়।

দান্

বাতিদান পিকদান শামাদান আতরদান। স্বার্থে ই প্রত্যয়যোগে বাতিদানি পিকদানি আতরদানি হইয়া থাকে।

সই

হাতসই মাপসই প্রমাণসই মানানসই ট্যাকসই।

পনা

বুড়াপনা ন্যাকাপনা ছিব্লেপনা গিন্নিপনা।

ওলা বা ওয়ালা

কাপড়ওয়ালা ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর

এমনতর যেমনতর কেমনতর।

অৎ

মানৎ বসৎ ঘুরৎ ফেরৎ গলৎ (গলদ)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয়ে দ্রুতবেগ বুঝায়: সড়াৎ ফুড়ৎ পটাৎ খটাৎ।

অৎ+আ

ধর্তা ফের্তা পড়্তা জান্তা (সবজান্তা)।

তা

বিশিষ্ট অর্থে, যথা: পান্তা নোন্তা তল্তা (তরল্তা, তরল বাঁশ)। আওতা নাম্তা শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝা যায় না।

অৎ+ই

ফির্তি চল্তি উঠ্তি বাড়্তি পড়্তি চুক্তি ঘাট্তি গুন্তি।

অৎ+আ+ই

খোল্তাই ধর্তাই।

অন্ত

জিয়ন্ত ফুটন্ত চলন্ত।

মন্ত

লক্ষ্মীমন্ত বুদ্ধিমন্ত আক্কেলমন্ত।

অন্‌দা (?)

বাসন্দা (অধিবাসী) মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন)। বলা উচিত এ-প্রত্যয়টির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই।

ট্

চাপট্ (চৌচাপট্) সাপট্ ঝাপট্ দাপট্।

ট্+ই

চিম্‌টি।

ট্র

ভরট্র (নদীভরট্র, খালভরট্র জমি)।

আ+ট্

জমাট্ ভরাট্ ঘেরাট্।

টা

চ্যাপটা ল্যাঙ্‌টা ঝাপ্‌টা ল্যাপ্‌টা চিম্‌টা শুক্‌টা।

আট্+ই+আ

রোগাটিয়া (রোগাটে) বোকাটিয়া (বোকাটে) তামাটিয়া (তামাটে) ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে) ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে) বামন্‌টিয়া (বেঁটে)।

অং আং ইং

ভড়ং ভুজং-ভাজাং চোং (নল) খোলাং (খোলাং কুচি) তিড়িং। বড়াং, কোনো কোনো জেলায় অহংকার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে।

অঙ্গ আঙ্গ অঙ্গিয়া

সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গি সুড়ুঙ্গে কুলঙ্গি ধিঙ্গি ধেড়েঙ্গে বিরিঙ্গি (বৃহৎ পরিবারকে কোনো কোনো প্রদেশে 'বিরিঙ্গি গুষ্টি' বলে)।

চ চা চি

আল্‌গচ (আলগা ভাব) ল্যাংচা (খোঁড়ার ভাব) ভ্যাংচা (ব্যাঙের ভাব) ভাংচি খিম্‌চি ঘামাচি তাড়্‌চা (তির্যক ভাব)। আধার অর্থে : ধুনচি ধুপচি খুঞ্চি চিলিম্‌চি খাতাঞ্চি মশাল্‌চি।

ক্ষুদ্র অর্থে : ব্যাঙাচি নলচি (হুঁকার) কঞ্চি কুচি ; মোচা (কলার মোচা, মুকুলচা হইতে মোচা) ; মোচার ক্ষুদ্র মুচি।

অস্

খোলস্ মুখস্ তাড়স্ ঢ্যাপস্।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়ে স্থূলতা ও ভার বুঝায়— ধপ্ হইতে ধপাস্ ; ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, ধড়াস্ করিয়া পড়া— অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া পড়া ; খট্ এবং খটাস্ পট্ এবং পটাস্ শব্দের সূক্ষ্ম অর্থভেদ নির্দেশ করিতে গেলে পাঠকদের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করি।

সা

চোপ্‌সা গোম্‌সা ঝাপ্‌সা ভাপ্‌সা চিম্‌সা পান্‌সা ফেন্‌সা এক্‌লা খোলসা মাকড়্‌সা কাল্‌সা।

সা+ইয়া

ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে), লাল্চে সম্ভবত লাল্সে কথার বিকার, কাল্সিটে—কাল+সা+ইয়া+টা=কাল্সিয়াটা কাল্সিটে।

আম

অনুকরণ অর্থে : বুড়ামো ছেলেমো পাগ্লামো জ্যাঠামো বাঁদরামো।
ভাব অর্থে : মাত্লামো, ঢিলেমো আল্সেমো।

আম+ই

বুড়ামি মাত্লামি ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গে ই

ছুঁড়ি ছুক্‌রি বেটি খুড়ি মাসি পিসি দিদি পাঁঠি ভেড়ি বুড়ি বাম্‌নি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি

কলুনি তেলিনি গয়লানি বাঘিনি মালিনি ধোবানি নাপ্‌তিনি কামার্‌নি চামার্‌নি পুরুত্‌নি মেত্‌রানি তাঁতনি ঠাকুরানি চাক্‌রানি উড়েনি কায়েত্‌নি খোট্টানি মুসলমান্‌নি জেলেনি।

বাংলা কৃৎ তদ্ধিত আমার যতগুলি মনে পড়িল লিখিলাম। নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে ; সেগুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, ততই কাজে লাগিবে।

প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করাও বাকি রহিল। এ সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার হ্যর্নলে-রচিত Comparative Grammar of the Gaudian Languages পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন।

প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ করিয়াছেন, প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়। তাহারা কেন যে কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মন্ত প্রত্যয় কেনই-বা আক্কেল শব্দকে আশ্রয় করিয়া আক্কেলমন্ত হইবে, অথচ চালাকি শব্দের সহযোগে চালাকিমন্ত হইতে পারিল না, তাহা কে বলিবে। নি যোগে বহুতর বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে— কামারনি খোট্টানি ইত্যাদি। কিন্তু বদ্যিনি (বৈদ্য-স্ত্রী) কেহ তো বলে না ; উড়েনি বলে, কিন্তু পঞ্জাবিনি বা শিখিনি বা মগিনি বলে না। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুরনি বেড়ালনি হয় না। প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়। পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঠি হয়, মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ-সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য।

কোন্ প্রত্যয়যোগে শব্দের কী প্রকার রূপান্তর হয় তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া লেখা আবশ্যক। নিতান্তই সময়াভাববশত আমি সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি ; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় দেড়ে ; টোল শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় টুলো ; মধু শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় মোধো ; লুন্ শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় লোনা ; জ্বল্ শব্দের উত্তর অন্+ই প্রত্যয় করিলে হয় জ্বলুনি, কোঁদল শব্দের উত্তর ই+আ প্রত্যয় করিলে হয় কুঁদুলে।

কতকগুলি প্রত্যয় আমি আনুমানিক ভাবে দিয়াছি। সেগুলিকে প্রত্যয় বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু শব্দ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রমাণ করিতে পারি নাই। যেমন, অং প্রত্যয় ; ভুজং ভড়ং প্রভৃতি শব্দের অং বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা বাংলায় চলিত নাই। ভড়্

শব্দ নাই বটে, কিন্তু ভড়কা আছে, ভড়ং এবং ভড়কের অর্থসাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, ভড়্ বলিয়া একটা আদিশব্দ ছিল, তাহার উত্তরে অক্ করিয়া ভড়ক্ ও অং করিয়া ভড়ং হইয়াছে। বড়াং শব্দে এই মত সমর্থন করিবে। আমার কাল্না-প্রদেশীয় বন্ধুগণ বলেন, তাঁহারা বড়াই শব্দের স্থলে বড়াং সর্বদাই ব্যবহার করেন ; তাহাতে বুঝা যায় বড়ো শব্দের উত্তর যেমন আ+ই প্রত্যয় করিয়া বড়াই হইয়াছে, তেমনই আং প্রত্যয় করিয়া বড়াং হইয়াছে— মূল শব্দটি বড়ো, প্রত্যয় দুইটি আই ও আং।

প্রত্যয়গুলি কী ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহাও বিচারের দ্বারা ক্রমশ স্থির হইতে পারিবে। যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ-বর্জিত, সা প্রত্যয় স+আ অথবা সা, এ-সমস্ত নির্ণয় করিবার ভার ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতদের উপর নিক্ষেপ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

১৩০৮

ভাষার ইঙ্গিত

বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলাভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয় ; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজি হইবে তবু বস্ত্র ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না, তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে ; তেমনই আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ মাত্র থাকে। এরূপ বেনামিতে বিদ্যালাভ ভালো কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলাভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।

এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

সেই ভেদগুলি ঠিক হইয়া গেলে ঐক্যগুলি কি বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলাভাষা বাঙালির কাছে

ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলাভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।

ভাষার অমুক ব্যবহার বাংলার পশ্চিমে আছে পূর্বে নাই বা পূর্বে আছে পশ্চিমে নাই, এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্বেই আভাস দিয়াছি, ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলাভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না ; আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গি থাকে, এমনই করিয়া কাজ চালাইতে হয়। কতকটা অর্থ এবং কতকটা ইঙ্গিতের উপরে আমরা নির্ভর করি।

আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইশারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে-সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না, তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত-বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত-বাক্যগুলি অভিধানব্যাকরণের বাহিরে বাস করে, কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে নহিলে চলে না।

বাংলাভাষায় এই ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর-কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।

যে-সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোনো অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে, তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে ; যেমন ধাঁ সাঁ চট্ খট্ ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনির অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সকল সময় বাস্তবধ্বনির অনুকরণ নহে, অনেক সময় ধ্বনির কল্পনামাত্র। মাথা দব্দব্ করিতেছে, টন্‌টন্ করিতেছে, কন্‌কন্ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে বেদনাবোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্ করিতেছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করিতেছে, এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয় এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না ; এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিসকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগুণসম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয়, কিন্তু, লাল টুক্‌টুক্ করিতেছে বলিলে সেই লাল রঙ আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত, ইহা বোবার ভাষা।

বাংলাভাষায় এইরূপ অনির্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলকশব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রঙ লইয়া বসিলে চলে না, নানা রকমের মিশ্র রঙ, সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরেজিভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন, walk run hobble waggle wade creep crawl ইত্যাদি ; বাংলা লিখিত ভাষায় কেবল দ্রুতগতি ও মন্দগতি দ্বারা এই-সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কথিত ভাষা লিখিত ভাষার মতো বাবু নহে, তাহাকে যেমন করিয়া হউক প্রতিদিনের নানান কাজ চালাইতে হয় ; যতক্ষণ বোপদেব পাণিনি অমরকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম আসিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া না দেন ততক্ষণ কাত হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহার চলে না ; তাই সে নিজের বর্ণনার ভাষা নিজে বানাইয়া লইয়াছে, তাই তাহাকে কখনো সাঁ করিয়া, কখনো গট্‌গট্ করিয়া, কখনো খুট্‌স্ খুট্‌স্ করিয়া, কখনো নড়বড় করিতে করিতে, কখনো সুড়্‌সুড়্ করিয়া, কখনো থপ্‌থপ্ এবং কখনো থপাস্ থপাস্ করিয়া চলিতে হয়। ইংরেজিভাষা laugh, smile, grin, simper, chukle করিয়া নানাবিধ

আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশ করে ; বাংলাভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া, ফিক্ করিয়া এবং মুচকিয়া হাসে। মুচকে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান শব্দের অর্থ বাঁকান, বাঁকাইতে গেলে যে মচ্ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচকাইয়া রাখিলে তাহা মুচকে হাসিরূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে।

বাংলাভাষার এই শব্দগুলি প্রায়ই জোড়াশব্দ। এগুলি জোড়াশব্দ হইবার কারণ আছে। জোড়াশব্দে একটা কালব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধূধূ করিতেছে ধবধব করিতেছে, বলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল নাই ; যেমন, ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি।

যখন ধাঁ ধাঁ, সাঁ সাঁ, বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনরাবর্তন বুঝায়।

'এ' প্রত্যয় যোগ করিয়া এই-জাতীয় শব্দগুলি হইতে বিশেষণ তৈরি হইয়া থাকে ; যেমন, ধব্‌ধবে টক্‌টকে ইত্যাদি।

টকটক ঠকঠক প্রভৃতি কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাঝখানে আকার যোগ করিয়া উহারই মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটানো হইয়া থাকে ; যেমন, কচাকচ কটাকট কড়াক্কড় কপাকপ খচাখচ খটাখট খপাখপ গপাগপ ঝনাজ্‌ঝন টকাটক টপাটপ ঠকাঠক ধড়াধ্বড় ধপাধপ, ধমাধ্বম পটাপট ফসাফস।

কপকপ এবং কপাকপ, ফসফস এবং ফসাফস, টপটপ এবং টপাটপ শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র আকারযোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, তাহা কোনো বিদেশীকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে বোঝানো শক্ত। ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক করিয়া তাহার পরে বলসঞ্চয়পূর্বক পুনর্বার দ্বিতীয়বার ঠক করা ; মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকার যোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলাভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের মতো ব্যবহার করিয়াছে। সে-সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সে-ই তাহার সূক্ষ্মতম মর্মটুকু বুঝিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে লক্ষ করিবার বিষয় আর-একটি আছে। আদ্যক্ষরে যেখানে অকার আছে সেইখানে পরবর্তী অক্ষরে আকার-যোজন চলে, অন্যত্র নহে।

যেমন টকটক হইতে টকাটক হইয়াছে, কিন্তু টিকটিক হইতে টিকাটিক বা ঠুকঠুক হইতে ঠুকাঠুক হয় না। এইরূপে মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, বাংলাভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলির কতকগুলি কঠিন বিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর-এক জায়গায় প্রয়োগ করিলে আর-একরকমের সুর বাহির হয় ; তাহার দৃষ্টান্ত, টুকটাক ঠুকঠাক খুটখাট ভুটভাট দুড়দাড় কুপকাপ গুপগাপ ঝুপঝাপ টুপটাপ ধুপধাপ হুপহাপ দুমদাম ধুমধাম ফুসফাস হুসহাস।

এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট। যখন বলি, টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

আমরা এতক্ষণ যে-সকল জোড়াকথার দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম তাহারা বিশুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক। আর-একরকমের জোড়াকথা আছে তাহার মূলশব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূলশব্দেরই অর্থহীন বিকার ; যেমন, চুপচাপ ঘুষঘাষ তুকতাক ইত্যাদি। চুপ ঘুষ এবং তুক এ-তিনটে শব্দ আভিধানিক, ইহারা অর্থহীন ধ্বনি নহে ; ইহাদের সঙ্গে চাপ ঘাষ ও তাক, এই তিনটে অর্থহীন শব্দ শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের কাজ করিতেছে।

জলের ধারেই যে-গাছটা দাঁড়াইয়া আছে সেই গাছটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংলগ্ন বিকৃত ছায়াটাকে একত্র করিয়া দেখিলে যেমন হয়, বাংলাভাষার এই কথাগুলাও সেইরূপ ; চুপ কথাটার সঙ্গে তাহার

একটা বিকৃত ছায়া যোগ করিয়া দিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ইহাতে অর্থেরও একটু অনির্দিষ্টভাবের বিস্তৃতি হইল। যদি বলা যায় কেহ চুপ করিয়া আছে, তবে বুঝায় সে নিঃশব্দ হইয়া আছে ; কিন্তু যদি বলি চুপচাপ আছে, তবে বুঝায় লোকটা কেবলমাত্র নিঃশব্দ নহে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াও আছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়াকথার কাজ।

ছায়াটা আসল জিনিসের চেয়ে বড়োই হইয়া থাকে। অনির্দিষ্টটা নির্দিষ্টের চেয়ে অনেক মস্ত। আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে। আকার স্বরবর্ণের যোগে ঘুষঘাষ-এর ঘাষ, তুকতাক-এর তাক, ঘুষ অর্থ ও তুক অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল অথচ স্পষ্ট কিছুই বলিল না।

কিন্তু যেখানে মূলশব্দে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে এ নিয়ম খাটে না, পুনর্বার আকার যোগ করিলে কথাটা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিগুণিত করিলে তাহার অর্থ অন্য রকম হইয়া যায়। যদি বলি গোল-গোল, তাহাতে হয় একাধিক গোল পদার্থকে বুঝায় নয় প্রায়-গোল জিনিসকে বুঝায়। কিন্তু গোল-গাল বলিলে গোল আকৃতি বুঝায়, সেইসঙ্গেই পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরো কিছু অনির্দিষ্ট ভাব মনে আনিয়া দেয়।

এইজন্য এইপ্রকার অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার স্থলে দ্বিগুণিত করা চলে না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন ; তাহার দৃষ্টান্ত, দাগদোগ ডাকডোক বাছবোছ সাজসোজ ছাঁটছোঁট চালচোল ধারধোর সাফসোফ।

অন্যরকম : কাটাকোটা খাটাখোটা ডাকাডোকা ঢাকাঢোকা ঘাঁটাঘোঁটা ছাঁটাছোঁটা ঝাড়াঝোড়া চাপাচোপা ঠাসাঠোসা কালোকোলো।

এইগুলির রূপান্তর : কাটাকুটি ডাকাডুকি ঢাকাঢুকি ঘাঁটাঘুঁটি ছাঁটাছুঁটি কাড়াকুড়ি ছাড়াছুড়ি ঝাড়াঝুড়ি ভাজাভুজি তাড়াতুড়ি টানাটুনি চাপাচুপি ঠাসাঠুসি। এইগুলি ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন। বিশেষ্যপদ হইতে উৎপন্ন শব্দ : কাঁটাকুঁটি ঠাট্টাঠুট্টি ধাক্কাধুক্কি।

শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পূর্বে আকার ও পরে ইকার থাকিলে মাঝখানের ওকারটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য উকাররূপ ধরে। শুদ্ধমাত্র 'কোটি' উচ্চারণ সহজ, কিন্তু 'কোটাকোটি' দ্রুত উচ্চারণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। চাপাচোপি ডাকাডোকি ঘাঁটাঘোঁটি, উচ্চারণের চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে, অথচ চুপি ডুকি ঘুঁটি উচ্চারণ কঠিন নহে।

তাহা হইলে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, জোড়া কথাগুলির প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই উ বা ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার-স্বর যুক্ত হয় ; যেমন, ঠিকঠাক মিটমাট ফিটফাট ভিড়ভাড় টিলেঢালা ঢিপঢাপ ইত্যাদি ; কুচোকাচা গুঁড়োগাঁড়া গুঁতোগাঁতা কুটোকাটা ফুটোফাটা। ভুজংভাজাং টুকরো-টাকরা হুকুম-হাকাম শুকনো-শাকনা ; গোলগাল যোগযাগ সোরসার রোখরাখ খোঁচখাঁচ গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।

কিন্তু যেখানে প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে ওকার জুড়িতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ; জোগাড় শব্দের বেলায় হইল জোগাড়-জাগাড়, ডাগর শব্দের বেলায় হইল ডাগর-ডোগর। একদিকে দেখো টুকরো-টাকরা হুকুম-হাকাম, অন্য দিকে হাপুস-হুপুস নাদুস-নুদুস। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আকারে ওকারে একটা বোঝাপড়া আছে। ফিরিঙ্গি যেমন ইংরেজের চালে চলে, আমাদের সংকরজাতীয় অ্যাকারও এখানে আকারের নিয়ম রক্ষা করেন ; যথা, ঠ্যাকা-ঠোকা গ্যাঁটাগোটা অ্যালাগোলা।

উল্লিখিত নিয়মটি বিশেষ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই খাটে, অর্থাৎ যে-সকল কথায় প্রথমার্ধের অর্থ নির্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ অনির্দিষ্ট ; যেমন ঘুষোঘাষা। কিন্তু ঘুষোঘুষি কথাটার ভাব অন্য রকম, তাহার অর্থ দুই পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ঘুষি-চালাচালি ; ইহার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছুই নাই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আদ্যক্ষরে সেইজন্য স্বরবিকার হয় নাই।

এইরূপ ঘুষোঘুষি-দলের কথাগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা বুঝাইয়া থাকে ; কানাকানি-র মানে, এর

কানে ও বলিতেছে, ওর কানে এ বলিতেছে। গলাগলি বলিতে বুঝায়, এর গলা ও, ওর গলা এ ধরিয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের তালিকা এইখানেই দেওয়া যাক—

কষাকষি কচলা-কচলি গড়াগড়ি গলাগলি চটাচটি চটকা-চটকি ছড়াছড়ি জড়াজড়ি টক্করা-টক্করি ডলাডলি ঢলাঢলি দলাদলি ধরাধরি ধস্তাধস্তি বকাবকি বলাবলি।

আঁটাআঁটি আঁচাআঁচি আড়াআড়ি আধাআধি কাছাকাছি কাটাকাটি ঘাঁটাঘাঁটি চাটাচাটি চাপাচাপি চালাচালি চাওয়া-চাওয়ি ছাড়াছাড়ি জানাজানি জাপটা-জাপটি টানাটানি ডাকাডাকি ঢাকাঢাকি তাড়াতাড়ি দাপাদাপি ধাক্কাধাক্কি নাচানাচি নাড়ানাড়ি পালটা-পালটি পাকাপাকি পাড়াপাড়ি পাশাপাশি ফাটাফাটি মাখামাখি মাঝামাঝি মাতামাতি মারামারি বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি বাড়াবাড়ি ভাগাভাগি রাগারাগি রাতারাতি লাগালাগি লাঠালাঠি লাথালাথি লাফালাফি সামনা-সামনি হাঁকাহাঁকি হাঁটাহাঁটি হাতাহাতি হানাহানি হারাহারি (হারাহারি ভাগ করা) খ্যাচাখেঁচি খ্যামচা-খেমচি ঘ্যাষাঘেঁষি ঠ্যাসাঠেসি ঠ্যালাঠেলি ঠ্যাকাঠেকি ঠ্যাঙাঠেঙি দ্যাখাদেখি ব্যাঁকাবেঁকি হ্যাঁচকা-হেঁচকি ল্যাপালেপি।

কিলোকিলি পিঠোপিঠি (ভাইবোন)।

খুনোখুনি গুঁতোগুঁতি ঘুষোঘুষি চুলোচুলি ছুটোছুটি ঝুলোঝুলি মুখোমুখি সুমুখো-সুমুখি।

টেপাটেপি পেটাপিটি লেখালেখি ছেঁড়াছিঁড়ি।

কোনাকুনি কোলাকুলি কোস্তাকুস্তি খোঁচাখুঁচি খোঁজাখুঁজি খোলাখুলি গোড়াগুড়ি ঘোরাঘুরি ছোঁড়াছুঁড়ি ছোঁওয়াছুঁয়ি ঠোকাঠোকি ঠোকরা-ঠুকরি দোলাদুলি যোকাযুকি রোখারুখি লোফালুফি শোঁকাশুঁকি দৌড়োদৌড়ি।

এই শ্রেণীর জোড়াকথা তৈরির নিয়মে দেখা যাইতেছে— প্রথমার্ধের শেষে আ ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ই যোগ করিতে হয় ; যেমন ছড়্ ধাতুর উত্তরে একবার আ ও একবার ই যোগ করিয়া ছড়াছড়ি, বল্ ধাতুর উত্তরে আ এবং ই যোগ করিয়া বলাবলি ইত্যাদি।

কেবল ক্রিয়াপদের ধাতু নহে, বিশেষ্য শব্দের উত্তরেও এই নিয়ম খাটে ; যেমন, রাতারাতি হাতাহাতি মাঝামাঝি ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে, সেখানে আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয় ; যেমন কিলোকিলি খুনোখুনি দৌড়োদৌড়ি।

ইহাতে প্রমাণ হয়, ইকার ও উকারের পরে আকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত আছে ; যথা, যেখানে লিখিত ভাষায় লিখি— মিলাই মিশাই বিলাই, সেখানে কথিত ভাষায় উচ্চারণ করি— মিলোই মিশোই বিলোই ; ডিবা-কে বলি ডিবে, চিনাবাসন-কে বলি চিনেবাসন ; ডুবাই লুকাই জুড়াই-কে বলি— ডুবোই লুকোই জুড়োই ; কুলা-কে বলি কুলো, ধুলাকে বলি ধুলো ইত্যাদি। অতএব এখানে নিয়মের যে-ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা উচ্চারণবিধিবশত।

যেখানে আদ্যক্ষরে অ্যাকার একার বা ওকার আছে, সেখানে আবার আর-একদিকে স্বরব্যত্যয় ঘটে ; নিয়মমত, ঠ্যালাঠ্যালি না হইয়া ঠ্যালাঠেলি, টিপাটেপি না হইয়া টেপাটিপি, এবং কোনাকোনি না হইয়া কোনাকুনি হয়।

কিন্তু, শেষাশেষি দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি মেশামেশি প্রভৃতি শ-ওয়ালা কথায় একারের কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বাংলা উচ্চারণবিধির এই-সকল রহস্য আলোচনার বিষয়।

আমরা শেষোক্ত তালিকাটিকে বাংলার ইঙ্গিত-বাক্যের মধ্যে ভুক্ত করিলাম কেন তাহা বলা আবশ্যক। কানাকানি করিতেছে বা বলাবলি করিতেছে, বলিলে যে-সকল কথা উহ্য থাকে তাহা কেবল কথার ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের কানে কথা বলিতেছে, বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটাকে অর্থবিশিষ্ট কথায় ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু কান কথাটাকে দুইবার বাঁকাইয়া বলিয়া একটা ইঙ্গিতে সমস্তটা সংক্ষেপে সারিয়া দেওয়া হইল।

এ পর্যন্ত আমরা তিন রকমের ইঙ্গিত-বাক্য পাইলাম। একটা ধ্বনিমূলক যেমন, সোঁ সোঁ কন্‌কন্ ইত্যাদি। আর-একটা পদবিকারমূলক যেমন, খোলাখালা গোলগাল চুপচাপ ইত্যাদি। আর-একটা

পদদ্বৈতমূলক যেমন, বলাবলি দলাদলি ইত্যাদি।

ধ্বনিমূলক শব্দগুলি দুই রকমের ; একটা ধ্বনিদ্বৈত, আর-একটা ধ্বনিদ্বৈধ। ধ্বনিদ্বৈত যেমন, কলকল কটকট ইত্যাদি ; ধ্বনিদ্বৈধ যেমন, ফুটফাট কুপকাপ ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতি প্রকাশ করে।

পদবিকারমূলক শব্দগুলি একটা নির্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে অনির্দিষ্ট আভাসটুকু ফিকা করিয়া লেপিয়া দেয়। পদদ্বৈতমূলক শব্দগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা প্রকাশ করে।

ধ্বনিদ্বৈধ ও পদবিকারমূলক শব্দগুলিতে আমরা এ পর্যন্ত কেবল স্বরবিকারেরই পরিচয় পাইয়াছি ; যেমন, হুসহাস— হুসের সহিত যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছে তাহা স্বরবর্ণভেদ ; খোলাখালা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এবারে ব্যঞ্জনবর্ণ-বিকারের দৃষ্টান্ত লইয়া পড়িব।

প্রথমে অর্থহীন শব্দমূলক কথাগুলি দেখা যাক ; যেমন, উসখুস উস্কোখুস্কো নজগজ নিশপিশ আইঢাই কাঁচুমাচু আবল-তাবল হাঁসফাঁস খুঁটিনাটি আগড়ম-বাগড়ম এবড়ো-খেবড়ো ছটফট তড়বড় হিজিবিজি ফষ্টিনাষ্টি আঁকুবাঁকু হাবজা-গোবজা লটখটে তড়বড়ে ইত্যাদি।

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাতপা চোখমুখ কাপড়চোপড় লইয়া ছোটোখাটো কত কী করাকে যে উসখুস করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয় ; কী কী বিশেষ কার্য করাকে যে আইঢাই করা বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন। কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচুমাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কী তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

এ তো গেল অর্থহীন কথা ; কিন্তু যে-জোড়াকথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃতি, বাংলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ইনি একেবারে সরকারীভাবে নিযুক্ত ; জলটল কথাটথা গিয়েটিয়ে কালোটালো ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও ইঁহার অনধিকার নাই। অভিধানে দেখা যায় ট অক্ষরের কথা বড়ো বেশি নাই, কিন্তু বেকার ব্যক্তিকে যেমন পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বেগার ঠেলিয়া বেড়াইতে হয় তেমনই বাংলাভাষায় কুঁড়েমির্চর্চার যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ট-টাকে হাজরে দিতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মূলশব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাংলাভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপসা অর্থ ইশারায় সারিয়া দেয় ; জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত। এই সরকারী ট-এর পরিবর্তে এক-এক সময় ফ একটিনি করিতে আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে ; যদি বলি লুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।

আর দুটি অক্ষর আছে, স এবং ম। বিশেষভাবে কেবল কয়েকটি শব্দেই ইহাদের প্রয়োগ হয়।

স-এর দৃষ্টান্ত : জো-সো জড়োসড়ো মোটাসোটা রকম-সকম ব্যামোস্যামো ব্যারাম-স্যারাম বোকাসোকা নরম-সরম বুড়োসুড়ো আঁটসাট গুটিয়ে-সুটিয়ে বুঝেসুঝে।

ম-এর দৃষ্টান্ত : চটেমটে রেগেমেগে হিঁচকে-মিচকে সিটকে-মিটকে চটকে-মটকে চমকে-মমকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আঁৎকে-মাৎকে জড়িয়ে-মড়িয়ে আঁচড়ে-মাচড়ে শুকিয়ে-মুকিয়ে কুঁচকে-মুচকে তেড়েমেড়ে এলোমেলো খিটিমিটি হুড়মুড় ঝাঁকড়া-মাকড়া কটোমটো।

দেখা যাইতেছে ম-এর দৃষ্টান্তগুলি বেশ সাধু শান্ত ভাবের নহে, কিছু রুক্ষ রকমের। বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সচরাচর কথাতেও আমরা ম অক্ষরটাকে ট-এর পরিবর্তে ব্যবহার করি, অন্তত ব্যবহার করিলে কানে লাগে না, কিন্তু সে-সকল জায়গায় ম আপনার মেজাজটুকু প্রকাশ করে। আমরা বিষ-মিষ বলিতে পারি কিন্তু সন্দেশ-মন্দেশ যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে, এ কথা বলা চলে, কিন্তু বন্ধুকে যত্নমত্ন বা গরিবকে দানমান করা উচিত, একেবারে অচল। হিংসে-মিংসে করা যায়, কিন্তু ভক্তিমক্তি করা যায় না ; তেমন তেমন স্থলে খোঁচা-মোচা দেওয়া যায় কিন্তু আদর-মাদর নিষিদ্ধ। অতএব ট-এর ন্যায় ফ

ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে, ইহা নিশ্চয়।

তার পরে, কতকগুলি বিশেষ কথার বিশেষ বিকৃতি প্রচলিত আছে। সেগুলি সেই কথারই সম্পত্তি ; যেমন পড়েহড়ে বেছেগুছে মিলেজুলে খেয়েদেয়ে মিশেগুশে সেজেগুজে মেখেচুখে জুটেপুটে লুটেপুটে চুকেবুকে বকেঝকে। এইগুলি বিশেষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত তালিকাটি ক্রিয়াপদের। এখানে বিশেষ্য পদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে ; কাপড় চোপড় আশপাশ বাসন-কোসন রসকস রাবদাব গিন্নিবান্নি তাড়াহুড়ো চোটপাট চাকর-বাকর হাঁড়িকুঁড়ি[১] ফাঁকিজুকি আঁকজোক এলাগোলা এলোথেলো বেঁটে-খেটে খাবার-দাবার ছুঁতোনাতা চাষাভুষো[২] অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু নড়বড় হুলস্থূল।

এই দৃষ্টান্তগুলির গুটিকয়েক কথার একটা উলটাপালটা দেখা যায় ; বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে, যেমন : আশপাশ অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু হুলস্থূল।

উল্লিখিত তালিকার প্রথমার্ধের শেষ অক্ষরের সহিত শেষার্ধের শেষ অক্ষরের মিল পাওয়া যায়। কতকগুলি কথা আছে যেখানে সে-মিলটুকুও নাই ; যেমন : দৌড়ধাপ পুঁজিপাটা কান্নাকাটি তিতিবিরক্ত।

এইবার আমরা ক্রমে ক্রমে একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতেছি যেখানে জোড়াশব্দের দুইটি অংশই অর্থবিশিষ্ট। সে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোঠায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বোঝানো যাক। ছাইভস্ম কালিকিষ্টি লজ্জাশরম প্রভৃতি জোড়াকথার দুই অংশের একই অর্থ ; এ কেবল জোড় দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল :

চিঠিপত্র লোকজন ব্যাবসা-বাণিজ্য দুঃখধান্দা ছাইপাঁশ ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু কাজকর্ম ক্রিয়াকর্ম ছোটোখাটো ছেলেপুলে ছেলে-ছোকরা খড়কুটো সাদাসিধে জাঁক-জমক বসবাস সাফ-সুৎরো ত্যাড়াবাঁকা পাহাড়-পর্বত মাপজোখ সাজসজ্জা লজ্জাশরম ভয়ডর পাকচক্র ঠাট্টা-তামাশা ইশারা-ইঙ্গিত পাখি-পাখালি জন্তু-জানোয়ার মামলা-মকদ্দমা গা-গতর খবর-বার্তা অসুখ-বিসুখ গোনা-গুনতি ভরা-ভরতি কাঙাল-গরিব গরিবদুঃখী গরিব-গুরবো রাজা-রাজড়া খাটপালং বাজনা-বাদ্য কালিকিষ্টি দয়ামায়া মায়া-মমতা ঠাকুর-দেবতা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চালাক-চতুর শক্ত-সমর্থ গালি-গালাজ ভাবনা-চিন্তে ধর-পাকড় টানা-হ্যাঁচড়া বাঁধাছাঁদা নাচাকোঁদা বলা-কওয়া করাকর্ম।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনো অর্থসামঞ্জস্য পাওয়া যায় না ; যেমন : মেগেপেতে কেঁদেকেটে বেয়েছেয়ে জুড়েতেড়ে পুড়েঝুড়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আগেভাগে গালমন্দ পাকে-প্রকারে।

বাংলাভাষায় পত্র শব্দযোগে যে-কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সেইগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে ; কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনো অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ঐরূপ, তৈজসপত্র জিনিসপত্র খরচপত্র বিছানাপত্র ঔষধপত্র হিসাবপত্র দেনাপত্র আসবাবপত্র পুঁথিপত্র বিষয়পত্র চোতাপত্র দলিলপত্র এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

১ সংস্কৃতভাষায় কুণ্ডি শব্দের অর্থ পাত্রবিশেষ, সম্ভবত ইহা হইতে হাঁড়িকুঁড়ি শব্দের কুঁড়ি উৎপন্ন ; এই-সকল তালিকার মধ্যে এমন আরো থাকিতে পারে যে-স্থলে এই দোসর শব্দগুলিকে অর্থহীনের কোঠায় ফেলা চলিবে না।

২ ছুঁতোনাতা শব্দে ছুতা কী নিয়ম অনুসারে ছুঁতো হইয়াছে এবং চাষাভুষা শব্দের ভুষা কী কারণে ভুষো হইল পূর্বেই তাহা বলিয়াছি।

যে-সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অর্থটা কাছাকাছি, তাহাদের দৃষ্টান্ত : মাল-মসলা দোকান-হাট হাঁকডাক ধীরেসুস্থে ভাব-গতিক ভাবভঙ্গি লম্ফঝম্ফ চাল-চলন পাল-পার্বণ কাণ্ড-কারখানা কালিঝুলি ঝড়ঝাপট বনজঙ্গল খানাখন্দ জোতজমা লোক-লশকর চুরি-চামারি উঁকিঝুঁকি পাঁজিপুঁথি লম্বা-চওড়া দলামালা বাছ-বিছার জ্বালা-যন্ত্রণা সাতপাঁচ নয়ছয় ছকড়া-নকড়া উনিশ-বিশ সাত-সতেরো আলাপ-পরিচয় কথাবার্তা বন-বাদাড় ঝোপঝাড় হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদ লোহা-লক্কড় শাক-সবজি বৃষ্টি-বাদল ঝড়তুফান লাথিঝাঁটা সেঁকতাপ আদর-অভ্যর্থনা চালচুলো চাষবাস মুটে-মজুর ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়াশব্দ জোর দিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়— মালমসলা দোকানহাট প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্নার্থক জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে। কাণ্ড-কারখানা চুরি-চামারি হাসিখুশি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও আছে আভাসও আছে।

যে-সকল পদার্থ আমরা সচরাচর একসঙ্গে দেখি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদিভাবে বুঝাইয়া দিবার প্রথাও বাংলায় প্রচলিত আছে ; যেমন, ঘটিবাটি। যদি বলা যায় ঘটিবাটি সামলাইয়ো, তাহার অর্থ এমন নহে যে, কেবল ঘটি ও বাটিই সামলাইতে হইবে, এইসঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিস আসিয়া পড়ে। কাহারও সহিত মাঠে-ঘাটে দেখা হইয়া থাকে, বলিলে কেবল যে ঐ দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বুঝায় না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে-সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জোড়া-কথার দৃষ্টান্ত : পথঘাট ঘর-দুয়োর ঘটিবাটি কাছা-কোঁচা হাতিঘোড়া বাঘ-ভাল্লুক খেলাধুলা (খেলা-দেয়ালা) পড়াশুনা খালবিল লোক-লশকর গাড়ু-গামছা লেপকাঁথা গান-বাজনা খেতখোলা কানাখোঁড়া কালিয়া-পোলাও শাকভাত সেপাই-সান্ত্রী নাড়ি-নক্ষত্র কোলেপিঠে কাঠখড় দত্যিদানো ভূতপ্রেত।

বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার দৃষ্টান্ত : আগাগোড়া ল্যাজামুড়ো আকাশ-পাতাল দেওয়া-থোওয়া নরম-গরম আনাগোনা উলটোপালটা তোলপাড় আগা-পাস্তাড়া।

এই যতপ্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা। বাঘভাল্লুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে ; বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা নারাজ হয়, অথচ অর্থের অসংগতি হয় না।

এইখানে ইংরেজিতে যে-সকল ইঙ্গিতবাক্য প্রচলিত আছে তাহার যে-কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি ; বাংলার সহিত তুলনা করিলে পাঠকেরা সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন : nick-nack riff-raff wishy-washy dilly-dally shilly-shally pit-a-pat bric-a-brac।

এই উদাহরণগুলিতে জোড়াশব্দের দ্বিতীয়ার্ধে আকারের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বাংলাতেও এইরূপ স্থলে শেষার্ধে আকারটাই আসিয়া পড়ে ; যেমন, হো-হা জো-জা জোর-জার। কিন্তু যেখানে প্রথমার্ধে আকার থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি ; যেমন, ঘা-ঘো টান-টোন টায়-টোয় ঠারে-ঠোরে। সবশেষে যদি ইকার থাকে তবে মাঝের ওকার উ হইয়া যায়, যেমন জারি-জুরি।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঞ্জনবর্ণবিকারের দৃষ্টান্ত : Hotchpotch higgledy-piggledy harum-scarum helter-skelter hoity-toity hurly-burly roly-poly hugger-mugger namby-pamby wishy-washy।

আমাদের যেমন টুংটাং ইংরেজি তেমনই ding-dong, আমাদের যেমন ঠঙাঠঙ ইংরেজিতে তেমনই ding-a-dong।

প্রথমার্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্ধের মিল নাই এমন দৃষ্টান্ত— topsyturvy।

জোড়াশব্দের দুই অংশে মিল নাই, এমন কথা সকল ভাষাতেই দুর্লভ। মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে ; একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর-একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝংকৃত হইয়া উঠে, জোড়া মিলের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে, সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না, ছন্দের পর্বে পর্বে বারংবার আঘাতে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে ; কেবলমাত্র কথাদ্বারা মন যতটুকু বুঝিত, মিলের ঝংকারে অনির্দিষ্টভাবে তাহাকে আরো অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয় তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।

এইখানে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই প্রবন্ধের বিষয়টি অনেকের কাছে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিবে। আমার কৈফিয়ত এই যে, বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ। আমার মতো সাহিত্যওয়ালা বিপদে পড়িয়া বিজ্ঞানের দোহাই মানিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু প্রেমের নিবেদন যদি জানাই, বলি মাতৃভাষার কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ নহে— তবে আশা করি কেহ নাসা কুঞ্চিত করিবেন না। মাতাকে সংস্কৃতভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু ; কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা-কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি ; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলাভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে এবং এই আকৃতিপ্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলাভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১১

পরিশিষ্ট

সমাজ । শিক্ষা । শব্দতত্ত্ব

হিন্দুবিবাহ

সায়ান্স্‌ অ্যাসোসিয়েশন হলে পঠিত

অধ্যাপক সীলি তাঁহার Natural Religion নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন :

Among the crowd of Voltairian abbes we can fancy some in whom the conflict between inherited and imbided ways of thinking may have destroyed belief and energy alike. Those who live in the decay of Churches and systems of life are exposed to such a paralysis. They have been made all that they are by the system; their mode of thought and feeling, their very morality has grown out of it. But at a given moment the system is struck with decay. It falls out of the current of life and thought. Then the faith which had long been genuine, even if mistaken, which had actually inspired vigorous action and eloquent speech, begins to ebb. The vigour begins to be spasmodic, the eloquence to ring hollow, the loyalty to have an air of hopeless self-sacrifice. Faith gradually passes into conventionalism. A later stage comes when the depression, the uneasiness, the misgiving have augmented tenfold. It is then that in an individual here and there the moral paralysis sets in. In the ardour of conflict they have pushed in to the foreground all the weakest parts of their creed, and have learnt the habit of asserting most vehemently just what they doubt most, because it is what is most denied. As their own belief ebbs away from them they are precluded from learning a new one, because they are too deeply pledged, have promised too much, asseverated too much, and involved too many others with themselves. Happy those in such a situation who either are not too clear-sighted or cling to a system not entirely corrupt ! There is an extreme case when what is upheld as divine has really become a source of moral evil, while the champion is one who cannot help seeing clearly. As he becomes reluctantly enlightened as his advocacy grows first a little forced, then by degrees consciously hypocritical, until in the end he secretly confesses himself to be on the wrong side, what a moral dissolution !

ইহার মর্মার্থ :

যাঁহারা কোনো পুরাতন ধর্মপ্রণালী অথবা সমাজতন্ত্রের জীর্ণদশায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধবশত বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু-অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সমাজতন্ত্রের মধ্যেই গঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাপ্রণালী, এমন-কি, ধর্মনীতি সেই সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কখন এক সময়ে সেই সমাজে জরা প্রবেশ করিয়াছে ; সে-সমাজ মানবের বুদ্ধি ও জীবনস্রোতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। যে অকপট বিশ্বাস পূর্বে সকলকে উদ্যমশীল কার্যে ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এখন সে-বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। তাহার জীবন্ত উদ্যম কচিৎ ক্ষণস্থায়ী চকিত চেষ্টায় পর্যবসিত হয় ; তাহার বক্তৃতাবেগ শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার নিষ্ঠা অত্যন্ত আশাহীন আত্মবলিদানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমে বাহ্য প্রথায় পরিণত হয়। ক্রমে অবসাদ অশান্তি ও সংশয় বাড়িতে থাকে। এই মতবিরোধের সময় কতকগুলি লোক উঠেন, তাঁহারা বিবাদে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের মতের জীর্ণতম অংশগুলিই সম্মুখে সাজাইয়া আস্ফালন করিতে থাকেন ; যেগুলি মনে মনে

সর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ করেন সেইগুলিই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন, কারণ বিরোধী পক্ষ সেইগুলিকেই অধিকতর অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ক্রমে এতদূর পর্যন্ত হইতে পারে যে, যাহা নৈতিক দুর্দশার কারণ তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়া প্রচার করেন, অথচ ইহার অসংগতি নিজেই মনে মনে না বুঝিয়া থাকিতে পারেন না। প্রথমে অল্পে অল্পে চোখ ফুটিতে থাকে এবং জোর করিয়া নিজ মত সমর্থন করেন, পরে ক্রমে আপন মত অন্যায় জানিয়াও স্পষ্ট কাপট্য অবলম্বন করেন।

অধ্যাপক সীলির এই বর্ণনার সহিত আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থার কী আশ্চর্য ঐক্য। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গভূমির নূতন চিন্তাস্রোত ও জীবনস্রোতের সহিত প্রাচীন সমাজতন্ত্র মিশিতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রাচীন সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসবলে যে-সকল বৃহৎকার্য যেরূপ প্রবল বেগে সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখনকার জীবন্ত বিশ্বাস এখন জীবনহীন প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অবসাদ অশান্তি ও সংশয়ে আমাদের সমাজ ভারাক্রান্ত, এবং আমাদের মধ্যে একদল লোক উঠিয়াছেন, তাঁহারা পরমসূক্ষ্ম কূটযুক্তি দ্বারা প্রাচীন মতের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এবং বোধ করি একদল রূঢ়স্বভাব সংবাদপত্রব্যবসায়ীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কাপট্যের লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে একদলের মধ্যে এই-যে প্রাচীনতার একান্ত পক্ষপাত দেখা যায়, তাহার কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমত, নূতন শিক্ষার প্রভাবে আমরা অনেকগুলি নূতন কর্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু আমাদের অনভ্যাস, পূর্বরাগ, স্বাভাবিক জড়ত্ব ও ভীরুতাবশত আমরা তাহা সমস্ত পালন করিয়া উঠিতে পারি না। আলস্যের দায়ে ও সমাজের ভয়ে অনেক সময়ে আমরা তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু অসম্পন্ন কর্তব্যের লাঞ্ছনা মানুষ চিরদিন সহিয়া থাকিতে পারে না। কেন বিশ্বাস করিতেছি একরূপ এবং কাজ করিতেছি অন্যরূপ, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কিছুদিন পরে নূতন বিশ্বাসের খুঁত ধরিতে আরম্ভ করা যায়। নূতন শিক্ষালব্ধ কর্তব্য যে অকর্তব্য, এবং আমরা যাহা করিয়া আসিতেছি ঠিক তাহাই করা যে উচিত, প্রাণপণ সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থলে সাধারণত যুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে ; এত সূক্ষ্ম হয় যে সেই যুক্তিভেদ করিয়া যুক্তিকর্তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস কখনো কখনো কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, পুরাতনের উপর যখন একবার আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়, তখন আমরা অনেক সময় অবিচারে নূতনকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিই। নূতনের উপর প্রকৃত বিশ্বাসবশতই যে তাহাকে সকল সময়ে আমরা হৃদয়ে স্থান দিই তাহা নহে, অনেক সময়ে পুরাতনের প্রতি আড়ি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি। আমরা গৃহশত্রুর প্রতি আড়ি করিয়া কখনো কখনো বহিঃশত্রুকে গৃহে আহ্বান করিয়া থাকি। অবশেষে উপদ্রব সহ্য করিয়া যখন চৈতন্য হয় তখন আগাগোড়া নূতনের উপরে বিরাগ জন্মে। যখন এ দেশে নূতন কালেজ হয় তখন শিক্ষিত যুবকেরা যে অনেকগুলি উৎপাত আপন গৃহচালের উপরে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, সে কেবল পুরাতনের উপরে আড়ি করিয়া বৈ তো নয়। এখনকার একদল লোক সেই-সকল উৎপাতমিশ্রিত নূতন মতকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

তৃতীয়ত, আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পরের কাছে অপমানিত, সুতরাং ঘরে সম্মানের প্রত্যাশী। এইজন্য আমরা ইংরেজকে বলিতে চাহি— ইংরেজ, তোমাদের শস্ত্র বড়ো, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বড়ো ; তোমরা রাজা, আমরা আর্য। এককালে আমাদের যাহা ছিল এখনো যেন তাহাই আছে, এইরূপ ভান করিয়া অপমানদুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাই। দেহে বল ও হৃদয়ের সাহস নাই যে অপমান হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি, সুতরাং পুরাণ ও সংহিতা, চটুল রসনা ও কূটযুক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়। যে-সকল আচারের অস্তিত্ব হয়তো আমাদের অপমানের অন্যতম কারণ সেগুলি দূর করিতে সাহস হয় না, এইজন্য তাহাদের প্রতি আর্য আধ্যাত্মিক পবিত্র প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করি। এইরূপে অনেক

সময়ে অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইবার অভিপ্রায়েই আমরা অপমানের কারণ স্বহস্তে স্বদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিই।

চতুর্থত, ভাবেগতিকে বোধ হয়, কেহ কেহ মনে করেন প্রাচীনতাকে অবলম্বন করা আমাদের Political উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। তাহাকে বিশ্বাস করি বা না করি, তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করিলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে কতকগুলি লাভ আছে। কিন্তু সত্যমিথ্যার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া এরূপ লাভক্ষতি গণনা করিয়া যে দেশের কোনো স্থায়ী ও বৃহৎ কাজ করা যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইল হিন্দুবিবাহ লইয়া আলোচনা পড়িয়াছে। যাঁহারা এই আলোচনা তুলিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র এবং আমাদের বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহারা কেহই হিন্দুবিবাহের শাস্ত্রসম্মত ঐতিহাসিকতা বা বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতার বিষয় বড়ো-একটা-কিছু বলেন নাই, কেবল সূক্ষ্মযুক্তি ও কবিত্বময় ভাষা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে হিন্দু বিবাহের বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে— ইহার মধ্যে কোন্ সময়ের বিবাহকে যে তাঁহারা হিন্দুবিবাহ বলেন, তাহা ভালোরূপ নির্দেশ করেন নাই। যদি বঙ্গদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলেন, তবে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কেন। প্রাচীন কালে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, এখন সেরূপ আছে কি না সে বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। অতএব সেকালের শাস্ত্রোক্তি এখন প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে চোখে ধুলা দেওয়া হয়। হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে যদি কেহ বৈদিক বচন উদ্ধৃত করেন তাঁহার জানা উচিত যে, বৈদিক কালে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য অবস্থা আমাদের বর্তমান কালের ন্যায় ছিল না। যিনি হিন্দুবিবাহের পক্ষে পুরাণ ইতিহাস উদ্ধৃত করেন, তিনি এক মহাভারত সমস্ত পড়িয়া দেখিলে অকূল সমুদ্রে পড়িবেন। মহাভারতের নানা কাহিনীতে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা বিশৃঙ্খলা বর্ণিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে তাহার ভালোরূপ সমালোচনা ও কালাকাল নির্ণয় না করিয়া কোনো কথা বলা উচিত হয় না। যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে। প্রথমত, মনুসংহিতা যে-সমাজের সংহিতা সে-সমাজের সহিত আমাদের বর্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ। শিক্ষার ঐক্য নাই অথচ সমাজের ঐক্য আছে, ইহা প্রমাণ করিতে বসা বিড়ম্বনা। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ নির্দিষ্ট আছে তাহা যে বঙ্গদেশে কোন্‌কালে প্রচলিত ছিল নির্ণয় করা কঠিন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্ত জো-সো করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রতের অভিনয় সমাপনপূর্বক আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কোথায় বা গুরুগৃহে বাস, কোথায় বা বেদাধ্যয়ন, কোথায় বা কঠিন ব্রতাচরণ। অতএব প্রথমেই দেখা যাইতেছে, মনুসংহিতার মতে যে-মানুষ গঠিত হইত, এখনকার মতে সে-মানুষ গঠিত হয় না। দ্বিতীয়ত, মনু পুরুষের পক্ষে বিবাহের যে-বয়স নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কোথায় পালিত হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, বিবাহের পরে মনু স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংসর্গের যে-সকল নিয়ম স্থির করিয়াছেন, তাহাই বা কয়জন লোক জানে ও পালন করে। তবে, আপন সুবিধামত মনু হইতে দুই-একটা শ্লোক নির্বাচন করিয়া বর্তমান দেশাচার-প্রচলিত বিবাহপ্রথার পক্ষে প্রয়োগ করা সকল সময়ে সংগত বোধ হয় না। তবে যদি কেহ বলেন, আমাদের বর্তমান প্রথাসকল হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে, অতএব আমরা মনুকে আদর্শ করিয়াই আমাদের বিবাহাদিপ্রথার সংস্কার করিব, কারণ সেকালের বিবাহাদি পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ছিল, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই— বিবাহাদি সম্বন্ধে মনুর সমস্ত নিয়ম নির্বিচারে গ্রহণ করিবে, না আপনাপন মতানুসারে স্থানে স্থানে বর্জন করিয়া সংহিতাকে আপন সুবিধা ও নূতন শিক্ষার অনুবর্তী করিয়া লইবে। মনুসংহিতা স্ত্রীপুরুষের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন তাহার সমস্তটাই পবিত্র ও আধ্যাত্মিক, না তুমি তাহার মধ্য হইতে যেটুকু বাদসাদ দিয়া লইয়াছ সেইটুকু পবিত্র ও আধ্যাত্মিক?

আমরা যে শাস্ত্র হইতে বাদসাদ দিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেশানুরাগে কথঞ্চিৎ অন্ধ হইয়া আপন ঘরগড়া মতকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করি, এখানে তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিতে চাই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু পরম ভাবুক জ্ঞানবান ও সহৃদয়। তাঁহার শকুন্তলাসমালোচন তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আমি যতদূর জানি বাংলায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই। বাংলার পাঠকসাধারণে চন্দ্রনাথবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এইজন্য কিছুকাল হইল তিনি 'হিন্দুপত্নী' এবং 'হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' নামে যে-দুই প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহা সাধারণ্যে অতিশয় আদৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুদম্পতির একীকরণতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আজকাল গুটিকতক কাগজে অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে হিন্দুবিবাহ এবং তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যতটা বলিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তী আর কেহ ততটা বলেন নাই। খ্যাতনামা গুণী ও গুণজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় চন্দ্রনাথবাবুর বিবাহ প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন, "হিন্দুবিবাহের ওরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই।" অতএব উক্ত সর্বজনমান্য প্রবন্ধদ্বয়কে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি, এবং এই উপলক্ষে আমার মতামত যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়াছি।[১]

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার 'হিন্দুপত্নী' প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

> খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল ; হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতা সন্তুষ্ট হন।

প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন নহি এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু আজকাল মুখে ও লেখায় ও অনুবাদে শাস্ত্রচর্চা দেশে এতটুকু ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অধিকার অনেকেরই জন্মিয়াছে। চন্দ্রনাথবাবুর মত সত্য কি মিথ্যা তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এটুকু বলিতে পারি যে, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মত ভালোরূপ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি যেমন দুই-একটি শ্লোক আপন মতের স্বাপক্ষে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তেমনই অনেকগুলি শ্লোক তাঁহার মতের বিপক্ষে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে-সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মনুসংহিতার নবম

১ এইখানে বলা আবশ্যক, চন্দ্রনাথবাবু যখন বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তখন এ বিষয়ে আন্দোলন কিছুই ছিল না। সুতরাং বিবাহের সমস্ত দিক আলোচনা তেমন আবশ্যক ছিল না। তখন সহৃদয় কল্পনার দ্বারা নীত হইয়া হিন্দুবিবাহের কোনো একরূপ বিশেষ ব্যাখ্যা করা আশ্চর্য নহে ; ইহাতে সাহিত্যের অধিকার আছে। কিন্তু আজকাল বিষয়টি যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে কেবল সাহিত্যের হিসাবে দেখিলে আর চলে না। এইজন্য সাহিত্যের কল্পনাপূর্ণ ভাষা ও ভাবকে অনুসন্ধান ও যুক্তির দ্বারা নির্মমভাবে ভাঙিয়া দেখিতে হইতেছে। বর্তমান আন্দোলন যদি চন্দ্রনাথবাবু পূর্ব হইতে জানিতে পারিতেন তবে তাঁহার প্রবন্ধ আর-একরূপ হইত। তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধে সাহিত্যরস অপেক্ষাকৃত অল্প থাকিত এবং তিনি তাঁহার বিষয়টিকে একমাত্র যুক্তির সাহায্যে দুর্গম পথের মধ্য দিয়া অতি সাবধানে লইয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহের কথা বলিয়াছেন তাহা সমাজের কোনো কাল্পনিক অবস্থায় ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু আজকাল যে আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা ভালোমন্দ পরিপূর্ণ সমাজের প্রাত্যহিক বিবাহ লইয়া কিন্তু তাঁহার উক্ত সাহিত্য প্রবন্ধের ভাষা লইয়া আজকাল সকলেই কার্যস্থলে ব্যবহার করিতেছেন সুতরাং কঠিন যুক্তির দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধ সমালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর দোষ নাই এবং আমারও দোষ নাই— ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়া পড়িল।

অধ্যায়ে চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোক পাঠ করিবেন, আমি কেবল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক এইখানে পাঠ করি।

শয্যাসনমলংকারং কামং ক্রোধমনার্জবং
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।

শয্যা, আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রীলোক হইতে হয় ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মোব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ।

যেহেতুক স্ত্রীলোকের মন্ত্রদ্বারা কোনো ক্রিয়া নাই ধর্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্মজ্ঞানহীন মন্ত্র হীন স্ত্রীগণ অনৃত, মিথ্যা পদার্থ।

এ-সকল শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে হিন্দুবিবাহের সহিত কোম্‌তের মতের তুলনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতদূর কোম্‌ৎশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষাও অনেক অল্প, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুই এককথায় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোম্‌তের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করি :

বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এতদিনের পর য়ুরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ধর্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেইজন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

বলা বাহুল্য কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন মনু মুক্তকণ্ঠে ঠিক তাহা বলেন নাই। মহাভারতে ভীষ্ম ও যুদ্ধিষ্ঠিরও মুক্তকণ্ঠে কোম্‌তের মত সমর্থন করেন নাই। অনুশাসনপর্বে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে-কথোপকথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে। অতএব তাহার স্থানে স্থানে পাঠ করি। কালীসিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলম্বন।

কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর।

উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই।

তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনোই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে-সময় সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূতসমুদয় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন :

পুরুষে রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে।

কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করিতে অক্ষম, বিশেষত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোম্‌ৎ-শিষ্যগণের মতের সহিত তাহাদের মতের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমত স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। চন্দ্রনাথবাবু শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন— প্রাচীন সমাজে স্ত্রীলোকের সবিশেষ সম্মান ছিল, কিন্তু আমি দেখিতেছি, শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অসম্মানেরও প্রমাণ আছে। অতএব এ বিষয়ে এখনো নিঃসংশয়ে কিছু বলিবার সময় হয় নাই।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থা সেকালে কিরূপ ছিল। চন্দ্রনাথবাবু

রঘুনন্দনের এক বচন উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে—

হিন্দুভার্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন আমাদের দেশে সর্বসাধারণের সংস্কার এই যে, স্বামীই স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্ত্রী যে স্বামীর দেবতা ইহা ইতিপূর্বে শুনা যায় নাই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ স্বরূপে দান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিবেন, তৎপূর্বে তিনি আপনাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই যে, আপনাকে সম্মান করিতে কেহ বাধ্য নহে, কিন্তু মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে সকলে বাধ্য। দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্ঠিরের মান্যা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির কখনোই তাঁহাকে দ্যূতের পণ্যস্বরূপ দান করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদী যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন তখন ভীষ্ম-দ্রোণ-ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ দ্রৌপদীই যখন প্রকাশ্যভাবে বিরাটসভায় কীচকের পদাঘাত সহ্য করেন তখন সমস্ত সভাস্থলে কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই। মনুসংহিতার দণ্ডবিধির মধ্যে এক স্থলে আছে :

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতা চ সোদরঃ
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যুরজ্জ্বা-বেণুদলেন বা।

স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য ও সোদর কনিষ্ঠভ্রাতা যদি অপরাধ করে সূক্ষ্ম রজ্জু অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাড়ন করিবে।

দেবতার প্রতি এরূপ রজ্জু ও বেণুদলের তাড়নব্যবস্থা হইতে পারে না। স্বামীও স্ত্রী দেবতা, কিন্তু স্বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনো গ্রহণ করেন নাই; তবে শাস্ত্রের অনভিমতে সম্মার্জনীপ্রয়োগ প্রভৃতির উল্লেখ এখানে আমি করিতে চাহি না। যাহা হউক, আমার এবং বোধ করি সাধারণের বিশ্বাস এই যে, হিন্দু স্ত্রী কোনোকালে হিন্দু স্বামীর দেবতা ছিলেন না। অতএব এ স্থলে হিন্দুশাস্ত্রের সহিত কিঞ্চিৎ বলপূর্বক কোম্‌ৎশাস্ত্রের অসবর্ণ মিলন সংঘটন করা হইয়াছে।

বিবাহবিশেষ আলোচনায় তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্যবন্ধন কিরূপ ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য কোনো জাতির বিবাহে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এক স্বামী ও এক স্ত্রীর একীকরণ বিবাহের উচ্চতম আদর্শ। সে আদর্শ আমাদের দেশে যদি জাজ্বল্যমান থাকিত তবে এ দেশে বহুবিবাহ কিরূপে সম্ভব হইত। মহাভারত পাঠে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র মহিষী ছিল। তখনকার অন্যান্য রাজপরিবারেও বহুবিবাহদৃষ্টান্তের অসদ্ভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ ঋষিদিগেরও একাধিক পত্নী দেখা যাইত। অন্য ঋষির কথা দূরে যাউক, বশিষ্ঠের দৃষ্টান্ত দেখো। অরুন্ধতীই যে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী তাহা নহে, অক্ষমালা নামে এক অধম জাতীয়া নারী তাঁহার অপর স্ত্রী ছিলেন। এরূপ ব্যবস্থাকে ন্যায্যমতে একীকরণ বলা উচিত হয় না; ইহাকে পঞ্চীকরণ, ষড়ীকরণ, সহস্রীকরণ বলিলেও দোষ নাই। কেহ কেহ বলিবেন, স্ত্রী যতগুলিই থাক্-না কেন, সকলগুলিই স্বামীর সহিত মিশিয়া একেবারে এক হইয়া যাইবে, ইহাই হিন্দুবিবাহের গৌরব। স্ত্রী যত অধিক হয় বিবাহের গৌরবও বোধ করি তত অধিক, কারণ একীকরণ ততই গুরুতর। কিন্তু একীকরণ বলিতে বোধ করি এই বুঝায় যে, প্রেমবিনিময়বশত স্বামীস্ত্রীর হৃদয়মনের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য; এবং এরূপ ঐক্য যে দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্র আদর্শ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু প্রেমপ্রভাবে হৃদয়ের ঐক্য যেখানে মুখ্য আদর্শ সেখানে বহুদারপরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরিপূর্ণ মিলন যদি হিন্দুবিবাহের যথার্থ প্রাণ হইত তবে এ দেশে কৌলীন্য বিবাহ কোনোমতে স্থান পাইত না। বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে-আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না। কিন্তু ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বিবাহ পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া হয়। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আশ্চর্য উত্তর দিয়াছেন। হিন্দু বিধবার ন্যায় বিপত্নীক পুরুষও যে কেন নিষ্কাম ধর্ম অবলম্বন করেন না, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন :

হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না ; হিন্দু মানেন অনুপাতবাদ। ক খ যখন সমান নহে তখন তাহারা সমান আসন পাইবেও না ; ক যেমন তেমনই ক পাইবে, খ যেমন তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, ক-র ও খ-র স্বত্বাধিকার মধ্যে সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাতবাদী। হিন্দু স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্বীকার করে না ; কাজেই হিন্দু স্ত্রীপুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করে না।

এ কথা যদি বল তবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে হয় বলা যায় না। তুমি বলিতেছ নিষ্কামধর্মের পবিত্র মহত্ত্ব আছে ; অতএব স্বামীর মৃত্যুর পর কামনা বিসর্জন দিয়া সংসারধর্ম পালন করিবার যে-অবসর পাওয়া যায়, তাহা অতি পবিত্র অবসর, সে-অবসর অবহেলা করা উচিত নহে। এখন তোমার সাম্য বৈষম্যের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, নিষ্কামধর্মও কি হিন্দুদের ন্যায় অনুপাতবাদ মানিয়া চলেন। পুরুষের পক্ষেও নিষ্কামধর্ম কি পবিত্র নহে, অতএব কষ্টসাধ্য হইলেও হিন্দুবিবাহের পরম একীকরণ এবং আধ্যাত্মিক মিলনের দ্বারা অনিবার্যবেগে চালিত হইয়া স্ত্রীবিয়োগে পুরুষেরও নিষ্কামধর্মব্রত গ্রহণ করা কেন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্থির হয় নাই। তাহার বেলায় ক খ ও অনুপাতবাদের হেঁয়ালিধূম বিস্তার করিবার তাৎপর্য কী। পবিত্র একনিষ্ঠ অচল দাম্পত্যপ্রেম পুরুষেরও মহত্ত্বের লক্ষণ ও হৃদয়ের উন্নতির অন্যতম কারণ, তাহা কোন্ অনুপাতবাদী অস্বীকার করিতে পারেন।

তবে এমন যদি বল যে, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার কথা ছাড়িয়া দাও, হিন্দুবিবাহ সাংসারিক সুবিধার জন্য, তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে অনুপাতবাদের হিসাব কাজে লাগিতে পারে। অক্ষয়বাবু বলেন :

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, এ সিদ্ধান্ত বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে ; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যে বিবাহের অতি নিকৃষ্টভাগ, অতি সামান্যভাগ এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। এবং প্রাচীন হিন্দুরা যে ইহাকে নিকৃষ্ট ও সামান্য জ্ঞান করিতেন, আমার তাহা বোধ হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'ভারতবর্ষের ধর্মপ্রণালী' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, সমাজই সে সকলের কেন্দ্রস্থান, সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া সেই সকল ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতএব সমাজের কল্যাণের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে অপত্যোৎপাদন বিবাহের নিতান্ত সামান্য ও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য কেহই বলিবেন না। সুস্থকায় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রফুল্লচিত্ত সুচরিত্র সন্তান উৎপাদন অপেক্ষা সমাজের মঙ্গল আর কিসে সাধিত হইতে পারে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, এ কথা আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। মনু কহিতেছেন :

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ।

সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীগণ বহুকল্যাণভাগিনী পূজনীয়া ও গৃহের শোভাজনক হয়েন।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং।

স্ত্রীগণ অপত্যের উৎপাদন, অপত্যের পালন ও প্রত্যহ-লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ নিদান হয়েন।

যেখানে মনু বলিয়াছেন :

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

সেইখানেই বলিয়াছেন :

যদিহি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে।

নারী যদি দীপ্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে তিনি স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে পারেন না। স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে না পারিলে সন্তানোৎপাদন সম্পন্ন হয় না।

এই-সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে সংসারযাত্রানির্বাহই হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং কেবল সেই উদ্দেশ্যেই যতটা একীকরণ সাংসারিক হিসাবে আবশ্যক তাহার প্রতি হিন্দুধর্মের বিশেষ মনোযোগ। অনেক সময়ে সংসারযাত্রানির্বাহের সহায়তা-জন্যই পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য। কারণ, অপত্য উৎপাদন যখন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য তখন বন্ধ্যা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রমতে অন্যায় হইতে পারে না। এমন-কি, প্রাচীনকালে অশক্ত স্বামীর নিয়োগানুসারে অথবা নিরপত্য স্বামীর মৃত্যুতে দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্মহানিজনক ছিল না। মহাভারতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে।

অতএব সন্তান-উৎপাদন, সন্তানপালন ও লোকযাত্রানির্বাহ যদি হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে দেখা যাইতেছে, উক্ত কর্তব্যসাধনের পক্ষে স্ত্রীলোকের একপতিনিষ্ঠ হওয়ার যত আবশ্যক পুরুষের পক্ষে একপত্নীনিষ্ঠ হইবার তেমন আবশ্যক নাই। কারণ, বহুপতি থাকিলে সন্তানপালন ও লোকযাত্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু বহুপত্নীতে সে-ব্যাঘাত না ঘটিতেও পারে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ সংসারযাত্রার সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অধিকাংশস্থলে সংসারে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। কারণ, বিধবার যদি সন্তানাদি থাকে তবে সেই সন্তানদিগকে হয় এক কুল হইতে কুলান্তরে লইয়া যাইতে হয়, নচেৎ তাহাদিগকে মাতৃহীন হইয়া থাকিতে হয়। সন্তানাদি না থাকিলেও বিধবা রমণীকে পুরাতন ভর্তৃকুল হইতে নূতন ভর্তৃকুলে লইয়া যাওয়া নানা কারণে সমাজের অসুখ ও অসুবিধাজনক; অতএব যখন সাংসারিক অসুবিধার কথা হইতেছে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিকতার কথা হইতেছে না, তখন এ স্থলে অনুপাতবাদ গ্রাহ্য। এইজন্য মনু পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন:

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেবচ।

পূর্বমৃতা ভার্যার দাহকর্ম সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্বার স্ত্রী ও শ্রৌত অগ্নি গ্রহণ করিবেন।

এখানে সংসারধর্মের প্রতিই মনুর লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতি অনুরাগ ততটা প্রকাশ পাইতেছে না। বিবাহের আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে। সমস্ত বিরহবিচ্ছেদ-অবস্থান্তর, সমস্ত অভাবদুঃখক্লেশ, এমন-কি, কদর্যতা ও অবমাননা অতিক্রম করিয়াও ব্যক্তিবিশেষ বা ভাববিশেষের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার যে একটি পবিত্র উজ্জ্বল সৌন্দর্য আছে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিকতা বল এবং যদি বল সেই আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুবিবাহের মুখ্য অবলম্বন এবং সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য তাহার গৌণ উদ্দেশ্য, তাহার সামান্য ও নিকৃষ্ট অংশ তবে কোনো যুক্তি অনুসারেই বহুবিবাহ ও স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয় বিবাহ আমাদের সমাজে স্থান পাইতে পারিত না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি বিবাহ বলিতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই পরস্পরের সম্মিলন বুঝায়— বিবাহ লইয়া সম্প্রতি এত আন্দোলন পড়িয়াছে এবং বুদ্ধির প্রভাবে অনেকে অনেক নূতন কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ শুনা যায় নাই।

অনেকে হিন্দুবিবাহের পবিত্র একীকরণপ্রসঙ্গে ইংরেজি ডিভোর্স প্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ডিভোর্স প্রথার ভালোমন্দ বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ডিভোর্স প্রথা নাই বলিয়া যে আমাদের বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে শাস্ত্র ও রাজনিয়মে একাধিক বিবাহ হইতেই পারে না সেখানে ডিভোর্স প্রথা দূষণীয় বলা যায় না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্যস্ত্রী অথবা বারস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকের উপর পঙ্কিল পাদুকাসমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো অধিকার

দেওয়া হয় নাই। যদি জানা যাইত অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষের অধিকাংশই বারস্ত্রীসক্ত নহে তবে হিন্দুবিবাহের পবিত্র প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহমোচন হইত। কিন্তু যখন পুরুষ যথেচ্ছ বিবাহ ও ব্যভিচার করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকের স্বামীত্যাগের পথ কঠিন নিয়মের দ্বারা রুদ্ধ তখন এ প্রসঙ্গে কোনো তুলনাই উঠিতে পারে না।

আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার যে যথেষ্ট প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিতে হইবে না। বৃদ্ধ লোকেরা অবগত আছেন, কিছুকাল পূর্বে অন্যান্য নানা আয়োজনের মধ্যে বেশ্যা রাখাও বড়োমানুষির এক অঙ্গ ছিল। এখনো দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ি করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে এবং ধুমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না এবং সমাজও সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা করে না। সমাজের অনেক তুচ্ছ নিয়মটুকু লঙ্ঘন করিলে যে দায়ে পড়িতে হয় ইহাতে ততটুকু দায়ও নাই। অতএব ডিভোর্স প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়াই ইহা বলা যায় না যে, আমাদের দেশে বিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক একীকরণতা রক্ষার প্রতি সমাজের বিশেষ মনোযোগ আছে।

যাহা হউক আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুবিবাহের যথার্থ যাহা মর্ম ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ না করিয়া যদি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আপন মনের মতো এক নূতন আদর্শ গড়িয়া তাহাকে পুরাতন বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করি, তবে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমরা ইংরেজি শিক্ষা হইতে অনেক sentiment প্রাপ্ত হইয়াছি (sentiment শব্দের বাংলা আমার মনে আসিতেছে না), অনেক দেশানুরাগী ব্যক্তি সেইগুলিকে দেশীয় ও প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন, এবং তাঁহারা বিরোধী পক্ষকে বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করেন। কেবল sentiment নহে, অনেক Evolution, Natural Selection, Magnetism প্রভৃতি নব্য বিজ্ঞানতন্ত্রসকলও প্রাচীন ঋষিদের জটাজালের মধ্য হইতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বাছিয়া বাহির করিতেছেন। কিন্তু সাপুড়ে অনেক সময়ে নিরীহ দর্শকের ক্ষুদ্র নাসাবিবর হইতে একটা বৃহৎ সাপ বাহির করে বলিয়াই যে উক্ত নাসাবিবর যথার্থ সেই সাপের আশ্রয়স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে। সাপ তাহার বৃহৎ ঝুলিটার মধ্যেই ছিল। sentiment সকলও আমাদের ঝুলিটার মধ্যেই আছে, আমরা নানা কৌশলে ও অনেক বাঁশি বাজাইয়া সেগুলি পুঁথির মধ্য হইতেই যেন বাহির করিলাম এইরূপ অন্যকে এবং আপনাকে বুঝাইতেছি। হিন্দুবিবাহের মধ্যে আমরা যতটা sentiment পুরিয়াছি তাহার কতটা Comte-র, কতটা ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের, কতটা খৃস্টধর্মের 'স্বর্গীয় পবিত্রতা' নামক শব্দ ও ভাব বিশেষের এবং কতটা প্রাচীন হিন্দুর এবং কতটা আধুনিক আচারের, তাহা বলা দুঃসাধ্য। সাংসারিকতাকে প্রাচীন হিন্দুরা হেয়জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু খৃস্টানেরা করেন। অতএব, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা— এ কথা স্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে লজ্জার কারণ নহে, খৃস্টানের পক্ষে বটে। হিন্দু স্ত্রীকে যে পতিপ্রাণা হইতে হইবে সেও সাংসারিক সুবিধার জন্য। পুত্রার্থেই বিবাহ কর বা যে কারণেই কর-না কেন, স্ত্রী যদি পতিপ্রাণা না হয় তবে অশেষ সাংসারিক অসুখের কারণ হয়, এবং অনেক সময়ে বিবাহের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব সাংসারিক শৃঙ্খলার জন্যই স্ত্রীর পতিপ্রাণা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর পত্নীগতপ্রাণ হইবার এত আবশ্যক নাই যে তাহার জন্য ধরাবাঁধা করিতে হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, সা ভার্যা যা প্রতিপ্রাণা, সা ভার্যা যা প্রজাবতী— সেই ভার্যা যে পতিপ্রাণা। কিন্তু ইহা বলিয়াই শেষ হয় নাই— তাহার উপরে বলা হইয়াছে, সেই ভার্যা যে সন্তানবতী। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যতই থাক্, সন্তান না হইলেই হিন্দুবিবাহ ব্যর্থ।

এইখানে আমার মনে একটি আশঙ্কা জন্মিতেছে। যে-শব্দের পরিষ্কার অর্থ নাই অথবা নির্দিষ্ট হয় নাই তাহা ইচ্ছামত নানা স্থানে নানা অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে সে-শব্দের উপযোগিতা বাড়ে কি কমে তাহা বিচারের যোগ্য। সকলেই জানেন আমাদের বাংলাভাষায় 'ইয়ে' নামক সর্বভুক্ সর্বনাম শব্দ আছে ; শব্দ বা ভাবের অভাব হইলেই তৎক্ষণাৎ 'ইয়ে' আসিয়া ভাষার শূন্যতা পূর্ণ করিয়া

দেয়। এই সুবিধা থাকাতে আমাদের মানসিক আলস্য ও ভাবপ্রকাশের অক্ষমতা সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছে। Magnetism-এর স্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত না থাকাতে উক্ত শব্দকে আশ্রয় করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক উপকথা সমাজে প্রচলিত হয়। Magnetism-এর কুহেলিকাময় ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া আমাদের আর্যশাস্ত্রের অনেক প্রমাণহীন উক্তি ও অর্থহীন আচার বিজ্ঞানের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আসন পাইবার মন্ত্রণা করে। সম্প্রতি Psychic Force নামক আর-একটি অজ্ঞাতকুলশীল শব্দ Magnetism-এর পদ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। যতদিন-না স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়া তাহার মুক্তিলাভ হয় ততদিন সে প্রদোষের অন্ধকারে জীর্ণমতের ভগ্নভিত্তির মধ্যে ও দেবতাহীন প্রাচীন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষে প্রেতের ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে। অতএব মুক্তির উদ্দেশেই কথার অর্থ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ 'আধ্যাত্মিক' বলিতে কী বুঝায়। যদি কেহ বলেন যে, সাংসারিক কার্য সুশৃঙ্খলে নির্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহ করার নামই আধ্যাত্মিক বিবাহ, কেবলমাত্র নিজের সুখ নহে সংসারের সুখের প্রতি লক্ষ করিয়া বিবাহ করাই আধ্যাত্মিকতা, তবে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শব্দের প্রতি অত্যাচার করা হয়। পার্ল্যামেন্ট-সভায় সমস্ত ইংলন্ড এবং তাহার অধীনস্ত দেশের সুখ সম্পদ সৌভাগ্য নির্ধারিত হয়, কিন্তু পার্ল্যামেন্ট-সভা কি আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। যদি বল পার্ল্যামেন্ট-সভার সহিত ধর্মের কোনো যোগ নাই তাহা ঠিক নহে। দেশের church যাহাতে যথানিয়মে অব্যাহতরূপে বজায় থাকে পার্ল্যামেন্টকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। উক্ত সভার প্রত্যেক সভ্যকে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বীকার করিতে হয় এবং ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। যদি বল, পার্ল্যামেন্টের কার্যকে ইংরেজরা ধর্মকার্য বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু বিবাহকে আমরা ধর্মকার্য বলিয়া মনে করি, অতএব আমাদের বিবাহ আধ্যাত্মিক— তবে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদের কোন্ কাজটা ধর্মের সহিত জড়িত নহে। সম্মুখযুদ্ধে নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও পুণ্যের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এমন-কি, ক্রূরকর্মা দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির স্বর্গস্থ দেখিয়া যখন বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন তখন দেবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করেন যে, ক্ষত্রিয় সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়া যে-ধর্ম উপার্জন করেন তাহারই প্রভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ক্ষত্রিয় দুর্যোধন যে-যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাকে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বলিবে কি না। শরীর রক্ষার্থে আহারব্যবহার সম্বন্ধে ধর্মের নামে শাস্ত্রে সহস্র অনুশাসন প্রচলিত আছে ; তাহার সকলগুলিকে আধ্যাত্মিক বলা যায় কি না। শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি অন্য-একজন ব্রাহ্মণ মাঝখানে থাকেন ও তাঁহাকে উপলক্ষ রাখিয়া শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে তাহাতে অধর্ম নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলে তাহার আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত হয় কি না এবং ব্রাহ্মণ মধ্যবর্তী থাকিলেই সে ব্যাঘাত দূর হয় কি না। ধর্মের অঙ্গস্বরূপ নির্দিষ্ট হইলেও এ-সকল লৌকিক নিয়ম না আধ্যাত্মিক নিয়ম ? যখন আমাদের সকল কার্যই ধর্মকার্য তখন ধর্মানুষ্ঠানমাত্রকে যদি আধ্যাত্মিকতা বল, তবে আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে আমরা যাহাই করি-না কেন আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইবার জো নাই।

যদি বল হিন্দু স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ অনন্ত সম্বন্ধ, দেহের অবসানে স্বামীস্ত্রীর বিচ্ছেদ নাই এইজন্য তাহা আধ্যাত্মিক, তবে সে কথাও বিচার্য। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে কর্মফলানুসারে জন্মান্তরপরিগ্রহ কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত কর্মফলের প্রভেদ আছেই, অতএব পরজন্মে পুনরায় উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন দৈবক্রমে হইতেও পারে কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে। আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তরের ন্যায় স্বর্গনরককল্পনাও আছে, কিন্তু সকল সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে একত্রে স্বর্গ বা নরকে গতি হইবে তাহা নহে। যদি পুণ্যবলে উভয়েই স্বর্গে যায় তবে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে লোকভেদ আছে, এবং পাপভেদে নরকেও সেইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের শাস্ত্রে পাপপুণ্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম বিচারের কল্পনা আছে, এ স্থলে বিবাহের অনন্তকালস্থায়িত্ব সম্ভব হয় কিরূপে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রমতে সাধারণত ইহজীবনেই দাম্পত্যবন্ধনের সীমা, অতএব তাহাকে ইহলৌকিক অর্থাৎ সাংসারিক বলিতে আপত্তি কিসের। দাম্পত্যবন্ধনের ঐহিক সীমাসম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস বদ্ধমূল।

কুমারী যখন স্বামী প্রার্থনা করে তখন সে বলে, যেন রামের মতো বা মহাদেবের মতো স্বামী পাই। পূর্বজন্মের স্বামী এ জন্মেও আধ্যাত্মিক মিলনে বদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিবে এ বিশ্বাস যদি কুমারীর থাকিত, তবে এ প্রার্থনা সে করিত না। বাল্মীকির রামায়ণে কী আছে স্মরণ নাই, কিন্তু সাধারণে প্রচলিত গান এবং উপাখ্যানে শুনা যায় সীতা রামকে বলিতেছেন, পরজন্মে যেন তোমার মতো স্বামী পাই— কিন্তু তোমাকেই পাই এ কথা কেন বলা হয় নাই।

অনেকে বলেন, অন্য দেশের বিবাহ চুক্তিমূলক, আমাদের দেশে ধর্মমূলক, অতএব তাহা আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটাই অমূলক। য়ুরোপের ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্র বলে :

> Our divine Redeemer sanctified this holy state of matrimony and from a natural and civil contract raised it to the dignity of a Sacrament. And St. Paul declared it to be a representative of that sacred union which Jesus Christ had formed with his spouse the Church.

ইহার মর্ম এই :

> বিবাহ পূর্বে প্রাকৃতিক ও সামাজিক চুক্তিমাত্র ছিল কিন্তু যিশুখৃস্ট ইহাকে উদ্ধার করিয়া মন্ত্রপূত পবিত্র সংস্কারমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ধর্মমণ্ডলীর সহিত দেবতার যে পুণ্য মিলন সংঘটিত হইয়াছে বিবাহ সেই পুণ্য মিলনের সামাজিক প্রতীকস্বরূপ।

বিবাহসময়ে ক্যাথলিক স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট যে-প্রার্থনা করেন তাহাও পাঠ করিলে য়ুরোপীয় দাম্পত্যের একীকরণতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইবে। অতএব অন্যদেশের বিবাহের তুলনায় হিন্দুবিবাহকে বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া হয় কেন। আধ্যাত্মিক শব্দের শাস্ত্রসংগত ঠিক অর্থটি কী তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না ; শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আত্মা সম্বন্ধীয়'। কোনো খণ্ডকালে বা খণ্ডদেশে যাহার অবসান নাই এমন যে এক অজর অমর সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান, তাহা সহজবোধ্যই হউক বা দুর্বোধ্যই হউক, তৎসম্বন্ধীয় যে-ভাব তাহাকে আধ্যাত্মিক ভাব বলে। এ আত্মা সমাজ নহে, এবং এ সমাজে, এ সংসারে ও এ দেহে আত্মার নিত্য অবস্থিতি নহে— অতএব বিবাহ যদি শ্বশুরশ্বশ্রূ পরিবার প্রতিবেশী অতিথিব্রাহ্মণ প্রভৃতির সমষ্টিভূত সমাজ রক্ষার জন্য হয় অথবা ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য হয় তাহাকে কোন্ অর্থ অনুসারে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া যায়। যে-উদ্দেশ্য জন্মমৃত্যুসংসারকে অতিক্রম করিয়া নিত্য বিরাজ করে তাহাকেই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কহে। কিন্তু হিন্দুমতে বিবাহ নিত্য নহে, আত্মার নিত্য আশ্রয় নহে। হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহা সংসারের হিতসাধনের জন্য নহে।

যাহা হউক, আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিতেছি আমাদের বিবাহ সামাজিক বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন-কি, এখন মনুর নিয়মও সমস্ত রক্ষিত হয় না। অতএব বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক -অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন করিবার অধিকার আছে। যদি দেখা যায় হিন্দুবিবাহে আমাদের বর্তমান সমাজে রোগ শোক দারিদ্র্য বাড়িতেছে, তবে বলা যাইতে পারে, মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া বিবাহের নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন ; অতএব সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের নিয়মপরিবর্তন করা অন্যায় নহে। ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজসংস্কার আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল-পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল অমঙ্গল কোনোকালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না ; জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে কবে।

বিবাহের বয়সনির্ণয় লইয়া কিছুদিন হইতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যদি এমন

বিবেচনা করা যায় যে, সন্তানোৎপাদন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সুস্থ সবল সন্তান উৎপাদন সমাজের কল্যাণের প্রধান হেতু, তবে সুস্থ সন্তানোৎপাদনপক্ষে স্ত্রীপুরুষের কোন্ বয়স উপযোগী বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু কিছুদিন হইতে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোনো কথাই শুনিবেন না বলিয়া দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শরীরতত্ত্ববিৎ কোনো পণ্ডিতেরই মত শুনিতে চাহেন না, আপনারা মত দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, বাল্যবিবাহে সন্তান দুর্বল হয় এ কথা শ্রবণযোগ্য নহে। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশের মনুষ্যেরাই যে কেবল দুর্বল তাহা নহে পশুরাও দুর্বল, অথচ পশুরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মনুর বিধান মানিয়া চলে না ; অতএব বাল্যবিবাহের দোষ দেওয়া যায় না, দেশের জলবায়ুরই দোষ। এ বিষয়ে গুটিদুয়েক বক্তব্য আছে। সত্যই যে আমাদের দেশের সকল জন্তুই অন্যদেশের তজ্জাতীয় জন্তুদের অপেক্ষা দুর্বল তাহা রীতিমত কোনো বক্তা বা লেখক প্রমাণ করেন নাই। আমাদের বঙ্গদেশের ব্যাঘ্র ভুবনবিখ্যাত জন্তু। বাংলার হাতি বড়ো কম নহে, অন্যদেশের হাতির সহিত ভালোরূপ তুলনা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোনো মত ব্যক্ত করা অন্যায়। আমাদের দেশের বন্যপশুদের সহিত অন্যদেশের বন্যপশুর তুলনা কেহই করেন নাই। গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহাদের বিষয়েও ভালোরূপ না জানিয়া কেবল চোখে দেখিয়া কিছুই বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের উপরে যে জলবায়ুর প্রভাব আছে এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহের কথা চাপা দেওয়া যায় না। শ্যালককে মন্দ বলিলেই যে ভগ্নীপতিকে ভালো বলা হয়, ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ কোনো পদ্ধতি নাই। দেশের জলবায়ুর অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বাল্যবিবাহের দোষ তাহাতে কাটে না, বরং বাড়ে। বাল্যবিবাহে দুর্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে, এ কথা শুনিলেই অমনি আমাদের দেশের অনেক লোক বলিয়া উঠেন এবং লিখিয়াও থাকেন যে, 'ম্যালেরিয়াতে দেশ উচ্ছন্ন গেল, তাহার বিষয় কিছুই বলিতেছ না, কেবল বাল্যবিবাহের কথাই চলিতেছে।' যখন একটা কথা বলিতেছি তখন কেন যে সে-কথাটা ছাড়িয়া দিয়া আর-একটা কথা বলিব তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যাহারা কোনো কর্তব্য সমাধা করিতে চাহে না তাহারা এক কর্তব্যের কথা উঠিলেই দ্বিতীয় কর্তব্যের কথা তুলিয়া মুখচাপা দিতে চায়। আমরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং অতিশয় দূরদৃষ্টি ও সম্পূর্ণ সাবধানতাসহকারে দেশের সমস্ত অভাব এবং বিঘ্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সমালোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাকা চাল চালিতে চাহি, যাহাতে একই সময়ে সকল দিকে সকলপ্রকার সুবিধা করিতে পারি এবং সজোরে 'কিস্তিমাত' উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হইতে যাবজ্জীবন নির্বিঘ্নে তামাক এবং তাকিয়া সেবন করিবার অখণ্ড অবসর প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান বাঙালি হইলেও ঠিক এমন সুযোগটি সংঘটন করিতে পারিব না। এমন-কি, আমাদিগকেও ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। অতএব দেশে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য দুর্বলতার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে বাল্যবিবাহের কুফল সমালোচন ও তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। একেবারে অনেক অধিক ভাবিতে পারিব না, কারণ অত্যন্ত অধিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে অনেক সময়ে চিন্তনীয় বিষয় সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া চিন্তার অতীত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে হয়। মহাবীর হনুমান যদি অতিরিক্তমাত্রায় লম্ফনশক্তি প্রয়োগ করিতেন তবে তিনি সমুদ্র ডিঙাইয়া লঙ্কায় না পড়িয়া লঙ্কা ডিঙাইয়া সমুদ্রে পড়িতেও পারিতেন। ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে, অন্যান্য সকল শক্তির ন্যায় চিন্তাশক্তিরও সংযম আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের কথায় যদি কর্ণপাত না করি তবে সত্য সম্বন্ধে কিছু কিনারা করা দুর্ঘট। আমরা নিজে সকল বিষয়েই সকলের চেয়ে ভালো জানিতে পারিব না অতএব অগত্যা বিনীত ভাবে পারদর্শীদের মত লইতেই হয়। কিছুদিন হইল আমাদের মান্য সভাপতি[১] এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে বিধান দিয়াছেন তাহা কালক্রমে পুরাতন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাই

১ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে-সকল কথা পাড়িতে সাহস হয় না— সকলেই পরম অশ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিবেন, 'সেই এক পুরাতন কথা!' কিন্তু আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। পুরাতন কথা বার বার তুলিতেই হইবে— নাচার।

ডাক্তার কার্পেন্টারকে সকলেই মান্য করিয়া থাকেন, শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মস্ত পণ্ডিত এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; অতএব এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিতে সকলেই বাধ্য। তিনি বলেন, ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে। অনেকে বলেন উষ্ণদেশে স্ত্রীলোকদের যৌবনারম্ভের বয়স শীতদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। কিন্তু কার্পেন্টার তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যৌবনলক্ষণ প্রকাশ শারীরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে, বাহ্য উত্তাপের উপরে নহে। বাহ্য উত্তাপ সামান্য পরিমাণে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে মাত্র। অতএব যৌনবিকাশ সম্বন্ধে বাহ্য উত্তাপের প্রভাব অতি সামান্য। আমাদের মান্য সভাপতি মহাশয়ের মতের সহিতও এই মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। তবে আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসর বয়সেও যে অনেক স্ত্রীলোকের যৌবনসঞ্চার হইবার উপক্রম দেখা যায় তাহা বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে। বাল্যকালে স্বামীসহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়, ইহা সহজেই মনে করা যায়। যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইবামাত্রই যে স্ত্রীপুরুষ সন্তানোৎপাদনের যোগ্য হয় তাহাও নহে। কার্পেন্টার বলেন:

> যৌবনারম্ভে স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়সকলের বিকাশ লক্ষণ দেখা দিবামাত্র যে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহা কেবল পূর্ববর্তী আয়োজন মাত্র। নরনারী যখন সর্বাঙ্গীণ পরিস্ফুটতা লাভ করে হিসাবমতে তখনই তাহারা জাতিরক্ষার জন্য জননশক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকারী হয়।

আমাদের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন— যেমন দাঁত উঠিলেই অমনি ছেলেদের খুব শক্ত জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত হয় না, তেমনই যৌবন সঞ্চার হইবামাত্র স্ত্রীপুরুষ সন্তান-উৎপাদনের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তারদের মত এতবার সাধারণের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে যে, এ স্থলে অন্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। সুশ্রুতসংহিতার সহিত এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহাও সকলে অবগত আছেন— অতএব শাস্ত্র-আস্ফালন করিয়া প্রবন্ধবাহুল্যের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

যাহা হউক, কাহারও কাহারও মতের সহিত না মিলিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মান্য ব্যক্তিগণ বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শাইয়া বলিয়া থাকেন যে, যৌবনারম্ভ হইবামাত্রই অপত্যোৎপাদন স্ত্রী পুরুষ এবং সন্তানের শরীরের পক্ষে ক্ষতিজনক। অতএব বিজ্ঞানের পরামর্শ লইতে গেলে বাল্যবিবাহ টেঁকে না।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে দুই দল আছেন। একদল মনুর ব্যবস্থানুসারে পুরুষের ২৪ হইতে ৩০-এর মধ্যে এবং স্ত্রীলোকের ৮ হইতে ১২-র মধ্যে বিবাহ দিতে চান, আর-এক দল, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বাল্যাবস্থায় বিবাহে কোনো দোষ দেখেন না। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামক একখানি পরমোৎকৃষ্ট গ্রন্থে মান্যবর লেখক 'বাল্যবিবাহ' নামক প্রবন্ধে প্রথমে মনুর নিয়মের প্রশংসা করিয়া তাহার পরেই লিখিতেছেন:

> ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুটিকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটি নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে-প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে।

অতএব পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ লেখকের অভিমত কি না তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু বলেন, যখন স্ত্রীকে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতে হইবে, তখন স্বামীর পরিণতবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। কারণ:

যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার জ্ঞানবান বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশি, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম। চব্বিশে এবং আটে বিবাহ হইলে হাড়ে হাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও পারে কিন্তু সে-মিশ্রণ সত্বর বিশ্লিষ্ট হইতে আটক নাই। দম্পতির বয়সের এত ব্যবধান থাকিলে আমাদের দেশে বিধবাসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িবে সন্দেহ নাই। যদিও বৈধব্যব্রতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষ ও রমণী উভয়েরই কল্যাণ কামনায় ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাই বলিয়া বিবাহিতা রমণীর বৈধব্য প্রার্থনীয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়বাবু এই মনে করিয়াই 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে 'কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহ' অন্যায় বলিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ ইহাই স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

> আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালকবিবাহের কার্যত প্রতিবাদ করি। করিলে বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে। যাহার বিবাহ হয় নাই সে বিধবা হইয়াছে এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।

যদি ২৪ বৎসর এবং তদূর্ধ্ব বয়সে পুরুষের বিবাহ স্থির হয়, তবে যিনি যেরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন কন্যার বয়সও বাড়াইতেই হইবে।

এইখানে চন্দ্রনাথবাবুর কথা ভালো করিয়া সমালোচনা করা যাক। কেন কন্যার বয়স অল্প হওয়া আবশ্যক তাহার কারণ দেখাইয়া চন্দ্রনাথবাবু বলেন :

> ইংরেজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়া তাহার বিবাহ বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিস্টজিটনের বিবাহ ; যিশুখৃস্টের সহিত সেন্ট পলের বিবাহ ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, হিন্দুবিবাহ মহৎ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া হিন্দুদম্পতির সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া আবশ্যক, নতুবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। এবং এক হইতে গেলে স্ত্রীর বয়স নিতান্ত অল্প হওয়া চাই। মহৎ উদ্দেশ্য বলিতে এখানে স্ত্রীর পক্ষে এই বুঝাইতেছে যে, শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা দেবর প্রভৃতির সহিত মিলিয়া গৃহকার্যের সহায়তা, অতিথির জন্য রন্ধন ও সেবা, পরিবারে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান হয় তাহার আয়োজনে সহায়তা করা এবং স্বামীর সেবা করা। স্বামীর পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক নিত্যকার্যে স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা। সাংসারিক নিত্য-অনুষ্ঠেয় কার্যে স্ত্রীর সাহায্য-গ্রহণ-করা-রূপ মহৎ উদ্দেশ্য সকল দেশের সকল স্বামীরই আছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদ এই, সকল দেশে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সমান নহে। দেশভেদে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রভেদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যভেদ দেখিতেছি না। মুসলমান সংসারে নিত্য অনুষ্ঠান কী কী তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি মুসলমান পত্নী সে-সকল অনুষ্ঠানের প্রধান সহায়। ইংরেজ পরিবারে নিত্যকার্য কী তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি ইংরেজ পত্নীর সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেবল তাহাই নহে, শুনিয়াছি সাংসারিক কার্য ছাড়া অন্যান্য মহৎ বা ক্ষুদ্র কার্যেও ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকেন। লেখকের স্ত্রী স্বামীর কেরানিগিরি করেন, প্রুফ-সংশোধন করেন, এবং অনেক সময় তদপেক্ষা গুরুতর সাহায্য করিয়া থাকেন। পাদ্রির স্ত্রীর পল্লীর দরিদ্র রুগ্‌ণ শোকাতুর ও দুষ্কর্মকারীদের সাহায্য সেবা সান্ত্বনা ও উপদেশ দান করিয়া স্বামীর পৌরোহিত্য কার্যের অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি দরিদ্রের দুঃখমোচন বা অসুস্থের স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি কোনো লোকহিতকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে কায়মনে সাহায্য করে। চন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি না করে ? আমার উত্তর, হিন্দু স্ত্রী যদি সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম না পালন করে ? সে যদি দুষ্টস্বভাব বা আলস্যবশত শাশুড়ির সহিত ঝগড়া করে ও সঘনে হাতনাড়া দিয়া কঠিন পণ করিয়া বসে, আমি অমুক গৃহকাজটা করিতে পারিব না, তবে কী হয়। তবে হয় তাহাকে বলপূর্বক সে-কাজে প্রবৃত্ত করানো হয়, নয় বধূর এই বিদ্রোহ পরিবারকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইংলন্ডেও সম্ভবত তাহাই ঘটে। যদি

ইংরেজ স্ত্রী তাহার অসহায় স্বামীকে বলিয়া বসে তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পাকাদির ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব না, তবে হয় স্বামী বলপ্রকাশ বা ভয়প্রদর্শন করে, নয় ভালোমানুষটির মতো আর-কোনো বন্দোবস্ত করে। চন্দ্রনাথবাবু বলিবেন, হিন্দু স্ত্রী এমনভাবে শিক্ষিত ও পালিত হয় যে বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অল্প ; অপর পক্ষে তেমনই বলা যায়, ইংরেজ স্ত্রী যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতায় পালিত, তাহাতে সাংসারিক কার্য ছাড়া মহৎ স্বামীর অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিতে সে অধিকতর সক্ষম। কতকগুলি কাজ যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়, এবং কতকগুলি কাজ স্বাধীন ইচ্ছার বল ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। রন্ধন ও শুশ্রূষাদি শাশুড়ি-ননদের নিত্য সেবা এবং গৃহ-কর্মের অনুষ্ঠানে সাহায্য করা, আশৈশব অভ্যাসে প্রায় সকলেরই দ্বারা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিল যেরূপ স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন সেরূপ স্ত্রী জাঁতায় পিষিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। হার্মোদিয়াস এবং এরিস্টজিটন, যিশুখৃস্ট এবং সেন্ট পল, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, রাম এবং লক্ষ্মণের যে মহৎ উদ্দেশ্যজাত বিবাহ তাহা জাঁতায়-পেষা বিবাহ নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিবাহ। কেহ না মনে করেন আমি জাঁতায়-পেষা বিবাহের নিন্দা করিতেছি, অনেকের পক্ষে তাহার আবশ্যক আছে ; তাই বলিয়া যিনি একমাত্র সেই বিবাহের মহিমা কীর্তন করিয়া অন্য সমস্ত বিবাহের নিন্দা করেন তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্বত্রই পুরুষ বলিষ্ঠ, অনেক কারণেই স্বামী স্ত্রীলোকের প্রভু ; এইজন্য সাধারণত প্রায় সর্বত্রই সংসারে স্ত্রী স্বামীর অধীন হইয়া কাজ করে। ইংরেজের অপেক্ষা আমাদের পরিবার বৃহৎ ; এইজন্য পরিবারভারে অভিভূত হইয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অধীন-অবস্থা অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়া উঠে। ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর অধীন বটে কিন্তু বৃহৎ সংসারভারে এত ভারাক্রান্ত নহে যে, কেবল পারিবারিক কর্তব্য ছাড়া আর-কোনো কর্তব্য সাধন করিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। এইজন্য পরিবারের অবশ্যকর্তব্যকার্য তাহাকে সাধন করিতেই হয়, এবং তাহা ছাড়া জগতের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্তব্যগুলি পালন করিতেও তাহার অবসর হয়। যদি বল অনেক ইংরেজ স্ত্রী সে অবসর বৃথা নষ্ট করেন তবে এ পক্ষে বলা যায় যে, অনেক হিন্দু স্ত্রী জগতের অনেক স্থায়ী উপকার করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কুটনা কুটিয়া, বাটনা বাঁটিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতএব দাম্পত্যবলে বলীয়ান হইয়া কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বিবাহ করিতে হইলেই যে শিশুস্ত্রীকে বিবাহ করাই আবশ্যক তাহা আমার বিশ্বাস নহে। শিক্ষা পাইলেই যে লোকে মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহা নহে, স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। অতএব শিশুস্ত্রী বড়ো হইয়া মহৎ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনে স্বামীর সহযোগিনী হইতে পারিবে কি না কিছুই বলা যায় না। কতকগুলি নিত্যঅভ্যস্ত কার্য নির্বিচারেও নিপুণতাসহকারে সম্পন্ন করা এক, আর শিক্ষামার্জিত স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি ও বিবেচনা -সহকারে জগতের উন্নতিসাধনকার্যে স্বামীর সহযোগিতা করা আর-এক। ইহার জন্য নির্বাচন এবং দুই হৃদয়ের এক মহৎ উদ্দেশ্যগত স্বাভাবিক আকর্ষণ আবশ্যক। তবে নির্বাচন করিতে গেলে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া পাছে রূপ যৌবন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয় এই ভয়। কিন্তু যদি গোড়াতেই পুরুষকে পরিণতবয়স্ক বিদ্যাবান ধর্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও মহৎ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে ইহা কেন মনে করা হয়, উক্ত পুরুষ কেবলমাত্র কন্যার রূপ দেখিয়াই কন্যা নির্বাচন করিবেন। চন্দ্রনাথবাবু গোড়ায় তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; তিনি বলেন মহৎ-উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য স্ত্রীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার ভার স্বামীর উপরে, অতএব হিন্দুবিবাহে স্বামীর পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক। এমন স্বামী যদি অধিক থাকে, সমাজের এত উন্নতির অবস্থা যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে অনেক গোলযোগ গোড়ায় মিটিয়া যায়। তবে সে-সমাজে মহৎ পিতামাতার মহৎ আদর্শ ও মহৎ শিক্ষায় কন্যারাও সহজে মহত্ত্ব লাভ করে এবং মহৎ পুরুষের পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্যসম্পন্ন স্ত্রী লাভ করাও দুরূহ হয় না। কিন্তু সর্বদাই ভালো মন্দ দু-ই আছে, এবং মহৎ উদ্দেশ্য সকলের দেখা যায় না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর প্রভৃতির যথাবিহিত সেবা, এবং পুরপ্রচলিত দেবকার্যের যথাবিধি সহায়তা করিয়া স্ত্রী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেই যে সকল স্বামীর

সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে তাহা নহে। স্বামী চায় মনের মতো স্ত্রী। তাহারই বিশেষ প্রীতিকর রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রী নইলে কেবল অভ্যস্ত-গৃহকার্যনিষ্ঠা স্ত্রী লইয়া তাহার সম্পূর্ণ বাসনা তৃপ্ত হয় না। মনুষ্যের যে কেবল একমাত্র গার্হস্থ্য শৃঙ্খলার প্রতিই দৃষ্টি আছে তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্যের প্রতি স্পৃহা, কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ, এবং লোকবিশেষে কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও নৈতিকগুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এইজন্য রুচি-অনুসারে স্বভাবতই মানুষ সৌন্দর্য সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং আপন মনের গতি-অনুযায়ী বিশেষ কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণ স্ত্রীর নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। স্ত্রীতে তাহার অভাব দেখিলে হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যায়। সেরূপ স্থলে অনেক পুরুষ হতাশ হইয়া বারাঙ্গনাসক্ত হয় এবং অনেক পুরুষ দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া মনের অসুখে স্ত্রীর প্রতি ঠিক ন্যায্য ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা তো অনেক স্থলেই দেখা যায় স্ত্রী অভ্যাসমত গৃহকোণে আপনমনে নিত্যগৃহকার্য ম্লানমুখে সম্পন্ন করিতেছে, স্বামীর তাহার প্রতি লক্ষই নাই, আদর নাই, যত্ন নাই।

কেহ কেহ বলিবেন আধুনিক শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই এরূপ ঘটিতেছে, পূর্বে এতটা ছিল না। এ কথা অসংগত নহে। পূর্বে আমাদের মনে সকল বিষয়েই যে একটি সন্তোষ ছিল, ইংরেজিশিক্ষায় তাহা দূর করিয়া দিয়াছে। ইংরেজের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় বাঙালির মনে কিয়ৎপরিমাণে উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েই অদৃষ্টের হাত দেখিয়া আপন হাত গুটাইয়া লইতে পারি না। এইজন্য কোনো অভাব বোধ করিলে সকল সময়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া আপনাকেই ধিক্কার দিই ; ইহাই অসন্তোষ। আমাদের আকাঙ্ক্ষাবেগ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, এবং আগে অনেক কিছু যাহা অনুভব করিতাম না এখন তাহা অনুভব করিয়া থাকি। অতএব আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়াছে, এবং আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে উদ্যমও বাড়িয়াছে। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, আধুনিক কালে অনেক পুরুষ তাঁহার বাল্যবিবাহিতা পত্নীর প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে স্বভাববিরুদ্ধ কিছু ঘটিয়াছে এমন বলিতে পারি না। অনেকে বলিবেন এরূপ যাহাতে না হয়, প্রাচীন সন্তোষ যাহাতে ফিরিয়া আসে, এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কালে পুরুষের প্রতি যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এখন সে-শিক্ষাপ্রণালী আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। আমরা যে-শিক্ষার দায়ে পড়িয়াছি তাহা লইয়াই বিব্রত, কারণ তাহার সহিত পেটের দায় জড়িত। চারি দিকের অবস্থা আলোচনা করিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে এ শিক্ষা এখন অনেক কাল চলিবেই। অতএব এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ এবং অলক্ষ্য প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুতরাং সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান সমালোচন করিবার সময় এ শিক্ষাকে একেবারেই আমল না দিলে চলিবে কেন। সমাজে যে-শিক্ষা প্রচলিত নাই তাহারই ফলাফল বিচার করিয়া, এবং যে-শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাকে দূরে রাখিয়া কোনো সমাজনিয়ম স্থাপন করা যায় না।

বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজিশিক্ষার কী প্রভাব তাহা আলোচনা আবশ্যক। পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজি মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রীপুরুষের একীকরণ ইংরেজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে-একীকরণ সর্বাঙ্গীণ একীকরণ— কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ। স্বামী যদি বিদ্বান হয় এবং স্ত্রী যদি মূর্খ হয় তবে উভয়ের মধ্যে মানসিক একীকরণ সম্ভবে না, পরস্পরের মধ্যে সম্যক্ ভাবগ্রহ চলিতে পারে না। একটি প্রধান বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে।

জীবনের সমুদয় কর্তব্যসাধনে স্ত্রীর সহযোগিতা, ইহাও ইংরেজি বিবাহের আদর্শ। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি ; এবং ইহাও বলিয়াছি এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে মিলন ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায় না। চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের, যিশুখৃস্টের সহিত সেন্ট পলের, রামের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ অনিবার্য স্বাভাবিক মিলন ঘটিয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। ইংরেজি সকল বিবাহে যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু এইরূপ বিবাহই তাহাদের আদর্শ।

যাঁহারা বলেন হিন্দুবিবাহের এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনো মানিতে পারি না। হিন্দুবিবাহে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য। আমরা স্ত্রীকে

সহধর্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই ; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিতমতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না। ইহাকে যদি সহধর্ম বলে তবে প্রাচীন কালে শূদ্রদিগকেও ব্রাহ্মণের সহধর্মী বলা যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্মব্রতপালনের ঐক্য নাই, কেবলমাত্র জাতিকুলের ঐক্য আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে ইংরেজিশিক্ষার গুণে এই ইংরেজি একীকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। হৃদয়মনের স্বাভাবিক নিগূঢ় ঐক্য থাকা প্রযুক্ত দুই স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্বক এক হইয়া যাওয়াই ইংরেজি একীকরণ ; আঠা দিয়া এবং চাপ দিয়া জোড়া, সে অন্য প্রকার একীকরণ। উক্ত ইংরেজি আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজি ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই। জলে প্রবেশ করিয়া মাছ ধরিতে গেলে ভিজিতেও হইবে।

অতএব আধুনিক শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকেই যখন স্ত্রী গ্রহণ করেন তখন সে স্ত্রী যে কেবলমাত্র গৃহকার্য নিপুণরূপে সম্পন্ন করিবে, ও তাঁহাকেই দেবতা জ্ঞান করিবে, ইহাই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না। সে-স্ত্রীর স্বাভাবিক গুণ ও শিক্ষা তাঁহারা দেখিতে চান, এবং যাঁহারা ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন, তাঁহারা স্ত্রীর কোনো স্থায়ী রোগপ্রবণতা বা অঙ্গহীনতা না থাকে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে চান। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ বিচার করিয়া বিবাহ করিবেন তাহা বলি না। অনেকেই ধন রূপ বা যৌবন -মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবেন। বর্তমান হিন্দুবিবাহেও সেরূপ হইয়া থাকে। অক্ষয়বাবু তাঁহার বক্তৃতায় কায়স্থবিবাহে দরদামের প্রাবল্য এবং কুলশীলের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রচলিত বিবাহে কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াও যে কন্যা নির্বাচন হয় না, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। ইহার যা ফল তাহা এখনো হয় পরেও হইবে। পিতার ধনমদে মত্ত বধূ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে দরিদ্র পতিকুলের অশান্তির কারণ হইয়া থাকে ; এবং অক্ষমতাবশত দরিদ্র পিতা কন্যার বিবাহের পণ সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি করিলে অভাগিনী কন্যাকে তজ্জন্য বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অতএব কেবলমাত্র ধনযৌবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কন্যানির্বাচন করিলে তাহার যা ফল তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা গুণ দেখিয়া কন্যা বিবাহ করিতে চান, বাল্যবিবাহে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা। চরিত্রবিকাশ না হইলে কন্যার গুণাগুণ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কন্যা বড়ো হইয়াই যে সত্যনিষ্ঠ সদ্বিবেচক প্রিয়বাদিনী ও হিতানুষ্ঠান নিরতা হইবে তাহা বলা যায় না। অনেক শিশুস্ত্রী বড়ো হইয়া নানাবিধ বৃথা অভিমানে ও উত্তরোত্তর-বিকাশমান হীন স্বভাব-বশত ঝগড়া-বিবাদ ও ঘরভাঙাভাঙি করিয়া থাকে। এবং অনেকে অগত্যা বধূদশা নিরুপদ্রবে যাপন করিয়া যথাসময়ে প্রচণ্ড শাশুড়িমূর্তি ধারণ করিয়া অকারণে নিজ বধূর প্রতি যৎপরোনাস্তি নিপীড়ন, অধীনাগণকে তাড়ন ও গৃহের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে কী করিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের সমাজে এরূপ শাশুড়ির বহুল অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। অতএব বাল্যবিবাহেই যে সুগৃহিণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যৌবনবিবাহে হয় না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

উপহাসরসিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, যদি এমন করিয়া বাছিয়াই বিবাহ প্রচলিত হয় তবে সমাজে অন্ধ খঞ্জ কুৎসিত অঙ্গহীনদের দশা কী হইবে। মনুর আমলে অঙ্গহীনতা প্রভৃতি দোষ জন্য যে-সকল কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের দশা কী হইত। পিতামাতার উপরে নির্বাচনের ভার রহিয়াছে বলিয়াই যদি সমাজে অন্ধ খঞ্জ অঙ্গহীনরা পার হইয়া যায়, তবে এমন হৃদয়হীন বিবেচনাশূন্য নির্বাচন-প্রণালী অতি ভয়ানক বলিতে হইবে। ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবার সময় পিতামাতা তাহাদের মঙ্গল আগে খুঁজিবেন, না সমাজের যত অন্ধখঞ্জদের সুখ আগে দেখিবেন ?

কিন্তু পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেই সকল সময়ে মনের মতো হইবে এমন কী কথা আছে— ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনের মতো বিবাহ করাই যদি মত হয় তবে পছন্দ করিয়া লইতেই হইবে। আসল কথা, মনের মতো পাওয়া শক্ত, অতএব ঠকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া

এমন কয়জন লোক বলিতে পারেন, তবে আমি মনের মতো চাই না— মনের অ-মতো হইলেও ক্ষতি নাই। যদি আমার সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, আমার সমগ্র মানবপ্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য আমি স্ত্রী চাই, তবে তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এমন কোনো কথাই নাই। কিন্তু সন্ধানপূর্বক বিবেচনাপূর্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য পন্থা নাই। Catholic শাস্ত্র দাম্পত্যনির্বাচন সম্বন্ধে কী বলেন এইখানে উদ্ধৃত করিব :

> They ought to implore the divine assistance by fervent and devout prayer, to guide them in their choice of a proper person ; for on the prudent choice which they make will very much depend their happiness both in this life and in the next. They should be guided by the good character and virtuous dispositions of person of their choice rather than by riches, beauty or any other worldly considerations, which ought to be but secondary motives.

এখনকার অনেক ছেলে যথাসম্ভব স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লয়। এখন অনেক স্থলে শুভদৃষ্টিই যে প্রথম দৃষ্টি তাহা নয়। অতএব দেখিতেছি নির্বাচনপ্রথা অল্পে অল্পে শুরু হইয়াছে। পিতামাতারাও ইহাতে ক্ষুব্ধ নহেন।

তবে একান্নবর্তী পরিবারের কী দশা হইবে। বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে এই এক প্রধান যুক্তি। স্ত্রীকে যে অনেকের সহিত এক হইতে হইবে। স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ একীকরণ সকল সময় হউক বা না হউক, বৃহৎ পরিবারের সহিত বধূর একীকরণসাধন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবু যাহা বলেন তাহা যথার্থ :

> ইংরেজপত্নীর যেমন একটিমাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; যদি তাহাই হয় তবে কেমন করিয়া শৈশববিবাহের নিন্দা করি।

শৈশববিবাহের যে নিন্দাই করিতে হইবে, এমন তো কোনো কথা নাই। অবস্থাবিশেষে তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি স্ত্রীশিক্ষা না থাকে এবং একান্নবর্তী পরিবার থাকে, তবে শিশুস্ত্রীবিবাহ সমাজরক্ষার জন্য আবশ্যক। কিন্তু তাহার জন্য আরো গুটিকতক আবশ্যক আছে ; তাহার প্রতি কেহ মনোযোগ করেন না। পুরাকালে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক এবং তখন সাংসারিক অবস্থা যেরূপ ছিল সেইরূপ অবস্থা আবশ্যক। কারণ কেবলমাত্র শিশুস্ত্রীবিবাহের উপর একান্নবর্তী পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে না।

পূর্বকালে সমাজের যে-অবস্থা ছিল ও যে-শিক্ষা প্রচলিত ছিল, সেই-সমস্ত অবস্থা ও শিক্ষা একত্র মিলিয়া একান্নবর্তী-পরিবার-প্রথার স্থায়িত্ব বিধান করিত। ইহার মধ্যে কোনো একটিকে বাছিয়া লইলে চলিবে না। সন্তোষ একান্নবর্তী-প্রথার মূলভিত্তি। বর্তমান সমাজে সন্তোষ কোথায়। আমাদের কত কী চাই তাহার ঠিক নাই। প্রথমত, ছাতা জুতা টুপি অশন বসন ভূষণ এবং ভদ্রসমাজের বাহ্য উপকরণ বিস্তর বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের দামও বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও মহার্ঘতা বাড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে লেখাপড়া অল্প ছিল এবং তাহার খরচ অল্প ছিল। সংস্কৃত সকলে শিখিতেন না, যাঁহারা শিখিতেন তাঁহাদের জন্য টোল ছিল। রাজভাষা ফার্সি কেহ কেহ শিখিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের বর্তমান রাজভাষাশিক্ষার ন্যায় এমন গুরুতর ব্যাপার ছিল না। শুভংকর ও বাংলা বর্ণমালা শিখিতে অধিক সময়ও চাই না, অর্থও চাই না। কিন্তু এখন ছেলেকে ইংরেজি শিখাইতে হইবে, পিতামাতার মনে এ আকাঙক্ষা সর্বদাই জাগ্রত থাকে। কেহ কেহ বা ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবেন, এমন বাসনা মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন। ইংরেজিবিদ্যাকে যে

সকলে শুদ্ধমাত্র অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা নহে ; অনেকেই মনে করেন, ইংরেজি শিক্ষা না হইলে মানসিক, এমন-কি, নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এইজন্য ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া তাঁহারা পরম কর্তব্য জ্ঞান করেন। অতএব সন্তানের স্থায়ী উন্নতিসাধন পিতামাতার সর্বপ্রধান ধর্ম, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা পুত্রের সামান্য শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সবসুদ্ধ ধরিয়া অভাব আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুসারে খরচপত্র বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের সচ্ছল ও সন্তোষের অবস্থাতেই একান্নবর্তী পরিবার সম্ভব। যখন সকলেরই অভাব অল্প এবং সামান্য পরিশ্রমেই সে-অভাব মোচন হইতে পারে, তখন অনেকে একত্র থাকিয়া পরস্পরের অভাবমোচনচেষ্টা স্বাভাবিক, এবং তাহা দুরূহ নহে। বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন (ইংরেজিতে যাহাকে clan system বলে) সাধারণের অল্প অভাব এবং এক উদ্দেশ্য থাকিলে সহজেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই যদি বিপুল অভাব ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য জন্মে তবে ঐক্যবন্ধন বলবৎ থাকিতে পারে না। অভাব আমাদের বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে, একান্নবর্তী পরিবারও টলমল করিতেছে— অনেক পরিবার ভাঙিয়াছে এবং অনেক পরিবার ভাঙিতেছে।

ইংরেজি শাস্ত্রে স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয়। স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে সেখানে বুদ্ধির ভিন্নতা-অনুসারে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা জন্মিয়াই থাকে। এখন কর্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। ভিন্ন মত না থাকিলে বর্তমান প্রবন্ধ লইয়া আজ আমাকে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে হইত না। যখন শাস্ত্রের প্রবল অনুশাসনে সকলে গুটিকতক কর্তব্য শিরোধার্য করিয়া লইত তখন ভিন্ন লোকের মধ্যে জীবনযাত্রার ঐক্য ছিল, এবং এক শাস্ত্রের অধীনে অনেকে মিলিয়া বাস করা দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু এখন যখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, শাস্ত্র বলিতেছে বলিয়াই কিছু মানি না, এমন-কি, যাঁহারা শাস্ত্রকে সম্মান করেন তাঁহারা অনেকে আপন মতানুসারে শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করেন, অথবা নিজের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের কোনো কোনো অংশ বর্জন করিয়া কোনো কোনো অংশ নির্বাচন করিয়া লন, তখন নির্বিরোধে একত্র অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়। অতএব একত্র থাকিতে গেলে সকলের অভাব অল্প থাকা চাই, এবং যুক্তিবিচারনিরপেক্ষ কতকগুলি সরল কর্তব্য থাকা চাই, এবং তাহার কর্তব্যতার প্রতি সকলের সমান বিশ্বাস থাকা চাই।

ইহা ছাড়া পরিবারের একটি কর্তা থাকা চাই। কিন্তু এখন পূর্বের মতো কর্তার কর্তৃত্ব তেমন নাই বলিলেও হয়। বঙ্গদেশে পিতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, এইজন্য সচরাচর গুরুতর পিতৃদ্রোহ ততটা দেখা যায় না ; কিন্তু বড়ো ভায়ের প্রতি ছোটো ভায়ের অসম্মান এবং ভায়ে ভায়ে বিরোধ, ইহা অনেক দেখা যায়। বড়ো ভাই যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য, এবং যাহা করিবেন তাহাই সহিয়া থাকিতে হইবে, ইহা এখন সকলে মানে না। যে-কারণে শাস্ত্রের অনুশাসন শিথিল হইয়া আসিতেছে, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের নির্বিচার ভক্তিবন্ধন সেই কারণেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এ স্থলে আর-একটি বিষয় বিচার্য। তাহা শিক্ষার বৈষম্য। যে ভালোরূপ ইংরেজি শিখিয়াছে এবং যে শেখে নাই, তাহাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান পড়িয়াছে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্বে বিদ্বান-মূর্খের মধ্যে এরূপ প্রভেদ ছিল না। তখন একজন বেশি জানিত আর-একজন কম জানিত, এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে, আর-একজন অন্যরূপ জানে। এইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয়ে উভয়কে জানে না। সামান্য বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝে, এই জন্য উভয়ের তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকা প্রায় অসম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে, এক সময়ে একান্নবর্তী প্রথা থাকাতে অনেক সুবিধা ছিল এবং তাহাতে মানবপ্রকৃতির অনেক উন্নতি সাধন করিত। কিন্তু এখন অবস্থাভেদে তাহার সুবিধাগুলি চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে যে উন্নতির কারণ ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। পূর্বে জটিলতাবিহীন সমাজে যে-সকল সুখ সম্পদ ও শিক্ষা লভ্য ছিল, তাহা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই সকলে পাইত। এখন একান্নবর্তী পরিবারে থাকে বলিয়াই অনেকে সে-সকল হইতে বঞ্চিত হইতেছে। আমি

প্রাণপণে উপার্জন করিয়া যে-অর্থ সঞ্চয় করিতেছি, তাহাতে কোনোমতে আমার পুত্রের শিক্ষা দিয়া তাহার যাবজ্জীবন উন্নতির মূলপত্তন করিয়া দিতে পারি ; কিন্তু আমি আমার পুত্রের অহিতসাধন করিয়া আমার শ্যালকপুত্রের কথঞ্চিৎ উদরপূর্তি করিব, ইহাকে সকলের মহৎ উদ্দেশ্য মনে না হইতেও পারে। যদি ইচ্ছা কর তো সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিয়া অপরের সন্তানের উন্নতিসাধনে প্রাণপণ করিতে পার, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে ; কিন্তু যদি তোমার নিজের সন্তান জন্মে তবে সর্বাপেক্ষা প্রবল স্নেহ ও কর্তব্যসূত্রে তোমার সহিত বদ্ধ যে-আত্মজ, তাহার সম্যক্ উন্নতিবিধানের জন্য তুমি প্রধানত দায়ী। পূর্বে শ্যালকপুত্রের সহিত নিজ পুত্রের প্রভেদ করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না, কারণ তখন আমাদের অন্নপূর্ণা বঙ্গভূমি তাঁহার সকল সন্তানকে একত্রে কোলে লইয়া সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার ভাণ্ডার এমন পরিপূর্ণ ছিল ; এখন চারি দিকে অন্ন নাই অন্ন নাই রব উঠিয়াছে, এখন পিতা স্বয়ং আপন ক্ষুধিত সন্তানের মুখ না চাহিলে উপায় কি। দ্বিতীয় কথা, পূর্বকালে একান্নবর্তী পরিবারে প্রীতিভাবের অত্যন্ত চর্চা হইত। এজন্য তাহা দেশের একটি মহৎ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন সাধারণের অবস্থাভেদে শিক্ষাভেদে শাস্ত্রভেদে মতভেদে ও রুচিভেদে নিতান্ত একত্র অবস্থানে সর্বত্র সেরূপ সদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা ও নিন্দাগ্লানির সম্ভাবনা ; এবং ইহাতে মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবারই কথা। তৃতীয় কথা, যখন পরিবারের মধ্যে শাসন শিথিল হইয়া আসিয়াছে ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন তখন পরিবারের মধ্যে যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বহুবিস্তৃত পরিবারে এরূপ যথেচ্ছাচারের অপেক্ষা ক্ষতিজনক আর কী আছে। একজন এক ঘরে মদ্যপান করিতেছেন, আর-একজন অন্য ঘরে বন্ধুবান্ধবসমেত অট্টহাস্য ও ঊর্ধ্বকণ্ঠে কুৎসিত আলাপে নিরত, এ স্থলে আমার ছেলেপুলের শিক্ষা কীরূপ হয়। আমি আমার সন্তানকে এক ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, আমার গুরুজন তাহাকে অন্য ভাবে শিক্ষা দেন, সে স্থলে ছেলেটার উপায় কী। পিতার শিক্ষাগুণে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বিগড়িয়া গেছে, তাহাদের সহিত আমি আমার ছেলেকে একত্র রাখি কী করিয়া। তাহা ছাড়া বৃহৎ পরিবারে সকলের প্রেমের বন্ধন সমান হইতেই পারে না ; সুতরাং পরস্পরের প্রতি কুৎসা দ্বেষ মিথ্যাচরণ অনেক সময় দূষিত রক্তস্রোতের ন্যায় পরিবারের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। অতএব দেখিতেছি, কালক্রমে একান্নবর্তী প্রথার সদ্‌গুণসকল বিনষ্ট এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র কন্যার বাল্যবিবাহ-প্রবর্তন-রূপ ক্ষীণ দণ্ড আশ্রয় করিয়াই যে এই ঐতিহাসিক প্রকাণ্ড পতনোন্মুখ মন্দিরকে ধরিয়া রাখিতে পারিব তাহা মনে হয় না। প্রথমে শিখিতে হইবে শাস্ত্র অভ্রান্ত, গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়, তার পর দেখিতে হইবে জীবনের অভাব-সকল উত্তরোত্তর স্বল্প ও সরল হইয়া আসিতেছে ; তবে জানিব একান্নবর্তী প্রথা টিকিবে। কিন্তু দেখিতেছি, বর্তমান সমাজে দুটার মধ্যে কোনোটাই ঘটিতেছে না ; এবং ভবিষ্যতে যতটা দেখা যায়, শীঘ্র এ অবস্থার পরিবর্তন দেখি না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

এই-সকল ভাবিয়া যাঁহারা বলেন বর্তমান সমাজে একান্নবর্তী প্রথার অনেক দোষ ঘটিয়াছে, অতএব উহা উঠিয়া গেলে কোনো হানি নাই, বরং উঠিয়া যাওয়াই উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহ উঠাইবার কোনো প্রয়োজন দেখি না— তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, একান্নবর্তী প্রথা না রাখিলে বাল্যবিবাহ থাকিতে পারে না। যেখানে স্বতন্ত্র গৃহ করিতে হইবে সেখানে স্বামীস্ত্রীর বয়স অল্প হইলে চলিবে না। তখন শিশুস্ত্রী যদি অনেক দিন পর্যন্ত স্বামীর নিরুদ্যম ভারস্বরূপ হইয়া থাকে তবে স্বামীর পক্ষে সংকট। একক স্বামীগৃহে কেই-বা তাহাকে গৃহকার্য শিক্ষা দিবে। অতএব এরূপ অবস্থায় পিতৃভবন হইতে গৃহকার্য শিক্ষা করিয়া স্বামীগৃহে আসা আবশ্যক। অথবা পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে স্বল্প পরিবারের ভার গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

অতএব একান্নবর্তী প্রথা ভালো সুতরাং তাহা রক্ষার জন্যই বাল্যবিবাহ ভালো, এ কথা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা উঠে ; সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল। এখন আর-একটি কথা দেখিতে হইবে। যে-অসচ্ছল অবস্থার পীড়নে একান্নবর্তী প্রথা প্রতিদিন অল্পে অল্পে ভাঙিয়া

পড়িতেছে, সেই অবস্থার দায়েই বাল্যবিবাহ প্রথাও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। দায়ে পড়িয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক কন্যাকে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখা হইয়াছে, ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক মান্য কুলীনসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্থলে এখনো আছে। অতএব তেমন দায়ে পড়িলে অল্পে অল্পে কুমারী কন্যার বয়োবৃদ্ধি এখনো অসম্ভব নহে। সমাজ দায়েও পড়িয়াছে এবং অল্পে অল্পে বয়োবৃদ্ধিও আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আচার মানিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যেও ১৩ বৎসর বয়সে কন্যাদান অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে আট-দশ বৎসর পার হইলেই কন্যাকে পিতৃগৃহে দেখা যাইত না। পূর্বে কন্যার ৩।৪।৫ বৎসর বয়সে যত বিবাহ দেখা যাইত এখন তত দেখা যায় না। পুরুষের বিবাহবয়স পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দুসমাজে পুরুষের শিশুবিবাহ নাই বলিলেও হয়। এইরূপ অলক্ষিতভাবে বিবাহের বয়োবৃদ্ধি যে ইংরেজিশিক্ষার অব্যবহিত ফল, আমার তাহা বিশ্বাস নহে। অবস্থার অসচ্ছলতাই ইহার প্রধান কারণ। আমার বোধ হয় বড়োমানুষের ঘরে বাল্যবিবাহ যতটা আছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ততটা নাই। অর্থক্লেশের সময় ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া বিষম ব্যাপার। সুবিধা করিয়া বিবাহ দিতে অনেক সময় যায়। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য সাংসারিক খরচ বাদে অল্প অল্প করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহাতে অনেক সময় চাই। সমাজের সচ্ছল অবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্তকে লোকে সাহায্য করিত। কিন্তু এখন একপক্ষে খরচ বাড়িয়াছে, অপরপক্ষে সাহায্য কমিয়াছে।

এ ছাড়া, ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে অনেক অবিবাহিত যুবক নানা বিবেচনায় চটপট বিবাহকার্য সারিয়া ফেলিতে চান না। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যুবক আছেন যাঁহারা যৌবনের স্বাভাবিক উৎসাহে সংকল্প করেন যে, বিবাহ না করিয়া জীবন দেশের কোনো মহৎ কার্যে উৎসর্গ করিব ; অবশেষে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে মহৎ কার্যের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মিলে হয়তো বিবাহের প্রতি মনোযোগ করেন। অনেকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া পঠদ্দশায় বিবাহ করিতে অসম্মত। এবং অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া তাড়াতাড়ি পরিবারবৃদ্ধি করিলে ইহজীবন দারিদ্র্যের হাত এড়ানো দুষ্কর হইবে। তাঁহারা জানেন যে, অল্পবয়সে স্ত্রীপুত্রের ভারে অভিভূত হইয়া তেজ বল সাহস সমস্তই হারাইতে হয়। সহস্র অপমান নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হয়, তাহার সমুচিত প্রতিশোধ দিতে ভরসা হয় না। যখন বিদেশীয় প্রভুর নিকট হইতে নিতান্ত হীনজনের ন্যায় অন্যায় লাঞ্ছনা সহ্য করা যায় তখন গৃহের ক্ষুধিত রুগ্‌ণ সন্তানের ম্লান মুখই মনে পড়ে এবং নীরবে নতশিরে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হয়। কাগজে পত্রে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অনেক লেখনী-আস্ফালন করি, কিন্তু গৃহে ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে আর থাকা যায় না ; সেই শ্বেতপুরুষের দ্বারস্থ হইয়া জোড়হস্তে ছলছলনয়নে দুই বেলা উমেদারি করিয়া মরিতে হয়। সংসার-ভার বহন করিয়া বাঙালিদের স্বাভাবিক সাবধানতাবৃত্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠে এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া কোনো কাজে অগ্রসর হইতে পা উঠে না। এইরূপ ভারাক্রান্ত ভীত এবং ব্যাকুল ভাব জাতির উন্নতির প্রতিকূল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ কথা স্মরণ করিয়া অনেক দেশানুরাগী অপমান-অসহিষ্ণু উন্নতস্বভাব যুবক অসমর্থ অবস্থায় বিবাহ করিতে বিরত হইবেন। ইহা নিশ্চয়ই যে, দারিদ্র্যের প্রভাব যতই অনুভব করা যাইবে লোকে বিবাহবন্ধনে ধরা দিতে ততই সংকুচিত হইবে। যখন চারি দিকে দেখা যাইবে উদ্বাহবন্ধন উদ্বন্ধনের ন্যায় বিবাহিতের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখন মনু অথবা অন্য কোনো ঋষির বিধান সত্ত্বেও যুবক যখন-তখন উক্ত ফাঁসের মধ্যে গলা গলাইয়া দিতে সম্মত হইবে না। স্ত্রীর সহিত পবিত্র একত্ব সাধন করিতে গিয়া যদি পঞ্চত্ব নিকটবর্তী হয় তবে অনেক বিবেচক লোক উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। বাপ মায়ে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, তাহারাও যে তাড়াতাড়ি অবিবেচক বালকের গলদেশে বিষম গুরুভার বধূ বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। ছেলে যখন আপনি উপার্জন করিবে তখন বিবাহ করিবে, আজকাল অনেক পিতার মুখে এ কথা শুনা যায়। এমন-কি, হিন্দুগৃহে প্রাচীন নিয়মে পালিতা সেকেলে একটি প্রাচীনার মুখে এই মত শুনিয়া আশ্চর্য

হইয়াছি। অথবা আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই ; জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি— সমাজের অবস্থাগতিকে এ বিশ্বাস আর টিকে না।

অতএব ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অভাবের জটিলতা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই পুরুষেরা শীঘ্র বিবাহ করিতে চাহিবে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আগে অনেক ছেলে 'বিয়েপাগলা' ছিল, এখন অনেকে বিয়েকে ডরায়। ক্রমে এ ভাব আরো অনেকের মধ্যে সংক্রামিত হইতে থাকিবে। পুরুষ যদি উপার্জনক্ষম হইয়া বড়ো বয়সে বিবাহ করে তবে মেয়ের বয়সও বাড়াইতে হইবে সন্দেহ নাই। মস্ত পুরুষের সঙ্গে কচি মেয়ের বিবাহ নিতান্ত অসংগত। দেখা যায় বরকন্যার মধ্যে বয়সের নিতান্ত বৈসাদৃশ্য দেখিলে কন্যাপক্ষীয় মেয়েরা অত্যন্ত কাতর হন। বোধ করি মনের অমিল ও বৈধব্যের সম্ভাবনাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিবাহযোগ্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহযোগ্য মেয়ের বয়সও বাড়িতে থাকিবে।

অতএব যিনি যতই বক্তৃতা দিন, দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে এবং আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বয়সের সীমা বাড়িবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। কিছুদিন প্রাচীন নিয়ম ও নূতন অবস্থার বিরোধে সমাজে অনেক অসুখ অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এবং ক্রমশ এই মথিত সমাজের আলোড়নে নূতন জীবন নূতন নিয়ম জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাহার সমস্ত ফলাফল আমরা আগে হইতে সম্পূর্ণ বিচার করিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন আমাদের সমাজে অনেক মন্দ আছে, কিন্তু অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেগুলিকে তত গুরুতর মন্দ বলিয়া মনে হয় না ; তখনো হয়তো কতকগুলি অনিবার্য মন্দ উঠিবে যাহা আমরা আগে হইতে কল্পনা করিয়া যত ভীত হইতেছি তখনকার লোকের পক্ষে তত ভীতিজনক হইবে না। দূর হইতে ইংরেজেরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানের নামমাত্র শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে যতখানি চমক খাইয়া উঠেন, ভিতরে প্রবেশ করিলে ততখানি চমক খাইবার কিছুই নাই, সমাজের মধ্যে সন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক অনুষ্ঠানের ভালোমন্দ ভাগ লইয়া একপ্রকার সামঞ্জস্যবিধান হইয়াছে। তেমনই আমরাও দূর হইতে ইংরেজসমাজের অনেক আচারের নাম শুনিয়া যতটা ভয় পাই, ভিতরে গিয়া দেখিলে হয়তো জানিতে পারি ততটা আশঙ্কার কারণ নাই। তাহা ছাড়া অভ্যাসে অনেক ভালোমন্দ সৃজিত হয়। এখন যে-মেয়ে ঘোমটা দিয়া সূক্ষ্ম বসন পরে তাহাকে আমরা বেহায়া বলি না, কিছুকাল পরে যাহারা ঘোমটা না দিয়া মোটা কাপড় পরিবে তাহাদিগকে বেহায়া বলিব না। মনে করো, শ্যালীর সহিত ভগ্নিপতির অনেক স্থলে যেরূপ উপহাস চলে তাহাতে একজন বিদেশের লোক কত কী অনুমান করিয়া লইতে পারে, এবং অনুমান করিলেও তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সত্য সত্যই ততটা ঘটে না। সমাজের এক নিয়ম অপর নিয়মের দোষসম্ভাবনা কথঞ্চিৎ সংশোধন করে। অতএব কোনো সমাজের একটিমাত্র নিয়ম স্বতন্ত্র তুলিয়া লইয়া তাহার ভালো মন্দ বিচার করিলে প্রতারিত হইতে হয়। এইজন্য আমাদের সমাজের পরিবর্তনে যে-সকল নূতন নিয়ম অল্পে অল্পে স্বভাবতই উদ্ভাবিত হইবে, আগে হইতে তাহার সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। তাহারা অকাট্য নিয়মে পরস্পর পরস্পরকে জন্ম দিবে ও রক্ষা করিবে। সমাজে আগে-ভাগে বুদ্ধি খাটাইয়া গায়ে পড়িয়া একটা নিয়মস্থাপন করিতে যাওয়া অনেক সময় মূঢ়তা। সে-নিয়ম নিজে ভালো হইতে পারে, কিন্তু অন্য নিয়মের সংসর্গে সে হয়তো মন্দ। অতএব বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে আজ তাহার ফল যতটা ভয়ানক বলিয়া মনে হইবে, তাহা হইতে যত বিপদ ও অমঙ্গল আশঙ্কা করিব, তাহার অনেকটা আমাদের কাল্পনিক। কেবল, কতকটা দেখিতেছি এবং অনেকটা দেখিতেছি না বলিয়া এত ভয়।

বলা বাহুল্য, আমি সমাজের পরিবর্তন সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানত শিক্ষিত-সমাজের পক্ষে খাটে। অতএব শীঘ্র বাল্যবিবাহ দূর হওয়া শিক্ষিতসমাজেই সম্ভব। কিন্তু তাহা আপনি সহজ নিয়মে হইবে। যাঁহারা আইন করিয়া জবরদস্তি করিয়া এ প্রথা উঠাইতে চান তাঁহারা এ প্রথাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ইহার দুই-একটি ফলাফলমাত্র বিচার করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রথা তাঁহারা দেখেন নাই। সামাজিক অন্যান্য সহকারী নিয়মের মধ্য হইতে

বাল্যবিবাহকে বলপূর্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। অল্পে অল্পে নূতন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নূতন আকার ধারণ করিয়া সমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত আপন উপযোগিতাসূত্র বন্ধন করিতেছে। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহাদিগকে অকারণ ব্যস্ত হইতে হইবে না।

তেমনই, যাঁহারা একান্নবর্তী-পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন অবস্থা ও নূতন শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া আচার ও উপদেশ হইতে বাল্যবিবাহ দূর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম অথবা বিদেশগমন দ্বারা জাতিচ্যুত হইলেও বিবেচক হিন্দুমণ্ডলী তাঁহাদিগকে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা মহাপাতকী জ্ঞান না করেন। তাঁহারা কিছুই অন্যায় করেন নাই। তাঁহারা বর্তমান শিক্ষা ও বর্তমান অবস্থার অনুগত হইয়া আপন কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় যুক্তিসংগত কাজই করিয়াছেন। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অবস্থাবিশেষে বাল্যবিবাহ উপযোগী হইলেও অবস্থাবিপর্যয়ে তাহা অনিষ্টজনক।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কী কী বলিয়াছি, এইখানে তাহার একটি সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি আবশ্যক।

প্রথম। হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন না করাতে তাঁহাদের কথার সত্যমিথ্যা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের ইতস্তত হইতে শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া একই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়। যাঁহারা বলেন, হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ্য দম্পতির একীকরণতার প্রতি, তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে পুরুষের বহুবিবাহ এ দেশে কোনোক্রমে প্রচলিত হইতে পারিত না।

তৃতীয়। আজকাল অনেকেই বলেন হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ কী। উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ হিন্দুবিবাহে নানা কারণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; উক্ত কারণ-সকল একে একে দেখানো হইয়াছে।

চতুর্থ। তাহাই যদি হয় তবে দেখা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহ সামাজিক মঙ্গল ও সাংসারিক সুবিধার জন্য। সংহিতা সম্বন্ধে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি এবং মনুর কতকগুলি বিধান উক্ত মতের পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

পঞ্চম। সমাজের মঙ্গল যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহার না থাকে বা গৌণভাবে থাকে, তবে বিবাহ সমালোচনা করিবার সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজের পরিবর্তন হইতেছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েরও তদনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হইতেছে। পুরাতন সমাজের নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদের বর্তমান সমাজের বিবাহের সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক হয় কি না তাহা সমালোচ্য।

ষষ্ঠ। তাহা হইলে দেখিতে হইবে বাল্যবিবাহের ফল কী। প্রথম বাল্যবিবাহে সুস্থকায় সন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত হয় কি না। বিজ্ঞানের মতে ব্যাঘাত হয়।

সপ্তম। কেহ কেহ বলেন, পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ দিলেই আর কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পুরুষের বিবাহবয়স বাড়াইলে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় মেয়েদের বয়সও বাড়াইতে হইবে নয় পুরুষের বয়স আপনি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিবে, যেমন মনুর সময় হইতে কমিয়া আসিয়াছে।

অষ্টম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সুস্থ সন্তান উৎপাদনই সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ নহে, অতএব একমাত্র তৎপ্রতিই বিবাহের লক্ষ থাকিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্যসাধনেই বিবাহের মহত্ত্ব। অতএব মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের অভিপ্রায়ে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া স্বামীর কর্তব্য। এইজন্য স্ত্রীর অল্প বয়স হওয়া চাই। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যথার্থ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ উপযোগী। তাহার পরে দেখাইয়াছি, মহৎ উদ্দেশ্য সকল স্বামীরই থাকিতে পারে না; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে, উক্ত গুণ-সকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে; নিরাশ হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি

ও অমঙ্গল সৃষ্ট হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করিতে হইলে বড়ো বয়সে বিবাহ আবশ্যক।

নবম। কিন্তু পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে। আমি দেখাইয়াছি, কালক্রমে নানা কারণে একান্নবর্তী প্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব একমাত্র বাল্যবিবাহদ্বারা উহাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং রক্ষা উচিত কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ।

দশম। সমাজে এ-সকল ছাড়া দারিদ্র্য প্রভৃতি এমন কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে স্বতই বাল্যবিবাহ অধিক কাল টিকিতে পারে না। সমাজে অল্পে অল্পে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহ দূষণীয় জ্ঞান করেন অথবা সুবিধার অনুরোধে ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্বক বাল্যবিবাহ উঠানো যায় না। কারণ, ভালোরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হইবে। যেখানে শিক্ষার প্রভাব হইতেছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠিতেছে, যেখানে হয় নাই সেখানে এখনো বাল্যবিবাহ উপযোগী। আমাদের অন্তঃপুরের, আমাদের সমাজের, অনেক অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে এবং আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের ভিতরকার শিক্ষায় বাল্যবিবাহ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে ; অতএব অগ্রে শিক্ষার প্রভাবে সে-সকলের পরিবর্তন না হইলে কেবল আইনের জোরে ও বক্তৃতার তোড়ে সর্বত্রই বাল্যবিবাহ দূর করা যাইতে পারে না।

১২৯৪

রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে

পত্র

কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুনতে গিয়েছিলেম। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী নিরাভরণা শ্বেতাম্বরী ক্ষীণতনুযষ্টি উজ্জ্বলমূর্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল। তিনি বললেন, মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কী মনে হয়। মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন, রূপ এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে ; তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তা হলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়। সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of Compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ ; তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব'লে অবশ্য এ কথা কেউ বলবে না যে, তবে তাদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত ; যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, তবে পুরুষদের হৃদয়বৃত্তি চর্চা করা অকর্তব্য। অতএব স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই।

আমার তো বোধ হয় না, কবি হতে ভূরিপরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। মেয়েরা এতদিন যেরকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। Burns খুব যে সুশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। অনেক বড়ো কবি অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথমশ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনো হয় নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখছে এত পুরুষ শেখে নি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা

চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart কিংবা Beethoven জন্মাল ! অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই musician। এমন তো ঢের দেখা যায়, বাপের গুণ মেয়েরা এবং মায়ের গুণ ছেলেরা পায়, তবে কেন এরকম প্রতিভা কোনো মেয়ে সচরাচর পায় না। আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেইসঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই। আমার তো এইরকম বিশ্বাস। তুমি বলবে, এখন পর্যন্ত এইরকম চলে আসছে কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে কে বলতে পারে। সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আছে।

আসলে শিক্ষা, যাতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, তা কেবল বই পড়ে হতে পারে না— তা কেবল কাজ করে হয়। বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে পড়ে যখন সংগ্রাম করতে হয়, সহস্র বাধা বিঘ্ন যখন অতিক্রম করতে হয়, যখন বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতে ও জড় বাধাতে সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সমস্ত বুদ্ধি জেগে ওঠে। তখন আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির আবশ্যক হয় সুতরাং চর্চা হয়, এবং সেই অবিশ্রাম আঘাতে স্নেহ দয়া প্রভৃতি কতকগুলি কোমল বৃত্তি স্বভাবতই কঠিন হয়ে আসে। মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর-একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেক দিন ও অনেকক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সে-রকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়। কেননা, গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করত তা হলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাটত কী করে।

যদি এ কথা ঠিক হয় যে, বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে এ কথা নিশ্চয় যে, মেয়েরা কখনোই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না। য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভেদ কোথা থেকে হয়েছে তার কারণ অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যায়— আমাদের দেশের লোকেরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে নি, এইজন্যে তাদের বুদ্ধির দৃঢ়তা হয় নি। তাদের সমস্ত মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। এরকম আধাআধি রকমের সভ্যতা হয়েছিল ; য়ুরোপের আজ যে এত প্রভাব তার প্রধান কারণ, কাজ করে তার বুদ্ধি হয়েছে ; প্রকৃতির রণক্ষেত্রে অবিশ্রাম সংগ্রাম করে তার সমস্ত বুদ্ধি বলিষ্ঠ হয়েছে। আমরা চিরকাল কেবল বসে বসে চিন্তা করেছি। জীবতত্ত্ববিদ বলেন, যখন থেকে প্রাণীরাজ্যে বুড়ো-আঙুলের আবির্ভাব হল, তখন থেকে মানবসভ্যতার একরকম গোড়াপত্তন হল। বুড়ো-আঙুলের পর থেকে সমস্ত জিনিস ধরে ছুঁয়ে ভেঙে নেড়েচেড়ে আঁকড়ে ভার অনুভব করে উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করে দেখবার উপায় হল। কৌতূহল থেকে পরীক্ষার আরম্ভ হয়, তার পরে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত হতে থাকে। এই পরীক্ষায় বুড়ো-আঙুল পুরুষদের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করতে হয়, মেয়েদের তেমন করতে হয় না। সুতরাং—

যদি-বা এমন বিবেচনা করা যায়, একসময় আসবে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা উপার্জন প্রভৃতি কার্যে সমানরূপে ভিড়বে— সুতরাং তখন পরিবারু-সেবার অনুরোধে মেয়েদের অধিকাংশ সময় গৃহে বদ্ধ থাকবার আবশ্যক হবে না— বাহিরে গিয়ে এই বিপুল বিচিত্র সংসারের সঙ্গে তাদের চোখোচোখি মুখোমুখি হাতাহাতি পরিচয় হবে, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি আর-সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পারো, বাপভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন করতে পারো— কিন্তু সন্তানকে তো ছাড়বার জো নেই। সে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায় ভাবে জননীর কোল

অধিকার করে বসবে, তখন সমকক্ষ ভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়েদের পক্ষে কী রকমে সম্ভব হবে। এইরকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার-সেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে ; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান। যখন শারীরিক দুর্বলতা এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থাভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে তখন কাজে-কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে। এক সন্তানধারণ থেকেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে ; তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। আবার এ কারণটা এমন স্বাভাবিক কারণ যে, এর হাত এড়াবার জো নেই।

অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত ; তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন-কি, অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্বসম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তা হলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না। রাজভক্তি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয় ; সেগুলিকে যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তা হলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তা হলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলে আমি স্বাধীন। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে-ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাখাটানা কুলিকে লাথি মারে তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।

আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে ; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই। যারা অগত্যা অধীনতা স্বীকার করে আছে তারা নিজেকে দাসী মনে করছে ; সুতরাং তারা আপনার কর্তব্য কাজ প্রসন্ন মনে এবং সম্পূর্ণভাবে করতে পারছে না। দিনরাত খিটিমিটি বাধছে, নানা সূত্রে পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করছে। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেকটা বিচ্ছেদ হবে ; কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম। ছোটো বালকের পক্ষে পিতামাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তার পক্ষে পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম, সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল। নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না। অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের মতো আশ্রিত হতে পারলেই ভালো থাকত, কিন্তু তাদের অনুরোধে পুরুষ-সাধারণের কর্তব্যনিয়ম উলটে দেওয়া যায় না। যাই হোক, পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।

স্ত্রীপুরুষের অবস্থাপার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত ; কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড়সংকোচভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষা সত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়। রমাবাই যখন বললেন, মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ করতে পারে, তখন পুরুষ উঠে বলতে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ করতে পারত ; কিন্তু তা হলে এখন পুরুষদের যে-সব কাজ করতে হচ্ছে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনই মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না করতে হত তা হলে সে পুরুষের অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু এ 'যদি'কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিংবা আর কোনো বিদ্রোহী রমণীর কর্ম নয়। অতএব এ কথার উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা।

রমাবাইয়ের বক্তৃতার চেয়ে আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না। রমাবাই বলতে আরম্ভ করতেই তারা ভারি গোল করতে লাগল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীর পুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন ; তর্জনগর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা করতে লাগলুম, আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু ভদ্ররমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে এতটা প্রতাপ এখনো কারও জন্মায় নি। তবে বলা যায় না, নীচলোক সর্বত্রই আছে ; এবং নীচশ্রেণীয়হীনশিক্ষা ভীরুদের এই একটা মহৎ অধিকার আছে যে, পঙ্কের মধ্যে বাস করে তারা অসংকোচে স্নাত দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ করতে পারে ; মনে জানে, এরূপ স্থলে সহিষ্ণুতাই ভদ্রতার একমাত্র কৌলিক ধর্ম। মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবালকবর্গের প্রতি এতটা কথা বলা অসংগত হয়ে পড়ে— আমি কেবল প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটা বলে রাখলুম। আক্ষেপের বিষয় এই, যাদের প্রতি এ কথা খাটে তারা এ ভাষা বোঝে না এবং তাদের যে-ভাষা তা ভদ্রসম্প্রদায়ের শ্রবণের ও ব্যবহারের অযোগ্য।

পুনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬

মুসলমান মহিলা

সারসংগ্রহ

কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরেজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা জেনানার সুখদুঃখ সত্যমিথ্যা কে প্রমাণ করিবে। তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন তক্তার নীচে আর-একজন সিন্দুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়, তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধূর দৃষ্টিপথে ভাসুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এইমতই বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, "বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে। তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে, সূর্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।" আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড়ো বড়ো কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ

করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। যে-হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে, তাহাকে কেবলই শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ তাহাকে হীরা জহরতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপমায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল, তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, "বাবা আমাকে মারিয়া ফেলো, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।" ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সাও চাহি না, বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।" সে কহিল, "এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে।"

তাহার রকমসকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, "যেরকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।" বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয়, পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুই-চারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

১২৯৮

প্রাচ্য সমাজ

কোনো ইংরেজ মহিলা মুসলমান স্ত্রীলোকদের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা পূর্ব সংখ্যায় তাহার সারমর্ম প্রকাশ করিয়াছি।[১] গত সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় অনরেবল জস্টিস আমির আলি তাহার জবাব দিয়াছেন।

তিনি দেখাইতেছেন যে, খৃস্টীয় ধর্মই যে য়ুরোপে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশেই তাহারা বর্তমান উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। খৃস্টীয় সমাজের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীজাতি খৃস্টধর্মমণ্ডলীর চক্ষে নিতান্ত নিন্দিতভাবে ছিলেন। স্ত্রীলোকদের

১ মুসলমান মহিলা : সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী প্রবন্ধ

স্বাভাবিক দূষণীয়তা সম্বন্ধে চার্চের অধ্যক্ষগণ বিপরীত বিদ্বেষের সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ; খৃস্টীয় সাধু টর্টলিয়ন স্ত্রীলোককে শয়তানের প্রবেশদ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলচৌর, দিব্যধর্ম-পরিত্যাগিনী, মনুষ্যরূপী-ঈশ্বরপ্রতিমাবিনাশিনী আখ্যা দিয়াছেন। এবং সেন্ট ক্রিসস্টম স্ত্রীলোককে প্রয়োজনীয় পাপ, প্রকৃতির মায়াপাশ, মনোহর বিপৎপাত, গার্হস্থ্য সংকট, সাংঘাতিক আকর্ষণ এবং সুচিক্কণ অকল্যাণ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

তখন কোনো উচ্চ অঙ্গের ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকদের অধিকার ছিল না। জনসমাজে মিশিতে, প্রকাশ্যে বাহির হইতে, কোনো ভোজে বা উৎসবে গমন করিতে তাহাদের কঠিন নিষেধ ছিল। অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক স্বামীর আজ্ঞা পালন করা এবং তাঁত চরকা ও রন্ধন লইয়া থাকাই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল।

তার পর মধ্যযুগে যখন শিভল্‌রি-ধর্মের অভ্যুদয়ে য়ুরোপে নারীভক্তির প্রচার হইল, স্ত্রীলোকদের প্রতি উৎপীড়ন এবং প্রতারণা তখনকার কালেরও একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। বহুবিবাহ এবং গোপন বিবাহ কেবল কুলীন নহে সাধারণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ধর্মযাজকেরাও তাহাদের চিরকৌমার্যব্রত লঙ্ঘন করিয়া একাধিক বৈধ অথবা অবৈধ বিবাহ করিত। পুরাবৃত্তবিৎ হ্যালাম দেখাইয়াছেন যে, জর্মান ধর্মসংস্কারকগণ সন্তানাভাবে এককালীন দুই অথবা তিন বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকলেই জানেন মহারাজ শার্ল্‌মানের বহু পত্নী ছিল। খৃস্টধর্মবৎসল জাস্টিনিয়নের অধিকারকালে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের রাজপথ স্ত্রীলোকের প্রতি কী নিদারুণ অত্যাচারের দৃশ্যস্থল ছিল। একটি স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং বিদুষী ছিলেন, এইমাত্র অপরাধে কোনো খৃস্টান সাধুর অনুচরগণ তাঁহাকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার রাজপথে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বধ করিয়াছিল। লেখক বলিতেছেন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকার মনুর অনুশাসন আছে যে, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে তাহাকে চতুষ্পথে ডালকুত্তার দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলাই বিধান— যদি সেন্ট সীরিল্‌ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ লিখিতেন তবে কি মনুর সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইত না। য়ুরোপের মধ্যযুগে স্ত্রীলোক সদাসর্বদাই উৎপীড়িত, বলপূর্বক অপহৃত, কারামধ্যে বন্দীকৃত, এবং পরমখৃস্টান য়ুরোপের উপরাজগণের দ্বারা কশাহত হইত। খৃস্টানগণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে, জলমগ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

এমন সময় মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্তলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব সমাজে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রীপরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না ; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইজন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

লেখক বলেন, স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে খৃস্টীয় আইন অপেক্ষা মুসলমান আইনে অনেক উদারতা প্রকাশ পায়। হিন্দুশাস্ত্রে যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে স্বামীত্যাগের বিধি আছে কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার কোনো চিহ্ন নাই, সেইরূপ লেখক বলেন, মুসলমান্‌শাস্ত্রেও অত্যাচার, ভরণপোষণের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীর স্বামীত্যাগের অধিকার আছে।

আমরা যেরূপ লীলাবতী ও খনার দৃষ্টান্ত সর্বদা উল্লেখ করিয়া থাকি, লেখক সেইরূপ প্রাচীন কালের মুসলমান বিদুষীদের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন আরবরমণীদের উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, মান্যবর আমির আলি মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে-সকল সংস্কারকার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নাই। মধ্যস্থ হইয়া তখনকার প্রবল সমাজের সহিত উপস্থিতমত রফা করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজকে পথ নির্দেশ

করিয়াছিলেন। তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিল। কিন্তু সে দোষ মুসলমান ধর্মের নহে, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব।

আমির আলি মহাশয়ের এই রচনা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদের উদয় হয়। এককালে আদর্শ উচ্চতর ছিল, ক্রমশ তাহা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে; এবং এককালে কোনো মহাপুরুষ তৎসময়ের উপযোগী যে-সকল বিধান প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধিচালনাপূর্বক সচেতনভাবে সমাজ তাহার অধিক আর এক পা অগ্রসর হয় নাই— এ কথা বর্তমান মুসলমানেরাও বলিতেছেন এবং বর্তমান হিন্দুরাও বলিতেছেন। গৌরব করিবার বেলাও এই কথা বলি, বিলাপ করিবার বেলাও এই কথা বলি। যেন আমাদের এশিয়ার মজ্জার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রাম গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

য়ুরোপে এশিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এশিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এশিয়ায় বড়ো লোককে মহৎ মনুষ্য বলে না, একেবারে দেবতা বলিয়া বসে; কিন্তু য়ুরোপের কর্মপ্রধান দেশে প্রতিদিনই মনুষ্য নানা আকারে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, সেইজন্য তাহারা আপনাকে নগণ্য, জীবনকে স্বপ্ন এবং জগৎকে মায়া মনে করিতে পারে না। প্রাচ্য খৃস্টীয় ধর্মের প্রভাবে য়ুরোপীয়দের মনে মধ্যে মধ্যে বিপরীত ভাব উপস্থিত হইলেও তাহা প্রবল কর্মের স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙিয়া আসে, পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপরে স্বাধীনবুদ্ধি জয়লাভ করে।

আমাদের পূর্বাঞ্চলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিভূতভাবে বাস করিয়া প্রত্যেক মানুষ নিজের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করে; এইজন্য কোনো মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেবতা-পদে স্থাপিত করে। তাহার পর হইতে তিনি যে-কয়টি কথা বলিয়া গিয়াছেন বসিয়া বসিয়া তাহার অক্ষর গণনা করিয়া জীবনযাপন করি; তিনি সাময়িক অবস্থার উপযোগী যে-বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহার রেখামাত্র লঙ্ঘন করা মহাপাতক জ্ঞান করিয়া থাকি। পুনর্বার যুগান্তরে দ্বিতীয় মহৎলোক দেবতাভাবে আবির্ভূত হইয়া সময়োচিত দ্বিতীয় পরিবর্তন প্রচলিত না করিলে আমাদের আর গতি নাই। আমরা যেন ডিম্ব হইতে ডিম্বান্তরে জন্মগ্রহণ করি। একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলা ভাঙিয়া যে-নূতন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের যত্নে নিজের উপযোগী খাদ্যসংগ্রহ আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠে না। মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে যেখানে দাঁড় করাইলেন তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। কোনো সংস্কারকার্য বীজের মতো ক্রমশ অঙ্কুরিত হইয়া যে পরিপুষ্টতা লাভ করিবে, আমাদের সমাজ সেরূপ জীবনপূর্ণ ক্ষেত্র নহে। মনুষ্যত্বের মধ্যে যেন প্রাণধর্মের অভাব। এইজন্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ না করিয়া বিশুদ্ধ আদর্শ ক্রমশই বিকৃতি লাভ করিতে থাকে। যেমন পাখি তা' না দিলে ডিম পচিয়া যায়, সেইরূপ কালক্রমে মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাবের উত্তাপ যতই দূরবর্তী হয় ততই আবরণবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিকৃতি জন্মিতে থাকে।

আসল কথা, বিশুদ্ধ জিনিসও অবরোধের মধ্যে দূষিত হইয়া যায় এবং বিকৃত বস্তুও মুক্তক্ষেত্রে ক্রমে বিশুদ্ধি লাভ করে। যে-সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীনবুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক। কারণ, তাহাতে বাতাস লাগে না, প্রকৃতির স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তি তাহার উপর সম্পূর্ণ তেজে কাজ করিতে পায় না।

১২৯৮

আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত

অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আহার নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে আহারের দুই উদ্দেশ্য, দেহের পুষ্টিসাধন ও আত্মার শক্তিবর্ধন। তিনি বলেন, আহারে দেহের পুষ্টি হয় এ কথা সকল দেশের লোকই জানে, কিন্তু আত্মার শক্তিবর্ধনও যে উহার একটা কার্যের মধ্যে— এ-রহস্য কেবল ভারতবর্ষেই বিদিত; কেবল ইংরেজি শিখিয়া এই নিগূঢ় তথ্য ভুলিয়া ইংরেজি শিক্ষিতগণ লোভের তাড়নায় পাশব আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ধর্মশীলতা শ্রমশীলতা ব্যাধিহীনতা দীর্ঘজীবিতা, হৃদয়ের কমনীয়তা, চরিত্রের নির্মলতা, সাত্ত্বিকতা আধ্যাত্মিকতা সমস্ত হারাইতে বসিয়াছেন; তিনি বলেন, এই আহার-তথ্যের "শিক্ষা গুরুপুরোহিতেরা দিলেই ভালো হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি এ শিক্ষা দিতে অক্ষম হন তবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রকেই এ শিক্ষা দিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজে উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, "নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।"

এই লেখা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। নিশ্চয়ই লেখকমহাশয়ের অগোচর নাই যে, ইংরেজিশিক্ষিত নব্যগণ যে কেবল আমিষ খান তাহা নয়, তাঁহারা গুরুবাক্য মানেন না। কতকগুলি কথা আছে যাহার উপরে তর্কবিতর্ক চলিতে পারে। আহার প্রসঙ্গটি সেই শ্রেণীভুক্ত। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্বপ্রান্তে নিবিষ্ট করিয়াছেন; সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু। পূর্বকালের বাদশাহেরা যখন কাহারও মুণ্ড আনিতে বলিতেন তখন আদেশপত্রে এইরূপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন; এবং গুরুপুরোহিতেরাও সচরাচর নানা কারণে এইরূপ যুক্তিকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরেজ বাদশাহ কাহারও মুণ্ডপাত করিবার পূর্বে বিস্তারিত যুক্তিনির্দেশ বাহুল্য জ্ঞান করেন না, এবং ইংরেজ গুরু মত জাহির করিবার পূর্বে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে না পারিলে গুরুপদ হইতে বিচ্যুত হন। আমরা অবস্থাগতিকে সেই ইংরেজরাজের প্রজা সেই ইংরেজ গুরুর ছাত্র, অতএব চন্দ্রনাথবাবুর স্বাক্ষরের প্রতি আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহা ছাড়াও আমরা প্রমাণ প্রত্যাশা করিয়া থাকি। ইহাকে কুশিক্ষা বা সুশিক্ষা যাহাই বল, অবস্থাটা এইরূপ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আহার সম্বন্ধে কী নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচলিত ছিল জানি না এবং চন্দ্রনাথবাবুও নব্যশিক্ষিতদের নিকটে তাহা গোপন করিয়াই গেছেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রমাণ করিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আহার্যের মধ্যে মাংসের চলন না ছিল এমন নহে।

এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোনো সমাজ রচিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবল বিংশতি কোটি অধ্যাপক পুরোহিত এবং তপস্বীর প্রাদুর্ভাব হইলে অতি সত্বরই সেই সুপবিত্র জনসংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল মাংসপেশীও ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক-অনুসারে আমিষও ছিল নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত— শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল তখনই প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য আপনাকে মহতের ধৈর্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল এবং দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণহীন ব্রাহ্মণের গোরুটি হইয়া তাঁহারই ঘানিগাছের চতুর্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ

করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল জোগাইতে লাগিল। এমন সংযম এমন বদ্ধ নিয়ম, এমন নিরামিষ সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে। আজকাল চোখের ঠুলি খুলিয়া অনেকে ঘানি-প্রদক্ষিণের পবিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। কী আক্ষেপের বিষয়।

এক হিসাবে শঙ্করাচার্যের আধুনিক ভারতবর্ষকেই প্রাচীন ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতবর্ষ তখন এমনই জরাগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহার জীবনের লক্ষণ আর বড়ো নাই। সেই মৃতপ্রায় সমাজকে শুভ্র আধ্যাত্মিক বিশেষণে সজ্জিত করিয়া তাহাকেই আমাদের আদর্শস্থল বলিয়া প্রচার করিতেছি, তাহার কারণ, আমাদের সহিত তাহার তেমন অনৈক্য নাই। কিন্তু মহাভারতের মহাভারতবর্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে-প্রচণ্ড বীর্য, বিপুল উদ্যমের আবশ্যক তাহা কেবলমাত্র নিরামিষ ও সাত্ত্বিক নহে, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের আবাদ করিলে সে ভারতবর্ষ উৎপন্ন হইবে না।

আহারের সহিত আত্মার যোগ আর-কোনো দেশ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল কি না জানি না কিন্তু প্রাচীন য়ুরোপের যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যেও আহারব্যবহার এবং জীবনযাত্রা কঠিন নিয়মের দ্বারা সংযত ছিল। কিন্তু সেই উপবাসকৃশ যাজকসম্প্রদায়ই কী প্রাচীন য়ুরোপ। তখনকার য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়মণ্ডলীও কি ছিল না। এইরূপ বিপরীত শক্তির ঐক্যই কি সমাজের প্রকৃত জীবন নহে।

কোনো বিশেষ আহারে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় বলিতে কী বুঝায়।— মনুষ্যের মধ্যে যে-একটি কর্তৃশক্তি আছে, যে-শক্তি স্থায়ী সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণিক সুখ বিসর্জন করে, ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করিয়া বর্তমানকে চালিত করে, সংসারের কার্যনির্বাহার্থ আমাদের যে-সকল প্রবৃত্তি আছে প্রভুর ন্যায় তাহাদিগকে যথাপথে নিয়োগ করে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তবে স্বল্পাহারে বা বিশেষ আহারে সেই শক্তি বৃদ্ধি হয় কী করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এবং আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক; বিজ্ঞানে তাহা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যদি তৎসম্বন্ধে কোনো রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গোচর হইয়া থাকে, তবে অক্ষম গুরুপুরোহিতের প্রতি ভারার্পণ না করিয়া চন্দ্রনাথবাবু নিজে তাহা প্রকাশ করিলে আজিকার এই নব্য পাশবাচারের দিনে বিশেষ উপকারে আসিত।

এ কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।

মনে করো, প্রভুর নিয়োগক্রমে লোকাকীর্ণ রাজপথে আমাকে চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিতে হয়। কাজটা খুব শক্ত হইতে পারে কিন্তু ঘোড়াগুলার দানা বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আধমরা করিয়া রাখিলে কেবল ঘোড়ার চলৎশক্তি কমিবে, কিন্তু তাহাতে যে আমার সারথ্যশক্তি বাড়িবে এমন কেহ বলিতে পারে না। ঘোড়াকে যদি তোমার শত্রুই স্থির করিয়া থাক তবে রথযাত্রাটা একেবারে বন্ধই রাখিতে হয়। প্রবৃত্তিকে যদি রিপু জ্ঞান করিয়া থাক তবে শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে কি না তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য।

গীতায় "শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন" তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই যে, কর্মেই মনুষ্যের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযত করিতেও হয়। কর্ম যতই বিচিত্র, বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মসংযমের চর্চা ততই অধিক। এঞ্জিনের পক্ষে বাষ্প যেমন, কর্মানুষ্ঠানের পক্ষে প্রবৃত্তি সেইরূপ। এঞ্জিনে যেমন এক দিকে ক্রমাগত কয়লার খোরাক দিয়া আগ্নেয় শক্তি উত্তেজিত করিয়া তোলা হইতেছে আর-এক দিকে তেমনি দুর্ভেদ্য লৌহবল তাহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিয়া স্বকার্যে নিয়োগ করিতেছে, মনুষ্যের জীবনযাত্রাও সেইরূপ। সমস্ত আগুন নিবাইয়া দিয়া সাত্ত্বিক ঠাণ্ডা জলের মধ্যে শীতকালের সরীসৃপের মতো নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই যদি মুক্তির উপায় বল তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে উপদেশ নহে। প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির

দমনই সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ মনোজ শক্তিকে নানা শক্তিতে রূপান্তরিত ও বিভক্ত করিয়া চালনা করার দ্বারাই কর্মসাধন এবং আত্মকর্তৃত্ব উভয়েরই চর্চা হয়— খোরাক বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির শ্বাসরোধ করা আধ্যাত্মিক আলস্যের একটা কৌশলমাত্র।

তবে এমন কথা উঠিতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবমাত্রেরই আহারের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে ; যদি মধ্যে মধ্যে এক-একদিন আহার রহিত করিয়া অথবা প্রত্যহ আহার হ্রাস করিয়া সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় তবে তদ্দ্বারা আত্মশক্তির চালনা হইয়া আধ্যাত্মিক বললাভ হয়। এ সম্বন্ধে কথা এই যে, মাঝিগিরিই যাহার নিয়ত ব্যবসায়, শখের দাঁড় টানিয়া শরীরচালনা তাহার পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে প্রতিদিনই এত সংযমচর্চার আবশ্যক এবং অবসর আছে যে শখের সংযম বাহুল্যমাত্র। এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁহারা জপ তপ উপবাস ব্রতচারণে নানাপ্রকার সংযম পালন করেন, কিন্তু সাংসারিক বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সংযম নাই। শখের সংযমের প্রধান আশঙ্কাই তাই। লোকে মনে করে যখন সংযমচর্চার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র কঠিনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে তখন কর্মক্ষেত্রে ঢিলা দিলেও চলে। অনেক সময় ইহার ফল হয়, খেলায় সংযম এবং কাজে স্বেচ্ছাচারিতা, মুখে জপ এবং অন্তরে কুচক্রান্ত, ব্রাহ্মণকে দান এবং ব্যবসায়ে প্রতারণা, গঙ্গাস্নানের নিষ্ঠা এবং চরিত্রের অপবিত্রতা।

যাহা হউক, কর্মানুষ্ঠানকেই যদি মনুষ্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ বল, এবং কেবল ঘর-সংসার করাকেই একমাত্র কর্ম না বল, যদি ঘরের বাহিরেও সুবৃহৎ সংসার থাকে এবং সংসারের বৃহৎ কার্যও যদি আমাদের মহৎ কর্তব্য হয় তবে শরীরকে নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না ; তবে শারীরিক বল ও শারীরিক উদ্যমকে আধ্যাত্মিকতার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা হইলে বিচার্য এই যে, শরীরের বলসাধনের পক্ষে সামিষ এবং নিরামিষ আহারের কাহার কিরূপ ফল সে বিষয়ে আমার কিছু বলা শোভা পায় না এবং ডাক্তারের মধ্যেও নানা মত। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

> নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।

আমরা এক শতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহমনের সাতিশয় পুষ্টি অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়া আসিতেছি, মতপ্রচারের উৎসাহে চন্দ্রনাথবাবু সহসা তাহাদিগকে কী করিয়া ভুলিয়া গেলেন বুঝিতে পারি না। তাহারাই কি আমাদিগকে ভোলে, না আমরাই তাহাদিগকে ভুলিতে পারি ? তাহাদের দেহের পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদের নাসার সম্মুখে সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে, এবং তাহাদের মনের পুষ্টি যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে আমাদেরই বোধশক্তির অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

প্রমাণস্থলে লেখকমহাশয় হবিষ্যাশী অধ্যাপকপণ্ডিতের সহিত আমিষাশী নব্য বাঙালির তুলনা করিয়াছেন। এইরূপ তুলনা নানা কারণে অসংগত।

প্রথমত, মুখের এক কথাতেই তুলনা হয় না। অনির্দিষ্ট আনুমানিক তুলনার উপর নির্ভর করিয়া সর্বসাধারণের প্রতি অকাট্য মত জারি করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, যদি-বা স্বীকার করা যায় যে, অধ্যাপকপণ্ডিতেরা মাংসাশী যুবকের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তথাপি আহারের পার্থক্যই যে সেই প্রভেদের কারণ তাহার কোনো প্রমাণ নাই। সকলেই জানেন অধ্যাপকপণ্ডিতের জীবন নিতান্তই নিরুদ্বেগ এবং আধুনিক যুবকদিগের পক্ষে জীবনযাত্রানির্বাহ বিষম উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং উদ্বেগ যেরূপ আয়ুক্ষয়কর এরূপ আর কিছুই নহে।

নিরামিষাশী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতই বলিষ্ঠ ও নম্রপ্রকৃতি হউন-না কেন, তাঁহাকে "সাত্ত্বিক আহারের উৎকৃষ্টতার" প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা লেখকমহাশয়ের পক্ষে যুক্তিসংগত হয় নাই। আমিও এমন কোনো লোককে জানি যিনি দুইবেলা মাংস ভোজন করেন অথচ তাঁহার মতো

মাটির মানুষ দেখা যায় না। আরো এমন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অনেক আছে, কিন্তু সেগুলিকে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া ফল কী। চন্দ্রনাথবাবুর বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এরূপ ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রমাণস্বরূপে প্রয়োগ করিলে বুঝায় যে, তাঁহার মতে অন্যপক্ষে একজনও বলিষ্ঠ এবং নির্মলপ্রকৃতির লোক নাই।

আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের প্রতি চন্দ্রনাথবাবুর অভিযোগ এই যে :

তাঁহারা অসংযতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের সংযমশিক্ষা একেবারেই হয় না। এইজন্য তাঁহারা প্রায়ই সম্ভোগপ্রিয়, ভোগাসক্ত হইয়া থাকেন। শুধু আহারে নয়, ইন্দ্রিয়াধীন সকল কার্যেই তাঁহারা কিছু লুব্ধ, কিছু মুগ্ধ, কিছু মোহাচ্ছন্ন।

অসংযতেন্দ্রিয় এবং সংযমশিক্ষাহীন, সম্ভোগপ্রিয় এবং ভোগাসক্ত, মুগ্ধ এবং মোহাচ্ছন্ন, কথাগুলার প্রায় একই অর্থ। উপস্থিতক্ষেত্রে চন্দ্রনাথবাবুর বিশেষ বক্তব্য এই যে, নব্যদের লোভটা কিছু বেশি প্রবল।

প্রাচীন ব্রাহ্মণবটুদের ঐ প্রবৃত্তিটা যে মোটেই ছিল না, এ কথা চন্দ্রনাথবাবু বলিলেও আমরা স্বীকার করিতে পারিব না। লেখকমহাশয় লুব্ধ পশুর সহিত নব্য পশুখাদকের কোনো প্রভেদ দেখিতে পান না। কিন্তু এ কথা জগদ্‌বিখ্যাত যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বশ করিবার প্রধান উপায় আহার এবং দক্ষিণা। অধ্যাপকমহাশয় ঔদরিকতার দৃষ্টান্তস্থল। যিনি একদিন লুচিদধির গন্ধে উন্মনা হইয়া জাতিচ্যুত ধনীগৃহে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং আহারান্তে বাহিরে আসিয়া কৃত কার্য অম্লানমুখে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারই পৌত্র আজ 'চপকট্‌লেটের সৌরভে বাবুর্চি বাহাদুরের খাপরেলখচিত মুর্গিমণ্ডপাভিমুখে ছোটেন' এবং অনেকে তাহা বাহিরে আসিয়া মিথ্যাচরণপূর্বক গোপনও করেন না। উভয়ের মধ্যে কেবল সময়ের ব্যবধান কিন্তু সংযম ও সাত্ত্বিকতার বড়ো ইতরবিশেষ দেখি না। তাহা ছাড়া নব্য ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন পিতৃপুরুষেরা যে ক্রোধবর্জিত ছিলেন তাঁহাদের তর্ক ও বিচারপ্রণালী দ্বারা তাহাও প্রমাণ হয় না।

যাহা হউক, প্রাচীন বঙ্গসমাজে ষড়্‌রিপু যে নিতান্ত নির্জীবভাবে ছিল এবং আধুনিক সমাজে আমিষের গন্ধ পাইবামাত্র তাহারা সব ক'টা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, এটা অনেকটা লেখকমহাশয়ের কল্পনামাত্র। তাঁহার জানা উচিত, আমরা প্রাচীন কালের যুবকদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না ; যাহাদিগকে দেখি তাঁহারা যৌবনলীলা বহুপূর্বে সমাধা করিয়া ভোগাসক্তির বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের সহজেই ধারণা হয়, তবে বুঝি সেকালে কেবলমাত্র হরিনাম এবং আত্মারই আমদানি ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যে-সকল পীতবর্ণ জীর্ণ বৈষয়িক এবং রসনিমগ্ন পরিপক্ক ভোগী বৃদ্ধ দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, সত্যযুগ আমাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিল না।

সামিষ এবং নিরামিষ আহারের তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি, আহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া একটা ঘরগড়া দৈববাণী রচনা করা আজকালকার দিনে শোভা পায় না। এখনকার কালে যদি কোনো দৈবদুর্যোগে কোনো লোকের মনে সহসা একটা অভ্রান্ত সত্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে অথচ সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রমাণ দেখা না দেয়, তবে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য সেটাকে মনে মনে পরিপাক করা। গুরুর ভঙ্গিতে কথা বলার একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপ ভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয়, কারণ সত্য কোনো লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না, আপনার যুক্তি দ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ মাত্র।

অবশ্য, রুচিভেদে অভিজ্ঞতাভেদে আমাদের কোনো জিনিস ভালো লাগে কোনো জিনিস মন্দ লাগে, সকল সময়ে তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পারি না। তাহার যেটুকু কারণ তাহা আমাদের সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত, সেটাকে টানিয়া বাহির করা ভারি দুরূহ। মনের বিশেষ গতি অনুসারে অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপরেও আমরা অনেক মত গঠিত করিয়া থাকি ; এইরূপ ভূরি ভূরি অপ্রমাণিত

বিশ্বাস লইয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাই। সেইরূপ মত ও বিশ্বাস যদি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হয় তবে তাহা বলিবার একটা বিশেষ ধরন আছে। একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্বসাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্যস্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাতজনক।

১২৯৮

কর্মের উমেদার

প্রকাণ্ড পিয়ানো অথবা বৃহদাকার অর্গান যন্ত্র সঙ্গে না থাকিলে য়ুরোপীয় সংগীত সম্পূর্ণ হয় না— য়ুরোপীয় সংসারযাত্রাও তেমনই স্তূপাকার সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। শোয়াবসা চলাফেরা, অশন বসন ভূষণ, সকল দিকেই তাহাদের এত সহস্র সরঞ্জামের সৃষ্টি হইয়াছে যে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক হইতে হয়। একটা শামুকের পিঠে কতটুকুই বা খোলা, কিন্তু মানুষের আসবাবের খোলস প্রতিদিন পর্বতাকার হইয়া উঠিতেছে।

মানুষও সেই পরিমাণে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে কি না সেই একটা জিজ্ঞাস্য আছে। একটা রোগ আছে তাহাতে মানুষের খাদ্যের অধিকাংশই চর্বিতে পরিণত করে। অস্থি মাংসপেশী স্নায়ু অনুরূপমাত্রায় খাদ্য পায় না, কেবল শরীরের পরিধি বিপুল হইয়া উঠিতে থাকে। সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের পরিবর্তে এরূপ অতিরিক্ত আংশিক উদ্যমকে কেহ কল্যাণজনক মনে করিতে পারে না। ডাক্তাররা বলেন, এরূপ বিপরীত বসাগ্রস্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের বিকার (fatty degeneration of heart) ঘটিতে পারে এবং মস্তিষ্কের পক্ষেও এরূপ অবস্থা অনুকূল নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতাও কি সেইরূপ বেশি মাত্রায় বহরে বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং জিনিসপত্রের প্রকাণ্ড চাপে তাহার হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, অথবা তাহা দৈত্যের মতো সর্বাংশেই বিপুলতা লাভ করিতেছে এবং অন্যের পক্ষে যাহা অত্যধিক তাহার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক পরিমাণ, ইহার মীমাংসা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং সে চেষ্টাও বিদেশীর পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

কিন্তু সভ্যতার অসংখ্য আসবাব জোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মতো খাটিতেছে। যত সস্তায় যত বেশি জিনিস উৎপন্ন করা যাইতে পারে, সকলের এই প্রাণপণ চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই একান্ত চেষ্টা হইলে মানুষকে ক্রমে আর মানুষ জ্ঞান হয় না, কলেরই একটা অংশ মনে হয়, এবং তাহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব জিনিস আদায় করিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়। তাহার সুখদুঃখ শ্রান্তিবিশ্রামের প্রতি অধিক মনোযোগ করিলে অচল হইয়া উঠে।

য়ুরোপে এইরূপ অবস্থা উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিকসম্প্রদায় লাভ করিতেছেন এবং ধনীসম্প্রদায় আরামে আছেন।

কিন্তু য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। কোনো প্রবল শক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার উপর চাপ দিলেই আমরা ধূলির মতো গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই; তা সে ব্রহ্মণ্যশক্তিই হউক আর রাজন্যশক্তিই হউক, শাস্ত্রই হউক আর শস্ত্রই হউক। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে কারণেই হউক, যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে তখনই সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে— সে ধর্মের বন্ধনই হউক আর কর্মের বন্ধনই হউক।

য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজার

স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া উঠে— শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে, মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হউক বিলম্বেই হউক, সংশোধনের পথ মুক্ত আছে। সেখানে রোগ আরম্ভ হইলে একেবারে মৃত্যুতে গিয়া শেষ হয় না। যাহারা আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকার -চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে— জ্বর আরম্ভ হইলে বিকারে গিয়া দাঁড়ায়।

অতএব, আমাদের দেশে যদি অতিরিক্ত যন্ত্রচালনার প্রাদুর্ভাব হইত তবে তাহার পরিণাম ফল কী হইত বলা শক্ত নহে। আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে খুব বেশি পরিবর্তন হইত না। কারণ, আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কী খাইব, কী করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এবং দানধ্যান তপজপ প্রভৃতি ধর্মকার্যে আমরা এমনই বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়াছি যে, মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে— স্বাধীনভাবে চিন্তাও করিতে পারি না, স্বাধীনভাবে কার্যও করিতে পারি না। আকস্মিক ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি। প্রবল শক্তি মাত্রকেই অনিবার্য দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করি। য়ুরোপে গুটিপোকার মড়ক হইলে, দ্রাক্ষা কীটগ্রস্ত হইলে তাহারও প্রতিবিধানের চেষ্টা হয় ; আমাদের দেশে ওলাউঠা এবং বসন্তকে আমরা পূজা করিয়া মরি। স্বাধীন বুদ্ধির চোখ বাঁধিয়া, তুলা দিয়া তাহার নাসাকর্ণ রোধ করিয়া আমরাও সম্প্রতি এইরূপ পরম আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। অন্তরে যখন এইরূপ পরিপূর্ণ অধীনতা বাহিরে তখন স্বাধীনতা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না।

অতএব, যদি মজুরের আবশ্যক হয় তো আমাদের মতো কলের মজুর আর নাই।

য়ুরোপের মজুররা প্রতিদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কাছে যে কথা নূতন ঠেকিবে তাহারা সেই কথা উত্থাপিত করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, মজুর হই আর যা-ই হই, আমরা মানুষ। আমরা যন্ত্র নই। আমরা দরিদ্র বলিয়াই যে প্রভুরা আমাদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন তাহা হইতে পারে না, আমরা ইহার প্রতিকার করিব। আমাদের বেতন বৃদ্ধি করো, আমাদের পরিশ্রম হ্রাস করো, আমাদের প্রতি মানুষের ন্যায় আচরণ করো।

যন্ত্ররাজের বিরুদ্ধে যন্ত্রীগণ এইরূপে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রচার করিতেছে।

য়ুরোপে রাজা এবং ধর্মের যথেচ্ছ প্রভুত্ব শিথিল হইয়া ধনের প্রভুত্ব বলীয়ান হইয়া উঠিতেছিল। সারসরাজা ধরিয়া খায়, কাষ্ঠরাজা চাপিয়া মারে। য়ুরোপ পূর্বেই সারসরাজার চঞ্চু বাঁধিয়া দিয়াছে ; এবারে জড়রাজার সহিত লাঠালাঠি বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ধনের অধীনতার একটা সীমা ছিল, সেই পর্যন্ত মানুষ সহ্য করিয়াছিল। শিল্পীর একটা স্বাধীনতা আছে। শিল্পনৈপুণ্য তাহার নিজস্ব। তাহার মধ্যে নিজের প্রতিভা খেলাইতে পারে এমন স্থান আছে। শক্তি অনুসারে সে আপন কাজে গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম। নিজের হাতের কাজ নিজে সম্পূর্ণ করিয়া সে একটি স্বাধীন সন্তোষ লাভ করিতে পারে।

কিন্তু যন্ত্র সকল মানুষকেই ন্যূনাধিক সমান করিয়া দেয়। তাহাতে স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাইবার স্থান নাই। জড়ের মতো কেবল কাজ করিয়া যাইতে হয়।

এইরূপে সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমন-কি, সে যে-কাজ করে সে-কাজের মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্বে যাহারা শিল্পী ছিল এখন তাহারা মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে যাহারা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে কাজ করিত এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে।

ইহাতেই নির্ধনের আন্তরিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কাজের সুখ নাই। সে আপনার মনুষ্যত্ব খাটাইতে পারে না।

বিলাসী রোম একসময়ে অসভ্য বিদেশীকে আপনাদের সেনারূপে নিযুক্ত করিয়াছিল। য়ুরোপের শূদ্রদল যদি বিদ্রোহী হইয়া কখনো কর্মে জবাব দেয়, পূর্ব হইতে জানাইয়া রাখা ভালো, আমরা উমেদার আছি।

আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি। মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ; পশুর মতো নিজের স্বাভাবিক চক্ষুতে ঠুলি পরিয়া পরের রাশ মানিয়া কী করিয়া চলিতে হয় বহুকাল হইতে তাহা তাঁহারা শিখাইয়াছেন, এখন আমাদিগকে যন্ত্রে জুতিয়া দিলেই হইল। শরীর কাহিল বটে, যন্ত্রের তাড়নায় প্রাণান্ত হইতে পারে, কিন্তু কখনো বিদ্রোহী হইব না। কখনো এমন স্বপ্নেও মনে করিব না যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ অবস্থার কোনো প্রতিকার হইতে পারে।

কর্মে আমাদের অনুরাগ নাই। বৈরাগ্যমন্ত্র কানে দিয়া সেটুকু জীবনলক্ষণও আমাদের রাখা হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কলের কাজের কোনো ব্যাঘাত হইবে না, বরং সুবিধা হইবে। কেননা কর্মে যাহাদের প্রকৃত অনুরাগ আছে তাহারা সহিষ্ণুতা সহকারে কলের কাজ করিতে পারে না। কারণ, যাহারা কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া সুখ পায় তাহারাই কর্মের অনুরাগী। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে বাধা অতিক্রম করিয়া একটা কার্য সমাধাপূর্বক তাহারা আপনারই স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, সে-ই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু সেরূপ কর্মানুরাগী লোক কলের কাজ করিয়া সুখী হয় না, কারণ কলের কাজে কেবল কাজের দুঃখ আছে অথচ কাজের সুখটুকু নাই। তাহাতে স্বাধীনতা নাই। কোনো কর্মপ্রিয় লোক ঘানির গোরু কিংবা স্যাক্‌রাগাড়ির ঘোড়া হইতে চাহে না। কিন্তু যাহার কর্মে অনুরাগ দূর হইয়া গেছে তাহাকে এরূপ কাজে লাগাইলে ললাটের লিখন স্মরণ করিয়া বিনা উপদ্রবে সে কাজ করিয়া যায়।

মাঝে ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। বহুদিবসের পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না। তাঁহারা উপদেশ দেন, অদৃষ্টবাদ অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন চেষ্টাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া দেয়। সর্ববিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন বুদ্ধিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখে। আমাদের যাহা আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র, কারণ এ কথা স্মরণ রাখিলে স্বাধীন বুদ্ধি এবং স্বাধীন চেষ্টাকে একেবারেই জবাব দেওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় এই-সকল জ্ঞানগর্ভ কথা সাধারণের খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে, বহুকাল হইতে হৃদয় এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া আছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে যন্ত্র যতই সম্পূর্ণ হইবে তাহা চালনা করিতে মানুষের বুদ্ধির আবশ্যক ততই হ্রাস হইয়া আসিবে, এবং স্বাধীনবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে সে কাজ ততই অসহ্য হইয়া উঠিবে। আশা আছে, ভারতবর্ষীয়দের বিশেষ উপযোগিতা তখনই য়ুরোপ বুঝিতে পারিবে। যাহারা মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলে চাষ করিতেছে, যাহারা মনুর আমলের ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে, যাহারা যেখানে পড়ে সেইখানে পড়িয়া থাকাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় বলিয়া গর্ব করে, আবশ্যক হইলে তাহারাই সহিষ্ণুভাবে নতশিরে সমস্ত য়ুরোপের কল টানিতে পারিবে। যদি বরাবর পবিত্র আর্যশিক্ষাই জয়ী হয় তবে আমাদের প্রপৌত্রদিগের চাকরির জন্য বোধ হয় আমাদের পৌত্রদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না।

১২৯৮

আদিম আর্য-নিবাস

লেখাপড়া শিখিয়া আমাদের অনেকেই মা-সরস্বতীর কাছে আবেদন করিয়া থাকেন :

যে বিদ্যা দিয়েছ মা গো ফিরে তুমি লও,
কাগজ কলমের কড়ি আমায় ফিরে দাও।

মা-সরস্বতী অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা ফিরাইয়া লন, কিন্তু কড়ি ফিরাইয়া দেন না।

অনেক বিদ্যা, যাহা মাথা খুঁড়িয়া মাথায় প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল, হঠাৎ নোটিস পাওয়া যায়, সেগুলা মিথ্যা ; আবার মাথা খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহির করা দায় হইয়া উঠে। শতদলবাসিনী যদি ইংরেজ-আইনের বাধ্য হইতেন তবে উকিলের পরামর্শ লইয়া তাঁহার নিকট হইতে খেসারতের দাবি করা যাইতে পারিত। জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য-অপবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

বাল্যকালে শিক্ষা করিয়াছিলাম, মধ্য-এশিয়ার কোনো-এক স্থানে আর্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। সেখান হইতে একদল য়ুরোপে এবং একদল ভারতবর্ষে ও পারস্যে যাত্রা করে। কতকগুলি এশিয়াবাসী ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষার সাদৃশ্য দ্বারা ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

কথাটা মনে রাখিবার একটা সুবিধা ছিল। সূর্য পূর্ব দিক হইতে পশ্চিমে যাত্রা করে। শ্বেতাঙ্গ আর্যগণও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্বাচলের কাছেও দুই-একটি মলিন জ্যোতিরেখা রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উপমা যতই সুন্দর হউক, তাহাকে যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আজকাল ইংলন্ড ফ্রান্স ও জর্মানিতে বিস্তর পুরাতত্ত্ববিৎ উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, য়ুরোপই আর্যদের আদিম বাসস্থান, কেবল একদল কোনো বিশেষ কারণে এশিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইঁহাদের দল প্রতিদিন যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাতে বেশ মনে হইতেছে, আমাদের পুত্রপৌত্রগণ প্রাচীন আর্যদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং আমাদের ধারণাকে একটা বহুকেলে ভ্রম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে ছাড়িবেন না।

আর্যদিগের পশ্চিমযাত্রা সম্বন্ধে ইংলন্ডে ল্যাথাম সাহেব সর্বপ্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, শাখা হইতে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি হইতেই শাখা হয়। য়ুরোপেই যখন অধিকাংশ আর্যজাতির বাসস্থান দেখা যাইতেছে তখন সহজেই মনে হয়, য়ুরোপেই মোট জাতটার উদ্ভব হইয়াছে এবং পারস্য ভারতবর্ষে তাহার একটা শাখা প্রসারিত হইয়াছে মাত্র।

মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিৎ হুইটনি সাহেব বলেন, আর্যদিগের আদিম নিবাস সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান ইতিহাস অথবা ভাষা-আলোচনা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। অতএব মধ্য-এশিয়ায় আর্যদের বাসস্থান নিরূপণ করা নিতান্তই কপোলকল্পিত অনুমান।

জর্মান পণ্ডিত বেন্‌ফি সাহেব বলেন, এশিয়াই আর্যদিগের প্রথম জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিবার একটি কারণ ছিল। বহুদিন হইতে একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, এশিয়াতেই মানবের প্রথম উৎপত্তি হয় ; অতএব আর্যগণ যে সেইখান হইতেই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার বিশেষ প্রমাণ লওয়া কেহ আবশ্যক মনে করিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের ভূস্তরে বহুপ্রাচীন মানবের বাসচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইজন্য সেই পূর্ব সংস্কার এখন অমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই— সংস্কৃত ও পারসিকের সহিত গ্রীক লাটিন জর্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় গার্হস্থ্য সম্পর্ক এবং অনেক পশু ও প্রাকৃতিক বস্তুর নামের ঐক্য আছে ; সেই ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, নানা স্থানে বিভক্ত হইবার পূর্বে আর্যগণ যখন একত্রে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল ভাষা তুলনা করিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, যদি দেখা

যায় সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ভাষায় লাঙ্গলের নামের সাদৃশ্য আছে তবে স্থির করা যায় যে, আর্যগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই যদি দেখা যায় কোনো-একটা বস্তুর নাম উভয় ভাষায় পৃথক তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভিন্ন হইবার পরে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেন্‌ফি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় সিংহ শব্দ যে-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে-ধাতু য়ুরোপীয় কোনো ভাষায় নাই। অপর পক্ষে গ্রীকগণ সিংহের নাম হিব্রুভাষা হইতে ধার করিয়া লইয়াছেন— গ্রীক লিস্‌, হিব্রু লাইশ। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে, আর্যগণ একত্র থাকিবার সময় সিংহের পরিচয় পান নাই। সম্ভবত গ্রীক লিস্‌ ও লিওন্‌ শব্দের ন্যায় সংস্কৃত সিংহ শব্দও তৎকালীন কোনো অনার্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অথবা পশুরাজের গর্জনের অনুকরণেও নূতন নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, এশিয়াই যদি আর্যদিগের আদিম নিবাস হইত তবে সিংহ শব্দের ধাতু য়ুরোপীয় আর্যভাষাতেও পাওয়া যাইত। উষ্ট্র হস্তী এবং ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

এ দিকে আবার মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শ্বেতবর্ণ মানবেরা একটি বিশেষজাতীয় এবং এই-জাতীয় মানব য়ুরোপেই দেখা যায়, এশিয়ায় নহে। প্রাচীন বর্ণনা এবং বর্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে, আদিম আর্যগণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং বর্তমান আর্যদের অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। অতএব য়ুরোপেই এই শ্বেতজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি অধিকতর সংগত বলিয়া বিবেচনা হয়।

লিন্ডেন্‌স্মিট বলেন, ভাষার ঐক্য ধরিয়া যে-সমস্ত জাতিকে আর্য-নামে অভিহিত করা হইতেছে মস্তকের গঠন ও শারীরিক পরিণতি অনুসারে তাহাদের আদিম আদর্শ য়ুরোপেই দেখা যায়। য়ুরোপীয়দের শারীরিক প্রকৃতি, দীর্ঘ জীবন এবং দুর্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আর্যজাতির প্রবলতম প্রাচীনতম এবং গভীরতম মূল কোথায় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষে ও এশিয়ার অন্যত্র আর্যগণ তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া সংকর জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী ফিন্‌জাতি আর্যজাতি নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ কুনো সাহেব দেখাইয়াছেন, ফিন্‌ভাষার বহুতর সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম শব্দ, এবং পারিবারিক সম্পর্কের নাম ইন্ডোয়ুরোপীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাঁহার মতে এ-সকল শব্দ যে ধার করিয়া লওয়া তাহা নহে ; কোনো-এক সময়ে অতি প্রাচীনকালে উক্ত দুই জাতির পরস্পরসামীপ্যবশত কতকগুলি শব্দ ও ধাতু উভয়েরই সরকারি দখলে ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় য়ুরোপেই আর্যগণের আদিম বাসস্থান, সুতরাং ফিন্‌জাতি তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিল।

ইতিমধ্যে আবার একটা নূতন কথা অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে, সেটা যদি ক্রমে পাকিয়া দাঁড়ায় তবে আবার প্রাচীন মতই বহাল থাকিবার সম্ভাবনা।

সেমেটিক জাতি (আরব্য ইহুদি প্রভৃতি জাতিরা যাহার অন্তর্গত) আর্যজাতির দলভুক্ত নয়, এতকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজকাল দুই-একজন করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কোনো কোনো সেমেটিক শব্দের সহিত আর্যশব্দের সাদৃশ্য বাহির করিতেছেন। এবং কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, সেমেটিকগণ হয়তো এককালে আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল ; সর্বাগ্রে তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহাদের সহিত অবশিষ্ট আর্যগণের সাদৃশ্য ক্রমশই ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। আর্যদিগের সহিত সেমেটিকদের সম্পর্ক স্থির হইয়া গেলে আদিমকালে উভয়ের একত্র এশিয়া-বাসই অপেক্ষাকৃত সংগত বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু এ মত এখনো পরিস্ফুট হয় নাই, অনুমানের মধ্যেই আছে।

আমরা বলি, আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক্‌, কুটুম্বিতা যতই বাড়ে ততই ভালো। এই এক আর্যসম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বাধিয়াছে। আরবিক ও ইহুদিরা কম লোক নহে। তাহারা যদি জাতভাই হইয়া দাঁড়ায় সে তো সুখের বিষয়। বর্ণিত আছে যে, দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন— যখন আমার সে-ই পঞ্চস্বামীই হইল, তখন কর্ণকে সুদ্ধ ধরিয়া ছয় স্বামী হইলেই মনের খেদ মিটিত ; তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার স্বামীর তুলনা মিলিত না।

আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা। ইংরেজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা তো আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয়গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্যমাতার প্রথম-জাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

১২৯৯

আদিম সম্বল

যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোনো কাজে না খাটাইয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া যক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।

যেমন একটা আছে স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আর-একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোনো স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর-একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ কথা স্বভাবতই অসংগত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনোই উন্নতির পথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর-একজনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তেমনই সত্যপ্রিয়তা আর-একটি। ছলনার প্রতি যে একটা ঘৃণা, সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্নত সরলতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তেমনই স্বভাবসুস্থ যুবক জাতি সহজেই সত্যাচরণ করে।

যদি-বা কোনো বয়স্ক বিজ্ঞলোক এমন মনে করেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও আমার স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে, অতএব সেইরূপ স্থলে অধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসংগত; কথাটা যেমনই প্রামাণিক হউক তবু এ কথা বলিতেই হইবে, যে-জাতির মাথায় এমন যুক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে।

আর যা-ই হউক, জীবনের আরম্ভে এরূপ ভাব কিছুতেই শোভা পায় না। আমার কার্য আমাকেই করিতে হইবে; আর-একজন করিয়া দিলে কাজ হইতে পারে কিন্তু আমার ভালো হইবে না। কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কলে কাজ হয় কিন্তু কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে-জাতি কাজ করিতে আরম্ভ করে সে-ই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।

অন্যপক্ষে, যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া, মানুষের স্বাধীনতাসর্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মতো বানাইয়া তাহা হইতে নির্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ। সেখানে চিন্তা যুক্তি আত্মকর্তৃত্ব এবং সেইসঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কালের ধর্ম, কাজ করা, তাহাই চলিতে থাকিবে।

কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়, কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।

মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা

দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনই। অল্প বয়সে অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চিৎ বয়স হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন, সত্য সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত মিশাইয়া বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাঁহারা খুব পাকা কথা বলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত পাকা কথা কোনো মানুষের মুখে শোভা পায় না।

যে খাঁটি লোক, যাহার মন সাদা, যাহার পৌরুষ আছে, সে বলে, ফলাফল-বিচার আমার হাতে নাই, আমি যাহা সত্য তাহা বলিব, লোকে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক।

এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙালিরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কী হিসাবে দেখিব। যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না জীবনলীলা আর-একবার পালটাইয়া আরম্ভ করিব।

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে আমরা কখনো একজাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি ; ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সংকল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই-সমস্ত সমবেতহৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে ; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে ; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার লাভ করিবে ; এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসংকোচে অসীম জনতার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদান-প্রদান করিতে থাকিবে ; তাহার জ্ঞানের খনি, তাহার কর্মের ক্ষেত্র, তাহার প্রেমের পথ সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে— তবে মনের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে ; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে-স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহাকে এক কথায় বীরত্ব বলে, বুড়ামানুষের মতো তর্ক করিয়া অভ্যাস আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া তাহাকে নির্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা-রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্মে সমাজে দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াতেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে-সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা -সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।

১২৯৯

কর্তব্যনীতি

অধ্যাপক হক্সলির মত ১

জগতে দেখা যায়, সুখ দুঃখ প্রাণীদের মধ্যে ঠিক ন্যায়বিচার-মতে বণ্টন হয় না। প্রথমত, নিম্নশ্রেণীয় প্রাণীদের এতটুকু বিবেকবুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা দণ্ডপুরস্কারের স্বরূপ সুখদুঃখের অধিকারী হইতে পারে। তাহার পরে মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই পাপাচরণ করিয়াও কত লোকে উন্নতিলাভ করিতেছে এবং পুণ্যবান দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে ; পিতার দোষে পুত্র

১ Thomas H. Huxley, F.R.S., *Evolution and Ethics*.

কষ্টভোগ করিতেছে ; অজ্ঞানকৃত কার্যের ফল ইচ্ছাকৃত অপরাধের সমান হইয়া দাঁড়াইতেছে ; এবং একজন লোকের উৎপীড়ন বা অবিবেচনায় শত সহস্র লোককে দুঃখবহন করিতে হইতেছে।

অতএব জগতের নিয়মকে ধর্মনীতির আইন-অনুসারে বিচার করিতে হইলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু সাহস করিয়া কোনো বিচারক সে রায় প্রকাশ করিতে চান না।

হিব্রুশাস্ত্র এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ এবং গ্রীস আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ওকালতি করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষ বলেন, সকলকেই অসংখ্য পূর্বজন্মপরম্পরার কর্মফল ভোগ করিতে হয়। বিশ্বনিয়মে কোথাও কার্যকারণশৃঙ্খলের ছেদ নাই ; সুখদুঃখও সেই অনন্ত অমোঘ অবিচ্ছিন্ন নিয়মের বশবর্তী।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পরিবর্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্যসত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্তী সেই নিত্যপদার্থের নাম ব্রহ্ম এবং জীবের অন্তরস্থিত ধ্রুবসত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধিবাসনা প্রভৃতি মায়া দ্বারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়াকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকে।

এ মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়বাসনা, সমাজবন্ধন, পারিবারিক স্নেহপ্রেম, এমন-কি, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বিনাশ করিয়া একপ্রকার সংজ্ঞাহীন জড়ত্বকেই ব্রহ্মসম্মিলনের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের এই মত গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না ; তাঁহারা আত্মা এবং ব্রহ্মের সত্তাও লোপ করিয়া দিলেন। কারণ, কোথাও কোনো অস্তিত্বের লেশমাত্রও স্বীকার করিলে পুনরায় তাহা হইতে দুঃখের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিতে হয়। এমন-কি, হিন্দুশাস্ত্রের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো এমন একটা নাস্তিবাচক অস্তিত্বকেও তাঁহারা কোথাও স্থান দিতে সাহস করিলেন না।

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কী আর মনই বা কী, কিছুর মধ্যেই নিত্যপদার্থ নাই ; অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়, এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোনো নিত্যপদার্থ না থাকাতে একবার নির্বাণলাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

প্রাচীন গ্রীসে স্টোয়িক সম্প্রদায় যখন জগৎকারণ ঈশ্বরে অসীম সদ্‌গুণের আরোপ করিলেন তখন তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল, ইহাই এক সমস্যা দাঁড়াইল।

তাঁহারা বলিলেন, প্রথমত জগতে অমঙ্গল নাই ; দ্বিতীয়ত যদি-বা থাকে তাহা মঙ্গলেরই আনুষঙ্গিক ; এবং যেটুকু আছে তাহা আমাদের নিজদোষে নয় আমাদের ভালোরই জন্য।

হক্সলি বলেন, অমঙ্গলের মধ্যেও যে মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং দুঃখ কষ্ট যে অনেক সময় আমাদের শিক্ষকের কার্য করে তাহাও সত্য ; কিন্তু অসংখ্য মূঢ় প্রাণী, যাহারা এই শিক্ষায় কোনো উপকার পায় না এবং যাহাদিগকে কোনো কাজের জন্য দায়িক করা যাইতে পারে না, তাহারা যে কেন দুঃখভোগ করে এবং অনন্তশক্তিমান কেনই-বা সর্বতোভাবে দুঃখপাপহীন করিয়া জগৎসৃজন না করিলেন, স্টোয়িকগণ তাহার কোনো উত্তর দিলেন না। জগতে যাহা-কিছু আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম, এ কথা স্বীকার করিলে কোথাও কোনো সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকাই কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু বাহ্যজগৎ যে মানুষের ধর্মশিক্ষাস্থল, সর্বমঙ্গলবাদী স্টোয়িকদের নিকটও তাহা ক্রমশ অপ্রমাণ হইতে লাগিল। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রকৃতির বিরোধী। এ সম্বন্ধে হক্সলির মত আর-একটু বিবৃত করিয়া নিম্নে লিখা যাইতেছে।

মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া আজ সমস্ত জীবরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। নিজেকে যেন তেন প্রকারেণ বজায় রাখা, যাহা পাওয়া যায় নির্বিচারে তাহাকে আত্মসাৎ করা এবং যাহা হাতে আসে তাহাকে একান্ত চেষ্টায় রক্ষা করা, ইহাই জীবনযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যে-সকল গুণের

প্রভাবে বানর এবং ব্যাঘ্র জীবনরক্ষা করিতেছে সেই-সকল গুণ লইয়াই মানুষ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার শারীর প্রকৃতির বিশেষত্ব, তাহার ধূর্ততা, তাহার সামাজিকতা, তাহার কৌতূহল, তাহার অনুকরণনৈপুণ্য এবং তাহার ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে নিষ্ঠুর হিংস্রতাই তাহাকে জীবনরঙ্গভূমিতে বিজয়ী করিয়াছে।

ক্রমে আদিম অরাজকতা দূর হইয়া যতই সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ততই মনুষ্যের পাশব গুণগুলি দোষের হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সভ্য মানব যে-মই দিয়া উপরে উঠিয়াছে সে-মইটা আজ পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিতে চাহে। ভিতরে ব্যাঘ্র এবং বানরের যে-অংশটা আছে সেটাকে দূর করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্রবানরটা সভ্য মানবের সুবিধা বুঝিয়া দূরে যাইতে চাহে না ; সেই কৈশোরের চিরসহচরগুলি অনাদৃত হইয়াও মানবসমাজের মধ্যে অনাহূত আসিয়া পড়ে এবং আমাদের সংযত সামাজিক জীবনে শত সহস্র দুঃখকষ্ট এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সনাতন ব্যাঘ্রবানর-প্রবৃত্তিগুলাকে মানুষ আজ পাপ বলিয়া দাগা দিয়াছে এবং যাহারা এককালে আমাদিগকে দুরূহ ভবসংগ্রামে উত্তীর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধনে ছেদনে সবংশে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির আনুকূল্য করিতেছে এ কথা স্বীকার করা যায় না ; বরঞ্চ দেখা যায়, আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার অহর্নিশি সংগ্রাম চলিতেছে। স্টোয়িকগণও তাহা বুঝিলেন এবং অবশেষে বলিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া তবে কিয়ৎপরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে। Apatheia অর্থাৎ বৈরাগ্য মানবপ্রকৃতির পূর্ণতাসাধনের উপায়। সেই বৈরাগ্যের অবস্থায় মানবহৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুশাসন পালন করিয়া চলে। সেই স্বল্পাবশিষ্ট চেষ্টাটুকুও কেবল অল্পদিনের জন্য ; সে যেন বিশ্বব্যাপী পরমাত্মারই দেহপিঞ্জরাবদ্ধ একটি উচ্ছ্বাস, মৃত্যু-অন্তে সেই সর্বব্যাপী আত্মার সহিত পুনর্মিলনের প্রয়াস পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ভিন্ন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক বৈরাগ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

বৈদিক এবং হোমেরিক কাব্যে আমাদের সম্মুখে যে-জীবনের চিত্র ধরিয়াছে তাহার মধ্যে কী একটা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং আনন্দপূর্ণ সমরোৎসাহ দেখা যায়— তখন বীরগণ সুখ-দুঃখ, শুভদিনের সূর্যালোক এবং দুর্দিনের বজ্রপতন উভয়কেই খেলাচ্ছলে গ্রহণ করিতেন এবং যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিত তখন দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার পরে কয়েক শতাব্দী অতীত হইতেই পরিণত সভ্যতা-প্রভাবে চিন্তাজ্বরে জরাজীর্ণ হইয়া সেই বীরমণ্ডলীর উত্তরপুরুষগণ জগৎসংসারকে দুঃখময় দেখিতে লাগিল। যোদ্ধা হইল তপস্বী, কর্মী হইল বৈরাগী। গঙ্গাকূলে এবং টাইবর-তীরে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিলেন বিশ্বসংসার প্রবল শত্রু এবং বিশ্ববন্ধনচ্ছেদনই মুক্তির প্রধান উপায়।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক -দর্শন যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল আধুনিক মানবমনও সেইখান হইতেই যাত্রার উপক্রম করিতেছে।

কিন্তু আধুনিক সমাজে যদিও দুঃখবাদী ও সুখবাদীর অভাব নাই তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয়, আমাদের অধিকাংশ লোকই দুই মতের মাঝখান দিয়া চলিয়া থাকেন। মোটের উপর সাধারণের ধারণা, জগৎটা নিতান্ত সুখেরও নহে নিতান্ত দুঃখেরও নহে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ যে নিজকৃত কর্মের দ্বারা জীবনের অনেকটা সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে এ সম্বন্ধেও অধিকাংশের মতের ঐক্য আছে।

তৃতীয়ত, কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গলসাধন যে আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য এ সম্বন্ধেও লেখক কাহাকেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে শোনেন নাই।

এক্ষণে বর্তমানকালে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে-সকল নূতন জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কর্তব্যনীতির কতটা যোগ তাহাই আলোচ্য।

একদল আছেন যাঁহারা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় ধর্মনীতিরও ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করেন। লেখকের সহিত তাঁহাদের মতের বিশেষ অনৈক্য নাই, কিন্তু হক্সলি বলেন, আমাদের ভালোমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিরূপে পরিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্তিবাদ তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে, কিন্তু ভালো যে মন্দের অপেক্ষা কেন শ্রেয়, অভিব্যক্তিতত্ত্ব তাহার কোনো নূতন সদ্‌যুক্তি দেখাইতে পারে না। হয়তো কোনো একদিন আমাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, কিন্তু তাহাতে করিয়া এটা সুন্দর এবং ওটা কুৎসিত এই বোধশক্তির কোনো হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না।

ধর্মনীতির অভিব্যক্তিবাদ উপলক্ষে আর-একটা ভ্রম আজকাল প্রচলিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপরে জীবজন্তু-উদ্ভিদগণ জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমতা অনুসারে টিঁকিয়া গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব সামাজিক মনুষ্য, নীতিপথবর্তী মনুষ্যও সেই এক উপায়েই উন্নতিসোপানে অগ্রসর হইতে পারে, এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগ্যতম এবং সাধুতম কথাটা এক নহে। প্রকৃতিতে যোগ্যতমতা অবস্থার উপরে নির্ভর করে। পৃথিবী যদি অধিকতর শীতল হইয়া আসে তবে ওক অপেক্ষা শৈবাল যোগ্যতর হইয়া দাঁড়াইবে ; সে স্থলে অন্য কোনোরূপ শ্রেষ্ঠতাকে যোগ্যতা বলা যাইবে না।

সামাজিক মনুষ্যও এই জাগতিক নিয়মের অধীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জীবিকার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে— যাহার জোর বেশি, আপনাকে বেশি জাহির করিতে পারে, সে অক্ষমকে দলিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু তথাপি অভিব্যক্তির এই জাগতিক পদ্ধতি সভ্যতার নিম্নাবস্থাতেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক উন্নতির অর্থই, এই জাগতিক পদ্ধতিকে পদে পদে বাধা দিয়া তৎপরিবর্তে নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা, যাহাকে বলে নৈতিক পদ্ধতি ; এবং যাহার শেষ উদ্দেশ্য, অবস্থানুযায়ী যোগ্যতাকে পরিহার করিয়া নৈতিক শ্রেষ্ঠতাকে রক্ষা করা।

জাগতিক পদ্ধতির স্থলে নৈতিক পদ্ধতিকে সমাজে স্থান দিতে হইলে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে আত্মসংযম অবলম্বন করিতে হইবে— সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত বিদলিত না করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে— যাহাতে করিয়া কেবল যোগ্যতম রক্ষা না পায়, পরন্তু সাধ্যমত সম্ভবমত অনেকেই রক্ষা পাইবার যোগ্য হয়। আইন এবং নীতিসূত্র সকল জাগতিক পদ্ধতিকে বাধা দিয়া সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে ; তাহারই আশ্রয় ও প্রভাবে কেবল যে প্রত্যেকে জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা নহে, পাশব বর্বরতার আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছে।

অতএব এ কথা বিশেষরূপে মনে ধারণা করা কর্তব্য যে, জাগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অথবা তাহার নিকট হইতে সত্রাসে পলায়ন করিয়া সমাজের নৈতিক উন্নতি হয় না, তাহার সহিত সংগ্রাম করাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া বিশ্বজগতের সহিত লড়াই করিতে বসিব এ কথা স্পর্ধার মতো শুনিতে হয়, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানোন্নতি পর্যালোচনা করিলে ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বজগতের মধ্যে একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিতেছে। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক সমাজে শাস্ত্র ও লোকাচারের দ্বারা মানবাশ্রিত জাগতিক পদ্ধতি সংযত ও রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বহিঃপ্রকৃতিতেও পশুপাল কৃষি ও শিল্পীর দ্বারা তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে ততই প্রকৃতির কার্যে মানুষের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া আসিয়াছে ; অবশেষে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে মানব-বহির্ভূত প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভাব এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রজালেরও এত ক্ষমতা লোকে বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে ধরাধামে ভূস্বর্গপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলিয়া আশা হয় না। কারণ,

যদিচ বহুযুগ ধরিয়া আমাদের পৃথিবী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, তথাপি এক সময়ে তাহার শিখরচূড়ায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার তাহাকে নিম্নদিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করিতে সাহস হয় না যে, মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি কোনোকালে কালের গতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে।

তাহা ছাড়া, জাগতিক প্রকৃতি আমাদের আজন্ম সঙ্গী, আমাদের জীবনরক্ষার সহায় এবং তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরে কঠিন সাধনায় সিদ্ধ ; কেবল কয়েক শতাব্দীর চেষ্টাতেই যে তাহাকে নৈতিক নিগড়ে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে, এ আশা মনে পোষণ করা মূঢ়তা। যতদিন জগৎ থাকিবে বোধ করি ততদিনই এই কঠিনপ্রাণ প্রবল শত্রুর সহিত নৈতিক প্রকৃতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

অপরপক্ষে মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা একত্র সম্মিলিত ও বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক অবস্থাকে যে কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহারও সীমা দেখা যায় না। এবং মানবপ্রকৃতিরও কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। যে-মানুষ নেকড়ে বাঘের জাতভাইকে মেষরক্ষক কুক্কুরে পরিণত করিয়াছে, সে মানুষ সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত বর্বর প্রবৃত্তিগুলিকেও যে বহুল পরিমাণে দমন করিয়া আনিতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।

জগতে অমঙ্গল দমন করা সম্বন্ধে আমরা যে পুরাকালের নীতিজ্ঞদের অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি সে-আশা সফল করিতে হইলে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এ মতটা দূর করিতে হইবে।

আর্যজাতির শৈশবাবস্থায় যখন ভালো এবং মন্দ উভয়কেই ক্রীড়াসহচরের ন্যায় গ্রহণ করা যাইত সে-দিন গিয়াছে। তাহার পরে যখন মন্দর হাত হইতে এড়াইবার জন্য গ্রীক এবং হিন্দু রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নোদ্যত হইল সে-দিনও গেল ; এখন আমরা সেই বাল্যোচিত অতিশয় আশা এবং অতিশয় নৈরাশ্য পরিহার করিয়া বয়স্ক লোকের ন্যায় আচরণ করিব, কঠিন পণ ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া চেষ্টা করিব, সন্ধান করিব, উপার্জন করিব এবং কিছুতে হার মানিব না। ভালো যাহা পাইব তাহাকে একান্ত যত্নে পালন করিব এবং মন্দকে বহন করিয়া অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিব ; হয়তো সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে, হয়তো-বা সুখময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, কিন্তু সেই অনিশ্চিত পরিণামের পূর্বে এমন অনেক নিশ্চিত কার্য সমাধা হইবে যাহাতে মহত্ত্বগৌরব আছে।

১৩০০

বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য

অল্পদিন হইল সুইডেনদেশীয় একটি যুবক বঙ্গদেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া বাঙালির বাড়িতে বাস করিতেন, বাঙালি ছাত্রদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন, যাহা কিছু পাইতেন তাহাতে বহি কিনিতেন ও সেই বহি ছাত্রদিগকে পড়িতে দিতেন, এবং পথের দরিদ্র বালকদিগকে পয়সা বিতরণ করিতেন।

কোনো য়ুরোপীয়কে অতিথি-আত্মীয়-ভাবে সন্নিকটে পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। ইংরেজ কিছুতেই আপনার রাজগর্ব ভুলিতে পারে না, আমাদের কাছে আসিতে তাহার ইচ্ছাও নাই, তাহার সাধ্যও নাই। সেইজন্য এই সুইডেনবাসীর সঙ্গ আমাদের নিকট সবিশেষ মূল্যবান ছিল।

যে-লোকটির কথা বলিতেছি তিনি আকারে প্রকারে ব্যবহারে নিতান্ত নিরীহের মতো ছিলেন। কোটপ্যান্ট্‌লুনের মধ্যে এত নম্রতা ও নিরীহতা দেখা আমাদের অভ্যাস নাই।

কিন্তু এই সাহেবটি আমাদেরই মতো বিনম্র মৃদুপ্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার অস্থিমজ্জার মধ্যে য়ুরোপের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল। দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সহজ লোকের মতো, অথচ লোকটি যে-সে লোক নহে এমন দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর পাই না। আমাদের দিশি ভালো মানুষ

মাটির মানুষ, দেবপ্রতিমা, কিন্তু ভিতরে কোনো চরিত্র নাই, বহুল পরিমাণে খড় আছে। যথার্থ চরিত্র-অগ্নি থাকিলে সেই তৃণনির্মিত নির্জীব ভালোমানুষি দগ্ধ হইয়া যায়।

এই কৃশ খর্বকায় শান্তস্বভাব য়ুরোপীয় যুবকটির অন্তরের মধ্যে যে একটি দীপ্তিমান চরিত্র-অগ্নি ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছিল তাহা তাঁহার প্রথম কার্যেই প্রকাশ পায়। তিনি যে স্বদেশ ছাড়িয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জন্মভূমি ও আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরজাতির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এই দুঃসাধ্য কার্যে কে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইল। কোথায় সেই মেরুতুষারচুম্বিত য়ুরোপের শীর্ষবিলম্বিত সুইডেন আর কোথায় এই এশিয়ার প্রান্তবর্তী খররৌদ্রক্লান্ত বঙ্গভূমি। পরস্পরের মধ্যে কোনো সভ্যতার সাম্য, কোনো আত্মীয়তার সম্বন্ধ, কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ নাই। ভাষা প্রথা অভ্যাস জীবনযাত্রার প্রণালী, সমস্তই স্বতন্ত্র। সমস্ত প্রিয়বন্ধন সমস্ত চিরাভ্যস্ত সংস্কার হইতে কোনো দেশের রাজশাসনও কোনো ব্যক্তিকে এমন সম্পূর্ণরূপে নির্বাসনদণ্ড বিধান করিতে পারে কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় বাঙালির নিমন্ত্রণসভায় উৎসবক্ষেত্রে ধর্মসমাজে এই শুভ্রকোর্তাধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে এক প্রান্তভাগে অনেকবার দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিবার জন্য যেন তাঁহার একটি বিশেষ আগ্রহ ছিল। অনেক সভাস্থলে আমাদের বক্তৃতার ভাষা আমাদের সংগীতের সুর তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না ; ধৈর্যসহকারে হৃদয়ের অন্তরঙ্গতাগুণে আমাদের ভাবের মধ্যে যেন স্থানলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। পরজাতির গূঢ় হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিবার জন্য যে-নম্রতাগুণের আবশ্যক তাহা তাঁহার বিশেষরূপে ছিল।

ছাত্রশিক্ষার যে-কার্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে অসামান্য কষ্টস্বীকার করিতে হইত। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে অনাহারে অনিয়মে কলিকাতার পথে পথে সমস্তদিন পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহার অশ্রান্ত উদ্যমকে পরাভূত করিতে পারে নাই। রৌদ্রতাপ এবং উপবাস তিনি কিরূপ সহ্য করিতে পারিতেন বর্তমান লেখক একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব-উপলক্ষে গত বৎসর পৌষ মাসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়া প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হন। বিনা ছাতায় বিনা আহারে সমস্তদিন মাঠে মাঠে ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অপরাহ্নে উৎসবারম্ভকালে ফিরিয়া আসেন— তখন কিছুতেই আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পদব্রজে স্টেশনে গমনপূর্বক সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

একদিন তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া একেবারে বারাকপুরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে পুনর্বার পদব্রজে ফিরিতে রাত্রি দশটা হইয়া যায়। পাছে ভৃত্যদের কষ্ট হয় এইজন্য সেই দীর্ঘ ভ্রমণ দীর্ঘ উপবাসের পর অনাহারেই রাত্রি যাপন করেন। কোনো কোনো দিন রাত্রে তিনি আহারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে গৃহস্বামিনী যখন খাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তিনি বলিতেন, ভোজনে আজ আমার অধিকার ও অভিরুচি নাই— দিনের কার্য আজ আমি ভালো করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে আহার করিবার সময় তিনি রুটিখণ্ড গাছের শাখায় এবং ভূতলে রাখিয়া দিতেন, পাখিরা আসিয়া খাইলে পরে তবে তাঁহার আহার সম্পন্ন হইত।

তাঁহার একটি সাধ ছিল আমাদের দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের জন্য ভালো লাইব্রেরি এবং আলোচনাসভা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রৌদ্রবৃষ্টি অর্থব্যয় এবং শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহায়তাসাধনে প্রতিশ্রুত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহ অনবরত প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। অবশেষে আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন।

শুনা যায় এই লাইব্রেরি-স্থাপন-চেষ্টার জন্য গুরুতর অনিয়ম ও পরিশ্রমই তাঁহার পীড়ার অন্যতম কারণ। মৃত্যুর পূর্বদিনে তিনি আমাদের দেশীয় কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন, দেশে আমার যে কোনো আত্মীয়স্বজন নাই তাহা নহে, খৃস্টিয়ান ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করাতেই

আমি তাঁহাদের পর হইয়াছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার লাইব্রেরির কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কোনো-একটি ছাত্রের নিকট হইতে তিনি অগ্রিম বেতন লইয়াছিলেন, সেই টাকা তাহাকে ফেরত দিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় তাহার বিদেশীয় নাম স্মরণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ চেষ্টা ; এবং সেই ছাত্রকে সন্ধান করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ অনুরোধ।

তিনি যদি এখানে আসিয়া তাঁহার স্বজাতীয়দের আতিথ্য লাভ করিতেন তবে আর কিছু না হউক হয়তো তাঁহার জীবনরক্ষা হইত, কারণ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য য়ুরোপীয়ের পক্ষে কী কী নিয়ম পালন করা কর্তব্য সে-অভিজ্ঞতা তিনি স্বজাতীয়ের নিকট হইতে লাভ করিতে পারিতেন। যদি-বা জীবনরক্ষা না হইত তথাপি অন্তত যেরূপ চিকিৎসা যেরূপ আরাম যেরূপ সেবাশুশ্রূষা তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত, বিদেশে মৃত্যুকালে সেটুকু হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না ; এবং য়ুরোপীয় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার জন্য অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁহার যে-আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত ছিল তাহাও পূর্ণ হইতে পারিত।

সুইডেনবাসী হ্যামারগ্রেন সাহেবের বাংলায় আতিথ্যযাপনের সংক্ষেপ বিবরণ আমরা প্রকাশ করিলাম। তিনি এ দেশে অল্পকাল ছিলেন, এবং যদিও আমাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রেম ও আমাদের হিতসাধনে তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল এবং যদিও তাঁহার অকৃত্রিম অমায়িক স্বভাবে তিনি ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি এমন-কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাতে সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইতে পারেন, সুতরাং এই বিদেশীর বৃত্তান্ত সাধারণের আলোচ্য বিষয় না হইবার কথা। আমরাও সে প্রসঙ্গে বিরত থাকিতাম, কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বাংলাসংবাদপত্র তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসৎকার সম্বন্ধে যেরূপ নিষ্ঠুর আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

হ্যামারগ্রেন মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তাঁহার সেই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ হইয়াছিল। শাস্ত্রমতে অগ্নি যদিও পাবক এবং কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তথাপি হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় ইহাতে কোনো কোনো হিন্দুপত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন এ পর্যন্ত মৃত্যুর পরে তাঁহারা 'হাড়িডোম' প্রভৃতি অনার্য অন্ত্যজ জাতির সহিত একস্থানে ভস্মীভূত হইতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যে-শ্মশানে কোনো সুইডেনবাসীর চিতা জ্বলিয়াছে সেখানে যে তাঁহাদের পবিত্র মৃতদেহ পুড়িবে, ইহাতে তাঁহারা ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

কিছুকাল পূর্বে একসময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশপ্রেমিকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, হিন্দুধর্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম নির্বিচার-আতিথ্য অন্য-সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু জানি না কী দুর্দৈবক্রমে সম্প্রতি এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও হিন্দুধর্মকে নিষ্ঠুর সংকীর্ণ এবং একান্ত পরবিদ্বেষী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

শ্রুতিতে আছে, অতিথিদেবোভব। কিন্তু কালক্রমে আমাদের লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে, কোনো বিদেশীয় বিজাতীয় সাধুব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোনো হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসংকোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুক্কুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে ; এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে, অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও কি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব। জীবিত কালে আমাদের গৃহে পরদেশীর স্থান নাই, মৃত্যুর পরে আমাদের শ্মশানেও কি পরদেশীর দগ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে না।

যদি আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধে কোনো নিষেধ থাকিত তাহা হইলেও আমাদের ধর্মশাস্ত্রের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া আমরা অগত্যা নীরব থাকিতাম। যখন সেরূপ নিষেধ কিছু নাই তখন ধর্মের নাম করিয়া অধর্মবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া, অকারণে গায়ে পড়িয়া বিদ্বেষবহ্নিকে প্রধূমিত করিয়া

হিন্দুসমাজের কী হিতসাধন হইবে বলিতে পারি না।

শ্মশান বৈরাগ্যের মহাক্ষেত্র। সেখানে মতভেদ ধর্মভেদ জাতিভেদ নাই; সেখানে একদিন ছোটো-বড়ো ধনী-দরিদ্র দেশী-বিদেশী, সকলেই মুষ্টিকয়েক ভস্মাবশেষের মধ্যে সমান পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের হিন্দুসন্ন্যাসীরা শ্মশানে সমাজবন্ধনবিহীন মহাকালের নিরঞ্জন নির্বিকার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন। সেখানে সেই দেশকালাতীত ধ্যাননিমগ্ন বৈরাগ্যের সমাধিভূমিতেও কি পরজাতিবিদ্বেষ আপন সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র জয়ধ্বজা লইয়া ফর্ফর শব্দে আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

আমাদের দেবতার মধ্যে যম কোনো জাতিকে ঘৃণা করেন না, মহাযোগী মহাদেবেরও সর্বজাতির প্রতি অপক্ষপাতের কথা শুনা যায়। কিন্তু আজ তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র বিহারভূমি শ্মশানের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহরীগণ মৃতদেহের জাতিবিচার করিতে বসিয়া গিয়াছেন— সে কি ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, না সংকীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য।

এই সুইডেনদেশীয় নিরীহ প্রবাসী প্রীতিপূর্বক বিশ্বাসপূর্বক অতি দূরদেশে পরজাতীয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পাছে কোথাও অনধিকার প্রবেশ হয়, পাছে কাহারও অন্তরে আঘাত লাগে, পাছে অজ্ঞাতসারে কাহারও পীড়ার কারণ হন, এইজন্য সর্বত্র সর্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। সেই দয়ালু সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি কাহারও কোনো অপকার করেন নাই, কেবল পরজাতি পরধর্মীর হিতচেষ্টায় আপন জীবনপাত করিয়াছেন মাত্র। সেই অসম্পন্ন চেষ্টার জন্য তাঁহার প্রতি কাহাকেও কৃতজ্ঞ হইতে অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু এই অকালমৃত বিদেশী সাধুর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুর অবমাননা করিতে কি নিষেধ করাও উচিত নহে।

যদি দৈবক্রমে কোনো বিদেশী আপন আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে হউক-না সে পরের সন্তান, হউক-না সে বিধর্মী, বঙ্গভূমি কি জননীবাৎসল্যে আপন স্নেহক্রোড়ের এক প্রান্তভাগে তাহাকে স্থান দিতে পারিবে না এবং তাহার অকালমৃত্যুর পরে সকল ঘৃণার অবসানক্ষেত্র শ্মশানভূমির মধ্যেও তাহার প্রতি সুকঠোর ঘৃণা প্রকাশ করিবে? এই নিষ্ঠুর বর্বরতা কি অতিথিবৎসল হিন্দুধর্মের প্রকৃতিগত, না এই পতিত জাতির বুদ্ধিবিকারমাত্র?

এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে পবিত্র আর্যভূমির নিকটে কোন্ অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা? তিনি ব্রাহ্মণের ঘরের আসন, কুলীনের ঘরের কন্যা, যজমানের ঘরের দক্ষিণা চাহেন নাই; তিনি সুইডেনের উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার যে-শ্মশানে 'হাড়িডোম'[১] প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে, সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র।

হায় বিদেশী, বঙ্গভূমির প্রতি তোমার কী অন্ধ বিশ্বাস, কী দুঃসহ স্পর্ধা। মনে যত অনুরাগ যত শ্রদ্ধাই থাক্ পুড়িয়া মরিবার এবং মরিয়া পুড়িবার এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে জীবনে মরণে তোমাদের কোনো অধিকার নাই।

১৩০১

ব্যাধি ও প্রতিকার

ইংরেজিশিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে আমাদের বক্ষ যতটা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর ততটা নাই, এমন-কি, কিছুকাল হইতে নাড়ী স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও যেন দাবিয়া গেছে। জ্বরের মুখে যে-উত্তাপ দেখিতে দেখিতে একশো-চারপাঁচছয়ের দিকে উঠিতেছিল, এখন যেন তাহা আটানব্বইয়ের নীচে নামিয়া চলিয়াছে এবং সমস্তই যেন হিম হইয়া আসিতেছে। এমন অবস্থায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১ পাঠকগণ মনে করিবেন না আমরা ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক হাড়িডোম প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতেছি; আমরা সংবাদপত্রের ভাষা উদ্‌ধৃত করিতেছি।

মহাশয়ের মতো সুযোগ্য ভাবুক ব্যক্তি "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার" সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিবেন তাহা আমাদের ঔৎসুক্যজনক না হইয়া থাকিতে পারে না।

তথাপি আমরা লেখকমহাশয়ের এবং তাঁহার প্রবন্ধের নামের দ্বারা স্বভাবত আকৃষ্ট হইয়াও অতিশয় অধিক প্রত্যাশা করি নাই। কারণ, আমরা নিশ্চয় জানি, সামাজিক ব্যাধির কোনো অভূতপূর্ব পেটেন্ট ঔষধ কবি বা কবিরাজের কল্পনার অতীত। আসল কথা, ঔষধ চিরপরিচিত, কিন্তু নিকটে তাহার ডাক্তারখানা কোথায় পাওয়া যায়, সেইটে ঠাহর করা শক্ত। কারণ, মানসিক ব্যাধির ঔষধও মানসিক এবং ব্যাধি থাকাতেই সে-ঔষধ দুষ্প্রাপ্য

তবে এ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আসিয়াছে; কেননা আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্যজগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি।

কিছু পূর্বে এরূপ আন্তরিক দ্বিধা আমাদের শিক্ষিতসমাজে ছিল না। স্বদেশাভিমানীরা মুখে যিনি যাহাই বলিতেন, আধুনিক সভ্যতার উপর তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। ফরাসীবিদ্রোহী, দাসত্ববারণচেষ্টা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষকালীন ইংরেজি কাব্যসাহিত্য বিলাতি সভ্যতাকে যে ভাবের ফেনায় ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল, তখনো তাহা মরে নাই— সে-সভ্যতা জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মনুষ্যত্বকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে, এমনই একটা আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিতেছিল। আমাদের তাহাতে তাক লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা সেই সভ্যতার ঔদার্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সংকীর্ণতার তুলনা করিয়া য়ুরোপকে বাহবা দিতেছিলাম।

বিশেষত আমাদের মতো অসহায় পতিতজাতির পক্ষে এই ঔদার্য অত্যন্ত রমণীয়। সেই অতিবদান্য সভ্যতার আশ্রয়ে আমরা নানাবিধ সুলভ সুবিধা ও অনায়াসমহত্ত্বের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। মনে আশা হইতে লাগিল, কেবল স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া আমরা বীরপুরুষ হইব, এবং কলেজ হইতে দলে দলে উপাধিগ্রহণ করিয়াই আমরা সাম্যসৌভ্রাত্রস্বাতন্ত্র্যমন্ত্রদীক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে স্বাধীনশাসনের দাবি করিব।

চৈতন্য যখন ভক্তিবন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদবাঁধ ভাঙিয়া দিবার কথা বলিলেন তখন যে-হীনবর্ণ সম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।

আমরাও সভ্যতার প্রথম ডাক শুনিয়া যখন নাচিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম, এই পাশ্চাত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতা-বিজেতার ভেদ থাকিবে না— কেবল মন্ত্রবলে গৌরে-শ্যামে একাঙ্গ হইয়া যাইবে।

এইজন্যই আমাদের এত বেশি উচ্ছ্বাস হইয়াছিল এবং বায়রনের সুরে সুর বাঁধিয়া এমন উচ্চ সপ্তকে তান লাগাইয়াছিলাম। এমন পতিতপাবন সভ্যতাকে পতিতজাতি যদি মাথায় করিয়া না লইবে, তবে কে লইবে।

কিন্তু আমরা বৈষ্ণব হইলাম, ব্রাহ্মণ হইলাম না। আমাদের যাহা-কিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি, কিসের জন্য—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর!

বাঁশি বাজিয়াছিল মধুর, কিন্তু এখন মনে হইতেছে—

যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও।

এখন বিলাতি শিক্ষাটাকে ডালেমূলে উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কথা এই যে কেবলমাত্র বাঁশির আওয়াজে যিনি কুলত্যাগ করেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতেই হইবে। মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব -লাভ এত সহজ মনে করাই ভুল। আমরা কথঞ্চিৎপরিমাণে ইংরেজের ভাষা শিখিয়াছি বলিয়াই যে ইংরেজ জেতা-বিজেতার সমস্ত প্রভেদ ভুলিয়া আমাদিগকে তাহার রাজতক্তায় তুলিয়া লইবে এ কথা স্বপ্নেও

মনে করা অসংগত। জাতীয় মহত্ত্বের দুর্গমশিখরে কণ্টকিত পথ দিয়া উঠিতে হয় ; কেমন করিয়া উঠিতে হয়, সে তো আমরা ইংরেজের ইতিহাসেই পড়িয়াছি।

আমি এই কথা বলি যে, ইংরেজ যদি আমাদিগকে সমান বলিয়া একাসনে বসাইত, তাহা হইলে আমাদের অসমানতা আরো অধিক হইত। তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরো কমিয়া যাইত। তাহারা পৌরুষের দ্বারা যে আসন পাইয়াছে, আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইয়া যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকিতাম, আমাদের আত্মাভিমান শান্ত হইত, তবে তদ্দ্বারা আমাদের জাতির গভীরতর দারুণতর দুর্গতি হইত।

কিছু আদায় করিতে হইবে এই মন্ত্র ছাড়িয়া, কিছু দিতে হইবে কিছু করিতে হইবে, এই মন্ত্র লইবার সময় হইয়াছে। যতক্ষণ আমরা কিছু না দিতে পারিব, ততক্ষণ আমরা কিছু পাইবার চেষ্টা করিলে এবং সে-চেষ্টায় কৃতকার্য হইলেও তাহা ভিক্ষাবৃত্তিমাত্র— তাহাতে সুখ নাই, সম্মান নাই।

সে কথাটা আমাদের মনের মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা ভিক্ষার সময় কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম কপিলের কথা পাড়িয়া থাকি। বলি যে, আমাদের পিতামহ জগতের সভ্যতার অনেক খোরাক জোগাইয়াছিলেন ; অতএব ভিক্ষা দে বাবা!

পিতামহদের মহিমা স্মরণ করার খুবই দরকার কিন্তু সে কেবল নিজেকে মহিমালাভে উত্তেজিত করিবার জন্য, ভিক্ষার দাবিকে উচ্চ সপ্তকে চড়াইবার জন্য নহে। কিন্তু যে-ব্যক্তি হতভাগা, তাহার সকলই বিপরীত।

যাহাই হোক, পৃথিবীতে আমাদের একটা-কিছু উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। দরখাস্ত লিখিবার উপযোগিতা নহে, দরখাস্ত পাইবার। কিছু-একটার জন্য পৃথিবীকে আমাদের দেউড়িতে উমেদারি করিতে হইবে, তবে আমাদের মুখে আস্ফালন শোভা পাইবে।

রাষ্ট্রনীতিতে মহত্ত্বলাভ আমাদের পক্ষে সর্বপ্রকারে অসম্ভব। সেই পথে আমাদের সমস্ত মনকে যদি রাখি, তবে পথের ভিক্ষুক হইয়াই আমাদের চিরটা-কাল কাটিবে। যে-শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় সে-শক্তি আমাদের নাই, লাভ করিবার কোনো আশাও দেখি না। কেবল ইংরেজকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে-শাখায় দাঁড়াইয়া আছেন, সেই শাখাটাকে অনুগ্রহপূর্বক ছেদন করিতে থাকুন। সেই অনুরোধ ইংরেজ যেদিন পালন করিবে, সেদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে কালবিলম্ব হইবার আশঙ্কা আছে।

যেখানে আমাদের অধিকার নাই, সেখানে কখনো কপট করজোড়ে কখনো কপট সিংহনাদে ধাবমান হওয়া বিড়ম্বনা, সে কথা আমরা ক্রমেই অনুভব করিতেছি। বুঝিতেছি, নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী স্থায়ী যাহা-কিছু করিয়া তুলিতে পারিব, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যে-জিনিসটা এ বৎসর একজন কৃপা করিয়া দিবে, পাঁচ বৎসর বাদে আর-একজন গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইবে, সেটা যতবড়ো জিনিস হোক, আমাদিগকে এক ইঞ্চিও বড়ো করিতে পারিবে না।

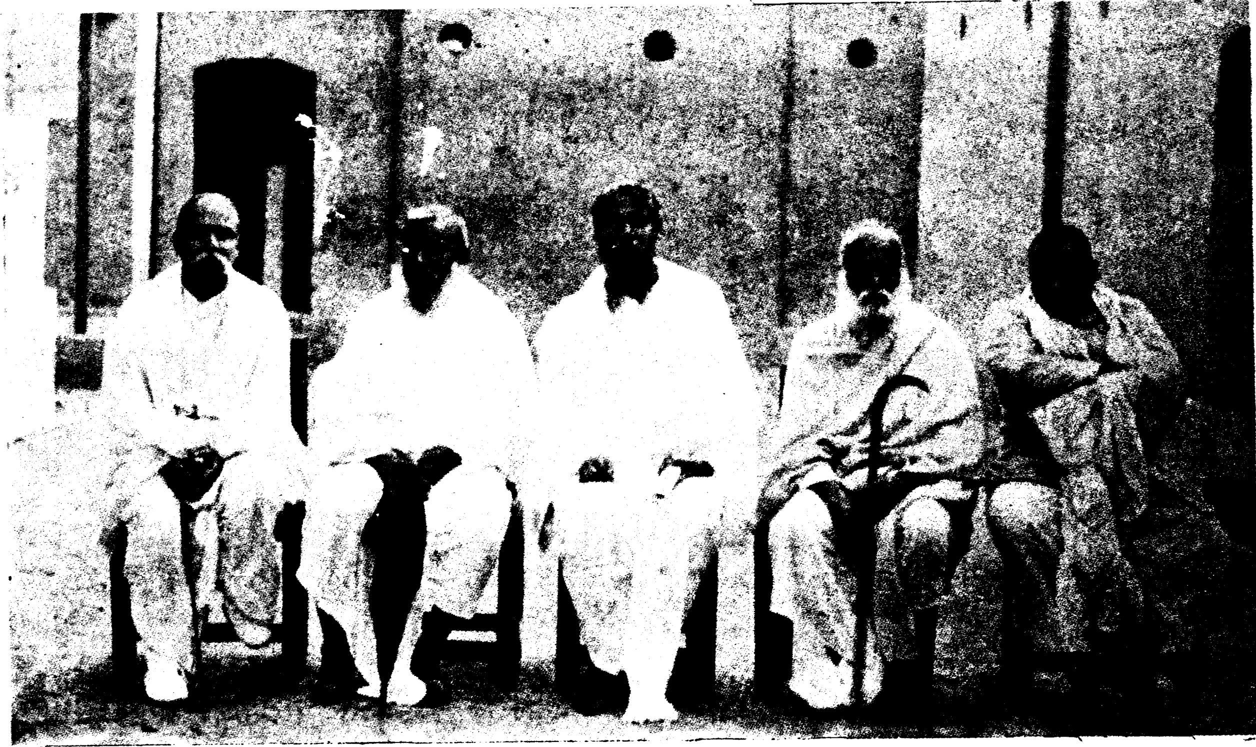
কোনো বিষয়ে একটা-কিছু করিয়া তুলিতে যদি চাই তবে উজান স্রোতে সাঁতার দিয়া তাহা পারিব না। কোথায় আমাদের বল, আমাদের প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে, তাহা বাহির করিতে হইবে। তাহা বাহির করিতে হইলেই নিজেকে যথার্থরূপে চিনিয়া লইতে হইবে।

হতাশ ব্যক্তিরা বলেন, চিনিব কেমন করিয়া। বিদেশী শিক্ষায় আমাদের চোখে ধুলা দিতেছে।

ধুলা নহে, তাহা অঞ্জন। বিপরীত সংঘাত ব্যতীত মহত্ত্বশিক্ষা জ্বলিয়া উঠে না। খৃস্টধর্ম য়ুরোপীয় প্রকৃতির বিপরীত শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা মথিত হইয়াই য়ুরোপীয় প্রকৃতির সারভাগ এমন করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

তেমনই য়ুরোপীয় শিক্ষা ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির পক্ষে বিপরীত শক্তি। এই শক্তির দ্বারাই আপনাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিব এবং ফুটাইয়া তুলিব।

আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা গিয়াছে। অন্তত নিজেকে আদ্যোপান্তভাবে জানিবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম আবেগে অনেকটা হাতড়াইতে হয়,



সুহৃদ্‌বর্গসহ রবীন্দ্রনাথ

আশুতোষ চৌধুরী   রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়   রবীন্দ্রনাথ   ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল   শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

১৩১৮ সালে গৃহীত ফোটোগ্রাফ। সুহাসচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে

উদ্যমের অনেকটা বাজেখরচ হইয়া যায়। এখনো আমাদের সেই হাস্যকর অবস্থাটা কাটিয়া যায় নাই।

কিন্তু কাটিয়া যাইবে। পূর্ব-পশ্চিমের আলোড়ন হইতে আমরা কেবলই যে বিষ পাইব, তাহা নহে ; যে-লক্ষ্মী ভারতবর্ষের হৃদয়সমুদ্রতলে অদৃশ্য হইয়া আছেন তিনি একদিন অপূর্বজ্যোতিতে বিশ্বভুবনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবেন।

নতুবা, যে ভারতে আর্যসভ্যতার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, সেই ভারতেই সুদীর্ঘকাল পরে আর্যসভ্যতার বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ কী করিতে আসিয়াছে।

জাগাইতে আসিয়াছে। প্রাচীন ভারত তপোবনে বসিয়া একদিন এই জাগরণের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো, যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। কবিরা বলিতেছেন, সেই পথ ক্ষুরধারা, শাণিত দুর্গম।

য়ুরোপও আমাদের রুদ্ধহৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া সেই মন্ত্রের পুনরুচ্চারণ করিতেছে ; বলিতেছে, যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা আর-কেহ ভিক্ষাস্বরূপ দান করিতে পারে না ; আবেদনপত্রপুটে তাহা ধারণ করিতে পারে না, তাহা সন্ধান করিতে হইলে দুর্গম পথেই চলিতে হয়।

সে পথ কোথায়। অরণ্যে সে-পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, তবু পিতামহদের পদচিহ্ন এখনো সে-পথ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু হায়, পথের চেয়ে সেই পথলোপকারী অরণ্যের প্রতিই আমাদের মমতা। আমাদের প্রাচীন মহত্ত্বের মূলধারাটি কোথায় এবং তাহাকে নষ্ট করিয়াছে কোন্ বিকারগুলিতে, ইহা আমরা বিচার করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি না। স্বজাতিগর্ব মাঝে মাঝে আমাদের উপর ভর করে, তখন যেগুলি আমাদের স্বজাতির গর্বের বিষয় এবং যাহা লজ্জার বিষয়, যাহা সনাতন এবং যাহা অধুনাতন, যাহা স্বজাতির স্বরূপগত এবং যাহা আকস্মিক, ইহার মধ্যে আমরা কোনো ভেদ দেখিতে পাই না। যাহা আমাদের আছে তাহাকেই ভালো বলিয়া, যাহা আমাদের ছিল তাহাকে অবমানিত করি।

এ কথা ভুলিয়া যাই, ভালোর প্রমাণ, সে-ভালোকে যাহারা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারাই। সবই যদি ভালো হইবে তবে আমরা ভ্রষ্ট হইলাম কী করিয়া।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে-আদর্শ যথার্থ মহান তাহা কেবল কালবিশেষ বা অবস্থাবিশেষের উপযোগী নহে। তাহাতে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব দান করে, সে-মানুষ সকল কালে সকল অবস্থাতেই আপন শ্রেষ্ঠতা রাখিতে পারে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতে যে-আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে ; বিলাতে গেলে তাহা নষ্ট হয় না, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা বিকৃত হয় না, বর্তমান কালোপযোগী কর্মে নিযুক্ত হইতে গেলে তাহা অনাবশ্যক হইয়া উঠে না। যদি তাহা হইত, তবে সে-আদর্শকে মহান বলিতে পারিতাম না।

সকল সভ্যতারই মূল মহত্ত্বসূত্রটি চিরন্তন এবং তাহার বাহ্য আয়তনটি সাময়িক ; তাহা মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্য অবয়বটি যদি আমরা অবলম্বন করি, তবে আমরা ভুল করিব। কারণ, যাহা ইংলন্ডের ইতিহাসে বাড়িয়াছে, ভারতের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। এই কারণেই বিলাতে গিয়া আমরা ইংরেজের বাহ্য আচারের যে-অনুকরণ করি, এ দেশে তাহা অস্থানিক অসাময়িক বিদ্রূপমাত্র। কিন্তু সেই সভ্যতার চিরন্তন অংশটি যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে তাহা সর্বদেশে সর্বকালেই কাজে লাগিবে।

তেমনই ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে।

যেটা সাময়িক সেটা অন্য সময়ে শোভা পায় না। সেইটেকেই যদি প্রধান করিয়া দেখি, তবে বর্তমান কাল ও বর্তমান অবস্থা দ্বারা আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত উপহসিত হইব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।

এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান ছিল, তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।

তবে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় আদর্শের বিভিন্নতা কোন্‌খানে। কে কোন্‌টাকে মুখ্য এবং কোন্‌টাকে গৌণ দেখে তাহা লইয়া। ভালোকে সব সভ্যদেশই ভালো বলে কিন্তু সেই ভালোকে কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে, কোন্‌টা আগে বসিবে এবং কোন্‌টা পরে বসিবে সেই রচনার বিভিন্নতা লইয়াই প্রভেদ।

যেমন সকল জীবের কোষ-উপাদান একই-জাতীয় কিন্তু তাহার সংস্থান নানাবিধ, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু এই সংস্থানের নিয়মকে অবজ্ঞা করিবার জো নাই। ইহা আমাদের প্রকৃতির বহুকালীন অভ্যাসের দ্বারা গঠিত। আমরা অন্য কাহারও নকল করিয়া এই মূল উপাদানগুলিকে যেমন খুশি তেমন করিয়া সাজাইতে পারি না ; চেষ্টা করিতে গেলে এমন একটা ব্যাপার হইয়া উঠে, যাহা কোনো কর্মের হয় না।

এইজন্য কোনো বিষয়ে সার্থকতালাভ করিতে হইলে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে উড়াইয়া দিতে পারিব না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহারই আনুকূল্যে আমাদিগকে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে।

কেহ বলিতে পারেন, তবে তো কথাটা সহজ হইল। নিজের প্রকৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টার দরকার হয় না তো ?

হয়। তাহারও সাধনা আছে। স্বাভাবিক হইবার জন্যও অভ্যাস করিতে হয়। কারণ, যে-লোক দুর্বল, তাহাকে নানা দিকে নানা শক্তি বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। সে নিজেকে ব্যক্ত না করিয়া পাঁচজনেরই অনুকরণ করিতে থাকে। পাঁচজনের আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইলে নিজের প্রকৃতিকে সবল সক্ষম করিয়া তুলিতে হয় ; সে একদিনের কাজ নহে, বিশেষত বাহিরের শক্তি যখন প্রবল।

কবি প্রথম বয়সে এর ওর নকল করিয়া মরে, অবশেষে প্রতিভার বিকাশে যখন সে নিজের সুরটি ঠিক ধরিতে পারে তখনই সে অমর হয়। তখনই সে-স্বকীয় কাব্যসম্পদে তার নিজেরও লাভ, অন্য সকলেরও লাভ। আমরা যতদিন ইংরেজের নকলে সব কাজ করিতে যাইব, ততদিন এমন কিছু হইবে না যাহাতে অমাদের সুখ আছে বা ইংরেজের লাভ আছে। যখন নিজের মতো হইব, স্বাভাবিক হইব, তখন ইংরেজের কাছ হইতে যাহা লইব তাহা নূতন করিয়া ইংরেজকে ফিরাইয়া দিতে পারিব।

সে দিন নিঃসন্দেহই আসিবে। আসিবে যে তাহার শুভলক্ষণ এই দেখিতেছি, আমাদের পোলিটিক্যাল আন্দোলনের নেশা অনেকটা ছুটিয়া গেছে ; এখন আমরা স্বাধীন চেষ্টায় স্বাধীন সন্ধানে আমাদের ইতিহাসবিজ্ঞানদর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজের প্রতিও দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ত্রিবেদীমহাশয় বলিয়াছেন, অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষাকে আমরা প্রকৃতিগত করিতে পারি নাই, সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতেছে ; সেইজন্যই বিলাতি সভ্যতার বাহ্যভাগ লইয়া আছি, তাহার মূল মহত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

কিন্তু তিনি আর-একটা কথা বলেন নাই। কেবল ইংরেজ-সভ্যতা নহে, আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা তাহার বাহ্যিক ক্ষণিক অংশ লইয়া যে-আড়ম্বর করিতেছি তাহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইতেই পারে না। কারণ, মনুর সময়ে যাহা সাময়িক

আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক, মনুর সময়ে যাহা চিরন্তন, আমাদের সময়েও তাহা চিরন্তন।

এই-যে নিত্যানিত্য-কালাকাল-বিবেক, ইহাই আমাদের হয় নাই। কেবল সেইজন্যই ইংরেজের কাছ হইতে আমরা ভালোরূপ আদায় করিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের কাছ হইতেও পারিতেছি না।

কিন্তু আমার এ কথার মধ্যে অত্যুক্তি আছে। কালের সমস্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চক্ষে পড়ে না। যে-শক্তি কাজ করিতেছে, তাহা অলক্ষ্যে সমাজ গড়িয়া তোলে বলিয়া তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ-পঞ্চাশ বৎসরে ভাগ করিয়া দেখিলে তবেই তাহার কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন হতাশের আক্ষেপ গাহিতেছি, তখনো সে বিনা-জবাবদিহিতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা পর-শিক্ষাবলেই পর-শিক্ষাপাশ হইতে নিজেকে কিরূপে ধীরে ধীরে এক-এক পাক করিয়া মুক্ত করিতেছি তাহা পঞ্চাশ-বৎসর-পরবর্তী বঙ্গদর্শনের সম্পাদক অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইবেন।

তখনো যে সমস্তটা সম্পাদকের সম্পূর্ণ মনোমতই হইবে, তাহা নহে ; কারণ, সংসারে হতাশের আক্ষেপ অমর— কিন্তু ত্রিবেদীমহাশয়ের পুস্তিকার সহিত মিলাইয়া সুসময়ের আলোচনা করিলে তিনি অনেকটা পরিমাণে সান্ত্বনা পাইবেন, এ কথা তাঁহার পূর্ববর্তী সম্পাদক জোর করিয়া বলিতে পারেন।

১৩০৮

আলোচনা

'নকলের নাকাল' সম্বন্ধে

'নকলের নাকাল' প্রবন্ধে লেখক সাহেবিয়ানার নকল লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমস্ত জাতি ও সমাজের মধ্যে চিরকাল অনুকরণশক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক ব্যাজট্ সাহেব তাঁহার 'ফিজিক্স্ অ্যান্ড পলিটিক্স্' গ্রন্থে জাতিনির্মাণ কার্যে এই অনুকরণশক্তির ক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

গোড়ায় একটা জাতি কী করিয়া বিশেষ একটা প্রকৃতি লাভ করে, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাহার পরে কালে কালে তাহার যে পরিবর্তনের ধারা চলিয়া আসে, প্রধানত অনুকরণই তাহার মূল। ইংলন্ডে রাজ্ঞী অ্যানের রাজত্বকালে ইংরেজসমাজ সাহিত্য আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল, জর্জ-রাজগণের সময় তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন প্রসার এমন-কিছু হয় নাই, যাহাতে অবস্থাপরিবর্তনের গুরুতর কারণ কিছু পাওয়া যায়।

ব্যাজট্ সাহেব বলেন এই-সকল পরিবর্তন তুচ্ছ অনুকরণের দ্বারা সাধিত হয়। একজন কিছু-একটা বদল করে, হঠাৎ কী কারণে সেটা আর-পাঁচজনের লাগিয়া যায়, অবশেষে সেটা ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো সেই বদলটা কোনো কাজের নহে ; হয়তো তাহাতে সৌন্দর্যও নাই ; কিন্তু যে-লোক বদল করিয়াছে, তাহার প্রতিপত্তিবশত বা কী কারণবশত সেটা অনুকরণবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে। এইরূপে পরিবর্তনের বৃহৎ কারণ না থাকিলেও, ছোটোখাটো অনুকরণের বিস্তারে কালে কালে জাতির চেহারা বদল হইয়া যায়।

ব্যাজট্ সাহেবের এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যেমন সবল সুস্থ শরীর বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত প্রভাব নিজের অনুকূল করিয়া লয়, অস্বাস্থ্যকর যাহা-কিছু অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারে, তেমনই সবলপ্রকৃতি জাতি স্বভাবতই এমন-কিছুই গ্রহণ করে না বা দীর্ঘকাল রক্ষা করে না, যাহা তাহার জাতীয় প্রকৃতিকে আঘাত করিতে পারে। দুর্বল জাতির পক্ষে ঠিক উলটা। ব্যাধি তাহাকে চট করিয়া চাপিয়া ধরে এবং তাহা সে শীঘ্র ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। বাহিরের প্রভাব তাহাকে অনেক সময় বিকারের দিকে লইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়। সবল লোকের পক্ষে যাহা বলকারক স্বাস্থ্যজনক, রোগা লোকের পক্ষে তাহাও অনিষ্টকর হইতে পারে।

মোগলরাজত্বের সময়েও কি মুসলমানের অনুকরণ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হয় নাই। নিশ্চয়ই তাহাতে ভালোমন্দ দুইই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজিয়ানার নকলের সহিত তাহার একটি গুরুতর প্রভেদ ছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

মুসলমানরাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু -সভ্যতা পরস্পর জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল। এইজন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচারব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দুভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুলপরিমাণে পারসিক ও আরবি। আধুনিক হিন্দুসংগীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। চাপকান-জাতীয় সাজ যে মুসলমানের অনুকরণ তাহা নহে, তাহা উর্দুভাষার ন্যায় হিন্দুমুসলমানের মিশ্রিত সাজ; তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেখক লিখিয়াছেন, বিলাতিয়ানার মূল আদর্শ বিলাতে, ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে। সুতরাং এই আদর্শ আমরা অবলম্বন করিলে বরাবর তাহাকে জীবিত রাখিতে পারিব না, মূলের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকাতে, আজ না হউক কাল তাহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

বিলাতের যাহা-কিছু সম্পূর্ণ আমাদের করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে অন্যায় আত্মবিরোধ না ঘটে, চারি দিকের সহিত সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, যাহা আমাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগকে পোষণ করিতে পারে, ভারাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত না করে, তাহাতেই আমাদের বলবৃদ্ধি এবং তাহার বিপরীতে আমাদের আয়ুক্ষয়মাত্র।

সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে বোঝা। তাহার কাঠখড় অধিকাংশ বিলাত হইতে আনাইতে হয়, তাহার খরচ অতিরিক্ত। তাহা আমাদের সর্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাহাতে আমাদের নিজের আদর্শ, নিজের আশ্রয় নষ্ট করে, অথচ তৎপরিবর্তে যে-আদর্শ যে-আশ্রয় দেয়, তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে পারি না। তীর ছাড়িয়া যে-নৌকায় পা দিই, সে-নৌকার হাল অন্যত্র। মাঝে হইতে স্বেচ্ছাচার-অনাচার প্রবল হইয়া উঠে।

সেইজন্য প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের দেশী সাহেবিয়ানার মধ্যে কোনো ধ্রুব আদর্শ নাই; ভালোমন্দ শিষ্ট-অশিষ্টর স্থলে সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছা দখল করিয়া বসিয়াছে। কেহ-বা নিজের সুবিধামতে একরূপ আচরণ করে, কেহ-বা অন্যরূপ; কেহ-বা যেটাকে বিলাতি হিসাবে কর্তব্য বলিয়া জানে, দেশী সমাজের উত্তেজনার অভাবে আলস্যবশত তাহা পালন করে না; কেহ-বা যেটা সকল সমাজের মতেই গর্হিত বলিয়া জানে, স্বাধীন আচারের দোহাই দিয়া স্পর্ধার সহিত তাহা চালাইয়া দেয়। এক দিকে অবিকল অনুকরণ, এক দিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা। এক দিকে মানসিক দাসত্ব, অন্য দিকে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য। সর্বপ্রকার আদর্শচ্যুতিই ইহার কারণ।

এই আদর্শচ্যুতি এখনো যদি তেমন কুদৃশ্য হইয়া না উঠে, কালক্রমে তাহা উত্তরোত্তর কদর্য হইতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরেজের টাটকা সংস্রব হইতে নকল করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও যদি ইংরেজি সামাজিক শিষ্টতার বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষিত না হয়, তবে তাঁহাদের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে বিকার কিরূপ বিষম হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও লজ্জাবোধ হয়।

ব্যাজট্ বলেন, অনুকরণের প্রভাবে জাতি গঠিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা সংগত অনুকরণে— জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল অনুকরণে।

যে-জাতি অসংগত অনুকরণ করে—

ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি ধ্রুব নষ্টমেব চ।

১৩০৮

স্মৃতিরক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে বড়োলোকের মৃত্যু হইলে, তাহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টায় সভা করা হইয়া থাকে।[1] এই-সকল সভা যে বার বার ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যে দেশে কোনো-একটা চেষ্টা ঠিক একটা বিশেষ জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে চায় না, সে দেশে সেই চেষ্টাকে অন্য কোনো একটা সহজ পথ দিয়া চালনা করাই আমি সুযুক্তি বলিয়া মনে করি। যেখানে দরজা নাই কেবল দেয়াল আছে, সেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া লাভ কী।

আমাদের দেশে মানুষের মূর্তিপূজা প্রচলিত নাই। এই পৌত্তলিকতা আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু এখনো কৃতকার্য হইবার কোনো লক্ষণ দেখিতেছি না।

ইজিপ্ট মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপ মৃতদেহকে কবরে রাখিয়া যেন তাহা রহিল এই বলিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখে। যাহা থাকিবার নহে তাহার সম্বন্ধে মোহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলা আমাদের দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা লক্ষ্য।

অথচ য়ুরোপে বার্ষিক শ্রাদ্ধ নাই, আমাদের দেশে তাহা আছে। দেহ নাই বলিয়া যে যাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব তিনি নাই এ কথা আমরা স্বীকার করি না। মৃত্যুর পরে আমরা দেহকে সমস্ত ব্যবহার হইতে বর্জন করিয়া অনশ্বর পুরুষকে মানিয়া থাকি।

আমাদের এইপ্রকারের স্বভাব ও অভ্যাস হওয়াতে মানুষের মূর্তিস্থাপনায় যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করি না। অথচ আমাদের দেশে মূর্তিরক্ষার পরিবর্তে কীর্তিরক্ষা বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ মৃত্যুর পরে ইহলোকে মূর্তিরূপে নহে কীর্তিরূপে থাকে, এ কথা আমরা সকলেই বলি। "কীর্তির্যস্য স জীবতি" এ কথার অর্থ এই যে, যাঁহার কীর্তি আছে তাঁহাকে আর মূর্তিরূপে বাঁচিতে হয় না।

কিন্তু কীর্তি মহাপুরুষের নিজের ; পূজাটা তো আমাদের হওয়া উচিত। কেবল পাইব, কিছু দিব না সে তো হইতে পারে না।

তা ছাড়া মহাপুরুষকে স্মরণ করা কেবল যে কর্তব্য, তাহা তো নয়, সেটা যে আমাদের লাভ। স্মরণ যদি না করি, তবে তো তাঁহাকে হারাইব। যত দীর্ঘকাল আমরা মহাত্মাদিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্যরূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে।

বড়োলোককে স্মরণীয় করিবার একটা দেশী উপায় আমাদের এখানে প্রচলিত আছে, শিক্ষিতলোকে সে দিকে বড়ো-একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমাদের দেশে জয়দেবের মূর্তি নাই, কিন্তু জয়দেবের মেলা আছে।

যদি মূর্তি থাকিত, তবে এতদিনে কোন্ জঙ্গলের মধ্যে অথবা কোন্ কালাপাহাড়ের হাতে তাহার কী গতি হইত বলা যায় না। বড়ো জোর ভগ্নাবস্থায় ম্যুজিয়মে নীরবে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভয়ংকর বিবাদ বাধাইয়া দিত।

মূর্তি মাঠের মধ্যে বা পথের প্রান্তে খাড়া হইয়া থাকে, পথিকের কৌতূহল-উদ্রেক যদি হয় তো সে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখে, না হয় তো চলিয়া যায়। কলিকাতা শহরে যে মূর্তিগুলো রহিয়াছে, শহরের অধিকাংশ লোকই তাহার ইতিহাসও জানে না, তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে না।

একবার সভা ডাকিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের শিল্পীকে দিয়া অনুরূপ হউক বা বিরূপ হউক একটা মূর্তি কোনো জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া গেল, তার পরে ম্যুনিসিপ্যালিটির জিম্মায় সেটা রহিল ; ইহা মৃত মহাত্মাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে 'থ্যাঙ্কস্' দিয়া বিদায় দেওয়ার মতো কায়দা।

১ তুলনীয় 'বারোয়ারি-মঙ্গল', 'ভারতবর্ষ'— রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড (সুলভ দ্বিতীয়), 'শোকসভা'— পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড (সুলভ পঞ্চম)।

তাঁহার নামে একটা লাইব্রেরি বা একটা বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেও কিছুদিন পরে নানা কারণে তাহা নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু মেলায় যে-স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এক কাল হইতে অন্য কাল পর্যন্ত ধনী-দরিদ্রে পণ্ডিতে-মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না, ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিতসমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশী উপায়ে খর্ব না করিয়া, ব্যর্থ না করিয়া, কেবল নগরের কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশপ্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি।

১৩১২

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখন মনে করি নাই যে, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শনে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। বিশেষত উক্ত প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখেই পঠিত হয়। সেখানে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই ; বরং যতদূর জানা গিয়াছিল অনেকেই অনুকূলভাবে লেখকের মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অবশেষে উক্ত প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হইলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাঠক উহা ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং কলেজের অনেক পুরাতন ছাত্রের নিকট উহার ঐকমত শুনা যায়। বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যাঁহাদের হৃদয়নিকুঞ্জে প্রিয়স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত লোকের মুখে তাহার কোনোরূপ অমর্যাদার কথা শুনিলে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অতএব বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি। কেবল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা গৌরবস্থল এমন অনেক মহোদয়ের উৎসাহবাক্যে আমি নিজের লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইতেছি।

তর্কের আরম্ভেই যখন মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন হয়, তখন সেই নিষ্ফল বাক্‌যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই সুবুদ্ধিসংগত। সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না, এরূপ তর্কও সেইমত রুদ্রমূর্তি ধারণ করে কিন্তু শীতল শান্তিবারি বর্ষণ না করিয়াই বায়ুবেগে উড়িয়া যায়।

ভাষা একে অসম্পূর্ণ, তাহাতে তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পাঠক সাধারণেরও পূর্বাপর মিলাইয়া দেখিবার অবসর নাই, সেই কারণে প্রতিবাদমাত্রেই তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং 'শিক্ষাসঙ্কট'[২] প্রবন্ধে আমাদের যে-সকল কথার যথার্থ অর্থনির্ণয় হয় নাই তাহার পুনরবতারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

১ দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)

২ শিক্ষাসঙ্কট। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৭শ ভাগ

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে:

আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন। সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কেন বর্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন বলিতে পারি না।

দোষ যে কে কাহার ঘাড়ে কেন চাপায় বোঝা শক্ত; অবশেষে অদৃষ্টকেই দোষী করিতে হয়। আমি যে ঠিক পূর্বোক্তভাবে কথা বলিয়াছি এ দোষ আমার ঘাড়েই বা কেন চাপানো হইল তাহা কে বলিতে পারে।

আমি কেবল বলিয়াছিলাম আমাদের দেশে শিশুদের স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ নাই। ইংরেজের ছেলে কেবল যে ভূগোল এবং জ্যামিতির সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মরে তাহা নহে, বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতিহাস পড়িতে পায়। বিশেষত তাহারা স্বভাষায় শিক্ষালাভ করে বলিয়া পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যতটুকু সাহিত্যরস থাকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কায়ক্লেশে কেবলই শিক্ষণীয় বিষয়ের শুষ্ক অংশটুকু মুখস্থ করিয়া যায়।

এ স্থলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলি নাই।

মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলাভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ঐ দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং অনভ্যস্ত ভাষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে স্বভাবতই তাহারা বিমুখ হয়, এবং ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য, অতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের ছেলেদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে; এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।

আমি বলিয়াছিলাম ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে-সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে-সকল কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্বদা প্রবাহিত, যে-সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমি যখন বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার এমন অর্থ নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কাজ বা অকাজ করিতেছে না এবং ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কোনো উপকার বা অপকার হয় নাই। আমার কথার অর্থ এই ছিল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কাল যদি ইংরেজ দেশ হইতে চলিয়া যায় তবে ঐ বড়ো বড়ো সৌধগুলি কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না।

ইংরেজিশিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন

করিয়া গভীর ও স্থায়ী -রূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে, এই ইচ্ছা যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদাহরণের দ্বারা বলা বাহুল্য যে, পূর্বে 'বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু' এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের অন্য কারণ প্রচার করিতেছে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ভূমিকম্পের কাল্পনিক হেতুনির্ণয়ের মূলোচ্ছেদন করিতে হইলে ইংরেজিশিক্ষাকে সহজ স্বাভাবিক ও সাধারণের আয়ত্তগম্য করিতে হইবে, যাহাতে শিশুকাল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে বহুব্যয়ে ও সাংঘাতিক চেষ্টায় তাহাকে ক্রয় করিতে না হয়, যাহাতে অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশ সুলভ হয়। নতুবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বাসুকির গাত্রকণ্ডু ভূমিকম্পের কারণরূপে ফিরিয়া দেখা দেয় এমন উদাহরণের অভাব নাই।

'ইংরাজিশিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত' ইংরেজিশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যে কথা[১] বলিয়াছেন 'শিক্ষাসঙ্কট' প্রবন্ধে তাহার উচিত অর্থ গ্রহণ হয় নাই, আমার এই বিশ্বাস। শিক্ষাটা কতদূর হয় বা না-হয়, ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও তিনি বলেন নাই যে, পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে লোক ঘুষ অধিক লইতেছে অথবা জাল করিতে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল এই বলিয়াছেন যে, বর্তমান প্রণালীতে ছাত্রেরা কেবল যে ভালো শেখে না তাহা নহে পরন্তু ভুল শেখে। কিন্তু প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন পদ অবলম্বন করিয়া সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাকালে লোকে ঘুষ লইত, জালিয়াতকে আশ্রয় দিত, এবং বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করিত।

লেখক আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি তো ইংরেজিশিক্ষা নিষ্ফল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত।

—যদি সত্যই আমি এইমাত্র বলিতাম তবে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইতাম বলা শক্ত ; তবে এখনকার ছেলেরা আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত, এবং বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু ও আনন্দমোহন বসু মহাশয় কখনোই আমার লেখার তিলমাত্র অনুমোদন করিতেন না।

লেখক সর্বশেষে বলিয়াছেন :

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর-একটি ভাব মনে উদয় হয়— সন্দেহ উঠে যে, লেখকগণ হয়তো অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক— এটা ভারতবর্ষ, ইংলন্ড নয়।

আমরা ঠিক সেই কথাটাই ভুলি না ; আমরাই বারংবার বলিতেছি, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এখানকার দেশী ভাষা বাংলা, ইংরেজি নহে। যদি কর্ষণ করিয়া সম্যক্ ফললাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বাংলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক 'কালচার' হইবে না।

আমরা এ কথা স্বপ্নেও ভুলি না যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এইজন্যই আমরা বাংলায় যাহা পাই তাহাকেই বহুমান্য করি ; ইংরেজির সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে হতাদর করিবার চেষ্টা করি না। এইজন্যই আমরা বাঙালির শিক্ষাসাধনের ভার কতক পরিমাণে বাংলার প্রতিও অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এইজন্যই আমরা মনে করি, ইংরেজিশিক্ষা বাংলাভাষার মধ্যে যে-পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান হইবার সম্ভাবনা।

বাংলার শস্য, বাংলার ভাষা, বাংলার সাহিত্যের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং একান্ত বিশ্বাস আছে, এ কথায় যাঁহাদের 'সন্দেহ' হয় তাঁহারা পুনর্বার ধীরভাবে আলোচ্য প্রবন্ধগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এবং যদি কোথাও দৈবক্রমে কোনো একটি বা দুটি কথায় কোনো ত্রুটি বা কোনো অলংকারদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন ; কারণ, আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।

১৩০০

১ শিক্ষাপ্রণালী। সাধনা, মাঘ ১২৯৯

প্রসঙ্গকথা

১

অল্পকাল হইল বাংলাদেশের তৎসাময়িক শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জিসাহেবকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দুরবস্থা উপলক্ষে নিজের সম্বন্ধে করুণা, স্বদেশ সম্বন্ধে আক্ষেপ, এবং স্বদেশীয়ের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে একটা নালিশের সুর ছিল। বাদী ছিলেন তিনি, প্রতিবাদী ছিল তাঁহার অবশিষ্ট স্বজাতিবর্গ এবং জজ ও জুরি ছিল ম্যাকেঞ্জিপ্রমুখ রাজপুরুষগণ। এ বিচারে আমাদের নিরপরাধে খালাস পাইবার আশামাত্র ছিল না।

কবুল করিতেই হইবে, আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত— অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য -বশত লজ্জাবোধও আমাদের নাই। কিন্তু সেই অপরাধখণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়োলোকদের উপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামীশ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। নালিশ করিবার লোক ঢের আছে এবং বাঙালির নামে নালিশ শুনিবার লোকও রাজপুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে।

প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্যজাতিটা খুব শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; তথাপি ইতিহাসের আরম্ভভাগ হইতেই দেখা যায় মনুষ্যের উপকার করা সহজ কাজ নহে। যাঁহারা ইহাকে বিপুল চেষ্টা ও সুদীর্ঘ সময় -সাধ্য বলিয়া না জানেন তাঁহারা যেন সাধারণের উপকার করার কাজটায় হঠাৎ হস্তক্ষেপ না করেন। যদি করেন তবে অবশেষে পাঁচজনকে ডাকিয়া বিলাপ পরিতাপ ও সাধারণের প্রতি দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। তাহা দেখিতেও শোভন হয় না, তাহার ফলও নিরুৎসাহজনক, এবং তাহাতে গৌরবহানি ঘটে।

অবশ্য সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি মহেন্দ্রবাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ আছে এবং সেই অনুরাগের টানে তিনি অনেক করিয়াছেন। কিন্তু অনেক করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ না করিয়া তাঁহাকে যে আরো অনেক করিতে হয় নাই সেজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত ছিল। বিজ্ঞানপ্রচারের উৎসাহে কোনো মহাপুরুষ জেলে গিয়াছেন, কোনো মহাপুরুষকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। বড়োলোক হইয়া বড়ো কাজ করিতে গেলে এরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে।

মহেন্দ্রবাবুর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিয়া তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ফল অনেকে হইয়াছেন। ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্যন্ত সমস্ত বঙ্গদেশে এমন কয়টা অনুষ্ঠান আছে যে নিজের ঘর-দুয়ার ফাঁদিতে পারিয়াছে, বহুব্যয়সাধ্য আসবাব সংগ্রহ করিয়াছে, যাহার স্থায়ী অর্থের সংস্থান হইয়াছে, এবং যাহার সভাপতি দেশের ছোটোলাট বড়োলাট সাহেবকে সম্মুখে বসাইয়া নিজের মহৎ ত্যাগস্বীকার ঘোষণাপূর্বক অশ্রুপাত করিবার দুর্লভ অবসর পাইয়াছে। যতটা হইয়াছে বাঙালি তাহার জন্য ডাক্তার সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেজন্য তিনিও বাঙালির নিকট কতকটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতেন।

বড়োলোকেরা বড়ো কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা আলাদিনের প্রদীপ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁহারা রাতারাতি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের নাম ছোটোখাটো আলাদিনের প্রদীপবিশেষ। সেই প্রদীপের সাহায্যে এবং ডাক্তার সরকারের নিজের নাম ও চেষ্টার জোরে এই বিজ্ঞানচর্চাবিহীন বঙ্গদেশে অকস্মাৎ পাকা ভিত এবং যন্ত্রতন্ত্রসহ এক সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া পড়িল। ইহাকে একপ্রকার ভেলকি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবজগতে আরব্য উপন্যাস অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভেলকির জোরে জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা সম্ভব নহে। আজ প্রায় সিকি শতাব্দীকাল

বাংলাদেশে বিজ্ঞানের জন্য একখানা পাকাবাড়ি, কতকগুলি আসবাব এবং কিঞ্চিৎ অর্থ আছে বলিয়াই যে বিজ্ঞান আপনা-আপনি গোকুলে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। আরো আসবাব এবং আরো টাকা থাকিলেই যে বিজ্ঞান আরো ফুলিয়া উঠিবে এমনও কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম দেখা যায় না।

অবশ্য, দেশ কাল পাত্র সমস্তই ষোলো-আনা অনুকূল যদি হয় তবে তাহার মতো সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সর্বত্রই প্রায় কোনো-না কোনোটা সম্বন্ধে টানাটানি থাকেই ; আমাদের এ দরিদ্র দেশে তো আগাগোড়াই টানাটানি। অন্তত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনই কাল, তেমনই পাত্র। এখানে সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মতো ছুটিতে থাকিবে, অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না। গাড়ি চলে না বলিয়া দেশাধিপতির নিকট দেশের নামে নালিশ রুজু না করিয়া আপাতত রাস্তা বানাইতে শুরু করা কর্তব্য।

রাস্তা বানাইতে গেলে নামিয়া আসিয়া একেবারে মাটিতে হাত লাগাইতে হয়। আমাদের দেশের বড়োলোকদের নিকটে সে-প্রস্তাব করিতে সংকোচ বোধ করি, কিন্তু অগত্যা না করিয়া থাকা যায় না। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে-ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রাসাদবাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ হইত।

নালিশ এই যে বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্তমত খোরাকি এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম নিরর্থক, ধর্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থবিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দিক অনুন্নত সেখানে সংকীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অদ্য ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহার তিন দিনের উপনয়ন ব্রহ্মচর্যের বিদ্রূপমাত্র, তাহার মন্ত্রার্থজ্ঞানহীন সংস্কার বর্বরতা। তাহার কারণ, অশিক্ষিত বিপুলবিস্তৃত শূদ্রসম্প্রদায় আপন দূরব্যাপী প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মণ্যের উচ্চশিরকে ধূলিসাৎ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

অদ্য ইংরেজিশিক্ষিতগণ কিয়ৎপরিমাণে সেই ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণের কাছে ইংরেজিভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজিভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ।

তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোনো চর্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জনের উপায়রূপে।

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই স্বল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের জন্য আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে ; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অথচ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বাঙালি বিশেষ উদ্যোগী হইতেছে না, এ আক্ষেপ তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর

হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞানঘেঁষা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন। যেমন পাথুরে জমির উপর আধহাতখানেক পুষ্করিণীর পাঁক তুলিয়া দিয়া তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে গাছটা প্রথম প্রথম খুব ঝাড়িয়া মাথা তুলিয়া ডালেপালায় গজাইয়া উঠে, অবশেষে শিকড় যেমনি নীচের কঠিন স্তরে গিয়া ঠেকে অমনি অকস্মাৎ মুষড়িয়া মরিয়া যায়— আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষারও সেই অবস্থা।

ঘরে-বাইরে চারি দিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এ দেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা আপাতত দুইদিনের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই— কেননা, চারি দিকের দিগন্তপ্রসারিত মূঢ়তা দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ এই ভিত্তির সংকীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য।

অথচ বাংলাভাষায় ইংরেজি-অনভিজ্ঞদের কাছে বিজ্ঞানপ্রচারের কোনো উপায় এ দেশে নাই। ইহা ব্যয়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য, ইহাতে আশু ফললাভের আশাও নাই— কোনো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত উৎসাহ রক্ষার উপযোগী কোনো উত্তেজনা ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে অর্থনাশ ছাড়া অর্থাগমেরও সম্ভাবনা অল্প। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ— বিজ্ঞানের যাথাতথ্য রক্ষাপূর্বক তাহাকে জনসাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া সরলভাষায় প্রকাশ করাও শক্ত।

অতএব যেমন করিয়াই দেখি সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় সামর্থ্যশালী বিশেষ সভার দ্বারাই এই কার্য সম্ভবপর বোধ হয়। ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য অনেক ইস্কুল কলেজ আছে, তাহার গ্রন্থ ও আচার্যের অভাব নাই। এমন-কি, যাঁহারা ইংরেজিতে বিজ্ঞানশিক্ষা সমাধা করিতে চান তাঁহারা বিলাতে গিয়াও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু নানা কারণে ইংরেজিশিক্ষায় বঞ্চিত আমাদের অধিকাংশ, আমাদের সর্বসাধারণ, আমাদের প্রকৃত দেশ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারাও উপেক্ষিত ; অথচ এমনই দৈব বিড়ম্বনা, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই দেশের নামে অবহেলার অভিযোগ আনিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ায় কার্য যথোচিতরূপে অগ্রসর হইতেছে না। এই কার্যে সাহিত্যপরিষদের সহিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের যোগ দেওয়া কর্তব্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিজের উপযোগিতা উপকারিতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করা আবশ্যক। তবেই দেশের সহিত সভার দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র বিলাপের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এমন-কি, রাজপ্রতিনিধির মধ্যস্থতা দ্বারাও বেশি কিছু হইবে না। রাজা সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে সফল করিতে পারেন না।

যাহাই হোক, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি যথার্থ পথে কাজ করিতে অগ্রসর হন তবে তাঁহার ভর্ৎসনা সহিতে আমরা প্রস্তুত আছি ; কিন্তু কাজও করিবেন না, চোখও রাঙাইবেন, দেশকে দূরে রাখিবেন অথচ সাহেবকে ডাকিয়া দেশের নামে নালিশ করিবেন, ইহার অপরূপ সৌন্দর্যটুকু আমরা দেখিতে পাই না।[১]

১৩০৫

১ তুলনীয় "বিজ্ঞান সভা": পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)

২

বর্তমানসংখ্যক 'ভারতী'তে 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙালি ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।[১] তাঁহার প্রস্তাবটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন।

ইতিহাসের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মতো বাড়িয়া চলে ; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি— যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না, কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।

কেহ কেহ এইরূপ প্রাত্যহিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতি বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে এবং সেই ঘটনার বিবরণে সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা আমরা না পাইতেও পারি কিন্তু তৎসাময়িক অনেক লোকের মনে তাহা কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে-পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ-উপকরণমূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমাণ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুই সাক্ষীর মধ্যে কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব তাহা অনেক সময়ে কেবলমাত্র বিচারকের স্বভাব ও পূর্বসংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরেজ মিথ্যা বলে না, ইংরেজ জজ ইহা কতকটা স্বভাবত এবং কতকটা টানিয়াও বিশ্বাস করেন ; এই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস -বশত তাঁহারা অন্যদেশীয়দের প্রতি অনেক সময়ে অবিচার করিয়া থাকেন, তাহা ইংরেজ ব্যতীত আর-সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

ইতিহাসে এইপ্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাসপাঠে পীড়ন কেন সহ্য করিব। আমরা যে-ইতিহাস সংকলন করিব, তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না ; কিন্তু ইতিহাসের যে-অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে, সে-অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

তাহা ছাড়া ইতিহাস একতরফা না হইয়া দুইতরফা হইলে সত্যনির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক এক ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্য ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন, তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।

যাহা হউক, বিদেশীলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় হইতেছে না। কোনো ইতিহাসই কোনোকালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও ভূরি ভূরি চিরপ্রচলিত দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।

লেখকমহাশয় আমাদের দেশীয় ইতিহাস সমালোচন ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড়ো-একটা বিশ্বাস নাই। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের দেশের মাটিতে শিব গড়িতে গিয়া কিরূপ লজ্জা পাইতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভা নামক বড়ো শিব গড়িতে গিয়া আরো কি বড়ো প্রহসনের সম্ভাবনা নাই।

যে দেশে কোনো-একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লেখকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে, সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে দেশে উৎসাহী লোক স্বল্প সে দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, সে সভায় অধিকাংশ বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব করিয়া দেয় মাত্র।

আমরা লেখকমহাশয় ও তাঁহার দুই-চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ-সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্ত -দ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে।

সমবেত চেষ্টার জন্য উৎসাহী অনুরাগী লোকমাত্রেরই মন কাঁদে। মানুষ কাজ করিবার যন্ত্র নহে— অন্য পাঁচজন মানুষের সহিত মিশিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি, সমাদর ও উৎসাহ -দ্বারা বললাভ প্রাণলাভ করিতে হয়; জনহীন শূন্য সভায় একা দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র কর্তব্য করিয়া যাওয়া বড়ো কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে যাঁহারা কোনো মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই।

বিনা আড়ম্বরে বিনা ঘোষণায় 'ঐতিহাসিক চিত্রাবলী' নামক যে কয়েকটি মূল্যবান ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই আমাদের বিপুল আশার কারণ। যাঁহারা "সিরাজদ্দৌল্লা" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সভার দ্বারা তেমন কাজ হয় না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।

১৩০৫

প্রাইমারি শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বাংলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগ-অনুসারে চাররকমের গ্রাম্য উপভাষা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে এ কথা সকলেই জানেন।[১]

এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কাগজে পত্রে তাহা নানাপ্রকারে বলা হইয়া গেছে; কিন্তু দেশের উৎকণ্ঠা ঘুচিতেছে না। আমাদের পক্ষে যুক্তি আছে বলিয়া যে জয়ও আমাদের দিকে, তাহা আশা করা কঠিন।

আমরা দেখিয়াছি গবর্মেন্টের কোনো প্রস্তাবে আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত বেশি আপত্তি করিলে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করিতে গবর্মেন্ট যেন আরো বেশি নারাজ হন।

ইহার অনেকগুলা কারণ আছে। প্রথমত, আমরা যেটাকে অনিষ্ট বলিয়া মনে করি, সরকারের শাসননীতির পক্ষে যে-কোনো কারণে সেইটেই যদি ইষ্ট হয়, তবে আমাদের তরফের সমস্ত যুক্তিগুলা তাঁহাদের সংকল্পকেই সবল করিবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের ভয় হয়, পাছে আমাদের দোহাই শুনিয়া কোনো সংকল্প হইতে নিরস্ত হইলে প্রজার কাছে প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, প্রবল পক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের কতদূর পর্যন্ত যে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

অতএব আমরা সকলে মিলিয়া আপত্তি তুলিয়াছি বলিয়া সেটা যে আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

১ তুলনীয়— 'সফলতার সদুপায়' প্রসঙ্গ— গ্রন্থপরিচয়, প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড (সুলভ দ্বিতীয়)

না তুলিলেই যে বিশেষ আশার কারণ হইত, তাহাও বলিতে পারি না। হতভাগ্যের পক্ষে কোন্‌টা যে সৎপথ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

তথাপি মোটের উপর, কমিটির প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে যে ভয়ের কারণ আছে, আমার তাহা মনে হয় না। সেইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

ভাবিয়া দেখো-না, চাষার ছেলে প্রাইমারি স্কুলে কেন যায়। ভালো করিয়া চাষার কাজ শিখিতে যে যায়, তাহা নহে। গুরুমশায় যে তাহার ছেলেকে কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ করিতে পারে, এ কথা শুনিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।

তার পরে, প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়া তাহার ছেলে ডাক্তারও হইবে না, উকিলও হইবে না, কেরানিও হইবে না। প্রাইমারির পরে যদি তাহার ছাত্রবৃত্তি পড়ার শখ থাকে, তবে উপভাষা ছাড়িয়া আবার তাহাকে সাধুভাষা শিখিতে হইবে।

যাই হোক, যে-চাষা তাহার ছেলেকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠায়, তাহার একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তাহার ছেলে নিতান্ত চাষা না থাকিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ভদ্রসমাজ-ঘেঁষা হইবার যোগ্য হয়; চিঠিটা পত্রটা লিখিতে পারে, পড়িতেও পারে, জমিদারের কাছারিতে দাঁড়াইয়া কতকটা ভদ্রছাঁদে মোক্তারি করিতে পারে, গ্রামের মোড়লি করিবার যোগ্য হয়, ভদ্রলোকের মুখে শুনিতে পায় যে, "তাই তো রে, তোর ছেলেটা তো বলিতে-কহিতে বেশ!"

চাষা একটু সম্পন্ন অবস্থার হইলেই ভদ্রসমাজের সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়া বসিতে তাহার স্বভাবতই ইচ্ছা হয়। এমন-কি, তাহার ছেলে একদিন হাল-লাঙল ছাড়িয়া দিয়া বাবুর চালে চলিবে এ সাধও তাহার মনে উদয় হইতে থাকে। এইজন্য সময় নষ্ট করিয়াও, নিজের ক্ষতি করিয়াও ছেলেকে সে পাঠশালায় পাঠায় অথবা নিজের আঙিনায় পাঠশালার পত্তন করে।

কিন্তু চাষাকে যদি বলা হয়, তোর ছেলেকে তুই চাষার পাঠশালায় পাঠাইবি, ভদ্রের পাঠশালায় নয়, তবে তাহার উৎসাহের কারণ কিছুই থাকিবে না। এরূপ স্থলে ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যই তাহার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

শুধু তাই নয়। পল্লীর মধ্যে চাষার পাঠশালাটা চাষার পক্ষে একটা লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। কালক্রমে ভাগ্যক্রমে যে-চাষাত্ব হইতে তাহারা উপরে উঠিবার আশা রাখে, সেইটাকে বিধিমত উপায়ে স্থায়ী করিবার আয়োজনে, আর যেই হউক চাষা খুশি হইবে না।

ওষুধ বলিতে যেমন তিক্ত বা ঝাঁঝালো কিছু মনে আসে, তেমনই শিক্ষা বলিতে চাষা এমন একটা কিছু বোঝে যাহা তাহার প্রতিদিনের ব্যাপার-সংক্রান্ত নহে। তাহার কাছে শিক্ষার গৌরবই তাই।

তাহার ছেলে যদি এত করিয়া পাঠশালে গিয়া তাহাদের অভ্যস্ত গ্রাম্যভাষা এবং তাহাদের নিজের ব্যবসায়ের সামান্য দুটো কথা শিখিতে বসে, তবে সে-শিক্ষার উপরে চাষার অশ্রদ্ধা হইবেই।

চাষা সাধুভাষা ব্যবহার করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধুভাষা যে তাহার অপরিচিত তাহা নহে। যাত্রায়, গানে, গ্রন্থশ্রবণে নানারূপেই সাধুভাষা তাহার কানে পৌঁছিয়া থাকে, ভদ্রদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় সেও যথাসাধ্য এই ভাষার মিশাল চালাইতে চেষ্টা করে।

তাহার ছেলেকে বিশেষ শিক্ষার দ্বারা যখন সেই ভদ্রভাষা ভুলাইবার চেষ্টা করা হইবে, তখন চাষা যে তাহা বুঝিবে না তাহা নহে, বুঝিয়া যে খুশি হইবে তাহাও বলিতে পারি না।

'observer, thinker and experimenter' কাহাকে বলে তাহা চাষা বুঝে না, কিন্তু ভদ্র এবং অভদ্র কাহাকে বলে তাহা সে বুঝে। অতএব যাহা কিছুই বুঝে না তাহার প্রলোভনে, যাহা বুঝে তাহার আশা প্রসন্ন মনে বিসর্জন দিবে, চাষা এতবড়ো চাষা নহে।

এই-সকল কারণে আশা করিতেছি, চাষার সদ্‌বুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষাকমিটির গুপ্তবাণ হইতে রক্ষা করিবে।

১৩১২

পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি

বৈশাখের ভাণ্ডারে যে-প্রশ্ন[১] তোলা হইয়াছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের পব্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃতসাধারণের যোগ রক্ষার উপায় কী— দেশের নানা বিশিষ্ট লোকের[২] কাছ হইতে তাহার উত্তর পাওয়া গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের আধুনিক উদ্‌যোগগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবু মোটের উপর তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে কোনো অনৈক্য নাই।

তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন যে, প্রাকৃতসাধারণকে আমাদের পব্লিক উদ্‌যোগে আহ্বান করা এখন চলে না। আগে তাহাদের শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত করা চাই।

তাহার কারণ ইঁহারা বলিতেছেন, দেশ বলিতে কী বুঝায় তাহা দেশের সাধারণ লোকে বুঝে না, এবং দেশের হিত যে কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাও ইহাদের বুদ্ধিতে আসিবে না। অতএব, ইস্কুল করিয়া এবং অন্য পাঁচরকম উপায়ে ইহাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দেওয়া চাই।

কথাটা একটা বড়ো কথা, প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই, তার পরে কাজে লাগিতে হইবে।

ভাণ্ডারের পরীক্ষায় এটা দাঁড়াইতেছে যে, মতের মিল হইয়াছে। কিন্তু কর্তব্যসম্বন্ধে মতের মিল হওয়া সহজ, উপায় সম্বন্ধে মিল হওয়াই কঠিন।

তবু কাজ আরম্ভ করিতে হইলে কাজের কথা পাড়িতেই হইবে, কোথায় কী বিঘ্ন আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে চলিবে না।

আমরা দেখিতেছি, গবর্মেন্ট আমাদের দেশের প্রাকৃতসাধারণের শিক্ষার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। ইহাও দেখিতেছি, সেইসঙ্গে তাঁহারা ভারি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, দেশের লোক রোগে এবং দুর্ভিক্ষে একেবারে অবাধে মারা পড়িতেছে। ইহাতে তাঁহাদের শাসনকার্যের একটা ভারি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজার অন্নবস্ত্র এবং প্রাণটা বাঁচানো কেবল যে প্রজার হিত তাহা নহে, তাহা রাজারও স্বার্থ।

কর্তারা মনে করিতেছেন, চাষারা যদি আর-একটু ভালো করিয়া চাষ করিতে শেখে এবং স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া চলিবার উপদেশ পায়, যদি সাধারণ হিসাবপত্রটা লিখিয়া জমিদার ও মহাজনের অন্যায় প্রবঞ্চনার হাত এড়াইতে পারে, তবে তাহাতে দেশের যতটুকু শ্রীরক্ষা হইবে, তাহাতে প্রজার লাভ এবং রাজারও লাভ। অতএব গোড়ায় তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

কিন্তু শিক্ষা-জিনিসটাকে একদিকে একবার শুরু করিয়া দিলে তার পরে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত। বিদেশী রাজার পক্ষে সেটা একটা বিষম ভাবনা। প্রজা বাঁচিয়া-বর্তিয়া থাকে, এটা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বাঁচার চেয়েও যদি বেশি অগ্রসর হইয়া পড়ে, তবে সেটা তাঁহার প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এইজন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানারকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভালো নয়— শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

১ প্রশ্নকর্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল— ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১২

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে ; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তাহাদের ভাষা শিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।

অতএব প্রথমেই দেখিতেছি, আমরা চাষাদের শিক্ষালাভ হইতে দেশের যে সুবিধাটা আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সেটাকে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমাদের দেশহিতৈষীরা যদি মনে করেন, সরকারের কর্তব্য দেশের সাধারণ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের কর্তব্য তৎসম্বন্ধে রেজোল্যুশন পাস করা, তবে এ কথাটা আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, সরকারের হাতে শিক্ষার ভার দিলে সে-শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই চেষ্টা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেখিবেন না। তাঁহারা চাষাকে গ্রামের চাষা রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে ভারতবর্ষের অধিবাসী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মতলবমত শিক্ষা দিতে পারিব— ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েশও দিব, এ কখনো হয় না। ইংরেজিতে একটি চলতি কথা আছে, দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

আমাদের নিজের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিজেরা করিব, এ কথা তুলিলেই আপত্তি এই উঠে যে, আমাদের পাঠশালার শিক্ষায় অন্নের সংস্থান কেমন করিয়া হইবে। সরকার যদি এমন কথা বলেন, সরকারি বিধানের ছাঁচে বিদ্যালয় না বানাইলে সেখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আমরা উমেদারির বেলা আমল দিব না, তবে আমরা কী উপায় করিব।

এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উত্তর দিবার পূর্বে প্রশ্নের বিষয়টাকে পরিষ্কার করিয়া সম্মুখে ধরা যাক।

প্রথম কথা— দেশের কাজে দেশকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে গোড়ায় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা— শিক্ষার যদি একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, দেশের লোককে দেশের কাজে যোগ্য করা, তবে স্বভাবতই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হইবে না।

তৃতীয় কথা— যদি তাহা না হয় তবে পরের বাঁধা-চালে কতকগুলা বিদ্যালয় বানাইয়া বিদেশের শাসনে স্বদেশের সরস্বতীকে জিঞ্জির পরাইলে বিশেষ ফললাভ প্রত্যাশা করা চলিবে না। শিক্ষাপ্রণালীকে সকল প্রকারেই স্বদেশের মঙ্গলসাধনে উপযোগী করিবার জন্য দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার।

শেষ কথা— তাহার বাধা এই যে, অন্নের দায়ে বিদ্যা সরকারের দ্বারে বাঁধা পড়িয়াছে। সে বন্ধন না কাটিলে বিদ্যাকে স্বাধীন করিব কী উপায়ে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, বাধা যে শুধু এইমাত্র, তাহা নহে। দেশের যে-কোনো একটা মঙ্গলসাধনের ভার নিজের হাতে লইতে গেলে যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন, আমরা যে ততদূর প্রস্তুত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি-বা প্রস্তুত হই, তবে গোড়াতেই যে বিঘ্নটা আছে, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন ও চিন্তা করা উচিত বোধ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ইহার বিচার প্রার্থনা করি। আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, দেশকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষিগণ 'ভাণ্ডারে' তাহারই আলোচনা উপস্থিত করুন।

১৩১২

বিজ্ঞানসভা

স্বর্গগত মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় গবর্মেন্টের উৎসাহে ও দেশের লোকের আনুকূল্যে একটি বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া গেছেন।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারই এই সভার উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের লোকহিতকরী সভাগুলির মতো এ সভাটি নিঃস্ব নয়। ইহার নিজের চালচুলা আছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, দেশে বিজ্ঞানচর্চার তেমন ভালোরকম সুযোগ জুটিতেছে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্প্রতি কিছু বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে আমরা পরাধীন, তাহার 'পরে আমরা অধিক ভরসা রাখি না। আমাদের ছেলেদের যে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, সেখান হইতে এমন খোঁটা খাইবার সম্ভাবনা আমাদের আছে।

বিজ্ঞানচর্চাসম্বন্ধে দেশের এমন দুরবস্থা অথচ এই বিদ্যাদুর্ভিক্ষের মাঝখানে বিজ্ঞানসভা তাঁহার পরিপুষ্ট ভাণ্ডারটি লইয়া দিব্য সুস্থভাবে বসিয়া আছেন।

সেখানকার হলে মাঝে মাঝে লেকচার হইয়া থাকে জানি— সেটা কলেজের লেকচারের মতো— তেমন লেকচারের জন্য কোনো বিশেষ বন্দোবস্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এটুকু নিঃসন্দেহ যে, বিজ্ঞানসভা নাম ধরিয়া একটা ব্যাপার এ দেশে বর্তমান এবং তাহার যন্ত্রতন্ত্র-অর্থসামর্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে।

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্না দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া বেড়াই— কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সে দিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না। আমাদের অভাবের মাঝখানে এই যে বিজ্ঞানসভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ইহার কি ঘুম ভাঙাইবার সময় হয় নাই।

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন। দেশের বিজ্ঞানসভা দেশের বিজ্ঞানবীরদের মুখের দিকে তাকাইবেন না ? ইহাতে কি তাঁহার লেশমাত্র গৌরব বা সার্থকতা আছে।

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানপণ্ডিত, দেশের ভাষায় দেশের লোকের কাছে বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সেজন্য তাঁহাদের নাম থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞানসভা কী করিলেন।

দেশের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগকে ও সুযোগ্য অনুসন্ধিৎসুদিগকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দান করা, ও দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুগম করিয়া দেওয়া, বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশে বিজ্ঞানসভার এই দুটি মস্ত কাজ আছে ; ইহার মধ্যে কোনোটাই তিনি করিতেছেন না।

কেহ যেন না মনে করেন যে, আমি বিজ্ঞানসভার সম্পাদক প্রভৃতিকে এজন্য দায়ী করিতেছি। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার ভার তাঁহাদের উপরে আছে মাত্র। কিন্তু সভা যে আমাদের সকলের। ইহা যদি সমস্ত আয়োজন উপকরণ লইয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। ইহাকে কাজে লাগাইবার কর্তা আমরা সকলেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহে।

আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকার লইবার জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানসভার

মতো ব্যাপারগুলি দেশের জমি জুড়িয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকিলে প্রতিদিন প্রমাণ হইতে থাকে যে, আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকারী নহি। কারণ, যে অধিকার আমাদের হস্তে আছে তাহাকে যদি ব্যর্থ করি, তবে যাহা নাই তাহাকে পাইলেই যে আমরা চতুর্ভুজ হইয়া উঠিব এ কথা স্বীকার করা যায় না।

এই কারণে বিজ্ঞানসভার মতো কর্মশূন্য সভা আমাদের জাতির পক্ষে লজ্জার বিষয়। ইহা আমাদের জাতির পক্ষে নিত্য কুদৃষ্টান্ত ও নিরুৎসাহের কারণ।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিজ্ঞানসভা যখন আমাদের দেশের জিনিস, তখন ইহাকে হাতে লইয়া ইহার দ্বারা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব দেশের কাজ করাইয়া, স্বজাতির অন্তত একটা জড়তা ও হীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণকে দূর করিয়া দিতে যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করি।[১]

১৩১২

ইতিহাসকথা

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে— একমাত্র পুরাণকথার ভিতর দিয়া সকল প্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই-সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনোই ঘটিবে না। তা ছাড়া ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সব চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কী করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কী করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ-সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিতলোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজকর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমন-কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।

আজকাল য়ুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাসশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়— এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই চলিত আছে— য়ুরোপ আজ সেইরূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে, আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞানপ্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে

১ তুলনীয় প্রসঙ্গকথা (১)— রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)

পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জিত ইস্কুলশিক্ষার শরণ লইব।

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্যপ্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি— কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্যে দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন-কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজি, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন। এমন-কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন।

১৩১২

স্বাধীন শিক্ষা

দেশের শিক্ষাকে বিদেশী রাজার অধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য কী উপায় করা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন 'ভাণ্ডারে' উঠিয়াছে।

যতদিন বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের উপরে অন্নলাভ নির্ভর করিবে, ততদিন মুক্তির আশা করা যায় না এই কথাই সকলে বলিতেছেন।

কিন্তু কথাটা কেবল উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে প্রাকৃতগণ যে শিক্ষালাভের জন্য ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায়, সে শিক্ষার দ্বারা গবর্মেন্টের চাকরি কেহ প্রত্যাশা করে না।

আমাদের দেশে এই পাঠশালা চিরকাল স্বাধীন ছিল। আজও এই-সকল পাঠশালার অধিকাংশ ব্যয় দেশের লোক বহন করে ; কেবল তাহার উপর আর সামান্য দুই-চার-আনার লোভে এই আমাদের নিতান্তই দেশীয় ব্যবস্থা পরের হাতে আপনাকে বিকাইয়াছে।

এই প্রাথমিক পাঠাশালার চেয়ে উপর পর্যন্ত উঠে অথচ কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে না এমন একদল ছাত্র আছে, সাধারণত ইহারাও সরকারি চাকরির দাবি করিতে পারে না। ইহারা অনেকেই সদাগরের আপিসে, জমিদারের সেরেস্তায়, ধনিগৃহের দপ্তরখানায়, গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু দেশে ইহাদের শিক্ষার তেমন ভালো ব্যবস্থা নাই। পূর্বে ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইহাদের কতকটা উপযোগী ছিল। কিন্তু মাইনর স্কুল এখন ছাত্রবৃত্তিকে প্রায় চাপিয়া মারিল। ইংরেজি শিক্ষাই যে-সব স্কুলের প্রধান লক্ষ্য এবং কলেজই যাহার গম্য স্থান, সে-সকল স্কুলে কিছুদুর পর্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলে না বাংলা না ইংরেজি না কিছুই শেখা হয়।

অতএব যাহারা পাঠশালা পর্যন্ত পড়ে এবং যাহারা নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধা বশত তাহার চেয়ে আর-কিছুদূর মাত্র পড়িবার আশা করিতে পারে, দেশ তাহাদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইলে বাধার কারণ তো কিছুই দেখা যায় না।

গুনতি করিয়া দেখিলে কলেজে পাস-করা ছাত্রদের চেয়ে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি হইবে। এই বহুবিস্তৃত নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা

ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি হইয়া উঠিতে পারে। পাঠশালায় শিশুবয়সে যে-সকল ভাব, জ্ঞান ও অভ্যাস সঞ্চার করিয়া দেওয়া যায়, বড়োবয়সে বক্তৃতার দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হয় না।

যাই হোক, উচ্চশিক্ষায় দেশের লোকের পক্ষে গবর্মেন্টের প্রতিযোগিতা করিবার যে-সকল বাধা আছে নিম্নশিক্ষায় তাহা নাই।

কিন্তু এতবড়ো দেশব্যাপী কাজের ভার আমাদিগকে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা বলিলেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হতাশ হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহারা ইহাও জানেন, এ কাজ সরকারের হাতে দিলে কিন্ডারগার্টেনের ধুয়া ধরিয়া নিতান্ত ছেলেখেলা হইতে থাকিবে এবং লাভের মধ্যে ম্যাক্‌মিলন কোম্পানির উদরপূরণ হইবে। কিছু না-হউক, এ শিক্ষা আমরা যেমন চাই তেমন হইবে না, বরঞ্চ কতক অংশে বিপরীত হইবে।

অন্যত্র ইহা তো দেখিয়াছি দয়ানন্দের দল আপন সম্প্রদায়ের জন্য স্বচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্টা কী করিলে সাধ্য হইতে পারে এবং এই-সকল নিম্নতন বিদ্যালয়গুলিতে কী কী বিষয় কী নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে, সুধীগণ 'ভাণ্ডার' পত্রে তাহার আলোচনা করিলে সম্পাদক কৃতার্থ হইবেন।

১৩১২

শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনোদিন স্বদেশী বা বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় যে বিদ্যায়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনো কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্তমানকালে নানা কারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষালাভের কী পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিতসাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে-পাঠশালা যে-টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে, সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছে। মোগলসাম্রাজ্যসূর্য যখন অস্তমিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এ দেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্নজীবী টোল-পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তিলাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্বলাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে তখন সে ক্ষতি কোনোপ্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিমনি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল সেই তার সেই চিমনির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ

করি-না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র ; যখনই জাগ্রত হইব তখনই সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সংকীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এ দেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরো অনেকগুলি শক্তি আছে যাহার উৎকর্ষসাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই-সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্ট -স্বীকারে অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন-কি, আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে-মানবে কোনোদিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছুদিন আলোচনা চলিতেছিল— এমন-কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমত সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কিরূপ ছিল, তাহা কাহারও অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে সে-পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না, আমরা পরাধীনজাতির মজ্জাগত দুর্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশীবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি তবে স্বদেশ একটি নূতন শক্তি লাভ করিবে। যে-সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তাহা অপেক্ষা যে-শক্তিলাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর-এক শক্তিকে আকর্ষণ করে— বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ-সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশীবর্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে, এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পরে মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জিত সার্ক্যুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে, আমরা বর্তমান য়ুনিভর্সিটিকে 'বয়কট' করিব ; আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঔচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অনেক সময় প্রবর্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘ কাল ধরিয়া একটা আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে এ দেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্‌বোধন সম্ভবত বর্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি, স্থায়ী মঙ্গল যে উদ্যোগের লক্ষ্য, আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো

ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়োই কঠিন। রাগারাগির স্টীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কী। গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তুবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।

আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন-কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনোমতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবলক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেইজন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্থ স্বদেশপ্রীতি প্রবর্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারি। তখন কেবলই এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্য আরম্ভকে আমরা কেবলই বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই-যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ শুরু করিয়াছি। আমাদের যাঁহার যতটুকু মনের-মতো না হইতেছে, যাঁহার যে পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্‌যোগকে আঘাত করিতেছেন। এ কথা বলিতেছেন না, "আচ্ছা, হউক, পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হউক ; কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারে নিখুঁতসুন্দর এবং সর্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না ; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায় যাহা চিরদিনের মতো জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।"

বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা-সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা-কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমত প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে, এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শরচনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম ও বিচক্ষণতা সহকারে আদর্শরচনা কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ববিষয়ে তাঁহার

সহিত মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমার তো কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা একজনকে মানিতেই হইবে। পাঠশালায় ডিবেটিং ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা, এ কেবল সেইপ্রকার বৈঠকেই শোভা পায় যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষাচালনার নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে, এই শিক্ষাব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে।

নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্তনব্যাপারে গুরুদাসবাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্তমান আন্দোলনব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই; তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে, গম্যস্থানে পৌঁছানোই লক্ষ্য, আন্দোলনের উত্তেজনায় এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্তৃপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কার্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ এ কথা যাঁহারা এক মুহূর্ত ভোলেন না দেশের সংকটের সময় তাঁহাদের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্বস্ব খোয়াইয়া মকদ্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাসবাবুর মতো লোকের প্রয়োজন। স্পর্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় নৈব নৈব চ।

যাহাই হউক, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সেজন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক কাল পুনরায় এ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্‌যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।

১৩১২

একটি প্রশ্ন

ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় কতকগুলি জায়গায় ভাবনা উপস্থিত হয়। যথা— ইংরেজি sir। বাংলায় সার লেখা উচিত না সর্ লেখা উচিত? ইংরেজি v অক্ষরে বাংলার ব না ভ? vow শব্দ বাংলায় কি বৌ লিখিব, না ভৌ লিখিব, না বাউ অথবা ভাউ লিখিব। এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত যাহা বলেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তাই এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম।

সাধারণত পণ্ডিতেরা বলেন perfect শব্দের e, sir শব্দের i আ নহে— উহা অ। stir শব্দের i এবং star শব্দের a কখনো এক হইতে পারে না— শেষোক্ত a আমাদের আ এবং প্রথমোক্ত i

আমাদের অ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শুনিবামাত্র অনুভব করা যায় যে, stir শব্দের i এবং star শব্দের a একই স্বর ; কেবল উহাদের মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভেদ মাত্র। সংস্কৃতবর্ণমালায় অ এবং আ-এ হ্রস্বদীর্ঘের প্রভেদ, কিন্তু বাংলাবর্ণমালায় তাহা নহে। বাংলা অ আকারের হ্রস্ব নহে, তাহা একটি স্বতন্ত্র স্বর, অতএব সংস্কৃত অ যেখানে খাটে বাংলা অ সেখানে খাটে না। হিন্দুস্থানিরা কলম শব্দ কিরূপে উচ্চারণ করে এবং আমরা কিরূপ করি তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিলেই উভয় অকারের প্রভেদ বুঝা যায়। হিন্দুস্থানিরা যাহা বলে তাহা বাংলা অক্ষরে 'কালাম' বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, আ স্বর আমরা প্রায় হ্রস্বই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাংলায় কল লিখিলে ইংরেজি call কথাই মনে আসে, কখনো cull মনে হয় না ; শেষোক্ত কথা বাংলায় কাল লিখিলেই প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি যায়। এইরূপ noun শব্দবর্তী ইংরেজি ou আমাদের ঔ নহে, তাহা আউ ; অথবা time শব্দবর্তী i আমাদের ঐ নহে তাহা আই। v শব্দের উচ্চারণ অনেকে বলিয়া থাকেন অন্ত্যস্থ ব। আমার তাহা ঠিক মনে হয় না। ইংরেজি w প্রকৃত অন্ত্যস্থ ব, ইংরেজি f অন্ত্যস্থ ফ, ইংরেজি v অন্ত্যস্থ ভ। কিন্তু অন্ত্যস্থ ফ অথবা অন্ত্যস্থ ভ আমাদের নাই। এইজন্য বাধ্য হইয়া f ও v-র জায়গায় আমাদিগকে ফ ও ভ ব্যবহার করিতে হয় ; wise এবং voice শব্দ উচ্চারণ করিলে w এবং v-এর প্রভেদ বুঝা যায়। w-এর স্থানে ব দিলে বরঞ্চ সংস্কৃত বর্ণমালার হিসাবে ঠিক হয়, কিন্তু v-র স্থানে ব দিলে কোন্ হিসাবে ঠিক হয় বুঝিতে পারি না। আমার মতে আমাদের বর্ণমালার ভ-ই v-এর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি আসে। যাহা হউক এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করি।

১২৯২

সংজ্ঞাবিচার

পৌষ মাসের বালকে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বাহির করিবার জন্য 'হুজুগ', 'ন্যাকামি', এবং 'আহ্লাদে' এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, পাঠকদের নিকট হইতে অনেকগুলি সংজ্ঞা আমাদের হাতে আসিয়াছে।[১]

কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রচলিত। আমরা পরস্পর কথোপকথনে ঐ কথাগুলি যখন ব্যবহার করি তখন কাহারও বুঝিবার ভুল হয় না, অথচ স্পষ্ট করিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে এমন বুঝাইতেছে না যে, বাস্তবিকই ঐ কথাগুলি ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া থাকেন— কারণ, তাহা হইলে তো ও কথা লইয়া কোনো কাজই চলিত না। প্রকৃত কথা এই, আমরা অনেক জিনিস বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কী বুঝিলাম সেটা ভালো করিয়া বুঝিতে অনেক চিন্তা আবশ্যক করে। যেমন আমরা অনেকে সহজেই সাঁতার দিতে পারি, কিন্তু কী উপায়ে সাঁতার দিতেছি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। অথবা, একজন মানুষ রাগিলে তাহার মুখভঙ্গি দেখিলে আমরা সহজেই বলিতে পারি মানুষটা রাগিয়াছে ; কিন্তু আমি যদি পাঁচজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলো দেখি রাগিলে মানুষের মুখের কিরূপ পরিবর্তন হয়, মুখের কোন্ কোন্ মাংসপেশীর কিরূপ বিকার হয়, মুখের কোন্ অংশের কিরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে পাঁচজনের বর্ণনায় প্রভেদ লক্ষিত হইবে। অথচ ক্রুদ্ধ মনুষ্যকে দেখিলেই পাঁচজনে বিনা মতভেদে সমস্বরে বলিয়া উঠিবে লোকটা ভারি চটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকদের নিকট হইতে যে-সকল সংজ্ঞা পাইয়াছি তাহার কতকগুলি এই স্থানে পরে পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাইবে।

একজন বলিতেছেন, 'হুজুক— জনসাধারণের হৃদয়োন্মাদক আন্দোলন।' তা যদি হয় তো, বুদ্ধ চৈতন্য যিশু ক্রমোয়েল ওয়াশিংটন প্রভৃতি সকলেই হুজুক করিয়াছিলেন। কিন্তু লেখক কখনোই

১ পাঠকদের প্রতি : বালকের যে-কোনো গ্রাহক 'হুজুগ', 'ন্যাকামি' ও 'আহ্লাদে' শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা (Definition) লিখিয়া পৌষ মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভালো গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। একেকটি সংজ্ঞা পাঁচটি পদের অধিক না হয়। বালক, পৌষ ১২৯২

সচরাচর কথোপকথনে এরূপ অর্থে হুজুক ব্যবহার করেন না।

ইনিই বলিতেছেন, 'ন্যাকামি— অভিমানবশত কিছুতে অনিচ্ছা প্রকাশ অথবা ইচ্ছাসত্ত্বে অভিমানীর অনিচ্ছা প্রকাশ।'

স্থলবিশেষে অভিমানচ্ছলে কোনো ব্যক্তি ন্যাকামি করিতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অভিমানবশত অনিচ্ছা প্রকাশ করাকেই যে ন্যাকামি বলে তাহা নহে।

আহ্লাদে শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি বলেন, 'দশজনের আহ্লাদ পাইয়া অহংকৃত।' প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অহংকৃত এবং 'আহ্লাদে'-র মধ্যে যে অনেক প্রভেদ বলাই বাহুল্য।

হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিত প্রাপ্ত সংজ্ঞাগুলি পরে পরে প্রকাশ করিলাম।

হুজুগ

১। বিস্ময়জনক সংবাদ যাহা সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

২। অকারণ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহ (অকারণ শব্দের দুই অর্থ— ১ অনির্দিষ্ট ; ২ তুচ্ছ, সামান্য)।

৩। অল্পেতে নেচে ওঠার নাম।

৪। অতিরঞ্জিত জনরব।

★

৬। ফল অনিশ্চিত এরূপ বিষয়ে মাতা।

৭। কোনো এক ঘটনা ; লোকে যাহার হ্যাপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসে। 'বাজারদরে নেচে বেড়ানো।' 'ঝড়ের আগে ধুলা উড়া।'

৮। ফস্ কথায় নেচে ওঠা।

৯। দেশব্যাপী কোনো নূতন (সত্য এবং মিথ্যা) আন্দোলন।

১০। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা।

প্রথম সংজ্ঞাটি যে ঠিক হয় নাই তাহা ব্যক্ত করিয়া বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে লেখক নিজেই অকারণ শব্দের যে-অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যাহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই এমন কোনো তুচ্ছ সামান্য বিষয়কেই বোধ করি তিনি অকারণ বিষয় বলিতেছেন— তাঁহার মতে এইরূপ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহকেই হুজুগ বলে। কেহ যদি বিশেষ উদ্যোগের সহিত একটা বালুকার স্তূপ নির্মাণ করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া পরমোৎসাহে তাহা আবার ভাঙিতে থাকে তবে তাহাকে হুজুগে বলিবে না পাগল বলিবে ?

তৃতীয় সংজ্ঞা। রাম যদি ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র উৎসাহে নাচিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে।

চতুর্থ সংজ্ঞা। অতিরঞ্জিত জনরবকে যে হুজুগ বলে না তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শ্যাম তাহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাঁচশো টাকা খরচ করিয়াছে ; লোকে যদি রটায় যে সে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে, তবে সেই জনরবকেই কি হুজুগ বলিবে।

পঞ্চম সংজ্ঞা। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অসম্ভব সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া থাকে, তাহাকে কেহ হুজুগ বলে না।

ষষ্ঠ সংজ্ঞা। লাভ অনিশ্চিত এমনতরো ব্যবসায়ে অনেকে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেরূপ ব্যবসায়কে কেহ হুজুগ বলে না।

সপ্তম। এ সংজ্ঞাটি পরিষ্কার নহে। যে-ঘটনার স্রোতে লোকে ভাসিতে থাকে তাহাকে হুজুগ বলা যায় না ; তবে লেখক হ্যাপা শব্দের যোগ করিয়া ইহার মধ্যে আর-একটি নূতন ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু হ্যাপা শব্দের ঠিক অর্থটি কী সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে, অতএব হুজুগ শব্দের ন্যায় হ্যাপা শব্দও সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। সুতরাং হ্যাপা শব্দের সাহায্যে হুজুগ শব্দ বোঝাইবার চেষ্টা

★ মূলে মুদ্রাকরপ্রমাদ

সংগত হয় না। 'বাজারদরে নেচে বেড়ানো', 'ঝড়ের আগে ধুলা উড়া'— দুটি ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট নহে।

অষ্টম। হরি যদি মাধবকে বলে, তুই ট্যাকশালের দাওয়ান হইবি— অমনি যদি মাধব নাচিয়া উঠে— তবে মাধবের সেই উৎসাহ-উল্লাসকে হুজুগ বলা যায় না।

নবম। আন্দোলন নূতন হইলেই তাহাকে হুজুগ বলা যাইতে পারে না।

দশম। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা মাত্রই হুজুগ বলিতে পারি না। কোনো রায়বাহাদুর যদি তাহার খেতাব ও গাড়িজুড়ি লইয়া মাতিয়া থাকে, তাহার সেই মত্ততাকে কি হুজুগ বলা যায়।

আমরা যে-লেখককে পুরস্কার দিয়াছি তিনি হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিত মত ব্যাখ্যা করেন :

> 'মাথা নাই মাথা ব্যথা গোছের কতকগুলো নাচুনে জিনিস লইয়া যে নাচন আরম্ভ হয় সেই নাচনের অবস্থাকেই হুজুগ বলে। বিশেষ কিছুই হয় নাই অথবা অতি সামান্য একটা-কিছু হইয়াছে আর সেইটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার নাম হুজুগ।'

আমরা দেখিতেছি হুজুগে প্রথমত এমন একটা বিষয় থাকা চাই যাহার প্রতিষ্ঠাভূমি নাই— যাহার ডালপালা খুব বিস্তৃত, কিন্তু শিকড়ের দিকের অভাব। মনে করো আমি 'সার্বজনীনতা' বা 'বিশ্বপ্রেম' প্রচারের জন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি ; তাহার কত মন্ত্রতন্ত্র কত অনুষ্ঠান তাহার ঠিক নাই, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকদের প্রতি আমাদের জাত-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে— মূলেই প্রেমের অভাব অথচ প্রেমের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। দ্বিতীয়ত, ইহার সঙ্গে একটা নাচনের যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ কাজের প্রতি ততটা নহে যতটা মত্ততার প্রতি লক্ষ। অর্থাৎ হো-হো করিয়া বেশ সময় কাটিয়া যাইতেছে, খুব একটা হাঙ্গামা হইতেছে এবং তাহাতেই একটা আনন্দ পাইতেছি। যদি স্থির হইয়া স্তব্ধভাবে কাজ করিতে বল তবে তাহাতে মন লাগে না, কারণ নাচানো এবং নাচা, এ-দুটোই মুখ্য আবশ্যক। তৃতীয়ত, কেবল একজনকে লইয়া হুজুগ হয় না— সাধারণকে আবশ্যক— সাধারণকে লইয়া একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা। চতুর্থত, হুজুগ কেবল একটা খবরমাত্র রটানো নহে ; কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমারোহের সহিত উদ্যোগ করা, তার পরে সেটা হউক বা না-হউক।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখকের সংজ্ঞা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার সংজ্ঞার দুইটি পদকে সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই একপদে পরিণত করিতে পারিতেন।

সংজ্ঞা রচনা করা যে দুরূহ তাহার প্রধান একটা কারণ এই দেখিতেছি যে, একটি কথার সহিত অনেকগুলি জটিল ভাব জড়িত হইয়া থাকে, লেখকেরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে তাহার সকলগুলি গুছাইয়া লইতে পারেন না— অনবধানতাদোষে একটা-না-একটা বাদ পড়িয়া যায়। উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পাঠকেরা তাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন।

ন্যাকামি

১। জানিয়া না-জানার ভান।
২। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করা।
৩। জেনেও জানি না, এই ভাব প্রকাশ করা।
৪। জানিয়াও না-জানার ভান।
৫। অবগত থাকিয়া অজ্ঞতা দেখানো।
৬। বিলক্ষণ জানিয়াও অজ্ঞানতার লক্ষণ প্রকাশ করা।
৭। বুঝেও নিজেকে অবুঝের ন্যায় প্রতিপন্ন করা।
৮। সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা।
৯। জেনেশুনে ছেলেমি।
১০। বুঝে অবুঝ হওয়া। জেনেশুনে হাবা হওয়া।
১১। ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা এবং মিথ্যা সরলতা।

প্রথম হইতে সপ্তম সংজ্ঞা পর্যন্ত সকলগুলির ভাব প্রায় একই রকম। অর্থাৎ সকলগুলিতেই জানিয়াও না-জানার ভান, এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু এরূপ ভাবকে অসরলতা মিথ্যাচরণ বা কপটতা বলা যায়। কিন্তু কপটতা ও ন্যাকামি ঠিক একরূপ জিনিস নহে। অষ্টম সংজ্ঞায় লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় যে বলিয়াছেন, সেয়ানা হইয়া বোকা সাজা, ইহাই আমার ঠিক বোধ হয়। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করিলেই হইবে না, সেইসঙ্গে প্রকাশ করিতে হইবে আমি যেন নির্বোধ, আমার যেন বুঝিবার শক্তিই নাই। ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংজ্ঞাতেও কতকটা এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নবম ও দশম সংজ্ঞা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম হইতে দশম সংজ্ঞাতে বোকা, ছেলেমি, হাবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; এই শব্দগুলি সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। অর্থাৎ হাবামি, বোকামি ও ছেলেমির বিশেষ লক্ষণ কী তাহা মনোযোগ-সহকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এইজন্য একাদশ সংজ্ঞার লেখক যে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ভানের সঙ্গে 'মিথ্যা সরলতা' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ন্যাকামি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে। অজ্ঞতা এবং সরলতা উভয়ের ভান থাকিলে তবে ন্যাকামি হইতে পারে। আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক লিখিয়াছেন, "ন্যাকামি বলিতে সাধারণত জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজার ভাব বুঝায়" পরে দ্বিতীয় পদে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না এই ভাবের নাম ন্যাকামি।" যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না বলিতে লোকটা যেন নেহাত হাবা, নিতান্ত খোকা এইরূপ বুঝায়, লোকটা যেন কিছু বুঝেই না, এবং তাহাকে বুঝাইবার উপায়ও নাই।

আহ্লাদে

১। স্বার্থের জন্য বিবেচনারহিত।
২। যাহারা পরিমাণাধিক আহ্লাদে সর্বদাই মত্ত।
৩। যে সকল-তা'তেই অন্যায়রূপে আমোদ চায়, অথবা যে হক্ না হক্ দাঁত বের করে।
৪। অযথা আনন্দ বা অভিমান-প্রকাশক।
৫। অন্যকে অসন্তুষ্ট করিয়া যে নিজে হাসে।
৬। যে সর্বদা আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।
৭। কী সময়ে কী অসময়ে যে আহ্লাদ প্রকাশ করে।
৮। যে অভিমানী অল্পে অধৈর্য হয়।
৯। যে অনুপযুক্ত সময়েও আবদারী।
১০। সাধের গোপাল নীলমণি।

আমার বোধ হয়, যে-ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে ; প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের কাছে আদুরে ছেলেরা যেরূপ ব্যবহার করে যে-ব্যক্তি সকল জায়গাতেই কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতে যায়। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সময়-অসময় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবদার করিতে যায়, সর্বত্রই দাঁত বাহির করে, মনে করে সকলেই তাহার সকল বাড়াবাড়ি মাপ করিবে, সে-ই আহ্লাদে। তাহাকে কে চায় না-চায়, তাহাকে কে কী ভাবে দেখে, সে-বিষয় বিবেচনা না করিয়া সে দুলিতে দুলিতে গায়ে পড়িয়া সকলের গা ঘেঁষিয়া বসে, সকলের আদর কাড়িতে চেষ্টা করে। সংজ্ঞালেখকগণ অনেকেই আহ্লাদে ব্যক্তির এক-একটি লক্ষণমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বলিলে তাহার সকল লক্ষণ ব্যক্ত হয় এমন কোনো কথা বলেন নাই। দশম সংজ্ঞাকে ঠিক সংজ্ঞা বলাই যায় না।

যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে তাঁহার আহ্লাদে শব্দের সংজ্ঞা ঠিক হয় নাই। তিনি বলেন :

ভাতের ফেনের মতো টগবগে। যাহাদিগের প্রায় সকল কার্যেই 'একের মরণ অন্যের আমোদ' কথার সত্যতা প্রমাণ হয়, অর্থাৎ তুমি বাঁচ আর মর আমার আমোদ হইলেই হইল, ইহাই যাহাদিগের মত ও কার্য, তাহাদিগকে 'আহ্লাদে' বলা যায়।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক দুটি সংজ্ঞার উত্তর দিয়াছেন। তৃতীয়টিতে কৃতকার্য হন নাই। শ্রী বঃ— বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন, বোধ করি নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। আমরা বলিয়াছিলাম সংজ্ঞা পাঁচ পদের অধিক না হয়, কেহ কেহ পদ বলিতে শব্দ বুঝিয়াছেন। আমরা ইংরেজি sentence অর্থে পদ ব্যবহার করিয়াছি।

১২৯২

‘নিছনি’

১

তৃতীয়সংখ্যক ‘সাধনা’য় কোনো পাঠক নিছনি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; তাহার উত্তরে জগদানন্দবাবু নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা লিখিয়াছেন।[1] কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনিচ্ছা অর্থে নিছনির ব্যবহার কোথাও দেখা যায় নাই : গোবিন্দদাসে আছে :

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।

স্পষ্টই অনুমান করা যায়, ‘বালাই লইয়া মরি’ বলিতে যে ভাব বুঝায় ‘নিছনি লইয়া মরি’ বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু সর্বত্র নিছনি শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের কোনো পদে আছে :

পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।

এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।

বসন্ত রায়ের অন্যত্র আছে :

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।

এখানে নিছনি বলিতে কী বুঝাইতেছে ঠিক করিয়া বলা শক্ত। এরূপ স্থলে নিছনি শব্দের সংস্কৃত মূলটি বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।

গোবিন্দদাসের এক স্থলে আছে :

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

এ স্থলে ‘নিছিয়া’ এবং ‘নিরছাই’ এক ধাতুমূলক বলিয়া সহজেই বোধ হয়।

অন্যত্র আছে :

বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।

ইহার অর্থ, বরং আমার জীবন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিব তথাপি অঙ্গ সমর্পণ করিব না।

আর-এক স্থলে দেখা যায় :

কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান।

অর্থাৎ তোমার চরণে মাথা লুটাইয়া কানের কুণ্ডল ও চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ দিয়া তোমার পা মুছাইয়া দিয়াছে, তথাপি তোমার মান গেল না ?

এই নির্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১ প্রশ্ন : প্রাচীন কাব্যে নিছনি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তাহার প্রকৃত অর্থ কী এবং তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। শব্দতত্ত্বান্বেষী। সাধনা, মাঘ ১২৯৮

উত্তর : নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা। শ্রীজগদানন্দ রায়, কৃষ্ণনগর। সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ দেখা যায়— 'নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা।' নীরাজনা অর্থ "আরাত্রিক, দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্রাদি, সাষ্টাঙ্গপ্রণাম— এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরুতি।" উহার আর-এক অর্থ 'শান্তিকর্মবিশেষ।'

অতএব যেখানে 'নিছনি লইয়া মরি' বলা হয়, সেখানে বুঝায় তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া মরি— এখানে 'শান্তিকর্ম' অর্থের প্রয়োগ।

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই

এ স্থলে নিরছাই অর্থে মোছা।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্ঘ্যোপহার বুঝাইতেছে।

পরাণ নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার

অর্থাৎ, তোমার প্রেমে প্রাণকে উপহার স্বরূপে অর্পণ করি।

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী
মূলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি।

ইহার অর্থ বোধ করি নিম্নলিখিত মতো হইবে—

তোমার প্রেমে যখন আমি সমূলে বিক্রীত হইয়াছি তখন বিশেষ করিয়া আরাধনাযোগ্য উপহার আর কী দিব।

বর্তমান প্রচলিত ভাষায় এই নিছনি শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি ; যদি কোনো পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান তো বাধিত হই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।

১২৯৮

২

মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ যৌবন সকল করি মানি
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার নিছনি।

এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজা। আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি 'নির্মঞ্ছন' শব্দের একটি অর্থ আরাধনা।

সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু।

নিছনি অর্থে যখন মোছা হয় তখন 'আপনে নিছিনু' অর্থে আপনাকে মুছিলাম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিলাম অর্থ অসংগত হয় না।

পদ পঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুনুঝুনু খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।

আমার মতে এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজার উপহার। অর্থাৎ গোবিন্দদাস চরণপঙ্কজে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে সমর্পণ করিতেছেন।

যশোদা আকুল হইয়া ব্যাকুলি রাইএরে করল কোলে
ও মোর বাছনি জান মু নিছনি ভোজন করহ ব'লে।

'জান মু নিছনি' অর্থাৎ আমি তোমার নিছনি যাই। অর্থাৎ তোমার অশান্তি অমঙ্গল আমি মুছিয়া লই ; যেরূপ ভাবে 'বালাই লইয়া মরি' ব্যবহার হয়, 'নিছনি যাই' বলিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছে।

নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি
কার ঘরের শিশু তোমার যাইতে নিছনি।

আমার বিবেচনায় এখানেও নিছনি অর্থে বালাই বুঝাইতেছে।

সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি
বাপ মোর যাইরে নিছনি।

এখানেও তাহাই।

নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন
কহয়ে মাধব উঠি বসিল তখন।

নিছনি যাইয়ে— অর্থাৎ সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া।

১। অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।

অমিয়া নিছনি— অর্থাৎ অমৃত মুছিয়া লইয়া।

২। নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
মোপুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম ফলে।

নিছিয়া লইনু— আরাধনা করিয়া লইনু, অর্থাৎ বরণ করিয়া লইনু অর্থ হইতে পারে।

৩। তথা কনক বরণ কিরে দরপণ নিছনি দিয়ে যে তার
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।

৪। তনু ধন জন যৌবন নিছিনু কালার পিরিতে।

উদ্‌ধৃত [১, ২, ৩, ৪] অংশগুলি চণ্ডীদাসের পদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

নিছনি শব্দ যদি নির্মঞ্ছন শব্দেরই অপভাষা হয় তবে নির্মঞ্ছন শব্দের যতগুলি অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। দীনেন্দ্রকুমার বাবু নিছনি শব্দের যতগুলি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন[১] তাহার সকলগুলিতেই কোনো-না-কোনো অর্থে নির্মঞ্ছন শব্দ খাটে।

দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে-সকল দুর্বোধ শব্দপ্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়োই সুখের বিষয় হইবে।

১২৯৯

‘পহুঁ’

বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন পহু অর্থে প্রভু এবং পঁহু অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে, নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু এবং পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু।[২]

গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর

অর্থাৎ গোবিন্দদাসের প্রভু নটবর শেখর।

রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ

অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ।

নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান,
রসিক কলাগুরু তুহু সব জান।

ইহার অর্থ এই, তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান, তুমি রসিক কলাগুরু, তুমি সকলই জান। এরূপ

১ ‘নিছনি’, দীনেন্দ্রকুমার রায়। সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯

২ ‘পহুঁ’ (১), দীনেন্দ্রকুমার রায়। সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

ভণিতা হিন্দি গানেও দেখা যায়। যথা :

তানসেনপ্রভু আকবর।

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙাও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাসের পহু
হাসিয়া হাসিয়া রহু।

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না।

রাধামোহন পহু দুঁহু অতি নিরুপম।

এ স্থলে পহুঁ-র ভণে অর্থ না হইলে আর-কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আর-কোনো বৈষ্ণব কবিতায় পহুঁ শব্দের এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে পহুঁ-র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল— দৈবাৎ দুই-একটি যদি পাওয়া যায়।

রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে।

এ স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে পহুঁ-র 'ভণে' অর্থব্যবহার দেখা যায়।

গোবিন্দদাস পহুঁ দীপ সায়াহ্ন, বেলি অবসান ভৈ গেলি।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে, সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এ স্থলে আর-কোনোরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরো এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে পহুঁ-র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে। এক, ভণহুঁ[১] হইতে ভহুঁ এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে— কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমানমাত্র। বিশেষত, যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোনো প্রাচীন পদকর্তার পদে পহুঁ-র এরূপ অর্থ দেখা যায় না তখন উক্ত অনুমানের সংগত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ ভণিতা পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। 'গোবিন্দদাস পঁহু', অর্থাৎ 'গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন', এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাস পহুঁ এই রস গায়।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদের পদে একপ্রকার অনির্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা :

তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।
রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।
গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে জানিয়ে কী ভেল গোরি।

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখনো বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখনো বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনোরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সংগত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, আমার কোনো শ্রদ্ধেয় পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, তাঁহাদের দেশে 'নিছেপুঁছে' শব্দের চলন আছে। এবং নববধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে 'নিছিয়া' লওয়া হয়। অতএব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে নিছনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

১২৯৯

১ ভণহুঁ বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী।

প্রত্যুত্তর

পঁহু প্রসঙ্গ

১

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী[১]

মান্যবরেষু

আপনি বলিয়াছেন :

অপভ্রংশের নিয়ম সকলজাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এইজন্যই বাংলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে :

শব্দশাস্ত্রের কোনো সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।

কিন্তু যে-হেতুক বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনো রচিত হয় নাই, ইহার সূত্র নির্ধারণ করার কোনো উপায় নাই। অতএব বাংলার আরো দুই-চারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি আপনার তর্কটা এই যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোনো সংস্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। 'বন্ধু' হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই ; যথা, কক্ষ হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শস্য হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণত অপ্রচলিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুই-একটি শব্দ উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা, শৈবাল হইতে শেঁয়লি; শ্রাবণ হইতে সাঙন।

ত বর্গের চতুর্থ বর্ণ ধ যেমন হ-এ পরিবর্তিত হইতে পারে তেমনই প বর্গের চতুর্থ বর্ণ ভ-ও অপভ্রংশে হ হইতে পারে, এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোনো মতান্তর নাই। তথাপি দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া কর্তব্য ; যথা, শোভন হইতে শোহন, গাভী হইতে গাই (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই), নাভি হইতে নাই (হি হইতে ই হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে, যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে-সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোনো ভ্রম না থাকে তবে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহু-র উদ্ভব হইতে আটক নাই, আপনি তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত পঁহু শব্দ বিদ্যাপতির কোনো মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি। আমি তো গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলাপ্রচলিত পুঁথিতে কোথাও 'পহু' ছাড়া 'পঁহু' দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বন্হু, বন্হু হইতে পন্হু এবং পন্হু হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙালির মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে, ইহাই আমার নিকট অধিকতর সংগত বোধ হয়। বিশেষত বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

১ প্রশ্নকর্তা। 'পঁহু', সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯

আর-একটা কথা এই যে, বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর।
রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ।
নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান। ইত্যাদি।

এ স্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধু শব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দু-ই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সংগত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহঁ শব্দের ব্যবহার এত স্থানে দেখিয়াছি যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই ; যদি আপনার সন্দেহ থাকে তো ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়ত, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্ব অনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষত, পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ হ-এ এবং ন চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্যয় নিয়মবিরুদ্ধ হয় নাই। নিবেদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৯৯

২

পঁহু শব্দ বন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা আপনি[১] স্বীকার করেন, তথাপি উক্ত শব্দ যে প্রভুশব্দমূলক তাহা আপনার সংগত বোধ হয় না। কিন্তু পঁহু যে তৎসম বা তদ্‌ভব সংস্কৃত শব্দ নহে পরন্তু দেশজ শব্দ, আপনার এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনো উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল আপনি বলিয়াছেন, "মধুররসসর্বস্ব পরকীয়া প্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত।" কিন্তু এই একমাত্র যুক্তি আমার নিকট যথেষ্ট প্রবল বোধ হয় না ; কারণ, বৈষ্ণবপদাবলীতে অনেক স্থানেই রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী ও কৃষ্ণ আপনাকে রাধিকার দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পদাবলীতে স্থানে স্থানে পঁহু শব্দ প্রভু অথবা বঁধু ছাড়াও অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

রাধামোহন দাস রাধিকার বিরহবর্ণনা করিতেছেন :

প্রেমগজদলন সহই না পারই জীবইতে করই ধিকার।
অন্তরগত তুহু নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।
অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জ্বর ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবাণ।

অর্থাৎ শ্যামকে সম্বোধন করিয়া দূতী কহিতেছে :

> প্রেমগজের দলন সহিতে না পারিয়া রাধিকা বাঁচিয়া থাকা ধিক্কারযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তর্গত তোমাকে নির্গত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তোমার অস্থির নয়নশরঘাতে বিষম জ্বরাতুর হইয়া বিরহিণী পদ্মশয়ন অবলম্বন করিয়াছেন। রাধামোহন কহিতেছেন, যাহাকে পঞ্চবাণ লাগে তাহার এরূপ আচরণ কিছুই অপরূপ নহে।

এ স্থলে পহুঁ শব্দের কী অর্থ হইতেছে। 'রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন' এরূপ অর্থ অসংগত। কারণ, কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক। 'রাধামোহন কহিতেছেন হে প্রভু' এরূপ অর্থও এ স্থলে ঠিক খাটে না ; কারণ, সেরূপ অর্থ হইলে পঁহু শব্দ পরে বসিত— তাহা হইলে কবি সম্ভবত 'রাধামোহন কহে অপরূপ নহে পঁহু' এইরূপ শব্দবিন্যাস ব্যবহার করিতেন।

১ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। 'পঁহু', সাধনা, চৈত্র ১২৯৯

যুগলমূর্তি বর্ণনায় গোবিন্দদাস কহিতেছেন :

ও নব পদুমিনী সাজ,
ইহ মত্ত মধুকর রাজ।
ও মুখ চন্দ উজোর,
ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

এখানে ভণিতার অর্থ :

অরুণের নিকট চাঁদ দেখিয়া গোবিন্দদাসের ধাঁদা লাগিয়াছে।

গোবিন্দদাসের প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে এ কথা বলা যায় না, কারণ তিনিই বর্ণনার বিষয়। এখানে পঁহু সম্বোধন পদ নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

শ্যামের সেবাসমাপনান্তে রাধিকা সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন :

সখীগণ মেলি করল জয়কার,
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।
নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়াণ,
ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী,
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয় কার,
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়
গোবিন্দদাস পহু এহ রস গায়।

এখানেও পঁহু অর্থে প্রভু অথবা বঁধু অসংগত।

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ,
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।
গোধন গরজত বড়ই গভীর
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।
গোরস ধীর ধীর বিরাজিত অঙ্গ,
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ।
মুটকি মুটকি ভরি রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু নিরীক্ষণ করিতেছেন' এরূপ অর্থ হয় না ; কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি দোহনে নিযুক্ত।

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
 পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
 গায়ত গোবিন্দদাস পঁহু।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু গান গাহিতেছেন' ঠিক হয় না : কারণ, তাঁহার মুখে মোহন মুরলী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।

শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখচন্দ ...
গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীজন
গুরুজন সেবন ফেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন
বেলি অবসান ভৈ গেলি।

এই পদে কেবল রাধিকার গৃহের কথা হইতেছে ; তিনি ক্রমে ক্রমে গৃহকার্য এবং ভোজনাদি সমাধা করিলেন এবং সন্ধ্যা হইল— কবি ইহাই দর্শন এবং বর্ণনা করিতেছেন। এখানে শ্যাম কোথায় যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, 'হে গোবিন্দদাসের বঁধু, বেলা গেল সন্ধ্যা হল।'

আমি কেবল নির্দেশ করিতে চাহি যে, গোবিন্দদাসের এবং দুই-এক স্থলে রাধামোহন দাসের পদাবলীতে পঁহু পহঁ বা পহু— প্রভু ও বঁধু অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কী অর্থে হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতির নোটে অক্ষয়বাবু এক স্থলে পহু অর্থে পুনঃ লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্থ নিতান্ত অনুমানমূলক না মনে করিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি স্থানে স্থানে পহঁ শব্দের পুনঃ অর্থ সংগত হয়। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে 'ভণে' অর্থ না করিয়া পুনঃ অর্থ করিলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে ; যেমন, গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন ইত্যাদি।

এই কারণে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া আছি। ভণহঁ এবং পুনহঁ এই দুই শব্দ হইতেই যদি পহঁ-র উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে স্থানভেদে এই দুই অর্থই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর-কোনো বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পহঁ শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি ; আপনি মিথিলা প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে ; এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোনো পুঁথিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়ার্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও পঁহু দেখি নাই ; এবং কিছুকাল পূর্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহঁ দেখি নাই।

১২৯৯

ভাষাবিচ্ছেদ

ইংরেজের রাজচক্রবর্তীত্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমত, এক রাজার শাসনপ্রণালীর বন্ধন তো আছেই, তাহার পরে পথের সুগমতা এবং বাণিজ্য ব্যাবসা ও চাকরির টানে পরস্পরের সহিত নিয়ত সম্মিলন ঘটিতেছেই।

ইহার একটা অনিবার্য ফল এই ছিল যে, যে-সকল প্রতিবেশী জাতির মধ্যে প্রভেদ সামান্য তাহারা ক্রমশ এক হইয়া যাইতে পারিত। অন্তত ভাষা সম্বন্ধে তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল।

উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলায় এই দুই উপবিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।

সামান্য অন্তরাল এইজন্য বলিতেছি যে, বাংলাভাষার সহিত আসামি ও উড়িষ্যার যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে-প্রভেদ, বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।

অবশ্য, উপভাষা আপন জন্মস্থান হইতে একেবারে লুপ্ত হয় না। তাহা পূর্বপুরুষের রসনা হইতে উত্তরপুরুষের রসনায় সংক্রামিত হইয়া চলে। কিন্তু লিখনভাষা যত বৃহৎ পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

ব্রিটিশ দ্বীপে স্কটল্যান্ড, আয়র্ল্যান্ড ও ওয়েল্সের স্থানীয় ভাষা ইংরেজি সাধুভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংরেজির উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষাসকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিস্তৃত নহে। কিন্তু ইংরেজের বল জয়ী হওয়ায় প্রবল ইংরেজিভাষাই ব্রিটিশ দ্বীপের সাধুভাষারূপে গণ্য হইয়াছে। এই ভাষার ঐক্যে ব্রিটিশজাতি যে উন্নতি ও বললাভ করিয়াছে, ভাষা পৃথক থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।

ভারতবর্ষেও যে যে সমশ্রেণীয় ভাষার একীভবন স্বাভাবিক অথবা স্বল্পচেষ্টাসাধ্য, সেগুলিকে এক হইতে দিলে আমাদের ব্যাপক ও স্থায়ী উন্নতির পথ প্রসর হইত।

কিন্তু, যদিচ একীকরণ ইংরেজরাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।

স্থানীয় চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালির বিরুদ্ধে যে-গণ্ডি টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বেহারি প্রভৃতি বঙ্গশাখীদের সহিত বাঙালির যে-একটি ঈর্ষার সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা আমরা স্বল্প অশুভেরই কারণ মনে করি ; কিন্তু ভাষার ঐক্য যাহা নিত্য,যাহা সুগভীর, যাহা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহাকে আপন রাজশক্তির দ্বারা পরাহত করিয়া ইংরেজ আমাদের নিরুপায় দেশকে চিরদিনের মতো ভাঙিয়া রাখিতেছেন।

ইংরেজিভাষা কোনো উপায়েই আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত উৎকট বিদেশী। এবং যে-সকল ভাষার ভিত্তি বহুসহস্র বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যে-সকল ভাষা বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনোই মরিবার নহে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতমূলক ভাষা রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাধায় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্ররূপে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের জয়চেষ্টার অবসর হয় নাই।

এক্ষণে সেই অবসরের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাংলাভাষার পরাভবের কোনো আশঙ্কা নাই।

প্রথমত, বাঙালিভাষীর জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অপরভাষীর তুলনায় অধিক। প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাংলা বলে।

কিন্তু আপন সাহিত্যের মধ্যে বাংলা যে-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহাতেই তাহার অমরতা সূচনা করে।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া বোধ হয় এমন কোনো ভাষাই নাই, যে-ভাষার আধুনিক সাহিত্যে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই সজাগ ঔৎসুক্য। অন্যত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্যই দেশীয় ভাষা প্রধানত অবলম্বনীয় জ্ঞান করেন— কিন্তু তাঁহাদের মনের শ্রেষ্ঠভাব ও নূতন উদ্ভাবনসকলকে তাঁহারা ইংরেজিভাষায় রক্ষা করিতে ব্যগ্র।

বাংলাদেশে ইংরেজিতে প্রবন্ধরচনার প্রয়াস প্রায় তিরোধান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যে-সকল ছাত্রের রচনা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাংলাসাহিত্য অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে আমাদের সাহিত্য এমন-একটি

সবেগতা, এমন-একটি প্রবলতা লাভ করিয়াছে। চতুর্দিকে জীবনদান এবং জীবনগ্রহণ করিবার শক্তি ইহার জন্মিয়াছে। ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে। এবং বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যে-দেশ দিয়া যায় সে-দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বাণিজ্যে ও ধনে-ধান্যে ধন্য হইয়া উঠে, তেমনই ভারতবর্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলাভাষার ব্যাপ্তি হইবে ততদূর পর্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই উপকূলকে নিত্য নব নব ভাবসম্পদে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখনপঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনিই সেই দেশের পক্ষেও।

কিন্তু ইংরেজের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠবিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলাপ্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষার জয়কীর্তন করিতেছেন।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দেশীয় ভাষা আমাদের রাজভাষা নহে, যে-ভাষার সাহায্যে বিদ্যালয়ের উপাধি বা মোটা বেতন লাভের আশা নাই। অতএব দেশীয় সাহিত্যের একমাত্র ভরসা তাহার প্রজাসংখ্যা, তাহার লেখক ও পাঠক -সাধারণের ব্যাপ্তি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেশে কখনোই মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না। তাহা সংকীর্ণ গ্রাম্য প্রাদেশিক আকার ধারণ করে। তাহা ঘোরো এবং আটপৌরে হইয়া উঠে, তাহা মানব-রাজদরবারের উপযুক্ত নয়।

আসামি এবং উড়িয়া যদি বাংলার সগোত্র ভাষা না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার কোনো অধিকার থাকিত না। বিশেষত শব্দভাণ্ডারের দৈন্যবশত সাধুসাহিত্যে লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য, অতএব সাহিত্যগ্রাহ্য ভাষায় অনৈক্য আরো সামান্য। লেখক কটকে বাসকালে উড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাধুবাংলার প্রভেদ তর্জনীর সহিত মধ্যম অঙ্গুলির অপেক্ষা অধিক নহে।

একটি উড়িয়া ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র কাহিনী এখানে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। কোনো বাঙালিকে ইহার অর্থ বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

> কেতে বেলে এক হরিণ পীড়িত হেবারু তাহার আত্মীয় ও পরিবারীয় পশুগণ তাকু দেখিবা নিমন্তে আসি চারিদিগরে শুষ্ক ও সরস যেতে তৃণ পল্লবিথিলা, তাহা সবু খায়ি পকাইলা। হরিণর পীড়ার শান্ত হেলা-উত্তারু সে কিছি আহার করিবা নিমন্তে ইচ্ছা কলা। মাত্র কিছিহি খাদ্য পাইলা নাহি, তহিঁ রে ক্ষুধারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হেলা। ইহার তাৎপর্য এহি— অবিবেচক বন্ধু থিবাঠারু বরং বন্ধু ন থিবা ভল।

ইংরেজ লেখকগণ বাংলার এই-সকল উপভাষাগুলিকে স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন তাহা যে কতদূর অসংগত ডাক্তার ব্রাউন -প্রণীত আসামি ব্যাকরণ আলোচনা করিলে তাহা দেখা যায়।

তিনি উচ্চারণপ্রভেদের যে-যুক্তি দিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিলে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়। আসামিরা চ-কে দন্ত্য স (ইংরেজি s) জ-কে দন্ত্য জ (ইংরেজি z) রূপে উচ্চারণ করে, পূর্ববাংলাতেও সেই নিয়ম। তাহারা শ-কে হ বলে, পূর্ববঙ্গেও তাই। তাহারা বাক্য-কে 'বাইক্য', মান্য-কে 'মাইন্য' বলে, এ সম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের সহিত তাহার প্রভেদ দেখি না।

ব্রাউন বলিয়াছেন, উচ্চারণের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলে আসামির সহিত হিন্দুস্থানির ঐক্য পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতমূলক শব্দের আসামি উচ্চারণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আসামি বাংলা হইতে জাত হয় নাই।

অথচ আশ্চর্য এই যে, মূর্ধন্য ষ আসামি ভাষায় খ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, ইহা ছাড়া আসামির সহিত হিন্দুস্থানির আর-কোনো সাদৃশ্য নাই এবং তাহার সমস্ত সাদৃশ্যই বাংলার সহিত।

অকারের বিশুদ্ধ উচ্চারণই হিন্দুস্থানির প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুস্থানিতে বট শব্দ ইংরেজি but শব্দের অনুরূপ, বাংলায় তাহা ইংরেজি bought শব্দের ন্যায়। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য গৌড়ীয় উচ্চারণের সহিত প্রাচ্য গৌড়ীয়ের এই সর্বপ্রধান প্রভেদ। আসামি ভাষা এ সম্বন্ধে বাংলার মতো। ঐকারের

উচ্চারণেও তাহা দেখা যায়। বাংলা 'ঐ' ইংরেজি stoic শব্দের oi, হিন্দি 'ঐ' ইংরেজি style শব্দের y। ঔ শব্দও তদ্রূপ।

বাংলার অকার উচ্চারণ স্থানবিশেষে, যথা, ইকার উকারের পূর্বে হ্রস্ব ওকারে পরিণত হয়। কল, কলি ও কলু শব্দের উচ্চারণভেদ আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আসামি ভাষার উচ্চারণে বাংলার এই বিশেষত্ব আছে।

আসামিতে ইকারের পূর্বে ওকার প্রায় উকারে পরিণত হয়, যথা 'বোলে' ক্রিয়া (বাংলা, বলে) বিভক্তি পরিবর্তনে 'বুলিছে' হয়। বাংলাতেও, খোলে খুলিছে, দোলে দুলিছে। বোল বুলি, খোল খুলি, ঝোলা ঝুলি, গোলা গুলি, ইত্যাদি।

যুক্ত অক্ষরের উচ্চারণেও প্রভেদ দেখি না, আসামিরাও স্মরণ-কে স্বরণ; স্বরূপ-কে সরূপ, পক্ষী-কে পক্‌খী বলে।

অন্ত্যস্থ ব় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বাংলাতেও এই উচ্চারণ আছে, কিন্তু বর্গীয় ব ও অন্ত্যস্থ ব়-এ অক্ষরের ভেদ নাই, আসামিতে সেই ভেদচিহ্ন আছে। তাহা বলিয়া এ কথা কেহ মনে করিবেন না, মহারাষ্ট্রিদের ন্যায় আসামিরা সংস্কৃতশব্দে অন্ত্যস্থ ও বর্গীয় ব-এর প্রভেদ রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেখানে 'পাওয়া' লিখি আসামিরা সেখানে 'পব়া' লেখে। আমাদের ওয়া এবং তাহাদের ব়া উচ্চারণে একই, লেখায় ভিন্ন।

যাহাই হউক, যে-ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত, তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরস্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে-চেষ্টা তাহাকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।

১৩০৫

উপসর্গ-সমালোচনা

মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চালনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাতপায়েরই সামিল। তেমনই য়ুরোপীয় আর্যভাষার prefix ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষার প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের প্রতি নূতন করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। লেখক আমাদের মান্য গুরুজন সে একটা কারণ বটে, কিন্তু গুরুতর কারণ এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে যে অসামান্য গবেষণা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের মতো অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় 'উপসর্গের অর্থ বিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' আখ্যা দিয়া এক রচনা বাহির করিয়াছেন। সেই রচনায় তিনি প্রবন্ধলেখকের মতের কেবলই প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কোথাও সমর্থনযোগ্য শ্রদ্ধেয় কোনো কথা আছে এমন আভাসমাত্র দেন নাই। এ সম্বন্ধে পাঠকদিগকে একটিমাত্র পরামর্শ দিয়া আমরা সংক্ষেপে কর্তব্যসাধন করিতে পারি, সে আর কিছুই নহে, তাঁহারা একবার সমালোচিত প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনা একত্র করিয়া পাঠ করুন,



দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

তাহা হইলে উভয় প্রবন্ধের ওজনের প্রভূত প্রভেদ বুঝিতে তাঁহাদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানি, অনেক পাঠকই শ্রমস্বীকারপূর্বক আমাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না, সুতরাং নানা কারণে সংকোচসত্ত্বেও উপসর্গঘটিত আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, উপসর্গের অর্থবিচার সম্বন্ধে তিনি একটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এবং সে-পথ তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত কোনো গোপন পথ নহে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ। তিনি দৃষ্টান্তপরম্পরা হইতে সিদ্ধান্তে নীত হইয়া উপসর্গগুলির অর্থ-উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফল সর্বত্র না-ও যদি হয়, তথাপি সেই প্রণালী একমাত্র সমীচীন প্রণালী।

প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে এইপ্রকার প্রণালী অবলম্বনে উপসর্গের অর্থনির্ণয় হইয়াছিল বলিয়া জানি না। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, "আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই উপসর্গের ধাতুভেদে প্রয়োগভেদে নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ঐ-সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (generalize) করিয়া তাঁহারা এক-একটি উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন।" কথা এই যে, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ না থাকায় তাঁহাদের কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি, পরখ করিয়া লইতে পারি না। এ সম্বন্ধে দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। মেদিনীকোষকার অপ উপসর্গের নিম্নলিখিত অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন— অপকৃষ্টার্থঃ ; বর্জনার্থঃ, বিয়োগঃ, বিপর্যয়ঃ ; বিকৃতিঃ, চৌর্যং, নির্দেশঃ, হর্ষঃ। আমাদের মনে প্রথমে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, যে-অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তাহা উপসর্গ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিরূপে হয়। অপ উপসর্গের চৌর্য অর্থ সহজেই সংগত বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য অপচয় বা অপহরণ শব্দে চৌর্য অর্থপ্রকাশ করে, অপ উপসর্গের অপকৃষ্টার্থই তাহার কারণ। হরণ শব্দের অর্থ স্থানান্তরকরণ, চয়ন শব্দে গ্রহণ বুঝায় ; অপ উপসর্গযোগে তাহাতে দূষিত ভাবের সংস্রব হইয়া চৌর্য অর্থ নিষ্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় ভাষায় abduction শব্দের অর্থ অপহরণ— ducere ধাতুর অর্থ নয়ন, তাহার সহিত ab (অপ) উপসর্গ যুক্ত হইয়া নীচার্থে চৌর্য বুঝাইতেছে। অপ উপসর্গের হর্ষ অর্থ সম্বন্ধেও আমাদের ঐরূপ সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রাচীন শব্দাচার্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া এই-সকল অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না ; সুতরাং হয় তাঁহার কথা তর্কের অতীত বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, নয়তো বিতর্কের মধ্যেই থাকিতে হয়। দুর্গাদাস সং উপসর্গের নানা অর্থের মধ্যে 'ঔচিত্য' অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য, সমুচিত শব্দের দ্বারা ঔচিত্য ব্যক্ত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহাতে সং উপসর্গের ঔচিত্য অর্থ সূচনা করে না। সংগতি, সমীচীনতা, সমীক্ষকারিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অভ্যন্তরে ইঙ্গিতে যে ঔচিত্যের ভাব আছে, সং উপসর্গই তাহার মুখ্য ও মূল কারণ নহে। এরূপ বিচার করিতে গেলে উপসর্গের অর্থের অন্ত পাওয়া যায় না ; তাহা হইলে বলা যাইতে পারে সং উপসর্গের অর্থ সম্মান এবং প্রমাণস্বরূপ সম্মান, সমাদর, সম্ভ্রম, সমভ্যর্থন প্রভৃতি উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। দুর্গাদাস সং উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন সম্ প্রকর্ষাশ্লেষনৈরন্তর্যৌচিত্যাভি মুখ্যেষু ; এই আভিমুখ্য অর্থ স্পষ্টতই সং উপসর্গের বিশেষ অর্থ নহে— কারণ, সং উপসর্গের যে আশ্লেষ অর্থ দেওয়া হইয়াছে আভিমুখ্য তাহার একটি অংশ, বৈমুখ্যও তাহার মধ্যে আসিতে পারে। সমাবেশ, সমাগম, সংকুলতা বলিলে যে আশ্লেষ বা একত্র হওন বুঝায় তাহার মধ্যে— আভিমুখ্য, বৈমুখ্য, উন্মুখতা, অধোমুখতা, সমস্তই থাকিতে পারে ; এ স্থলে বিশেষভাবে আভিমুখ্যের উল্লেখ করাতে অন্যগুলিকে নিরাকৃত করা হইয়াছে। যে-জনতায় নানা লোক নানা দিকে মুখ করিয়া আছে, এমন-কি, কেহ কাহারও অভিমুখে নাই তাহাকেও জনসমাগম বলা যায় ; কারণ, সং উপসর্গের মূল অর্থ আশ্লেষ, তাহার মধ্যে আভিমুখ্য থাকিলেও চলে না-থাকিলেও চলে। ইহাও দেখা যাইতেছে, উপসর্গ সম্বন্ধে প্রাচীন শব্দাচার্যদিগের অর্থতালিকায় পরস্পরের মধ্যে অনেক কমবেশি আছে। মেদিনীকোষকার সং উপসর্গের যে 'শোভনার্থ' উল্লেখ করিয়াছেন দুর্গাদাসের টীকায় তাহা নাই ; দুর্গাদাসের ঔচিত্য আভিমুখ্য অর্থ মেদিনীকোষে দেখা যায় না। এই-সকল শব্দাচার্যের অগাধ পাণ্ডিত্য ও কুশাগ্রবুদ্ধিতা

সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর দ্বারা পরীক্ষা করা কর্তব্য, এ সম্বন্ধেও সংশয় করা উচিত নহে।

প্রাচীন শব্দাচার্যগণ সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধকারের ন্যায় এক-একটি উপসর্গের সর্বত্রই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না।" প্রবন্ধকারও কোথাও তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি উপসর্গগুলির মূল অর্থ সন্ধান করিতেছেন এবং সেই এক অর্থ হইতে নানা অর্থের পরিমাণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় e (ই) উপসর্গের একটা অর্থ অভাব, আর-এক অর্থ বহির্গমতা ; educate শব্দের উৎপত্তিমূলক অর্থ বহির্নয়ন, edit শব্দের অর্থ বাহিরে দান, edentate শব্দের অর্থ দন্তহীন ; কেহ যদি দেখাইয়া দেন যে, e উপসর্গের মূল অর্থ বহির্গমতা এবং তাহা হইতেই অভাব অর্থের উৎপত্তি, অর্থাৎ যাহা বাহির হইয়া যায় তাহা থাকে না, তবে তিনি e উপসর্গের বহু অর্থ স্বীকার করেন না এ কথা বলা অসংগত। অন্তর শব্দের এক অর্থ ভিতর, আর-এক অর্থ ফাঁক ; যদি বলা যায় যে, ঐ ভিতর অর্থ হইতেই ফাঁক অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ দুই সীমার ভিতরের স্থানকেই ফাঁক বলা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা অন্তর শব্দের দুই অর্থ অস্বীকার করা হয় না। পরন্তু তাহার মূল অর্থ যে দুই নহে, এক, এই কথাই বলা হইয়া থাকে ; এবং মূল অর্থের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিলে সাধারণত শব্দের প্রয়োগ এবং তাহার রূপান্তরকরণ যথামত হইতে পারে ; এ কথাও অসংগত নহে। বস্তুত গুঁড়ি একটা হয় এবং ডাল অনেকগুলি হইয়া থাকে, ভাষাতত্ত্বের পদে পদে এ নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। একই ধাতু হইতে ঘৃণা, ঘৃত, ঘর্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্রার্থক শব্দের উৎপত্তি হইলেও মূল ধাতুর অর্থভেদ কল্পনা করা সংগত নহে। বরঞ্চ এক ধাতুমূলক নানা শব্দের মধ্যে যে-অংশে কোনো-একটা ঐক্য পাওয়া যায়, সেইখানেই ধাতুর মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তেমনই এক উপসর্গের নানা অর্থভেদের মধ্যে যদি কোনো ঐক্য আবিষ্কার করা যায়, তবে সেই ঐক্যের মধ্যে যে সেই উপসর্গের আদি অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা স্বভাবত মনে উদয় হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ব্যাপ্তিসাধন প্রণালী দ্বারা (Generalization) উপসর্গের বিচিত্র ভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে এক মূল অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এই প্রথম চেষ্টা। সুতরাং সে-চেষ্টার ফল নানাস্থানে অসম্পূর্ণ থাকাই সম্ভব এবং পরবর্তী আলোচকগণ নব নব দৃষ্টান্ত ও তুলনার সহায়তায় উক্ত প্রবন্ধের সংশোধন ও পরিপোষণ করিয়া চলিবেন আশা করা যায়। বস্তুত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত আর্যভাষার তুলনা করিয়া না দেখিলে উপসর্গের অর্থ বিচার কখনোই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং উহার মধ্যে অনেক অংশ কাল্পনিক থাকিয়া যাইতে পারে ; সেইরূপ তুলনামূলক সমালোচনাই এরূপ প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট সমালোচনা প্রাচীন শব্দাচার্য এইরূপ মত দিয়াছেন, এ কথা বলিয়া সমালোচনা করা চলে না।

প্রবন্ধকার মহাশয় প্রশ্বাস নিশ্বাস, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, প্রবাস নিবাস. প্রবেশ নিবেশ, প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রভৃতি দৃষ্টান্তযোগে প্র এবং নি উপসর্গের মূল অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্র উপসর্গের লক্ষ সম্মুখের দিকে বাহিরের দিকে, নি উপসর্গের লক্ষ ভিতরের দিকে।

ইহাদের সমশ্রেণীয় য়ুরোপীয় উপসর্গও তাহার মত সমর্থন করিতেছে। Projection, injection; progress, ingress ; induction, production ; install, forestall ; জর্মানভাষায় einfuhren— to introduce, vorfuhren— to produce। এরূপ দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

প্র, নি ; pro, in এবং vor, ein এক পর্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সমালোচক মহাশয় এক 'নিশ্বাস' শব্দ লইয়া প্রবন্ধকারের মত এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিশ্বাস শব্দ প্রশ্বাস শব্দের বৈপরীত্যবাচক নহে। তিনি প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না, তাহা বহির্গামী শ্বাস। সেইসঙ্গে বলিয়াছেন, "নিশ্বাস এই শব্দটি কোনো কোনো স্থলে 'নিঃশ্বাস' এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত হয়, কিন্তু উভয় শব্দেরই অর্থ এক।"

স যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হইয়া থাকে তখন তৎপূর্বে বিসর্গ লিখিলেও চলে, না

লিখিলেও চলে ; যথা, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, প্রাতস্নান। কিন্তু তাই বলিয়া নি উপসর্গ ও নিঃ উপসর্গ এক নহে, এমন-কি, তাহাদের বিপরীত অর্থ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমাণসহ তাহার বিচার করিয়াছেন। নি উপসর্গের গতি ভিতরের দিকে, নিঃ উপসর্গের গতি বাহিরের দিকে। নিবাস এবং নির্বাসন তাহার একটা দৃষ্টান্ত। নিঃ উপসর্গের না-অর্থ গৌণ, তাহার মুখ্যভাব বহির্গামিতা। নির্গত শব্দের অর্থ না-গত নহে, তাহার অর্থ বাহিরে গত। নিঃসৃত, বহিঃসৃত। নিক্রমণ, বহিষ্ক্রমণ। নির্ঘোষ, বহির্ব্যাপ্ত শব্দ। নির্ঝর, বহিরুদ্‌গত ঝরনা। নির্মোক, খোলস যাহা বাহিরে ত্যক্ত হয়। নিরতিশয় অর্থে, যে অতিশয় বাহিরে চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ আপনাকেও যেন অতিক্রম করিতেছে। য়ুরোপীয় e এবং ex উপসর্গে দেখা যায় তাহাদের মূল বহির্গমন অর্থ হইতে অভাব অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। নিঃ উপসর্গেও তাহাই দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম, শব্দস্তোমমহানিধি প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় অভাবার্থক নিঃ উপসর্গকে নির্গত শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা নিরর্গল— নির্গতমর্গলং যস্মাৎ, নিরর্থক— নির্গতোঽর্থো যস্মাৎ ইত্যাদি। অ এবং অন্ প্রয়োগের দ্বারা বিশুদ্ধ অভাব বুঝায়, কিন্তু নিঃ প্রয়োগে ভাব হইতে বহিশ্চ্যুতি বুঝায়। জর্মান ভাষায় ইহার স্বজাতীয় উপসর্গ— hin। নিঃ উপসর্গের বিসর্গ স্থানচ্যুতিবশত হি রূপে ন-এর পূর্বে বসিয়াছে, অথবা মূল আর্য ভাষায় যে-ধাতু ছিল তাহাতে হি পূর্বে ছিল, সংস্কৃতে তাহা বিসর্গরূপে পরে বসিয়াছে। Hin উপসর্গেরও বহির্গমতা এবং অভাব অর্থ দেখা যায়। জর্মান অভিধান hin উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলে, motion or direction from the speaker, gone, lost। সংস্কৃতে যেমন নি ভিতর এবং নিঃ বাহির বুঝায়, জর্মান ভাষায় সেইরূপ ein ভিতর এবং hin বাহির বুঝায়। Einfahren অর্থ ভিতরে আনা, hinfahren শব্দের অর্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া। লাটিন in উপসর্গে নি এবং নিঃ, ein এবং hin একত্রে সংগত হইয়াছে। innate অর্থ অন্তরে জাত, infinite অর্থ যাহা সীমার অতীত।

যাহাই হউক, প্র উপসর্গের মূল অর্থ বাহিরে, অগ্রভাগে ; নি উপসর্গের অর্থ ভিতরে এবং নিঃ উপসর্গের অর্থ ভিতর হইতে বাহিরে। অতএব নিঃ উপসর্গযোগে যে-শ্বাসের অর্থ বহির্গামী শ্বাস হইবে, নি উপসর্গযোগে তাহাই অন্তর্গমনশীল শ্বাস বুঝাইবে। অথচ ঘটনাক্রমে শ্বাস শব্দের পূর্বে নিঃ উপসর্গের বিসর্গ লোপপ্রবণ হইয়া পড়ে। অতএব এ স্থলে বানানের উপর নির্ভর করা যায় না। ফলত সংস্কৃত ভাষায় বাহ্যবায়ুগ্রহণ অর্থে সাধারণত উপসর্গহীন শ্বাস শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় শব্দই অন্তর্বায়ুর নিঃসারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

দেখা গেল, 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধে প্র এবং নি উপসর্গের যে-অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে, নিশ্বাস শব্দের আলোচনায় তাহার কোনো পরিবর্তন ঘটিতেছে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দ লইয়া সমালোচক মহাশয় বিস্তর সূক্ষ্ম তর্ক করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণ ও আলোচনা বিরক্তিজনক ও নিষ্ফল হইবে বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। পাণ্ডিত্য অনেক সময় দুর্গম পথ সৃষ্টি করে এবং সত্য সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলে। এ কথা অত্যন্ত সহজ যে, প্রবৃত্তি প্রবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা বাহিরের দিকে ধাবিত হয় ; নিবৃত্তি নিবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে।

সমালোচক মহাশয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তির এই সহজ উপপত্তি পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ জেদ করিয়া কষ্টকল্পনার পথে গিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রবৃত্তি কি, না প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ ভালো করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্বদবস্থা) (state of action) কোনো বস্তুর স্থিতির বা সত্তার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে।" ক্রিয়ার অবস্থাই যে ভালোরূপ থাকার অবস্থা এ কথা স্বীকার করা কঠিন। নিবৃত্তি শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তাহাও সংগত হয় নাই। তিনি বলেন, "নিতরাং বর্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণভাবে বেষ্টাদিশূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টাবিরাম।"

সমালোচক মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া উত্তেজনায় নিজেকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ কুর্বদবস্থায় লইয়া গেছেন— এ সম্বন্ধে আর-একটু নিতরাং বর্তন করিতেও পারিতেন ; কারণ

প্রাচীন শব্দাচার্যগণও নি উপসর্গের অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, যথা, মেদিনীকোষে নি অর্থে "মোক্ষঃ, অন্তর্ভাবং বন্ধনম্" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু পাছে সেই অর্থ স্বীকার করিলে কোনো অংশে প্রবন্ধকারের সহিত ঐক্য সংঘটন হয়, এইজন্য যত্নপূর্বক তাহা পরিহার করিয়াছেন ; ইহা নিশ্চয় একটা প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃষ্টাবৃত্তির কার্য।

নি উপসর্গ অর্থে নিতরাং কেন হইল। বস্তুত নি, প্র, পরি, উৎ প্রভৃতি অনেক উপসর্গেরই আধিক্য অর্থ দেখা যায়। ইহার কারণ, আধিক্যের নানা দিক আছে। কোনোটা বা বাহিরে বহুদূর যায়, কোনোটা ভিতরে, কোনোটা পার্শ্বে, কোনোটা উপরে। অত্যন্ত পাণ্ডিত্যকে এমনভাবে দেখা যাইতে পারে যে, তাহা পণ্ডিতমহাশয়ের মনের খুব ভিতরে তলাইয়া গিয়াছে, অথবা তাহা সকল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে চলিয়া গিয়াছে, অথবা তাহা রাশীকৃত হইয়া পর্বতের ন্যায় উপরে চড়িয়া গিয়াছে, অথবা তাহা নানা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কালক্রমে এই-সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়া সর্বপ্রকার আধিক্যকেই উক্ত যে-কোনো উপসর্গ দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে ব্যক্ত করা প্রচলিত হইয়াছে। যদিচ উৎ উপসর্গের ঊর্ধ্বগামিতার ভাব সুস্পষ্ট, এবং উৎপত্তি অনুসারে 'উদার' শব্দে বিশেষরূপে উচ্চতা ও উন্নতভাবই প্রকাশ করে, তথাপি জয়দেব রাধিকার পদপল্লবে উদার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাহার একান্ত গৌরব সূচনা করিয়াছেন মাত্র। অতএব নানা উপসর্গে যে একই ভৃশার্থ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা সেই উপসর্গগুলির ভিন্ন ভিন্ন নানা মূল অর্থেরই সমর্থন করে। অনেক স্থলেই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সময় উক্ত উপসর্গগুলির মূল অর্থ অথবা ভৃশার্থ দু-ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা, নিগূঢ় অর্থে অত্যন্ত গূঢ় অথবা ভিতরের দিকে গূঢ় দু-ই বলা যায়, intense অত্যন্তরূপে টানা অথবা ভিতরের দিকে টানা, উন্মত্ত অত্যন্ত মত্ত অথবা ঊর্ধ্বদিকে মত্ত অর্থাৎ মত্ততা ছাপাইয়া উঠিতেছে, concentrate অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত অথবা এরূপ স্থলে কেহ যদি বলেন, অত্যন্ত একত্রে কেন্দ্রীভূত। অর্থের বিকল্পে অন্য অর্থ আমি স্বীকার করিব না, তবে তাঁহার সহিত বৃথা বিতণ্ডা করিতে ক্ষান্ত থাকিব। সমালোচক মহাশয় ইহাও আলোচনা করিয়া দেখিবেন, প্রতি অনু আং প্রভৃতি উপসর্গে নিতরাং প্রকৃষ্ট সম্যক প্রভৃতি ভৃশার্থ বুঝায় না, তাহার মুখ্য কারণ ঐ-সকল উপসর্গে দূরত্ব বুঝাইতে পারে না।

যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষার উপসর্গের সহিত য়ুরোপীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলির যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের উৎপত্তিস্থল যে একই, সমালোচক মহাশয় বোধ করি তাহা অস্বীকার করেন না। সংস্কৃত উপসর্গগুলির প্রচলিত নানা অর্থের মধ্যে যে-অর্থ ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান, তাহাকেই মূল অর্থ বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে।

এইরূপ আর্যভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে-পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। যাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই সম্ভবে না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয় করিয়া কয়েকটি কথা বলিব, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা যোগ্যতর লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এই আশা করিয়া লিখিতে স্পর্ধিত হইতেছি।

প্র উপসর্গের অর্থ একটা কিছু হইতে বহির্ভাগে অগ্রগামিতা। য়ুরোপীয় উপসর্গ হইতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাভাষায় আইসা এবং পইসা নামক দুইটি ক্রিয়া আছে, তাহা আবিশ্ এবং প্রবিশ্ ধাতুমূলক— তন্মধ্যে পইসা ধাতু পশিল প্রভৃতি শব্দে বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে ও কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং আইসা ধাতু এখনো আপন অধিকার বজায় রাখিয়াছে। আইসা এবং পইসা এই দুটি ধাতুতে আ এবং প্র উপসর্গের অর্থভেদ স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা কেবল দিক্‌ভেদ, পইসা বক্তার দিক হইতে অগ্রভাগে এবং আইসা বক্তার দিকের সান্নিধ্যে আগমন সূচনা করে। য়ুরোপীয় আর্যভাষার pro উপসর্গের মুখ্য অর্থ বহির্দিকে অগ্রগামিতা এ কথা সর্ববাদিসম্মত ; অতএব এই অর্থ যে মূল প্রাচীন অর্থ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এ কথা স্বীকার্য যে, সূর্যের বর্ণরশ্মির ন্যায় প্র উপসর্গ য়ুরোপীয় ভাষায় নানা উপসর্গে বিভক্ত

হইয়াছে। Pro, pre, per তাহার উদাহরণ। প্রো সম্মুখগামিতা, প্রি পূর্বগামিতা এবং পর্ পারগামিতা অর্থাৎ দূরগামিতা প্রকাশ করে। কাল হিসাবে অগ্রবর্তিতা বক্তার মনের গতি অনুসারে পশ্চাৎকালেও খাটে সম্মুখকালেও খাটে, এই কারণে 'প্রাচীন' শব্দে 'প্র' উপসর্গ অসংগত হয় না। পুরঃ এবং পুরা শব্দে ইহার অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। উভয় শব্দের একই উৎপত্তি হইলেও পুরঃ শব্দ দেশ হিসাবে নিকটবর্তী সম্মুখস্থ দেশ এবং পুরা শব্দ কাল হিসাবে দূরবর্তী অতীত কালকে বুঝায়। পূর্ব শব্দেরও প্রয়োগ এইরূপ। পূর্বস্থিত পদার্থ সম্মুখে বর্তমান, কিন্তু পূর্বকাল অতীতকাল। অতএব প্রাচীন শব্দাচার্যগণ যে প্র উপসর্গের 'প্রাথম্যং' এবং 'আরম্ভঃ' অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অগ্রগামিতা অর্থেরই রূপভেদ মাত্র। লাটিন ভাষায় তাহাই প্রো এবং প্রি দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রীক প্রো উপসর্গে প্রাথম্য অর্থও সূচিত হয়, যথা prologue ; অপর পক্ষে সম্মুখগমতাও ব্যক্ত করে, যথা proboskis, শুণ্ড— উহার উপপত্তিমূলক অর্থ প্রভক্ষক, যাহা সম্মুখ হইতে খায়। লাটিন পর্ উপসর্গের অর্থ through, অর্থাৎ একপ্রান্ত হইতে পরপ্রান্তের অভিমুখতা, পারগামিতা। তাহা হইতে স্বভাবতই 'সর্বতোভাব' অর্থও ব্যক্ত হয়। দুর্গাদাস-ধৃত পুরুষোত্তমের মতে প্র উপসর্গের সর্বতোভাব অর্থও স্বীকৃত হইয়াছে।

পরি এবং পরা উপসর্গও এই প্র উপসর্গের সহোদর। প্র উপসর্গ বিশেষরূপে বহির্ব্যঞ্জক। Fro, from, fore, forth প্রভৃতি ইংরেজি অব্যয় শব্দগুলি এই অর্থ সমর্থন করে। পরি এবং পরা উপসর্গেও সেই বাহিরের ভাব, পরভাব, অনাত্মভাব বুঝায়। গ্রীক উপসর্গ peri এবং para, পরি এবং পরা উপসর্গের স্বশ্রেণীয়। গ্রীক ভাষায় পরি উপসর্গে নিকট এবং চতুর্দিক দু-ই বুঝায়। উক্ত উপসর্গ perigee perihelion শব্দে নৈকট্য অর্থে এবং periphery periphrasis শব্দে পরিবেষ্টন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক para উপসর্গেরও একাধিক অর্থ আছে। দূরার্থ, যথা paragoge (addition of a letter or syllable to the end of a word : from para, beyond and ago, to lead), paralogism (reasoning beside or from the point : from para, beyond and logismos, discourse)। Para উসপর্গের আর-একটি অর্থ পাশাপাশি, কিন্তু সে-পাশাপাশি নিকট অর্থে নহে, সংলগ্ন অর্থে নহে, তাহাতে মুখ্যরূপে বিচ্ছেদভাবই প্রকাশ করে। Parallel অর্থে যাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে কিন্তু ঘেঁষাঘেঁষি নহে ; এমন-কি, মিলন হইলেই 'প্যারালাল'ত্ব ব্যর্থ হইয়া যায়। Paraphrase অর্থে বুঝায় মূল বাক্যের পাশাপাশি এমন বাক্যপ্রয়োগ যাহারা একভাবাত্মক অথচ এক নহে। Peri উপসর্গে যেমন অবিচ্ছেদ বহির্বেষ্টন বুঝায়, para উপসর্গেও সেইরূপে বাহিরে স্থিতি বুঝায় কিন্তু তাহাতে মধ্যে বিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখে।

প্রতি উপসর্গও প্র উপসর্গের একটি শাখা। প্রতি উপসর্গ প্র উপসর্গের সাধারণ অর্থকে একটি বিশেষ অর্থে সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছে। ইহাতেও প্র উপসর্গের বাহিরের দিকে অগ্রসর হওয়া বুঝায়, কিন্তু সম্মুখভাগে একটি বিশেষ বাধা লক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে। গ্রীক pros এবং প্রাচীন গ্রীক proti উপসর্গ সংস্কৃত প্রতি উপসর্গের একজাতীয়। লাটিন উপসর্গ por (portend) এবং প্রাচীন লাটিন উপসর্গের port-ও এই শ্রেণীভুক্ত।

নি, in, ein এক পর্যায়গত উপসর্গ। নি এবং in উপসর্গে অন্তর্ভাব এবং কখনো কখনো অভাব বুঝায়। যাহা ভিতরে চলিয়া যায়, অন্তর্হিত হয়, তাহা আর দেখা যায় না। বস্তুত, নি অন্ত অন্তর, এগুলি একজাতীয়। নি নির্ অন্ত অন্তর, in en (গ্রীক) anti ante ein hin ent, নি ও নিঃ অব্যয় ও উপসর্গগুলিকে এক গণ্ডির মধ্যে ধরা যায়। ইহা দেখা গিয়াছে যে সংস্কৃত ভাষায় নি উপসর্গে যে ইকার পরে বসিয়াছে অধিকাংশ য়ুরোপীয় আর্যভাষাতেই তাহা পূর্বে বসিয়াছে। অ্যাংলোস্যাক্সন ডাচ জর্মান গথ ওয়েলস্ আইরিশ ও লাটিন ভাষায় in, গ্রীকভাষায় en, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষায় ন-বর্জিত শুদ্ধমাত্র i দেখা যায়। মূল আর্যভাষার অ স্বরবর্ণ সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে, য়ুরোপীয় আর্যভাষায় তাহা হয় নাই, শব্দশাস্ত্রে এই কথা বলে। অধ্যাপক উইল্‌কিন্স 'গ্রীকভাষা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

But while Graeco-Italic consonants are on the whole the same as those of the primitive tongue, there is a highly important and significant change in the vowel-system. The original a, retained for the most part in Sanskrit, and modified in Zend only under conditions which make it plain that this is not a phenomenon of very ancient date there, has in Europe undergone a change in two directions.

সেই দ্বিবিধ পরিবর্তন এই যে, অ কোথাও e, i এবং কোথাও o, u আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা হইতে এ কথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূল আর্যভাষায় যাহা অন্ ছিল, য়ুরোপীয় আর্যভাষায় তাহা ইন্ ও এন্ হইয়াছে। লাটিন ইন্ উপসর্গের উত্তর তর প্রত্যয় করিয়া inter intra intro প্রভৃতি শব্দের উদ্‌ভব হইয়াছে। সংস্কৃত অন্তর শব্দের সহিত তার সারূপ্য সহজেই হৃদয়ংগম হয়।

এইরূপে অন্ শব্দকেই অন্ত ও অন্তর শব্দের মূল বলিয়া ধরিলে, অভাবাত্মক অ অন্ ন নি, an (Greek) in un শব্দগুলির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়। অন্ত অর্থে শেষ ; যেখানে গিয়া কোনো জিনিস 'না' হইয়া যায় সেইখানেই তাহার অন্ত। অন্তর অর্থে যেখানে দূর সেখানে অন্তভাবেরই আধিক্য প্রকাশ করে। অন্তর অর্থে যেখানে ভিতর, সেখানেও একজাতীয় শেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্যতার অন্ত বুঝাইয়া থাকে। জর্মান ভাষায় unter, ইংরেজি ভাষায় under যদিও অন্তর শব্দের একজাতীয়, তথাপি তাহাতে ভিতর না বুঝাইয়া নিম্ন বুঝায় ; যাহা আর-কিছুর নীচে চাপা পড়ে তাহা প্রত্যক্ষগোচরতার অন্তে গমন করে। লাটিন উপসর্গ ante দেশ বা কালের পূর্বপ্রান্ত নির্দেশ করে। সংস্কৃত ভাষায় অন্তর বলিতে ভিতর এবং অন্তর বলিতে বাহির (তদন্তর অর্থে তাহার পরে অর্থাৎ তাহার বাহিরে), অন্তর বলিতে দূর বুঝায়— শেষের ভাব, প্রান্তের ভাব এই-সকল অর্থের মূল।

অতএব নি ও নির্ উপসর্গ এবং তাহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে অন্তের ভাব, অন্তর্ভাব, এবং অন্তর্ধানের ভাব কিরূপে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন নহে। এবং মূল অন্ শব্দ হইতে কিরূপে ন নি নিঃ, in hin en ein প্রভৃতি নানা রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও লক্ষ করিলে দেখা যায়।

সংস্কৃত অনু এবং গ্রীক ana, যাহার মুখ্য অর্থ কাহারও পশ্চাদ্‌বর্তিতা এবং গৌণ অর্থ তুল্যতা এবং পৌনঃপুন্য, পূর্বোক্ত অন্ ধাতুর সহিত তাহারও সম্বন্ধ আছে বলিয়া গণ্য করি।

লাটিন de dis এবং সংস্কৃত বি উপসর্গ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় শব্দশাস্ত্রে যে-মত প্রচলিত আছে তাহা শ্রদ্ধেয়। দ্বি (অর্থাৎ দুই) শব্দ সংকুচিত হইয়া দি এবং ভারতে বি রূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার ভাবই এই— খণ্ডিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সেইসঙ্গে নষ্ট হওয়া। Joint বা যোগ দুইখানা হইয়া গেলেই disjointed বা বিযুক্ত হইতে হয়। এই খণ্ডীভবনের ভাব হইতেই de এবং বি উপসর্গে deformity বিকৃতির ভাব আসিয়াছে এবং সাধারণ হইতে খণ্ডীকৃত হইবার ভাব হইতেই বি এবং de উপসর্গের 'বিশেষত্ব' অর্থ উদ্‌ভাবিত হইয়াছে।

আ অভি অপি অপ অব অধি এবং অতি উপসর্গগুলিকে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করা যায়। আ উপসর্গের অর্থ নিকটলগ্নতা ; ইংরেজি উপসর্গ a (aback, asleep), জর্মান an (ankommen অর্থাৎ আগমন), লাটিন ad, ইংরেজি অব্যয় at সংস্কৃত আ উপসর্গের প্রতিরূপ। এই নৈকট্য অর্থ সংস্কৃত ভাষায় স্থিতি এবং গতি অনুসারে আ এবং অভি এই দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। যাহা নৈকট্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আ এবং যাহা নৈকট্যের চেষ্টা করিতেছে তাহা অভি উপসর্গের দ্বারা ব্যক্ত হয়। অভ্যাগতশব্দে এই দুই ভাব একত্রেই সূচিত হয় ; অভি উপসর্গের দ্বারা দূর হইতে নিকটে আসিবার চেষ্টা এবং আ উপসর্গের দ্বারা সেই চেষ্টার সফলতা, উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে। যে-লোক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নিকটে আসিয়াছে সে-ই অভ্যাগত। কিন্তু ইহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে স্থানভেদে এই দুই অর্থই ব্যক্ত হয়। A an ad, সংস্কৃত আ এবং অভি উভয় উপসর্গেরই স্থান অধিকার করিয়াছে। Adjacent adjective adjunct শব্দগুলিকে আসন্ন আক্ষিপ্ত আবদ্ধ শব্দ দ্বারা অনুবাদ

করিলে মূল শব্দের তাৎপর্য যথাযথ ব্যক্ত করে। কিন্তু adduce adress advent শব্দ অভিনয়ন অভিদেশ (অভিনির্দেশ) এবং অভিবর্তন শব্দ দ্বারা অনুবাদযোগ্য। সংস্কৃত অধি উপসর্গও এই ad উপসর্গের সহিত জড়িত।

অপ উপসর্গ আ এবং অভির বিপরীত। লাটিন ab, গ্রীক apo, জর্মান ab এবং ইংরেজি off ইহার স্বজাতীয়। ইহার অর্থ from, নিকট হইতে দূরে। এই দূরীকরণতা হইতে ন্যগ্‌ ভাব অর্থাৎ ঘৃণাব্যঞ্জকতাও অপ উপসর্গের একটি অর্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরেজি ভাষাতেও abject abduction aberration abhor শব্দ আলোচনা করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়।

লাটিন sub, গ্রীক hupo যে উপ উপসর্গের স্বজাতীয় ইহা সকলেই জানেন। অব শব্দের নিম্নগতার উপ শব্দের নিম্নবর্তিতার কিঞ্চিৎ অর্থভেদ আছে। উপ উপসর্গে উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটি যোগ রাখিয়া দেয়, অব উপসর্গে সেই সম্বন্ধটি নাই। কূল ও শাখার তুলনায় উপকূল উপশাখা যদিচ নিম্নশ্রেণীয়, তথাপি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নিম্নে বসা মাত্রকেই উপাসনা বলে না, পরন্তু আর-কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নে নিজেকে আসীন করাই উপাসনা শব্দের উপপত্তিমূলক ভাবার্থ।

Hyper hupar up super উপসর্গগুলির সহিত সংস্কৃত উৎ উপসর্গের সম্পর্ক শ্রুতিমাত্র হৃদয়ংগম হয় না। কিন্তু উৎ হইতে উপ্‌ ; উধ হইতে উভ শব্দের উদ্‌ভব শব্দশাস্ত্র-মতে সংগত। প্রাচীন বাংলার উভমুখ, উভকর, উভরায় শব্দ তাহার প্রমাণ। পালিতেও উর্ধ্বম্‌ অব্যয়শব্দ উব্‌ভম হইয়াছে। উৎছলিত হওয়াকে বাংলায় উপছিয়া পড়া কহে। উৎপাটিত করাকে উপড়াইয়া ফেলা বলে।

সম উপসর্গ যে গ্রীক syn এবং লাটিন con উপসর্গের একজাতীয় এবং একত্রীভবনের ভাবই তাহার মূল অর্থ, এ সম্বন্ধেও আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা করি না। খণ্ডিত হওয়ার ভাব হইতে বি উপসর্গে যেরূপ বিকৃতি অর্থ আসিয়াছে, একত্রিত হওয়ার ভাব হইতে সং উপসর্গে ঠিক তাহার উলটা অর্থ প্রকাশ করে। ফলত সং এবং বি পরস্পর বৈপরীত্যবাচক উপসর্গ। সং এক এবং বি দুই। চেম্বার্সের অভিধানে syn উপসর্গ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে— the root originally signifying one is seen in L, simmul, together simple। শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে— Simplus, sim once, plico to fold। বিখ্যাত ঋক্‌ মন্ত্রে সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং শ্লোকে স্পষ্টতই সং শব্দের একত্ব অর্থ প্রকাশ পায় ; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন আর্যভাষায় সং শব্দের কোনো মূল ধাতুর অর্থ যে এক ছিল, সে অনুমান অন্যায় নহে।

যাহা হউক, অভিধানে উপসর্গগুলির যে-সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা না হইলেও, তাহারা যে মূল অর্থ নহে এবং বিচিত্র আর্যভাষার তুলনা করিয়া যে মূল অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করা যাইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বহুল পরিমাণে তুলনামূলক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি। ফলত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অবহেলা সহকারে 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে।

১৩০৬

প্রাকৃত ও সংস্কৃত

শ্রীনাথবাবু তাঁহার 'ভাষাতত্ত্ব'-সমালোচনার প্রতিবাদে[১] প্রাচীন বাংলাসাহিত্য হইতে যে-সকল উদাহরণ[২] উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়ছে, জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হইত। মারাঠি ভাষায় এখনো প্রাকৃত শব্দের সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু প্রাকৃত শব্দের এই প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় চলে নাই, চলা প্রার্থনীয় কি না সন্দেহ।

পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা, সাধারণকথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন যাহা প্রাকৃত ছিল তাহাই বিশেষরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।

এখনো বাংলায় লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যদি ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণকথিত বাংলাকে প্রাকৃত বলি, তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাংলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুত এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইহাই। কিন্তু এরূপ হইলে বিপাকে পড়িতে হইবে।

কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নাটকে যে-প্রাকৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সময়ের চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষা প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, অথচ সাহিত্যের প্রাকৃত একই এবং সে-প্রাকৃতের এক ব্যাকরণ। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় হয় না যে, বিশেষ সময়ের ও বিশেষ দেশের চলিত ভাষা অভিধানে প্রাকৃত শব্দে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া গেছে ; অন্য দেশকালের প্রাকৃতকে 'প্রাকৃত' বলিতে গেলে কেঁচোকেও উদ্ভিদ বলা যাইতে পারে।

যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলাশব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়, যদি লিখিত বাংলাকে 'সংস্কৃত বাংলা' ও কথিত বাংলাকে 'প্রাকৃত বাংলা' বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাকৃত ভাষা অন্যরূপ। প্রাকৃত ভাষা বাংলাভাষা নহে, বররুচি তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

১৩০৮

বাংলা ব্যাকরণ

তর্কের বিষয়টা কী, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয় ; অবশেষে খুনাখুনি রক্তপাতের পর হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, দুই পক্ষের মধ্যে মতের বিশেষ অনৈক্য নাই। অতএব ঝগড়াটা কোন্‌খানে, সেইটে আবিষ্কার করা একটা মস্ত কাজ।

আমি কতকগুলা বাংলাপ্রত্যয় ও তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা বিচারের জন্য 'পরিষৎ'-সভার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।[৩] আমার সে-লেখাটা এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হয় নাই, সুতরাং আমার তরফের বক্তব্য পাঠকের সম্মুখে অনুপস্থিত। শুনিয়াছি, কোন্ সুযোগে তাহার প্রুফটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কোন্ কাগজে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইয়া গেছে।[৪] আমার সাক্ষী হাজির নাই, এই অবকাশে বাদের পূর্বেই প্রতিবাদকে পাঠকসভায় উপস্থিত করিয়া একতরফা মীমাংসার চেষ্টা করাকে

১ শ্রীনাথ সেন প্রণীত ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮) গ্রন্থকার-কৃত প্রতিবাদ (আলোচনা গ :-বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮)।

২ দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, বর্তমান খণ্ড।

৩ দ্রষ্টব্য "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত", পৃ· ৩৮২

৪ নূতন বাংলা ব্যাকরণ— শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী : ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৮

ঠিক ধর্মযুদ্ধ বলে না।

এখন সে লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা।

বাংলায় জল হইতে জোলো, মদ হইতে মোদো, পানি হইতে পানতা, নুন হইতে নোনতা, বাঁদর হইতে বাঁদ্‌রাম, জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির জন্য যে অল্প একটুখানি বেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধারণের কাছে মনে মনে দাবি করিয়াছিলাম, তাহা নামঞ্জুর হইয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করিতাম না। সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিক্ষায় কাজ নাই, এখন কুত্তা বুলাইয়া লইলে বাঁচি।

এখন আমার নামে উলটা অভিযোগ আসিয়াছে যে, আমি এই চলিত কথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলাভাষাটাকেই মাটি করিবার চেষ্টায় আছি।

যে-কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর-কাহারও সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারও কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিত কথাগুলি এবং সংস্কৃত-ব্যাকরণনিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখমাত্র করিলেই বাংলাভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন ধারণা কেন হয়। হিন্দুঘরে গ্রাম্য আত্মীয়ের, দরিদ্র আত্মীয়েরও তো প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো জবাব দেয়, উহারা আত্মীয় বটে কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে।

বাংলায় যাহা-কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃতনিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা-নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলাভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, 'পাগলাম' এবং 'সাহেবিয়ানা' কথা যে বাংলায় আছে, ও 'আম' এবং 'আনা' নামক সংস্কৃতের প্রত্যয় দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যায়— এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন 'উন্মত্ততা' ও 'ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব' কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্য কথা দুটার অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।

সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে 'বালক', দ্বিবচনে 'বালকেরা' ও বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলাক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়— একবচন 'হইল', দ্বিবচন 'হইল', বহুবচন 'হইল' ; একবচন 'দিয়াছে', দ্বিবচন 'দিয়াছে', বহুবচন 'দিয়াছে' ইত্যাদি। 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক ; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক ; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন-কারক ; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন-কারক এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর ; এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত কর্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্ভূত। 'করিল' ক্রিয়াপদ 'কৃত' হইতে, 'করিব করিবে' 'কর্তব্য' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে ; হ্যর্নলে-সাহেব তাঁহার তুলনামূলক গৌড়ীয় ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাগ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি 'এন' বাংলায় 'এ' হইয়াছে ; যেমন, বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে, চোখে দেখিতে পাই না ইত্যাদি। বাঘে খাইল, কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জমা ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ। কিন্তু খাদিত শব্দ বাংলায় খাইল আকার ধারণ করিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল ; সুতরাং বাঘ যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য, ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ, বাংলায় হইল বাঘে রামকে খাইল ; বাঘে শব্দে করণকারকের এ-কার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাম শব্দে কর্মকারকের কে বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। পণ্ডিতমশায় বলিতে পারেন, হ্যর্নলে সাহেব-টাহেব আমি মানি না, বাংলায় এ-কার বিভক্তি কর্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক, তেমন করিয়া মেলানো যায় কি না। ধনে শ্যামকে বশ করা গেছে, ইহার সংস্কৃত অনুবাদ ধনেন শ্যামো বশীকৃতঃ। কিন্তু বাংলাবাক্যটির কর্তা কে। 'ধনে' যদি কর্তা হইত, তবে 'করা গেছে' ক্রিয়া 'করিয়াছে' রূপ ধরিত। 'তাঁহাকে' শব্দ কর্তা নহে, 'কে' বিভক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কর্তা উহ্য আছে বলা যায় না ; কারণ 'করা গেছে' ক্রিয়া কর্তা মানে না, আমরা করা গেছে, তাঁহারা করা গেছে, হয় না। অথচ ভাবার্থ দেখিতে গেলে, 'বশ করা গেছে' ক্রিয়ার কর্তা উহ্যভাবে 'আমরা'। করা গেছে, খাওয়া গেছে, হওয়া গেছে, সর্বত্রই উত্তম পুরুষ। কিন্তু এই 'আমরা' কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই ; আমরা আয়োজন করা গেছে, বলিতেই পারি না। এইরূপ কর্তৃহীন কবন্ধবাক্য সংস্কৃত ভাষায় হয় না বলিয়া কি পণ্ডিতমশায় বাংলা হইতে ইহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। তাঁহাকে নাচিতে হইবে, কথাটার সংস্কৃত কী। তাং নর্তিতুং ভবিষ্যতি, নহে। যদি বলি, 'নাচিতে হইবে' এক কথা, তবু 'তাং নর্তব্যম্' হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতে যেখানে 'তয়া নর্তব্যম্' বাংলায় সেখানে 'তাহাকে নাচিতে হইবে'। ইহা বাংলা ব্যাকরণ না সংস্কৃত ব্যাকরণ ? আমার করা চাই— এই 'চাই' ক্রিয়াটা কী। ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে উত্তমপুরুষ বোধ হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ইহাকে 'মম করণং যাচে' বলা চলে না। বাংলাতেও 'আমি আমার করা চাই' এমন কখনো বলি না। বস্তুত 'আমার করা চাই' যখন বলি, তখন অধিকাংশ সময়েই সেটা আমি চাই না, পেয়াদায় চায়। অতএব এই 'চাই' ক্রিয়াটা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন্ জিনিসটার কোন্ সম্বন্ধী। আমাকে তোমার পড়াতে হবে, এখানে 'তোমার' সর্বনামটি সংস্কৃত কোন্ নিয়মমতে সম্বন্ধপদ হয়। এই বাক্যের অনুবাদ ত্বং মাং পাঠয়িতুম্ অর্হসি ; এখানে ত্বং কর্তৃকারক ও প্রথমা এবং অর্হসি মধ্যমপুরুষ— কিন্তু বাংলায় 'তোমার' সম্বন্ধপদ এবং 'হবে' প্রথমপুরুষ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এ-সকল বাক্য সাধা অসাধ্য, বাংলাভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য। পণ্ডিতমশায় কোন্ পথে যাইবেন। 'আমাকে তোমার পড়াতে হবে' বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃতনিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে।

অপর পক্ষে বলিতে পারেন, যেখানে সংস্কৃতে বাংলায় যথার্থ প্রভেদ ঘটিয়াছে, সেখানে প্রভেদ মানিতে রাজি আছি, কিন্তু যেখানে প্রভেদ নাই, সেখানে তো ঐক্য স্বীকার করিতে হয়। যেমন সংস্কৃত ভাষায় ইন্ প্রত্যয়যোগে 'বাস' হইতে 'বাসী' হয়, তেমনই সেই সংস্কৃত 'ইন্' প্রত্যয়ের যোগেই বাংলা দাগ হইতে দাগী হয়— বাংলাপ্রত্যয়টাকে কেহ যদি ই প্রত্যয় নাম দেয় তবে সে অন্যায় করে।

আমরা বলিয়াছিলাম বটে যে, চাষি, দামি, দাগি, দোকানি প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়যোগে নহে, বাংলা ই প্রত্যয়যোগে হইয়াছে। কেন বলিয়াছিলাম বলি।

জিজ্ঞাস্য এই যে, বাসী শব্দ যে প্রত্যয়যোগে ঈ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ঈ প্রত্যয় না বলিয়া ইন্

প্রত্যয় কেন বলা হইয়াছে। ইন্ প্রত্যয়ের ন্-টা মাঝে মাঝে 'বাসিন্' 'বাসিনী' রূপে বাহির হইয়া পড়ে বলিয়াই তো ? যদি কোথাও কোনো অবস্থাতেই সে ন্ না দেখা যায় তবু কি ইহাকে ইন্ প্রত্যয় বলি। ব্যাঙাচির লেজ ছিল বটে, কিন্তু সে লেজটা খসিয়া গেলেও কি ব্যাঙকে লেজবিশিষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু পণ্ডিতমশায় বলেন, সংস্কৃত মানী শব্দও তো বাংলায় 'মানিন্' হয় না। আমাদের বক্তব্য এই যে, কেহ যদি সেইভাবে কোথাও ব্যবহার করেন, তাঁহাকে কেহ একঘরে করিবে না ; অন্তত মানী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মানিনী' হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীবিদ্যালয়ের মসীচিহ্নিত বালিকাকে যদি 'দাগিনী' বলা যায়, তবে ছাত্রীও হাঁ করিয়া থাকিবে, তাহার পণ্ডিতও টাকে হাত বুলাইবেন।

তখন বৈয়াকরণ পণ্ডিতমশায় উলটিয়া বলিবেন, দাগ কথাটা যে বাংলাকথা, ওটা তো সংস্কৃত নয়, সেইজন্য স্ত্রীলিঙ্গে তাহার ব্যবহার হয় না। ঠিক কথা, যেমন বাংলায় বিশেষণশব্দ স্ত্রীলিঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিয়াছে, তেমনই বাংলায় ইন্ প্রত্যয় তাহার ন্ বর্জন করিয়া ই প্রত্যয় হইয়াছে।

ভালো, একটি সংস্কৃত কথাই বাহির করা যাক। ভার শব্দ সংস্কৃত। তবু আমাদের মতে 'ভারি' কথায় বাংলা ই প্রত্যয় হইয়াছে, সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, 'ভারিণী নৌকা' লিখিতে পণ্ডিতমশায়ের কলমও দ্বিধা করিবে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, মানী কথাটা প্রত্যয় সমেত সংস্কৃত ভাষা হইতে পাইয়াছি; ভারি কথাটা পাই নাই ; আমাদের প্রয়োজনমত আমরা উহাকে বাংলা প্রত্যয়ের ছাঁচে ঢালিয়া তৈরি করিয়া লইয়াছি। মাস্টার কথা আমরা ইংরেজি হইতে পাইয়াছি, কিন্তু মাস্টারি (মাস্টার-বৃত্তি) কথায় আমরা বাংলা ই প্রত্যয় যোগ করিয়াছি। এই ই ইংরেজি mastery শব্দের y নহে। সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা লিখিবার সময় কেহ যদি 'ভো স্বদেশিন্' লেখেন, তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচক প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কেহ যদি 'ভো বিলাতিন্' লিখিয়া রচনার গাম্ভীর্যসঞ্চার করিতে চান, তবে ঘরে-পরে সকলেই হাসিয়া উঠিবে। কেহ বলিতে পারেন 'বিলাতি' সংস্কৃত ই প্রত্যয়, ইন্ প্রত্যয় নহে। আচ্ছা, দোকান যাহার আছে সেই 'দোকানি'কে সম্ভাষণকালে 'দোকানিন্' এবং তাহার স্ত্রীকে 'দোকানিনী' বলা যায় কি।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাংলায় 'রাগ' শব্দের অর্থ ক্রোধ ; সেই 'রাগ' শব্দের উত্তর ই প্রত্যয়ে 'রাগি' হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর কাল হইতে আজ পর্যন্ত পণ্ডিত অপণ্ডিত কেহই রুষ্টা স্ত্রীলোককে 'রাগিণী' বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই।

গোবিন্দদাস রাধিকার বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন :

নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে !

গোবিন্দদাস মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সংগীতের 'রাগিণী' কথাটা সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। 'অনুরাগী' কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, সে যেমনই হউক, এ-সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন ; আমিও সে কথা স্বীকার করি। প্রমাণ হইয়াছে, একই মূল হইতে 'হংস' এবং ইংরেজি 'গ্যান্ডার' শব্দ উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া গ্যান্ডার সংস্কৃত হংস শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে 'গ্যান্ডারী' না হইয়া 'গৃস্' হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই আর্যপিতামহ হইতে বপ্ বার্নুফ্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শাব্দিক ও বাঙালি ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না ; অতএব উৎপত্তি এক হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্নপ্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্ প্রত্যয় হইতে বাংলা ই প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তবু তাহা ইন্ প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না ; এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন কোঠায় না ফেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের ফলার লোহা হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছুঁচ দিয়া মাটি চষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে।

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক,

নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দুভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোশাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুললক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃতশব্দ ক'টা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে, ছাপাখানার কালির ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যাবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়।

ইন্ প্রত্যয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে ইনী ও ঈ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' 'ই' পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালি হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে। রয়ের পরে সে আর মূর্ধন্য ণ গ্রহণ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে কিন্তু জিহ্বাগ্রে করে না— সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এইজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে। সে যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইত, তবে 'পাঁঠা' হইতে 'পাঁঠি' হইত না, 'বাঘ' হইতে 'বাঘিনী' হইত না। কলু হইতে কলুনি, ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে মুগ্ধবোধের সূত্র টুকরা টুকরা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, ছি ছি ও কথাগুলা অকিঞ্চিৎকর, উহাদের সম্বন্ধে কোনো বাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর এই যে, কমলি নেই ছোড়তা। পণ্ডিতমশায়ও ঘরের মধ্যে কলুর স্ত্রীকে 'কল্বী' অথবা 'তৈলযন্ত্রপরিচালিকা' বলেন না, সে স্থলে আমরা কোন্ ছার! মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তুমি ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব ছাড়িলাম আর কই। একতলাতেই যাহার বাস তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই— নীচেই তো আছি। ঘোটকীর দীর্ঘ ঈ-তে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে— কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীনভাষা তাহাকে এ অধিকার দেয় নাই। কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই; তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে। টিপুসুলতানের কোনো বংশধর যদি নিজেকে মৈশুরের রাজা বলেন, তবে তাঁহার পারিষদরা তাহাতে সায় দিতে পারে, কিন্তু রাজত্ব মিলিবে না। হ্রস্ব ই-কে জোর করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব মিলিবে না। যেখানে খাস বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ-র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক, মেছনি কথাটার মধ্যে পূর্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স, এবং যফলা কোথায় গেল। ম্-এ একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন। ন-টা কোথাকার কে। ওটা কি মৎস্যজীবিনীর ন। তবে জীবিটা গেল কোথায়। এমন আরো অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে— এই ছ-ই ৎ এবং স-এর ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা 'বাছা' শব্দের মধ্যেও আছে। পরিবর্তনপরম্পরায় যফলা লোপ পাইয়া পূর্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে

কাল করিয়াছে— অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা পূর্ব ইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। মাছ শব্দের উত্তর বাংলাপ্রত্যয় উয়া যোগ হইয়া 'মাছুয়া' হয়, মাছুয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার 'মেছো' ; মেছো শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয় হইয়াছে। এই নি প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলা উচ্চারণের সত্যরক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈ-র স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে য়াহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করা বিধি হয়, তবে 'মৎস্য' লিখিয়া 'মাছ' পড়িলে ক্ষতি নাই। পণ্ডিত বলিবেন, আমরা সংস্কৃত শব্দেও তিন স, দুই ন, য ও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরকে লিখি শুদ্ধ, কিন্তু পড়ি অশুদ্ধ, অতএব ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চারণের সহিত বানানের অনৈক্য বাংলাতেও চালানো যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, অনেক বাঙালি ইংরাজি w বর্ণের উচ্চারণ করেন না— তাঁহারা লেখেন wood, কিন্তু উচ্চারণ করেন ood ; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের উচ্চারণদোষের অনুরূপ বানান করিবার অধিকার তাঁহার নাই ; ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে ; ইহার বানানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থবোধই হইবে না। কিন্তু, আলমারি শব্দ 'আলমাইরা' হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা জন্মান্তরগ্রহণকালে বাঙালি হইয়া গেছে ; সুতরাং বাংলা আলমারি-কে 'আলমাইরা' লিখিলে চলিবে না। সহস্র পারসি কথা বিকৃত হইয়া বাংলা হইয়া গেছে, এখন তাহাদের আর জাতে তোলা চলে না ; আমরা লোকসান-কে 'নুক্সান্' লিখিলে ভুল হইবে, এমন-কি, লুকসান-ও লিখিতে পারি না। কিন্তু যে পারসি শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, অথচ আমাদের রসনার অভ্যাসবশত যাহার উচ্চারণের কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহার বানান বিশুদ্ধ আদর্শের অনুরূপ লেখা উচিত। অনেক হিন্দুস্থানি নাইয়ের নীচে ধুতি পরে ; আমরা তাহাদের প্রথা জানি, সুতরাং আশ্চর্য হই না— কিন্তু সে যদি নাইয়ের নীচে প্যান্টলুন্ পরে, তবে তাহাকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিয়া দিতে হয়। নিজের জিনিস নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়, পরের জিনিসে নিজের নিয়ম খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে-সংস্কৃতশব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে— এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।

কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা জড়-এর জ এবং যখন-এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদা রকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলাগদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়া লেখা চলিত— ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ-কে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতো হইল ; তাহার—

আধভালে শুদ্ধ অন্তস্থ সাজে
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁটি বাংলাশব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের রচনাপঙ্ক্তির মধ্যে পারতপক্ষে স্থান দেন নাই— কেবল যে-সকল ক্রিয়া ও অব্যয় পদ নহিলে নয়, সেইগুলাকে সংস্কৃত বানানের দ্বারা যথাসাধ্য শোধন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ খাস বাংলাকথা সম্বন্ধে এখনো আমাদের অভ্যাস খারাপ হয় নাই ; সেগুলার খাঁটি বাংলা বানান চালাইবার সময় এখনো আছে।

আমরা এ কথা বলিয়া থাকি, সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত বলে, বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলা যায় না। ইহাতে যিনি, সংস্কৃত ব্যাকরণের অপমান বোধ করেন, তিনি বলেন, কেন ণিজন্ত বলিব না, অবশ্য বলিব। কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের দুইটি লাইন মনে পড়ে :

কেন গাহিব না অবশ্য গাহিব,
গাহে না কি কেহ সুস্বর বিহনে।

ণিজন্ত শব্দ সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহাশয়ের সেইরূপ অটল জেদ, তিনি বলেন, ণিজন্ত—

কেন বলিব না অবশ্য বলিব
বলে না কি কেহ কারণ বিহনে ?

আমরা ব্যাকরণে পণ্ডিত নই, তবু আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে ণিচ্ একটা সংকেত মাত্র— যেখানে সে-সংকেত খাটে না, সেখানে তাহার কোনোই অর্থ নাই। ণিচ্-এর সংকেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ঐ কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের খেতে লাঙল চলিবে কেন, নিশ্চয় দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড় জিনিস অত্যন্ত দামি উৎকৃষ্ট জিনিস হইলেও তবু চলিবে না। শ্রু ধাতু যে-নিয়মে 'শ্রাবি' হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর 'শু' 'শৌ' হইয়া ও পরে ইকার যোগে 'শৌনিতেছে' হইত। হয়তো খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃত পঠ্ ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড় ধাতু হইতে 'পড়ান' হয় 'পাড়ন' হয় না। অতএব সেখানে তাহার সংকেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্ সিগ্নালার তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর-একটি যে-সংকেত বসিয়া আছে, সে হয়তো তাহারই শ্রীমান পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে— কৌলিক সাদৃশ্য তো কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তবু যদি বাংলায় সেই ণিচ্ প্রত্যয়ই আছে বলিতে হয়, তবে ধ্রুপদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কাওয়ালিকে চৌতাল নাম দিলেও দোষ হয় না। প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে।

যে সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব মাধুর্য ওজন করা ব্যাকরণকারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে-ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক বা না-করুক, তিনি উদাসীন। কাহারও প্রতি তাঁহার কোনো আদেশ নাই, অনুশাসন নাই। জীবতত্ত্ববিৎ কুকুরের বিষয়ও লেখেন, শেয়ালের বিষয়ও লেখেন। কোনো পণ্ডিত যদি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শিয়ালের কথাটা এত আনুপূর্বিক লিখিতে বসিয়াছ, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুষিতে আরম্ভ করে !— তবে জীবতত্ত্ববিদ্ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া তাঁহার শেয়াল সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করিতেই প্রবৃত্ত হন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক যদি তাঁহার কাগজে মাছের তেলের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন, তবে আশা করি কোনো পণ্ডিত তাঁহাকে এ অপবাদ দিবেন না যে, তিনি মাছের তেল মাথায় মাখিবার জন্য পাঠকদিগকে অন্যায় উত্তেজিত করিতেছেন।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন :

যদি কেহ লেখেন, 'যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন— প্রিয়ে, তুমি যে-কথা বলিতেছ তাহার বিস্‌মোল্লায়ই গলদ' তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অতিশোভন হইবে।

প্রয়োগের শোভনতাবিচার ব্যাকরণের কাজ নহে, অলংকারশাস্ত্রের কাজ— ইহা পণ্ডিতমহাশয় জানেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের সাহস হয় না। উল্লিখিত প্রয়োগে ব্যাকরণের কোনো ভুলই নাই, অলংকারের দোষ আছে। 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' কথাটা এমন জায়গাতেও বসিতে পারে যেখানে অলংকারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে। অতএব পণ্ডিতমশায়ের রসিকতা এখানে বাজে খরচ হইল। যাঁহারা প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাঁহারা এই হাস্যবাণে বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবেন না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতমহাশয় এ কথাও মনে রাখিবেন যে, চলিত ভাষা অস্থানে বসাইলেই যে কেবল ভাষার প্রয়োগদোষ হয়, তাহা নহে ; বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃতনিয়মে বাংলায় বসাইলেও অলংকারদোষ ঘটিতে পারে। কেহ যদি বলেন, আপনার সুন্দরী বক্তৃতা শুনিয়া অদ্যকার সভা আপ্যায়িতা হইয়াছে, তবে তাহাতে স্বর্গীয় বোপদেবের কোনো আপত্তি থাকিবার কথা নাই, কিন্তু শ্রোতারা গাম্ভীর্যরক্ষা না করিতেও পারেন।

খাঁটি বাংলাকথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা— উট কথাটাকে কোনোমতেই স্ত্রীলিঙ্গে 'উটী' করা যাইবে না, অথবা দাগ শব্দের উত্তর কোনোমতেই ইত প্রত্যয় করিয়া 'দাগিত' হইবে না, ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন। কিন্তু সংস্কৃতশব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দরী' বলিতে পারি, আবার 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর' ইহাও বলা চলে। আমাদের পণ্ডিতমশায় এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিদ্যা যশের হেতুরূপে প্রতীয়মান হয়।' প্রতীয়মান কথাটা তিনি বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যদি সংস্কৃতনিয়মে 'প্রতীয়মানা' লিখিতেন তাহাও চলিত। আর-এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিভীষিকাময়ী ছায়াটাকে বঙ্গভাষার অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন'— ছায়া শব্দের এক বিশেষণ 'বিভীষিকাময়ী' সংস্কৃত বিধানে হইল, অন্য বিশেষণ 'নিষ্কাশিত' বাংলানিয়মেই হইল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতশব্দ বাংলাভাষায় সুবিধামত কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলানিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলাকথার সে-স্বাধীনতা নাই— 'কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে' এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু 'কথাটা ঠিক হইয়াছে' না বলিয়া যদি 'ঠিকা হইয়াছে' বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলারচনায় সংস্কৃতশব্দ কোথায় বাংলানিয়মে, কোথায় সংস্কৃতনিয়মে চলিবে তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলংকারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলাশব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ— সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে ; এইজন্যই, 'ভ্রাতৃবধূ একাকী আছেন' অথবা 'একাকিনী আছেন' দু-ই বলিতে পারি— কিন্তু 'আমার ভাজ একলা আছেন' না বলিয়া 'একলানী আছেন' এমন প্রয়োগ প্রাণান্ত সংকটে পড়িলেও করা যায় না। অতএব, বাংলাভাষায় সংস্কৃতশব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা-বৈয়াকরণের সে-যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই।

আমার প্রবন্ধে আমি ইংরেজি monosyllabic অর্থে 'একমাত্রিক' কথা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং 'দেখ্, মার্' প্রভৃতি ধাতুকে একমাত্রিক বলিয়াছিলাম, ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন : '

> ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে হ্রস্বস্বরের একমাত্রা,দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা গণনা করা হয়।

অতএব তাঁহার মতে দেখ্ ধাতু আড়াইমাত্রিক। এই যুক্তি অনুসারে 'একমাত্রিক' শব্দটাকে তিনি বিদেশী বলিয়া গণ্য করেন।

ইহাকেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলদ। মাত্রা ইংরেজিই কী বাংলাই কী আর সংস্কৃতই কী। যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো ছিল, তবু 'এক' তখনো 'এক'ই ছিল এবং দুই ছিল 'দুই'। পণ্ডিতমশায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়া দেখেন, তবে হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গণিতশাস্ত্রের এক ইংলন্ডেও এক, বাংলাদেশেও এক এবং ভীষ্ম-দ্রোণ ভীমার্জুনের নিকটও তাহা একই ছিল। তবে আমরা যেখানে এক ব্যবহার করি অন্যত্র সেখানে দুই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন, আমরা এক হাতে খাই, ইংরেজ দুই হাতে খায়, লঙ্কেশ্বর রাবণ হয়তো দশ হাতে খাইতেন ; আমরা কেবল আমাদেরই খাওয়ার নিয়মকে স্মরণ করিয়া ঐ-সকল 'বাহুহাস্তিক' খাওয়াকে 'ঐকহাস্তিক' বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় যে-শব্দ আড়াইমাত্রা কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইত, বাংলায় সেটা যদি একমাত্রা কাল লইয়া উচ্চারিত হয় তবুও তাহাকে আড়াইমাত্রিক বলিবই— সংস্কৃত ব্যাকরণের খাতিরে বুদ্ধির প্রতি এতটা জুলুম সহ্য হয় না। পণ্ডিতমহাশয়কে যদি নামতা পড়িতে হয়, তবে সাতসাত্তে উনপঞ্চাশ কথাটা তিনি কতক্ষণ ধরিয়া উচ্চারণ করেন ? বাংলা ব্যবহারে ইহার মাত্রা ছয়— সংস্কৃতমতে ষোলো। তিনি যদি পাণিনির প্রতি সম্মান রাখিবার জন্য ষোলো মাত্রায় সা-ত-সা-ত্তে-উ-ন-প-ঞ্চা-শ উচ্চারণ করিতেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা নির্বোধ ছেলে দ্রুত আওড়াইয়া দিয়া ক্লাসে তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইত। সংস্কৃত ব্যাকরণকেই যদি মানিতে হয়, তবে কেবল মাত্রায়

কেন উচ্চারণেও মানিতে হয়। পণ্ডিতমহাশয়ের যদি লক্ষ্মীনারান বলিয়া চাকর থাকে এবং তিনি অষ্টাধ্যায়ীর মতে দীর্ঘ-হ্রস্ব-প্লুত স্বরের মাত্রা ও কণ্ঠ-তালব্য-মূর্ধন্যের নিয়ম রাখিয়া 'লক্ষমীনারায়ণ' বলিয়া ডাক পাড়েন তবে একা লক্ষ্মীনারান কেন, রাস্তার লোক সুদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাজেই বাংলা 'ক্ষ' সংস্কৃত ক্ষ নহে এবং বাংলার মাত্রা সংস্কৃতের মাত্রা নহে, এ কথা বাংলাব্যাকরণকার প্রচার করা কর্তব্য বোধ করেন। এইজন্য স্বয়ং মাতা সরস্বতীও যখন বাংলা বলেন, বাঙালির ছেলেরা তাহা নিজের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিতে পারে— তবে তাঁহারই বরপুত্র হইয়া পণ্ডিতমহাশয় বাংলাভাষার বাংলানিয়মের প্রতি এত অসহিষ্ণু কেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আর-কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিবেন না, কেবল 'একমাত্রিক শব্দের দেশীয় ব্যাকরণ ও অভিধানানুযায়ী অর্থ গ্রহণ' করিবেন। তাই করুন, আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে, অর্থ জিনিসটাকে গ্রহণ করিব বলিলেই করা যায় না। অভিধান-ব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্ধুক— তাহারা অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পারে মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন :

> রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 'থ্যালো মাংস'— এই থ্যালোটা কী।

অবশেষে শ্রান্ত, বিমর্ষ, হতাশ হইয়া লিখিতেছেন :

> অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্বিশেষে মৎস্যমাংসের গতিবিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি, তাহাতেও কোনো ফল হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্‌কার দিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রবন্ধ বহন করিয়া আজ পর্যন্ত পরিষৎ- পত্রিকা বাহির হয় নাই, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার পাঠ শুনিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন। অতএব, যখন আমি 'থ্যাৎলা' বলিয়াছিলাম, তখন যদি বক্তার দুরদৃষ্টক্রমে শ্রোতা থ্যালো-ই শুনিয়া থাকেন, তবে সেজন্য বক্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দুষ্কৃতিকারীকে তৎক্ষণাৎ শাসন না করিয়া যে-সকল নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ লোক কলিকাতায় বাস করেন অথচ সাহিত্যচর্চা করেন এবং মৎস্য মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে খামকা জবাবদিহিতে ফেলিলেন কেন। প্রতিবাদী মহাশয় যদি কোনো সুযোগে পরিষৎ-পত্রিকার প্রুফ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল দেখিয়া থাকেন তবে সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ছাপার ভুলে যদি দণ্ডিত হইতে হয়, তবে দণ্ডশালায় পণ্ডিতমহাশয়েরও সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এরূপ ছোটো ছোটো ভুল খুঁটিয়া মূল প্রবন্ধের বিচার সংগত নহে। থ্যালো শব্দটা রাখিলে বা বাদ দিলে আসল কথাটার কিছুই আসে যায় না। বাংলা আল্‌ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমক্রমে যদি 'বাচাল' সংস্কৃত কথাটা বসিয়া থাকে তবে সেটাকে অনায়াসে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের মূলে আঘাত করে না। 'ছাগল' যদি সংস্কৃত শব্দ হয়, তবে তাহাকে বাংলা ল প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগণ্ডি হইতে বিনা ক্লেশে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, খাঁটি বাংলা দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। ধানের খেতের মধ্যে যদি দুটো-একটা গত বৎসরের যবের শীষ উঠিয়া থাকে, তাহাকে রাখ বা ফেলিয়া দাও, বিশেষ আসে যায় না, তাই বলিয়াই ধানের খেতকে যবের খেত বলা চলে না।

মোট কথাটার এবং আসল কথাটার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অণুবীক্ষণ হাতে ছোটো ছোটো খুঁত ধরিবার চেষ্টায় বেড়াইলে খুঁত সর্বত্রই পাওয়া যায়। যে-গাছ হইতে ফল পাড়া যাইতে পারে, সে-গাছ হইতে কীটও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই কীটের দ্বারা গাছের বিচার করা যায় না।

একটি গল্প মনে পড়িল। কোনো রাজপুত গোঁফে চাড়া দিয়া রাস্তায় চলিয়াছিল। একজন পাঠান আসিয়া বলিল, লড়াই করো। রাজপুত বলিল, খামকা লড়াই করিতে আসিলে, ঘরে কি স্ত্রী পুত্র নাই। পাঠান বলিল, আছে বটে, আচ্ছা তাহাদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিগে। বলিয়া বাড়ি গিয়া সব কটাকে কাটিয়াকুটিয়া নিঃশেষ করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুত

জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি যে লড়াই করিতে বলিতেছ, আমার অপরাধটা কী । পাঠান বলিল, তুমি যে আমার সামনে গোঁফ তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ । রাজপুত তৎক্ষণাৎ গোঁফ নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই, গোঁফ নামাইয়া দিতেছি ।

প্রতিবাদী মহাশয়ের কাছে আমারও প্রশ্ন এই যে, ঐ 'ছাগল' 'বাচাল' 'ধ্যাংলা' এবং 'নৈমিত্তিক' শব্দ কয়েকটি লইয়াই কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ । আচ্ছা আমি গোঁফ নামাইয়া লইতেছি— ও শব্দ কয়টা একেবারেই ত্যাগ করিলাম । তাহাতে মূল প্রবন্ধের কোনোই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না । ইহাতে বিবাদ মিটিবে কি । প্রতিবাদী বলিবেন, অকিঞ্চিৎকর কথাগুলো বাংলায় ঢোকাইয়া তুমি ভাষাটাকে মাটি করিবার চেষ্টায় আছ । আমার বিনীত উত্তর এই যে, ঐ কথাগুলো আমার এবং তাঁহার বহুপূর্ব পিতামহ-পিতামহীরা প্রচলিত করিয়া গেছেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে ।

প্রতিবাদী মহাশয়ের হুকুম হইতে পারে, আচ্ছা বেশ, ভাষায় আছে থাক্, তুমি ওগুলার নিয়ম আলোচনা করিয়ো না । কিন্তু এ হুকুম চলিবে না । গোঁফের এই ডগাটুকু নামাইতে পারিব না ।

যে-কথাগুলি লইয়া আজ এত তর্ক উঠিল তাহা এতই সোজা যে, পাঠক ও শ্রোতাদের এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-সভা'র সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেক্সপীয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই খাটে । তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য একা আসে না, দলবল সঙ্গে করিয়াই আসে । প্রতিবাদী মহাশয়ও একা নহেন, তাঁহার দলবল আছে । তিনি শাসাইয়াছেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বি. এ. এম. এ. উপাধিধারী' এবং 'বর্তমান সময়ে যে-সকল লেখক ও লেখিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন' তাঁহারা এবং 'ইংলন্ডপ্রত্যাগত অনেক কৃতবিদ্য' তাঁহার দলে আছেন ।— ইহাতে অকস্মাৎ বাংলাভাষার এত হিতৈষী অভিভাবকের ভিড় দেখিয়া এতকালের উপেক্ষিতা মাতৃভাষার জন্য আশাও জন্মে অথচ নিজের অসহায়তায় হৃৎকম্পও উপস্থিত হয় । সেই কারণে পণ্ডিতমহাশয়ের দল ভাঙাইয়া লইবার জন্যই আমার আজিকার এই চেষ্টা । তাঁহাদিগকে আমি আশ্বাস দিতেছি, এ দলে আসিয়াও তাঁহারা 'ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য রক্ষায়' মনোযোগ করিলে আমরা কেহ বাধা দিব না, চাই কি, আমরাও শিক্ষা লাভ করিতে পারিব ।

কেবল তাঁহাদিগকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলাভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে । ইহাতে তাঁহাদের কৃতবিদ্যতা ও ইংলন্ডপ্রত্যাগমনের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ আমিও যথেষ্ট সম্মানিত ও সহায়বান হইব ।

১৩০৮

বিবিধ

সাময়িক সাহিত্য

পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহুমূল্যবান ।... সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন । প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন । তাঁহারা সংস্কৃতবানানকে বাংলাবানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলাবানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন । ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে । বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলাবানান, এমন-কি, বাংলাপদবিন্যাসপ্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে । কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে যে দু-একটি পারিভাষিক শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলায় এভোল্যুশন্ থিওরি-র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখকমহাশয় তাহার মধ্যে হইতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত ; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট ; এবং শব্দটিকে অভিব্যক্ত বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তা ছাড়া ব্যক্ত হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালোমন্দ উন্নতি-অবনতির কোনো বিচার নাই ; বিকাশ শব্দের মধ্যে একটি উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখকমহাশয় Natural Selection-কে বাংলায় নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন। এই সিলেক্শন্ শব্দের চলিত বাংলা 'বাছাই করা'। বাছাই কার্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে ; বলিতে পারি চা-বাছাই করিবার যন্ত্র, কিন্তু চা-মনোনীত করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। মন শব্দের সম্পর্কে মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা-অভিরুচির ভাব আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক সিলেক্শন্ যন্ত্রবৎ নিয়মের কার্য, তাহার মধ্যে ইচ্ছার অভাবনীয় লীলা নাই। অতএব বাছাই শব্দ এখানে সংগত। বাংলায় বাছাই শব্দের সাধু প্রয়োগ নির্বাচন। 'নৈসর্গিক নির্বাচন' শব্দে কোনো আপত্তির কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। Fossil শব্দকে সংক্ষেপে 'শিলাবিকার' বলিলে কিরূপ হয় ? Fossilized শব্দকে বাংলায় শিলাবিকৃত অথবা শিলীভূত বলা যাইতে পারে।

লেখকমহাশয় ইংরেজি ফসিল্ শব্দের বাংলা করিয়াছেন 'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল'। কিন্তু উদ্ভিদ পদার্থের ফসিল্ সম্বন্ধে কঙ্কাল শব্দের প্রয়োগ কেমন করিয়া হইবে। 'পাতার কঙ্কাল' ঠিক বাংলা হয় না। ফসিলের প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, 'শিলাবিকার' metamorphosed rock-এর উপযুক্ত ভাষান্তর হয়, এবং জীবশিলা শব্দ ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

'চরিত্র নীতি' প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইংরেজি Ethics শব্দকে তিনি বাংলায় চরিত্রনীতি নাম দিয়াছেন। অনেকে ইহাকে নীতি ও নীতিশাস্ত্র বলেন— সেটাকে লেখক পরিত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছেন ; কারণ নীতি শব্দের অর্থ সকল সময়ে ধর্মানুকূল নহে।

প্রহরিস্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম।
অপিচাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ ॥

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো।

ইহাও এক শ্রেণীর নীতি, কিন্তু এথিক্স্ নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে মুখ্যত এথিক্স্ বুঝায়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে আরো অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌনী হইয়া ভোজন করিবে, ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম হইতে পারে কিন্তু ইহা এথিক্স্ নহে। অতএব চরিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর-একটু সংহত করিয়া 'চারিত্র' বলিলে ব্যবহার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। চরিত্রনীতিশিক্ষা, চরিত্রনীতিবোধ, চরিত্রনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা 'চারিত্রশিক্ষা', 'চারিত্রবোধ', 'চারিত্রোন্নতি' আমাদের কাছে সংগত বোধ হয়।... আর-একটি কথা জিজ্ঞাস্য, metaphysics শব্দের বাংলা কি 'তত্ত্ববিদ্যা' নহে।

লেখক মহাশয় সেন্ট্রিপীটাল্ ও সেন্ট্রিফ্যুগাল ফোর্স্-কে কেন্দ্রাভিসারিনী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি বলিয়াছেন— কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি আমাদের মতে সংক্ষিপ্ত ও সংগত।

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য

কিন্তু বিবাদ করা অসংগত। ইংরেজি মিটিয়রলজির বাংলা প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং জগদানন্দবাবু যদি আপ্তের সংস্কৃত অভিধানের দৃষ্টান্তে 'বায়ুনভোবিদ্যা' ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যোগেশবাবু 'আবহ' শব্দ কোনো প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কী বুঝিতেন এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে— এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে মর্তে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমরা কোন্ বায়ুর অধিকারে আসিয়াছি।" মাতলি উত্তর করিলেন, "গগনবর্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহবায়ুর মার্গ!" দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে 'প্রবহ' প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল— সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায়:

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্‌বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ ॥

এই-সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নির্বিচারে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃ শব্দ পারিভাষিক নহে, তাহার অর্থ আকাশ, এবং সে-আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সেইজন্য নভঃ ও নভস্য শব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস বুঝায়। কিন্তু নভঃ শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ুশব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি। আপ্তেও তাঁহার অভিধানে তাহা করেন নাই; তাঁহার আভিধানিক সংকেত অনুসারে নভোবায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা বায়ুবিদ্যা বুঝাইতেছে। 'নভোবিদ্যা' মিটিয়রলজির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা ভাঙা ডাঙা আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙ্গ-অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢ্যাঙা তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে-নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদ-কে চান্দ, পাঁক-কে পঙ্ক, কুমার-কে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনা-কে সোণা, কান-কে কাণ বানান করেন, অথচ শ্রবণশব্দজ শোনা-কে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই। পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় বাংলা বানানের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

টেক্‌সট্‌বুক্ কমিটি ক্ষকারকে বাংলা বর্ণমালা হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখাইয়া ক্ষকারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ কেমন করিয়া প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সে-সময়ে দ্বাররক্ষক যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ খ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ক্ষকারে মূর্ধন্য ষ-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ছিল না। না থাকিলেও উহা যুক্ত অক্ষর এবং উহার উচ্চারণ ক্‌খ। শব্দের আরম্ভে অনেক যুক্ত অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণ থাকে না, যেমন জ্ঞান শব্দের

জ্ঞ ; কিন্তু অজ্ঞ শব্দে উহার যুক্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ক্ষকারও সেই রূপ— ক্ষয় এবং অক্ষয় শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ হইবে। অতএব অসংযুক্ত বর্ণমালায় ক্ষকার দলভ্রষ্ট একঘরে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্যঞ্জনপঙ্‌ক্তির মধ্যে উহার অনুরূপ সংকরবর্ণ আর-একটিও নাই। দীর্ঘকালের দখল প্রমাণ হইলেও তাহাকে আরো দীর্ঘকাল অন্যায় অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত কি।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমত চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে না। তিনি বলেন, "কেন চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।" আমরা বলি, কেহ তো জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করিতেছে না, স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নবদ্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল ; কিন্তু নিশ্চয় কাব্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া সেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক-একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা লাটিননিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত, তবে এ ভাষা এত প্রবল, এত বিচিত্র, এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনারুপার মতো জড়পদার্থ নহে যে, তাহাকে ছাঁচে ঢালিব। তাহা সজীব— তাহা নিজের অনির্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাত করিয়া দেয় ; তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে। লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়ো। সেইজন্যই আমরা 'ক্ষান্ত' দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেইজন্যই ব্যাকরণ যেখানে 'আবশ্যকতা' ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে 'আবশ্যক' ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।

একটা ছোটো কথা বলিয়া লই। 'অনুবাদিত' কথাটা বাংলায় চলিয়া গেছে— আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা সৃজন কথার জায়গায় 'সর্জন' চালাইয়া বসেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গদর্শন-সম্পাদক 'শব্দদ্বৈত' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[১] ফাল্গুনমাসের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সেই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধলেখকের নিকট এই আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গেলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে। কেবল একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের আভাসমাত্র দিব।— আমরা বলিয়াছিলাম, 'চার চার' 'তিন তিন' প্রকর্ষবাচক। অর্থাৎ যখন বলি 'চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির' তখন একেবারে চার পেয়াদা আসায় বাহুল্যজনিত বিস্ময় প্রকাশ করি। প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব বিভক্ত-বহুলতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ যখন বলা হয়, 'তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চার চার জন পেয়াদা আসিয়া হাজির' তখন, সমালোচক মহাশয়ের মতে,

১ দ্রষ্টব্য "বাংলা শব্দদ্বৈত", রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রচল দ্বাদশ খণ্ড, পৃ· ৩৭১ : বর্তমান সলভ, পৃ·৬২৬

তাহাদের প্রত্যেকের জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত ইহাই বুঝায়। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। বিহারীবাবুও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, একজনের জন্যও 'চার চার পেয়াদা' বাংলাভাষা অনুসারে আসিতে পারে। বিহারীবাবু বলেন, দৃষ্টান্ত অনুসারে দুই অর্থই সংগত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিভক্ত-বহুলতা, দু-ই বুঝাইতে পারে। তাহা ঠিক নহে— প্রকর্ষই বুঝায়, সেই প্রকর্ষ একজনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে; সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে প্রকর্ষ ভাবই সাধারণ।

প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে-প্রথা কোনো-একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।

১৩০৫-১৩১২

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা[১]

অ

অর্শে (যথা, দোষ অর্শে— দোষ বর্তে)।

আ

আউলানো (এলানো) আওড়ানো আওটানো আইসা আঁকা আঁকড়ানো আঁচানো (আচমন ; আঁচ দেওয়া) আঁচড়ানো (আকর্ষণ) আগ্‌লানো আছ্‌ড়ানো আজ্জানো আঁটা আট্‌কানো আঁৎকানো (আতঙ্কন) আনা (আনয়ন) আওসানো (ভেজিয়ে দেওয়া) আম্‌লানো (টকে যাওয়া এবং নির্বীর্য ও মৃতপ্রায় হওয়া) আদ্‌রানো আঙ্‌লানো (অঙ্গুলিদ্বারা নাড়া) আবজানো (ভেজিয়া দেওয়া।— নদীয়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ব্যবহৃত) আজানো আজ্‌ড়ানো (কোনো পদার্থ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা)।

ই

ইঁটোনো (ইঁটদ্বারা আঘাত করা)।

উ

উগ্‌রোনো (উদ্গীরণ) উঁচোনো (উচ্চারণ) উঠা (উত্থান) উৎরনো (উত্তরণ) উথ্‌লনো (উচ্ছলিত) উপ্‌ড়নো (উৎপাটন) উব্‌চোনো উল্‌সনো (উল্লসন) উল্‌টনো (উল্লুণ্ঠন) উস্‌কনো উট্‌কনো উগ্লোনো (ভাজিবার সময় নাড়াচাড়া করা) উলোনো (নামিয়ে দেওয়া) উখ্‌ড়ানো (উলটে পালটে দেওয়া) উজ্‌ড়ানো (নিঃশেষ করা) উজানো (নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়া) উনানো (গালানো, তরল করা) উবা (উবে যাওয়া)।

এ

এগোনো এড়ানো এলানো এলা (ধান এলে দেওয়া) এলে দেওয়া।

ও

ওলা ওপ্‌ড়ানো ওড়া বা উড়া ওঠানো ওৎকানো ওল্‌টানো ওস্‌কানো ওট্‌কানো ওব্‌চানো ওথ্‌লানো ওঁচানো ওগ্‌রানো ওখ্‌ড়ানো।

ক

ককানো (কেঁদে ককানো) কমা কসা করা কহা কচ্‌লানো কড়্‌কানো কটিয়ে যাওয়া (যথা কটা, চুল কটিয়ে যাওয়া) কখ্‌চানো কব্‌লানো কাচা (কাপড় কাচা) কাটা কাড়া কাঁড়ানো (ধান কাঁড়ানো) কাঁদা (ক্রন্দন) কাঁপা (কম্পন) কাৎরানো কাম্‌ড়ানো কামানো (কর্ম) কাশা (কাশ) কিলোনো (কিল) কোঁচানো (কুঞ্চন) কোটা (কুট্টন) কুড়নো কুলনো কোপানো কোঁক্‌ড়ানো কোঁচকানো কোঁতানো (কুন্থন) কোঁদা কৈনা কোড়ানো কেলানো কচানো (নূতন পত্রোদ্গাম হওয়া) কলানো (অঙ্কুরিত হওয়া) কড়মড়ানো (কড়মড় শব্দ করা) কৎলানো (ধৌত করা) কন্‌কনানো (বেদনা করা) কোঁৎকানো (লাঠি ইত্যাদিদ্বারা আঘাত) কাব্‌রানো (কাবার অর্থাৎ শেষ করা) কুচোনো (কুচি কুচি করা) কাঁচানো (একবার পূর্ণতা বা পরিপক্কতা লাভ করিয়া পুনঃ অপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া— পাশাখেলার ঘুঁটি কাঁচানো) কোদ্‌লানো (কোদালদ্বারা কোপানো) কাছানো (কাছে আসা) কালানো (শীতে হাত পা কালিয়ে যাওয়া— অবশ হওয়া)।

খ

খতানো খসা খাটা খাওয়া খাম্‌চানো খাব্‌লানো খিঁচোনো (আক্ষেপ) খিচ্‌ড়ানো খেঁকোনো খোঁচানো খোঁজা খোঁটা খোঁড়া (খনন) খোদা খোলা খেদানো খেপা (ক্ষিপ্ত) খেলা খেঁচকানো খাপানো (কার্যে ব্যবহৃত করা) খরানো (তাপসংযোগে ঝল্‌সে যাওয়া) খিলানো (খিলান arch নির্মাণ করা) খোঁড়ানো (খঞ্জ) খোঁসড়ানো বা খুঁসড়ানো বা খোঁসা।

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে পুস্তিকাকারে প্রচারিত।

গ

গগানো (মুমূর্ষু অবস্থায়) গছানো (গচ্ছিত) গড়া (গঠন) গড়ানো (গলিত ; শয়ন) গতানো (গমিত) গজানো গলা (গলন) গর্জানো (গর্জন) গাওয়া (গান গাওয়া) গাদানো (ঠেসে দেওয়া) গালানো গেলা (গিলন) গোঁগানো গোংরানো (গোঁ গোঁ শব্দ করা) গোঁয়ানো গোছানো গোঁজা বা গোঁজ্‌ড়ানো গোটানো গোঁতানো গোনা (গণন) গোনানো (গুনিয়ে দেওয়া) গোলা গুম্‌রোনো গুঁতোনো গুলোনো গুছোনো গুটোনো গাঁজানো বা গেঁজানো(fermented হওয়া) গাবানো (স্পর্ধা প্রচার করা ; পুষ্করিণীর জল নষ্ট করা) গুঁড়ানো (গুঁড়া বা চূর্ণ করা)।

ঘ

ঘটা (ঘটন) ঘনানো ঘব্‌ড়ানো ঘসা (ঘর্ষণ) ঘস্‌ড়ানো বা ঘস্‌টানো ঘাঁটা ঘেরা ঘেঁসা ঘোচা ঘোঁটা ঘোরা ঘোলানো ঘুমানো ঘুসানো ঘুস্‌টানো ঘুরোনো ঘাড়ানো (ঘাড়ে দায়িত্বগ্রহণ করা) ঘেঙানো (কাতরোক্তি করা) ঘেঁতানো।

চ

চর্চা চড়া চলা চরা চসা চট্‌কানো চড়ানো (চড় মারা ; উচ্চ করা বা উচ্চ স্থানে রাখা) চল্‌কানো চম্‌কানো চাখা চাগা (উত্তেজিত হওয়া) চাঁচা চাটা চাপা চারানো চালানো চাপ্‌ড়ানো চেতানো চেনা চিবোনো চেরা চিরোনো চোকানো চোখানো (তীক্ষ্ণ করা) চেঁচানো চোটানো চোবানো (নিমজ্জিত করা) চোরানো চোষা চোনা (চুনে লওয়া) চোপ্‌সানো চান্‌কানো (প্রতিমা ও পুত্তলিকা প্রভৃতির চক্ষু অঙ্কন করা, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে গ্রাম্য চিত্রকরের মধ্যে ব্যবহৃত) চিম্‌টানো (চিম্‌টি কাটা ; রসহীন হওয়া) চেপ্‌টানো (চেপটা করা) চিক্‌রানো (চেঁচানো) চোপানো (অস্ত্রদ্বারা থোড়া)।

ছ

ছকা (ছক্ কাটা) ছড়ানো ছাঁকা ছাঁটা ছাড়া ছাঁদা ছানা (ছেনে লওয়া) ছাওয়া ছেঁড়া ছেঁচা ছটানো ছোঁচানো (শৌচ) ছোটা ছোঁড়া ছোলা (ছুলে দেওয়া) ছোঁয়া ছোব্‌লানো ছিটোনো ছুটোনো ছোটানো ছিট্‌কানো বা ছট্‌কানো ছাপানো (ছাপ দেওয়া ; ছাপিয়ে উঠা) ছেঁচ্‌ড়ানো (ঘর্ষণ সহকারে টানিয়া লওয়া) ছোবানো বা ছোপানো (রঞ্জিত করা)।

জ

জড়ানো জপা জমা জম্‌কানো জ্বলা জ্বরা জাঁকা (জাঁকিয়ে উঠা) জারা (জারণ) জানা জ্বালা জেতা জোটা জোতা জোড়া জ্যাব্‌ড়ানো জিয়োনো জিরোনো জুতোনো জুটনো জুড়োনো জুয়োনো জল্‌শনো জবানো (জবাই করা) জাগা জাওরানো (রোমন্থন করা)।

ঝ

ঝরা ঝল্‌সানো ঝাঁকানো (অধ্যাকম্পন) ঝাঁক্‌রানো ঝাঁটানো ঝাড়া ঝাঁপা ঝাম্‌রানো (অধ্যামর্ষণ) ঝালানো (অধ্যালেপন) ঝাঁকা ঝোলা ঝিমনো ঝট্‌কানো (অস্ত্রের আঘাতে দ্বিধা করা) ঝাঁজানো (তীব্রতা উৎপাদন)।

ট

টকা (টকিয়া যাওয়া) টলা টপ্‌কানো টহলানো টস্‌কানো টানা টাঁকা টেপা টোকা টুটা টেঁকা টোয়ানো (টুইয়ে দেওয়া) টিকনো টোপানো (বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া) টাটানো (ব্যথা করা) টাউরানো (শীতে শরীর টাউরে যাওয়া, অবশ হওয়া)' টোকা (note করা)।

ঠ

ঠকা ঠাসা ঠাওরানো ঠেকা ঠেলা ঠেসা ঠেঙানো ঠোকা ঠোকরানো ঠোসা।

ড

ডলা ডরানো ডাকা ডোক্‌রানো ডোবা ডিঙনো ডালানো (গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়া)।

ঢ

ঢাকা ঢালা ঢিলোনো ঢ্যালানো ঢিপোনো ঢিকোনো ঢোকা ঢোলা ঢোঁসানো ঢুকোনো ঢ্যাকানো (ধাক্কা

দেওয়া) ঢল্‌কানো (কোনো তরল পদার্থ ঢালিয়া ফেলা এবং তাহাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে লইয়া যাওয়া)।

ত

তরা (তরে যাওয়া) তলানো তড়বড়ানো তাকানো তাড়ানো তাংড়ানো তাসানো তোব্‌ড়ানো তোলা তোড়া (তুড়ে দেওয়া) তোত্‌লানো তাতানো (উত্তপ্ত করা)।

থ

থতা (থতিয়ে যাওয়া) থাকা থামা থম্‌কানো থাব্‌ড়ানো থোড়া (থুড়িয়ে দেওয়া) থিতোনো থোয়া থেঁত্‌লানো থাড়ানো (to make erect) থেব্‌ড়ানো (কোমল পদার্থে চাপ দিয়া চেপটা করা)।

দ

দমানো (বলপ্রয়োগে নত করা) দাঁড়ানো দাঁতানো (দাঁত বহির্গমন হওয়া) দাপানো (হস্তপদাদি আস্ফালন করা) দাব্‌ড়ানো দাবানো (দমানো) দোলানো দেওয়া দেখা দোষানো (দোষ প্রদর্শন) দৌড়োনো দড়বড়ানো দপ্‌দপানো দোয়ানো (দোহন করা) দোম্‌ড়ানো।

ধ

ধরা ধসা ধাওয়া ধোয়া ধোয়ানো ধোনা (তুলা ধোনা, অর্থাৎ তাহার আঁশগুলা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা)।

ন

নড়া নাচা নাড়া নাওয়া নাবা বা নামা নাদা নেতানো (নেতিয়ে পড়া) নেলানো নেংড়ানো নিড়োনো নিকোনো নোওয়া নিছোনো নিবোনো নেবা নেটানো (ছেঁচ্‌ড়ে লইয়া যাওয়া ; সংস্পর্শে আনা) নলানো (খেজুরগাছ হতে রস গ্রহণজন্য গাছে নল সংযুক্ত করা)।

প

পচা পটানো পড়া পড়া (পাঠ-কৃ) পরা পলানো পশা পাকা পাকানো পাওয়া পাঠানো পাড়া পানানো (গোরু পানিয়ে যাওয়া) পেঁচানো পোঁচানো পোঁছা পোড়া পোঁতা পোওয়ানো পোরা পোষা পেশা (পুজিয়ে বা পূরণ করিয়া পুজান দেওয়া) পেটানো পিছনো পিটোনো পিল্‌কানো পাক্‌ড়ানো পট্‌কানো পারা পাশানো (পাশ দেওয়া তাস-খেলায়) পেঁজা বা পিজা (তুলা প্রভৃতির আঁশ পৃথক করা) পিছ্‌লানো পিট্‌পিটোনো (চক্ষু পিটপিট করা)।

ফ

ফলা ফস্‌কানো ফাটা ফাড়া ফাঁদা ফাঁসা ফিরোনো ফুক্‌রোনো ফুলোনো ফুরোনো ফুটোনো ফুঁপোনো ফেলা ফেটানো ফেরা ফোঁকা ফোলা ফোটা ফোঁসানো ফোক্‌রানো ফাঁপা ফের্‌কানো (হঠাৎ রাগাদি-প্রযুক্ত চলিয়া যাওয়া) ফেনানো (ফেনাযুক্ত করা) ফোঁড়া (বিদীর্ণ করা) ফুসানো : ফুস্‌লানো (কুপরামর্শ গোপনে দেওয়া)।

ব

বহা বকা বখানো (বখিয়ে দেওয়া) বধা বনা বওয়া বদ্‌লানো বলা বসা বাঁকানো বাগানো বাঁচা বাচানো (বাচিয়ে দেওয়া) বাছা বাজা বাঁধা বানানো (তৈয়ার করা) বাড়া বাওয়া বেছানো বেড়ানো বিওনো বিকোনো বিগ্‌ড়ানো বিননো বিলানো বিষানো (বিষাক্ত হওয়া) বেচা বেলা (রুটি বেলা) বুঁচোনো বুজোনো বুঝোনো বুড়োনো বুনোনো বুলোনো বোঁচানো বোজা বোঝা বোড়ানো বোনা বোলানো বেড়ানো বেতোনো (বেতদ্বারা মারা) বাত্‌লানো বিঁধোনো।

ভ

ভজা ভরা ভড়্‌কানো ভাগা ভাঙা ভাজা ভাঁড়ানো ভাঁটানো (ভাঁটিয়ে দেওয়া) ভানা ভাপানো ভাবা ভাসা ভিজোনো ভিড়োনো ভুগোনো ভুলোনো ভেঙানো বা ভেঙচানো ভেজানো (বন্ধ করা) ভেপ্‌সানো ভেজানো (আর্দ্র করা) ভোগানো ভোলানো ভিয়ানো (মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা) ভাঁড়ানো (ভাঁড়ামি করা ; প্রতারণা করা) ভাব্‌ড়ানো (অকৃতকার্যতা-নিবন্ধন চিন্তা করা) ভ্যাকানো।

ম

মচ্‌কানো মজানো মওয়া (মন্থন করা) মরা মলা (মর্দন করা) মাখা মাঙা মাজা মাড়া মাতা মানা (মান্য করা) মাপা মারা মিটোনো মিওনো মিলোনো মিশোনো মুখোনো (মুখিয়ে থাকা) মুড়োনো মুতোনো মেটানো মেলানো মেশানো মোটানো মোড়ানো মোতা মোদা মোছা মোস্‌ড়ানো (হতাশ্বাস হওয়া) মস্‌টানো (ময়দা মস্‌টানো)।

য

যাচা যাওয়া যাঁতানো।

র

রগ্‌ড়ানো রঙানো রচা রটা রওয়া রসা রাখা রাগা রাঙানো রুচোনো রোখা রোচা রোপা রোওয়া।

ল

লড়া লতানো লওয়া লাফানো লুকোনো লুটোনো লেখা লেপা লোটা লোঠা লাঠানো (লাঠিদ্বারা প্রহার করা) লুফা বা লোফা (শূন্য হইতে পথে কোনো পদার্থকে ধরা)।

শ

শাসানো শিসনো শোষা শেখা শিখোনো শিউরোনো শোওয়া শুকোনো শোধ্‌রানো শোনা শাপানো (অভিসম্পাত করা) শিঙোনো (প্রথম শৃঙ্গোদ্গম হওয়া)।

স

সট্‌কানো সঁপা সওয়া সরা সাজা সাধা সাম্‌লানো সাঁৎরানো সাঁৎলানো সানানো সারানো সিটকোনো সুধানো সেঁকা সেঁচা সেঁধানো (প্রবেশ করা) সোঁকা সোল্‌কানো সাঁটানো সাপানো (সর্প-কর্তৃক দংশিত হওয়া) সারানো।

হ

হটা হওয়া হাঁকা হাগা হাঁচা হাজা হাঁটা হাঁট্‌কানো হাতানো হাৎড়ানো হাঁপানো হারা হাসা হেদোনো হেলা হেরা হ্যাঁচ্‌কানো (হঠাৎ জোরে টানা)।

ক্ষ

ক্ষওয়া ক্ষরা ক্ষেপানো (ক্ষিপ্ত করা) ক্ষুরোনো (প্রসবকালীন গোবৎসের প্রথম ক্ষুর নির্গমন)।

১৩০৮

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি ১৩১৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট গীতাঞ্জলির অনেক অংশের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল; তাহারই সাহায্যে গীতাঞ্জলির অনেক গান ও কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট, এবং রচনা-তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সংগ্রহে গীতাঞ্জলির অনেক গানের কবির হাতে লেখা প্রেস-কপি রক্ষিত ছিল, তাহা হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

১৩৩৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণে 'যাবার দিনে এই কথাটি' গানটি প্রথম গীতাঞ্জলির অন্তর্গত হয়। পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনার ফলে এই গানটির রচনা-তারিখ জানা গিয়াছে ও তদনুসারে ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯-এ প্রকাশিত সংস্করণে কালানুক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানটির পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও এই খণ্ডে মুদ্রিত হইল।

গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' গানটি মাঘ ১৩৩২ সংস্করণে বর্জিত হয়, তদবধি এটি গীতাঞ্জলিতে আর মুদ্রিত হয় না। গানটি প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অন্তর্গত; প্রায়শ্চিত্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডে (সুলভ পঞ্চম) মুদ্রিত হইয়াছে।

গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হইতে অনেকগুলি গানের মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ মুদ্রিত হইল, গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ হইতে সেগুলি অনেকাংশে পৃথক।—

৫০

নিভৃত প্রাণের পরম দেবতা
　　　　যেখানে বসেন একা
সেথাকার দ্বার খোলো হে ভকত,
　　　　লভিব তাঁহার দেখা।
শুনেছি কেবলি বাহিরের কথা,
শুনি নি গভীর গোপন বারতা,
নীরব নিবিড় সন্ধ্যাবেলার
　　　　আরতি হয় নি শেখা।
করুণা করিয়া বাহু ধরি মোর
　　　　আমারে দেখাও তবে—
পূজার থালায় জীবনপ্রদীপ
　　　　কেমনে সাজাতে হবে।
যেথা নিখিলের অমর সাধনা
মহাপূজালোক করিছে রচনা

সেথায় কেমনে রাখিয়া আসিব
একটি জ্যোতির রেখা।[১]

৫২

তুমি আমার আপন, তুমি
আছ আমার কাছে,
তোমার মাঝে মোর জীবনের
সব আনন্দ আছে—
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
আমায় দাও সুধাময় সুর,
আমার বাণী করো সুমধুর,
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও!
তোমার মধু ঢালো চিত্তে মম,
বাক্য করো সুধাসম,
তুমি আমার প্রিয়তম
এই কথাটি বলতে দাও।
এই নিখিল আকাশ নিখিল ধরা
তোমারি আনন্দে ভরা,
তুমিই আমার হৃদয়হরা
এই কথাটি বলতে দাও।
আমার দৈন্য বুঝেই ভালোবাস,
দুঃখ দেখেই কাছে আস,
ক্ষুদ্র জেনেই স্নেহে হাস,
এই কথাটি বলতে দাও।

৫৭

আজি বসন্ত আগত দ্বারে।
গোপনে রব না আমি
বৃথা ফিরাব না তারে।
খোলো রে হৃদয়দল খোলো,
ভোলো রে আপনারে ভোলো,
এই সংগীতমুখর আকাশে
গন্ধ বিকাশিয়া তোলো—
এই বাহির ভুবনে দিশাহারা
ছড়াও মাধুরী ভারে ভারে।

১ এই রচনাটি সংশোধিত আকারে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীর সেই সংখ্যায় নন্দলাল বসুর একখানি চিত্রও প্রকাশিত হয়। চিত্রটি দেখিয়া গানটি লিখিত, ভারতীতে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ওগো নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে,
গগনে কাহার পথ চাহি
ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।
দখিন পবন কর হানে
বার বার কেন প্রাণে—
আজি সৌরভবিধুর বিভাবরী
কেন জাগে বিনিদ্র নয়ানে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, স্বামী,
তুমি নীরবে ডাকিছ কারে ?

গীতিমাল্য

গীতিমাল্য ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গীতিমাল্যের অধিকাংশ গানের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল। তাঁহার পত্নী কমলা দেবীর সৌজন্যে উক্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গীতিমাল্যের কোনো কোনো গানের পাঠ ও রচনা-তারিখ সংশোধিত হইয়াছে।

গীতিমাল্যের প্রথম সংস্করণ হইতে 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে'র রচনা-স্থান Vale of Health, Hampstead, এবং রচনা-তারিখ জুলাই ১৯১২ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। দিনেন্দ্রনাথের সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত গানের খাতায় ইহার পাণ্ডুলিপি নাই। স্থান-তারিখের এই নির্দেশ যে ভ্রমাত্মক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে 508 W. High Street, Urbana. Illinois, U. S. A. হইতে ২৪ পৌষ ১৩১৯ [৮ জানুয়ারি ১৯১৩] তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত পত্রটি হইতে রচনার স্থান-তারিখ নির্দেশ করা সম্ভব হইল।—

নরেন্দ্র সিংহকে কয়েকদিন হল তাঁর সুরুলের বাড়ির অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছি। আমার চিঠি পেয়ে যদি তিনি নিষ্কৃতি দেন তা হলে ভালোই, না যদি দেন তা হলে ঐ ভাঙা সম্পত্তিই প্রসন্নমনে শিরোধার্য করে নিতে হবে। লোকসান জিনিসটাকে মর্মের মধ্যে বিঁধিয়ে রক্ত বিষাক্ত করে তোলবার দরকার নেই— যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা এসেছে তাকে নিয়ে নাও এবং যতটুকু তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার সেইটুকুই আদায় করে নাও। সংসারের এই-সমস্ত ছোটোখাটো লোকসানের কামড়গুলো পিঁপড়ে লাগার মতো— তারা অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যদি তাদের লেগে থাকতে দাও তা হলে তারা সমস্তটাকে ক্ষয় করে ফেলে। অতএব ঝেড়ে ফেলে দাও। জীবনের অন্তরতর প্রসন্নতা সুরুলের ভাঙা বাড়ির চেয়ে ঢের বড়ো। আজ সকালে বসে খামকা একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা হল— ধাঁ করে লিখে ফেললুম। লেখা হয়ে গেলে তার পর চেতনা হল এটা আমারই জীবনের ইতিহাস— আমার জীবন-দেবতা হাস্যমুখে সেইটা লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনে কিরকম লাভের ব্যাবসাটা যে আমি ফেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষকালে নিঃসম্বল খরিদ্দারদের কাছে বিনা মূল্যে কিরকম বিক্রিটা হল।—

'কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে ?'
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।

গীতিমাল্যের অধিকাংশ রচনার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত আছে। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ

বিষয় এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য স্বতন্ত্র আকারে প্রচারিত গীতিমাল্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্র-রচনার বহু পাঠভেদের কথা সুবিদিত ; গীতিমাল্য এর ব্যতিক্রম নয়। ১৮-সংখ্যক রচনার যে ছত্রটি প্রথমাবধি ভ্রমবশত গীতিমাল্যে মুদ্রিত ছিল না (স্তবক ২, ছত্র ৫), পাণ্ডুলিপি-দৃষ্টে তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থের সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংস্করণে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১শ খণ্ডের (চৈত্র ১৩৭৯) যথাস্থানে সংকলিত হইয়াছে। ৪৭-সংখ্যক রচনার সপ্তম ছত্রে 'তুমিই সংকট' পাঠটিও মুদ্রণপ্রমাদ ; কেননা, পাণ্ডুলিপি, প্রবাসী (চৈত্র ১৩২০), স্বরলিপিগ্রন্থ, সর্বত্র পাঠ 'তুমি সংকট'।

১৫-সংখ্যক রচনার দ্বিতীয় ছত্রে 'আমার মায়া'র পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ 'তোমার মায়া'। প্রবাসী পত্রের ভাদ্র ১৩১৯ সংখ্যায় এই পাঠ মুদ্রিত। ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৭১-সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ : 'such is thy maya'।

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে' গানটির তারিখ প্রথম সংস্করণে আছে '১৩১৫'। এই গানটি গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য দুই পাণ্ডুলিপিতেই কবির স্বহস্তে লিখিত আছে। গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে তারিখের নির্দেশ আছে '১৫ আশ্বিন নিশীথে'। গীতিমাল্যের পাণ্ডুলিপিতে তারিখ উল্লিখিত আছে '১৯১০'। তদনুসারে রচনার সাল ১৩১৭ হইবে।

গীতালি

গীতালি ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গীতালির 'আশীর্বাদ' ও ১-৬৭ -সংখ্যক গানের পাণ্ডুলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরবর্তী গানগুলি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংগ্রহ হইতে দেখিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা অবলম্বনে কোনো কোনো রচনার স্থান তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। কোনো কোনো রচনার মূল পাঠ মুদ্রিত পাঠ হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র ; মূল পাঠগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল :

২৩

কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে।
ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ যাবে না রে।
এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখি
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি—
যা রে তুই বিজন পথে চলে যা রে।
ওদের ওই হৃদয়-কুঁড়ি শিশির-রাতে
বসে রয় চোখের জলের অপেক্ষাতে।
মেটাতে পারবে না যে আঁধার নিশা
তোমার এই ফোটা ফুলের আলোর তৃষা—
সে যে তাই চেয়ে আছে পুবের পারে।

৩০

তীরে কি আর আসবে না তোর তরী।
ঢেউ দেখে তুই মরিস ডরে
সেই লাজেতেই মরি।

চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে
শান্তি যে তোর নাই রে প্রাণে—
কাণ্ডারী তোর হাসছে বসে
ডান হাতে হাল ধরি।
মিথ্যা স্বপন তোর
এমনি করে জড়িয়েছে রে ঘুচল না তার ঘোর।

[পরবর্তী স্তবক অপরিবর্তিত]

৫১

খুশি হ তুই আপন মনে।
যেমন আছিস তেমনি থাকিস—
ফিরিস কিসের অন্বেষণে।
চাস নে কিছু, কোস নে কিছু,
চলিস নে আর কারো পিছু,
হৃদয়টি তোর থাক্-না ভরা
শূন্য ফুলের অলখ ধনে।
ওঠে পড়ে আঁধার আলো—
ঢেউ খেলে রে দিবানিশি
চার দিকে তোর মন্দ ভালো।

[পরবর্তী স্তবক অপরিবর্তিত]

৮২

এই-যে ব্যথা এল আমার দ্বারে
এরে আমি ফিরিয়ে দেব না রে।
জাগতে হবে সারা রাতি,
ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি
জ্বালিয়ে নিতে হবে বারে বারে।
আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার দুঃখ আমায় কেন ডাকে।
ওগো প্রলয়, ওগো রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র,
ভয় যে আমি ভয় করি নে তারে।

৮৩

আমি পথিক, পথ যে আমার সাথি।
কয় সে কথা দিনের বেলা, গায় সে সকল রাতি।
কত যুগের রথের রেখা
বুকে তাহার আছে লেখা,

কত ক্লান্ত আশা ঘুমায়
বুলায় আঁচল পাতি।
কবে বাহির হয়েছিলেম
কার আছে তা মনে।
যাত্রা আমার নূতন হল
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
আমার আশা পথের আশা,
এই পথেরই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
চিরজীবন মাতি।

৮৪

বৃন্ত হতে ছিন্ন করে শুভ্র কমলগুলি
কে এনেছে তুলি।
তবু ওরা চায় যে মুখে সে নহে ভর্ৎসনায়,
শেষ নিমেষের পেয়ালা ভরে অম্লান সান্ত্বনায়,
মরণের অঙ্গনে এসে মাধুরীসংগীত বাজায় ক্লান্তি ভুলি
ওই-যে কমলগুলি।

এরা তোমার নিমেষ-কালের নিবিড়নন্দন
নীরব চুম্বন—
আমার আঁখি-পল্লবেতে মিলায় মরি মরি
তোমারি সুগন্ধ-শ্বাসে সকল বক্ষ ভরি।
হে কল্যাণলক্ষ্মী, এ যে আমার চিত্তে তব করুণ অঙ্গুলি,
ওই-যে কমলগুলি।

৯৮

পথের সাথি নমি বারংবার,
পথিকজনের লহো নমস্কার।
ওহে বিদায়, ওহে ক্ষতি,
ধুলার 'পরে চরম নতি,
ক্লান্ত প্রাণের লহো নমস্কার।
ওহে মরণ, হে বিরতি,
ওহে দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।
ওহে নব প্রভাতজ্যোতি,
ওহে চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি,
ওহে নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার।

স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গীতালি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত, এবং গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত 'আশীর্বাদ' কবিতাটি তাঁহাদের উদ্দেশেই রচিত। এই কবিতাটির মূল পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

আশীর্বাদ

আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
জেগেছি অনেক রাত্রি ভেবেছি অনেক—
ক্ষণেক বা আশা হয়, আশঙ্কা ক্ষণেক।
হৃদয়ের তোলাপাড়া তুফানের ঢেউ—
মনে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।
এমন করিয়া বলো কাটে কত কাল,
মাঝি যে তাহারি হাতে ছেড়ে দিনু হাল।

[পরবর্তী ছয় ছত্র অপরিবর্তিত]

কবিতাটির আরো পরিবর্তনের বিষয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি'তে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ক্ষণেক বা আশা হয় আশঙ্কা ক্ষণেক' ছত্র পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক'; 'এমন করিয়া বলো কাটে কত কাল' ছত্র পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'এ তরী আমারি বলে করেছিনু ভেবে'। এই ছত্র আরো পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'এ তরী আমারি বলে এত মরি ভেবে'। পরের ছত্রে 'হাল'এর পরিবর্তে 'এবে' লিখিয়াছিলেন। 'সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক' ছত্রের পরে যোগ করিয়াছিলেন—

সত্য ঢাকা পড়ে মোর ভয়ে ভাবনায়,
মিথ্যার মুরতি গড়ি ব্যর্থ বেদনায়।
বিশ্ব আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দেই ভরা—
মোর সৃষ্টি মায়া দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

বহুকাল প্রচলিত একটি মুদ্রণপ্রমাদ পাণ্ডুলিপিদৃষ্টে গীতালির শ্রাবণ ১৩৮৯ সংস্করণে সংশোধিত হইয়াছে: সংখ্যা ১০৬, শেষ স্তবক, প্রথম ছত্র: 'তোর' স্থলে 'তার'। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান (সুলভ) সংস্করণেও সংশোধিত হইল।

বর্তমান গ্রন্থপরিচয়-ভুক্ত 'গীতালি'র ২৩-সংখ্যক গানটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত স্বরলিপিসহ 'পল্লীবাণী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রথম ছত্রে 'মিথ্যা' স্থলে 'মিথ্যে' এবং অষ্টম ছত্রে 'যে' স্থলে 'তো' পাঠান্তর আছে। সম্প্রতি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র মাঘ-আষাঢ় ১৩৯২-৯৩ 'বিশেষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সংযোজন

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালি কাব্যের পাণ্ডুলিপি-পুস্তকে সমসাময়িক আরো কয়েকটি গানের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি গান ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতন পত্র (১৩২৬) ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, কয়েকটি গান বিভিন্ন গানের সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোনো খণ্ডে এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। 'অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া' সংযোজন-বিভাগে সেগুলি মুদ্রিত হইল। রাজা

নাটকের গানগুলিও এই পর্বের রচনা কিন্তু সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে একবার প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া পুনর্মুদ্রিত হইল না।

বলাকা

বলাকা ১৯১৬ খৃস্টাব্দের (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে বলাকার প্রথমটি ব্যতীত অন্য কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেই পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বলাকার রচনাবলী-সংস্করণে কয়েকটি কবিতার রচনাস্থান, রচনাকাল ও পাঠ -সম্পর্কিত নির্দেশ সংশোধিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাগুলি শিরোনামবর্জিত ছাপা হইয়াছিল। পরবর্তী মুদ্রণসমূহে প্রথম আটটি কবিতায় নাম থাকিলেও, রচনাবলীতে আদ্যোপান্ত প্রথম মুদ্রণের অনুসরণ করা হইল।

'হে বিরাট নদী' (৮) কবিতাটির রচনাবলীতে গৃহীত পাঠে অষ্টম ছত্রটি নূতন, পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত। 'পাখিরে দিয়েছ গান' (২৮) কবিতাটির প্রথম শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপির পাঠে সম্পূর্ণ একটি নূতন স্তবক আছে :

ফুলের পাতার পুটে রেখে দিলে তব নাম,
    করে সে প্রণাম—
তোমার নামের ভরে মাথা হয় নিচু
    তার বেশি আর নয় কিছু।
দিলে জনমের প্রাতে
    মোর হাতে
শুধু শূন্য সাজিখানি, রক্তে দিলে শান্তিহীন খোঁজা,
    শূন্য ভ'রে এনে দিই পূজা।

বলাকার সকল কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত, এবং ৩ ও ৪১ -সংখ্যক কবিতা ব্যতীত সবগুলিই শিরোনাম-যুক্ত ছিল। সেই প্রথম প্রচারের তালিকা অতঃপর দেওয়া গেল :

সংখ্যা	নাম	পত্রিকা
১	সবুজের অভিযান	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২১
২	সর্বনেশে	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২১
৩	আমরা চলি সমুখপানে (বলাকা : আহ্বান)	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
৪	শঙ্খ	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
৫	পাড়ি	সবুজ পত্র। ভাদ্র ১৩২১
৬	ছবি	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২১
৭	তাজমহল (বলাকা : শা-জাহান)	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২১
৮	চঞ্চলা	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২১
৯	তাজমহল	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২১
১০	উপহার	সবুজ পত্র। মাঘ ১৩২১
১১	বিচার	সবুজ পত্র। মাঘ ১৩২১
১২	দেওয়া নেওয়া	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩২২
১৩	যৌবনের পত্র	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২২
১৪	মাধবী	প্রবাসী। চৈত্র ১৩২২

১৫	আমার গান	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২২
১৬	রূপ	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২২
১৭	প্রেমের পরশ	মানসী। আষাঢ় ১৩২২
১৮	যাত্রা	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২২
১৯	জীবন মরণ	ভারতী। আশ্বিন ১৩২২
২০	যাত্রাগান	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২২
২১	অগ্রণী	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২২
২২	মুক্তি	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩২১
২৩	দুই নারী	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
২৪	স্বর্গ	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩২১
২৫	এবার	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
২৬	আবার	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
২৭	রাজা	ভারতী। আষাঢ় ১৩২৩
২৮	দেনাপাওনা	ভারতী। চৈত্র ১৩২২
২৯	তুমি আমি	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২২
৩০	অজানা	সবুজ পত্র। ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২২
৩১	পূর্ণের অভাব	ভারতী। চৈত্র ১৩২২
৩২	সন্ধ্যায়	ভারতী। শ্রাবণ ১৩২২
৩৩	প্রেমের বিকাশ	প্রবাসী। চৈত্র ১৩২১
৩৪	খোলা জানালায়	প্রবাসী। চৈত্র ১৩২১
৩৫	'মানসী'	মানসী। মাঘ ১৩২২
৩৬	বলাকা	সবুজ পত্র। কার্তিক ১৩২২
৩৭	ঝড়ের খেয়া	প্রবাসী। পৌষ ১৩২২
৩৮	নূতন বসন	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২২
৩৯	শেক্‌স্‌পিয়র	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২২
৪০	চেয়ে দেখা	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২২
৪১		সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২২
৪২	অপমানিত	মানসী। বৈশাখ ১৩২৩
৪৩	পথের প্রেম	ভারতী। বৈশাখ ১৩২৩
৪৪	যৌবন	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২৩
৪৫	নববর্ষের আশীর্বাদ	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২৩

৩৯-সংখ্যক কবিতাটি শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যুর তিনশততম স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষে রচিত হয়, এবং নিম্নমুদ্রিত কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদসহ A Book of Homage to Shakespeare, 1916 গ্রন্থে (পৃ· ৩২০-২১) প্রকাশিত হয়। কবির ইংরেজি কোনো কবিতাগ্রন্থে ইহা সংকলিত হয় নাই :

When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O sun, England's horizon felt you near her breast and took you to be her own.

She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest

branches, hid you behind her mist mantle and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow flowers.

A few early birds sang your hymn of praise while the rest of the woodland choir were asleep.

Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher and higher till you reached the mid-sky, making all quarters of heaven your own.

Therefore, at this moment, after the end of centuries the palm groves by the Indian sea raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise.

বলাকার ৪ ও ৭ -সংখ্যক কবিতা দুইটির নিম্নোদ্‌ধৃত ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

৪ ॥ বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়— অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীন ভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

৭ ॥ শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তা হলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না— ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়— পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে-সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়— তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে-সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'— যে চলে যায় সে-ই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই— আর যে-অহং কাঁদছে, সে-ই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে 'আমি' বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার' ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল, যে-মানুষটা বলে তারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে ; আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী— তাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে। (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮)

৭-সংখ্যক কবিতাটির শেষাংশ সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীকে একটি পত্রে (২১ শ্রাবণ, ১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

যে-প্রেম সম্মুখপানে···
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা। ইত্যাদি।

কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে—। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে— সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরো দশজন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, যদি সন্তোষজনক না মনে কর, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।

বেগমমণ্ডলী বাদশার-পরিবৃত যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলিত পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে প'ড়ে ধূলি হয়ে যায় নি, ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালে পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে-বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর-একটি ঘোষণা আছে, তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে— তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চিরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে, সে-প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।

আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময় এটাকে বর্জন করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম, কে বোঝে কে না-বোঝে সে-কথার বিচার আমি করতে যাব কেন— তোমাদের মতো অধ্যাপকদের আক্কেলদাঁতের চর্ব্য পদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগবে কী উপায়ে।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতাটি সম্বন্ধে প্রসঙ্গত লিখিয়াছেন :

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। য়িহুদি পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে-স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে-স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়— তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ির পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি—
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সে অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্য মিথ্যা, ভালো মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়।— অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে— জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে— অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে

branches, hid you behind her mist mantle and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow flowers.

A few early birds sang your hymn of praise while the rest of the woodland choir were asleep.

Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher and higher till you reached the mid-sky, making all quarters of heaven your own.

Therefore, at this moment, after the end of centuries the palm groves by the Indian sea raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise.

বলাকার ৪ ও ৭ -সংখ্যক কবিতা দুইটির নিম্নোদ্‌ধৃত ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

৪ ॥ বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়— অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীন ভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

৭ ॥ শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তা হলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না— ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়— পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে-সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়— তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে-সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'— যে চলে যায় সে-ই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই— আর যে-অহং কাঁদছে, সে-ই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে 'আমি' বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার' ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল, যে-মানুষটা বলে তারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে ; আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী— তাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে। (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮)

৭-সংখ্যক কবিতাটির শেষাংশ সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীকে একটি পত্রে (২১ শ্রাবণ, ১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

যে-প্রেম সম্মুখপানে···
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা। ইত্যাদি।

কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে—। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে— সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরো দশজন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, যদি সন্তোষজনক না মনে কর, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।

বেগমমণ্ডলী বাদশার-পরিবৃত যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলিত পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে প'ড়ে ধূলি হয়ে যায় নি, ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালে পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে-বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর-একটি ঘোষণা আছে, তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে— তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চিরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে, সে-প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।

আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময় এটাকে বর্জন করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম, কে বোঝে কে না-বোঝে সে-কথার বিচার আমি করতে যাব কেন— তোমাদের মতো অধ্যাপকদের আক্কেলদাঁতের চর্ব্য পদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগবে কী উপায়ে।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতাটি সম্বন্ধে প্রসঙ্গত লিখিয়াছেন :

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। য়িহুদি পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে-স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে-স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়— তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ির পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি—
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সে অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্য মিথ্যা, ভালো মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়।— অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে— জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে— অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে

সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং— মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন— তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে ; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে— তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না— সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়— শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়— সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা— এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃত লোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে, এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি— তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে— অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।"

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের অধ্যাপনার সময়ে (১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলাকার অনেকগুলি কবিতার যে-আলোচনা করিয়াছিলেন প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কৃত তাহার অনুলেখন ১৩২৯-৩০ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় নিম্নমুদ্রিত ক্রম-অনুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল :

১৩২৯ : জ্যৈষ্ঠ ১, ২, ৩, ৪, ; আষাঢ় ৫ ; অগ্রহায়ণ ১৭, ১৮ ; পৌষ ৩১ ; মাঘ ২৪, ৩০ ; ফাল্গুন ১৪ ; চৈত্র ৬।

১৩৩০ : বৈশাখ ১৬ ; আষাঢ় ২২ ; ভাদ্র ২৩ ; আশ্বিন ৩২, ৩৩ ; কার্তিক ৩৪, ৩৫ ; অগ্রহায়ণ ২৮, ২৯ ; পৌষ ৩১, ৩৬, ৩৮ ; মাঘ ৪৫।

এই আলোচনায় স্থানে স্থানে বলাকার কবিতাগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল[২] :

এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এন্ডরুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এইজন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা ক'রে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা (২) লেখার অনেক পরে আসে। এন্ডরুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্‌বেগ ছিল...

২ দ্রষ্টব্য বলাকা স্বতন্ত্র গ্রন্থ

এই কবিতা (৪) যে-সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে ; ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয় নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমা রোঁলা, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে ; সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

বলাকা-রচনাকালে যে-ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল এখনো সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে-আলোড়ন হলো তার কী সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে-চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি ; একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি ; সে-ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানে নি। বলাকায় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার (৩৬) মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না, কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে— এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর-এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংস-বলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল— এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ সকলে এক জায়গায় চলেছে ; তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী— এখানে নয়, এখানে নয়।

বলাকার রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি-সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৬৭) উল্লিখিত রবীন্দ্র ব্যাখ্যা ও আলোচনা সামগ্রিকভাবে বলাকার অঙ্গীভূত হইয়াছে। বলাকার পুনর্মুদ্রণে বা সংস্করণে তদবধি সেই রীতি চলিতেছে।

অচলায়তন

অচলায়তন ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (পোস্টমার্ক : শান্তিনিকেতন ১৪ জুলাই ১৯১১) লেখেন—

'শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি-কাটাকাটি চলবে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা।'

এই অনুমান ব্যর্থ হয় নাই।

প্রবাসীতে নাটকটি প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্য্যাবর্ত্ত' মাসিক পত্রে (কার্তিক ১৩১৮) ইহার একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন ; ইহাতে নাটকটির প্রশস্তি ও তিরস্কার দুইই ছিল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার উত্তর দেন ; পত্রটি 'আর্য্যাবর্ত্তে' (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) প্রকাশিত হয় ; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

'নিজের লেখা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে। সে রীতি আমি সাধারণত মানিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মতো বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমার দ্বারা হইয়া উঠে না।

'সাহিত্যের দিক দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিগ্রী দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।

'কিন্তু ওই-যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না। কেবলমাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই-তিন-রকম হইতে পারে। কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখি পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা, কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়তো পড়া যাইতে পারে। মুক্তির জন্য পাখির কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখির বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়।

'জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়, এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেইসঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

'ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই, আচারের সৃষ্টি ; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই-সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে— বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহরা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?

'আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাস-বশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে— তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না— এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে— এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।

'এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ-না-কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন এ কথা শুনিয়া খুশি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই— কিন্তু ভালো লাগুক আর না লাগুক এ কথা তাহাকে বারংবার শুনিতেই হইবে।

'প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে। সেই অহং'এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে, আপনার চেয়ে বড়োকে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখন তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়।

'ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতি-পদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই-সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোনো গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

'আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, উপায় কী। 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে। অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে। তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন।

'কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে। অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই 'না, তা যাইতে পারিবে না— যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে'? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয় প্রেতত্ব লাভই মানুষের পূর্ণতা। স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে, এ কথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

'অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই-যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

'কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার

উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে। কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কী হইতে পারে। যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই-সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন-জাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরসতা -লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে তখনই তো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন ; তিনি বলেন, পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি -অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা, সে যত দিনই বাঁচিবে তত দিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেননা, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান, আনন্দের টান— রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে— সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ, যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না ; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন ; যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু-বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে ; ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই খাটে। অবশ্য এই সর্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছে ; তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।

'মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব। কিন্তু 'নিজের কথা পাঁচ কাহন' হইয়া পড়ে ; বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ হন। ইতিপূর্বেও আপনার প্রতি জুলুম করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে ; এবারেও প্রশ্রয় পাইব এ ভরসা মনে আছে। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮, শান্তিনিকেতন'

আর্য্যাবর্ত্তের যে সংখ্যাতে (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয় সেই সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে, পূর্বসংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত তাঁহার অচলায়তন আলোচনার ও রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্রের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্রোত্তরে লেখেন—

'আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম ; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা। অবস্থাবিশেষে ক্রোধের উত্তেজনাই সত্যকে স্বীকার করিবার প্রথম লক্ষণ, এবং বিরোধই সত্যকে গ্রহণ করিবার আরম্ভ। যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই, অথচ বাহিরে দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহাদের মন রক্ষা করিয়া যে চলিবে হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সে'ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারি দিকে আবদ্ধ করিয়াছে ; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে— সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাহিরের সকল আঘাতের সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না। কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব ? অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ঐ বাহিরের শিকলটাই আছে ? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ঐ শাস্তির সঙ্গে ? আর, যত মমতা ঐ পাপের প্রতি ? তবে কি এই কথাই সত্য যে আমাদের কোথাও পাপ নাই, আমরা বিধাতার অন্যায় বহন করিতেছি ? যদি তাহা সত্য না হয়, যদি পাপ থাকে, তবে সে পাপের বেদনা আমাদের সাহিত্যে কোথায় প্রকাশ পাইতেছে ? আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই। আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশ-ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই— এই পাষাণ-প্রাচীরের চারি দিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। বাস রে ! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি ! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি। চারি দিকে তাকাইয়া শ্রেয় কোন্‌খানে দেখা যাইতেছে জিজ্ঞাসা করি। ঘরে বাহিরে কোথায় সে আছে। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে। ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন। আমাদেরও গুরু আসিতেছেন। দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন। তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব ; তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত। দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি ; সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে। বাজিবে না তো কী ! শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতেই হইবে। যে নিজে অনুভব করিতেছে সে অনুভব না

করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়া। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না। গালিকেই আমার চেষ্টার সার্থকতা মনে করিয়া আমি মাথায় করিয়া লইব, আর-কোনো পুরস্কার চাই না। ইতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮'

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই চিঠিগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহপূর্বক এগুলি আমাদের ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

অধ্যাপক এড্‌ওআর্ড্ টমসন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে অচলায়তনে কোনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থের ছায়া আছে, এইরূপ উক্তি[৩] করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠিতে (৩ আষাঢ় ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লেখেন—

'Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়ি নি— Princess-এর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই— আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।'

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে অচলায়তন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'— দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে— আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাকে শত্রু বলেই মনে করি ; তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়। কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করলে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।...

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি ?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল।' —সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

অচলায়তনের দুইখানি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। তন্মধ্যে যেটি প্রথম পাঠ বলিয়া গণ্য তাহার শেষে রচনার স্থান-কালের উল্লেখ আছে : ১৫ই আষাঢ়। ১৩১৮। শিলাইদা

৩ Its fable was probably suggested by *The Princess*, and, more remotely, *The Castle of Indolence* and *The Faerie Queen*— Edward Thompson in *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*, p. 225.

ডাকঘর

ডাকঘর ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন গ্রন্থাকারে ডাকঘরের পরে প্রকাশিত হয় ; কিন্তু ডাকঘর রচনার পূর্বে অচলায়তন লিখিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এইজন্য রচনাবলীতে উহা ডাকঘরের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে।

ডাকঘর রচনার স্থান-কাল সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে (দ্র· শারদীয় দেশ, ১৩৭৩, পত্র ৩, ৪, ৫)। ডাকঘরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে চতুর্থ পত্রে ; এই পোস্টকার্ড সম্ভবত ১ আশ্বিন ১৩১৮ তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' ভারতী পত্রে ১৩১৮ আশ্বিনে প্রচারিত, এটি রচনার পূর্বেই 'ডাকঘর' রচিত, ইহাও অনুমান করার কারণ আছে।

"'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।··· প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে— সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল।··· আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা··· 'ডাকঘরে'··· প্রকাশ করলুম।··· মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে।··· এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক।··· আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল।"

১৩২২ পৌষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল ডাকঘর।' স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ উহার যে অনুলেখন রাখিয়া গিয়াছেন, উপরে তাহারই কিয়দংশ 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ হইতে সংকলন করা গেল। ডাকঘর নাটক-রচনার প্রায় সমকালীন একটি পত্রে (২২ আশ্বিন ১৩১৮) এই কথাই কবির নিজের লেখায় ব্যক্ত হইয়াছে—

'মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চি।··· আমার মন এই কথা বল্‌চে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর ত সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্চে— আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।··· আমাদের কর্ম্ম ও সংস্কারের আবর্জ্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়— বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্ব্বে এই একটি ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্চি— এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।'

—শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত, পত্র ১৯, চিঠিপত্র ৭

দীনবন্ধু সি· এফ· এন্ডরুজকেও কবি অনুরূপ কথাই লেখেন—

I remember, at the time when I wrote it [*The Post Office*], my own feeling which inspired me to write it. Amal represents the man whose soul has received the call of the open road— he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable.

—dated June 4, 1921, included in *Letters to a Friend*.

রবীন্দ্রনাথ ১৭ ২ ১৯৩৯ তারিখের একখানি চিঠিতে পরিহাসচ্ছলে লেখেন, 'ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী— রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না— কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯১৭ অক্টোবরের জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে ডাকঘরের যে অভিনয় হয় তাহার প্রযোজনাতে কয়েকটি গান ছিল। 'আমি চঞ্চল হে' 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' এবং 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' এই তিনটি গানের উল্লেখ দেখা যায় সীতা দেবী -প্রণীত 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃ ২৫৮-৬০)। (শেষ দুটি গান রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরদার ভূমিকাতেও অভিনয় করিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়।) ১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়; জানা যায় ঐ সময়ে লোকমান্য টিলক, মিসেস বেসান্ট, গান্ধীজি, মালবীয়জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে মুদ্রিত বা পরে পুনর্মুদ্রিত ৪ জানুয়ারির ১৯১৮ তারিখের ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্রে জানা যায় যে, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' গানটি এই অভিনয়ে গাওয়া হয়। ইংরাজি অনুষ্ঠানপত্রে আরো জানি, ঠাকুরদাই (রবীন্দ্রনাথ) কখনো ভিক্ষুক কখনো প্রহরী আর কখনো ফকির সাজিয়াছেন।

সুতরাং মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১৯১৭ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ও ১৯১৮ সনের জানুয়ারিতে 'বিচিত্রা' ভবনে ডাকঘরের অভিনয়কালে, বিভিন্ন সময়ে, এই গানগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে—

আমি চঞ্চল হে
গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

উক্ত অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরপরিবারের অনেকেই অভিনয় করেন, অমলের ভূমিকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আশামুকুল দাস এবং সুধার ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর নাটকের নবতর অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন ও তদুপলক্ষে অনেকগুলি নূতন গান রচনাও করেন। গানগুলি বর্তমানে গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত রহিয়াছে; গীতিসংযুক্ত বা পরিবর্তিত 'ডাকঘর' নাটকের কোনো পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। (শেষ পর্যন্ত কবির ভগ্নস্বাস্থ্যে অনুচিত পীড়নের শঙ্কায়, এই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা হয়)— নিম্নে গানগুলির উল্লেখ করা গেল—

১ আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল
২ বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে

৩ শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি
৪ এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা
৫ সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন
৬ কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
৭ সমুখে শান্তিপারাবার। রচনা : ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১, ৬ -সংখ্যক গানের স্বরলিপি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এবং ২, ৩, ও ৭ -সংখ্যক গানের স্বরলিপি যথাক্রমে ৬০, ৫৩ ও ৫৫ -সংখ্যক স্বরবিতান গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ৬ -সংখ্যক গানের স্বরলিপিকার শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, অন্যান্য গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে।

ডাকঘর নাটক *The Post Office* (1914) রূপে অনূদিত হইয়া বিদেশে আদৃত ও অভিনীত হয়।

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী ১৯১৬ খৃস্টাব্দে (১৩২২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গীতিভূমিকার গানগুলি ও সর্বশেষের উৎসবের গানটি একত্রে 'বসন্তের পালা' নামে নাটকের প্রবেশকরূপে, এবং নাটক অংশটি 'ফাল্গুনী' নামে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের সবুজ পত্রে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি জুড়িয়া প্রকাশিত হয়। এই দুইটি অংশের রবীন্দ্রনাথ যে-দুইটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা সবুজ পত্র হইতে নিম্নে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল :

ভূমিকা : বসন্তের পালা

আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মতো তাহারই মূল সুরকয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।

একদা এপ্রেলের পয়লা তারিখে কবি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজটা খুব রীতিমত জমিয়াছিল ; তার পরে পরিণামে যখন বিল শোধের জন্য অর্থ বাহির করিবার দরকার হইল তখন কবির আর দেখা পাওয়া গেল না। সেদিনকার এই ছিল কৌতুক। এবারকার এপ্রেলেরও কৌতুকটা সেই একই, গোড়াতেই তাহা বলিয়া রাখা ভালো। সবুজ পাতার পাত পাড়িয়া যে-বাসন্তিক ভোজের উদ্যোগ হইল কবি শেষ পর্যন্ত তাহাতে যোগ দিবেন কিন্তু যখন সেই ভয়ংকর পরিণামের সময়টা উপস্থিত হইবে, যখন সকলে চীৎকার শব্দে অর্থ দাবি করিতে থাকিবে তখন, হে কবি,— "অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর !"

ভূমিকা : ফাল্গুনী

বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্ত-যাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যা-ই হউক ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্য-মিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো এত বড়ো প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারও কারও চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে-খবরটা এখনো তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সব চেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনো বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য যে সব চেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে

সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া— পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই। যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেল না। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।

নক্ষত্রলোকের যে-কবি নীহারিকার কাব্য লেখেন তিনি আপন খেয়ালমত অনেকখানি আলো ঝাপসা করিয়া আঁকিয়াছেন, তারই মাঝে মাঝে একটা-একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। বেশ দেখা যাইতেছে, এই মর্তের লেখকটা তাঁরই নকল করিবার চেষ্টা করে। আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানি না কিন্তু ঝাপসা নকল করিতে চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড়ো দূরবীন এবং খুব জোরালো অণুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

যত বড়ো লেখা তার চেয়ে ভূমিকা বড়ো হইলে লোকের সুবিধা হয়, এমন-কি, ভূমিকাটাই রাখিয়া লেখাটা বাদ দিতে পারিলেও কোনো উৎপাত থাকে না।— কিন্তু ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সময় আর বেশি নাই।

ফাল্গুনীর সবুজ পত্রে প্রকাশিত ভূমিকাসংবলিত পাঠের এবং গীতিভূমিকার গানগুলির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে। বর্তমান সংস্করণের পাঠ তাহার সাহায্যে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইল। পাণ্ডুলিপি-অনুসারে ফাল্গুনী-রচনার তারিখ ও স্থান, ২০ ফাল্গুন ১৩২১, সুরুল।

যে-সকল গানের রচনার তারিখ ও স্থান পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া	১২ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১ সুরুল
আকাশ আমায় ভরল আলোয়	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
ওগো নদী, আপন বেগে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
আমরা খুঁজি খেলার সাথি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো	১২ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আমরা নূতন প্রাণের চর	১৩ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
আর নাই যে দেরি	১৪ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
এবার তো যৌবনের কাছে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল

এতদিন যে বসেছিলেম	১৫ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
চোখের আলোয় দেখেছিলেম	২১ ফাল্গুন প্রাতে [১৩২১] সুরুল
তোমায় নতুন করে পাব ব'লে	২০ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল

চতুর্থ দৃশ্যের 'আমি যাব না গো অমনি চলে' গানটির একটি স্বতন্ত্র পাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে :

আমি বিদায় নিয়ে যাব না গো চ'লে
মালাখানি না পরায়ে গলে।
অনেক গভীর রাতে অনেক ভোরে
তোমার বাণী নিলেম বুকে ক'রে,
ফাগুনশেষে এবার যাবার বেলা
আমার বাণী তোমায় যাব ব'লে।
কিছু হল রইল অনেক বাকি।
ক্ষমা আমায় তুমি করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নি প্রাণে,
শোনানো তাই হয় নি তোমার কানে,
বাকি যাহা রইল, যাব রাখি'
নয়নজলে আমার নয়নজলে ।।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্য-কল্পে ১৩২২ সালের মাঘ মাসে কলিকাতায় ফাল্গুনী নাটকের অভিনয় হয়। ফাল্গুনীর প্রচলিত সংস্করণের 'সূচনা' অংশ সেই উপলক্ষে রচিত হয় (মাঘ ১৩২২) এবং 'বৈরাগ্য সাধন' নামে ১৩২২ সালের মাঘ মাসের সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের সূচনা অংশে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' গানটি সবুজ পত্রের পাঠ-অনুযায়ী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩২২ সালের এই অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্বে শান্তিনিকেতন হইতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রে এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত অভিনয়সূচীর একটি অসম্পূর্ণ খসড়া হইতে ফাল্গুনীর অভিনয় ও সূচনা-সংযোজন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। পত্র কয়খানি পুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে ছিল ; বর্তমানে শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

১

গগন, ফাল্গুনীর সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate— ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আসবে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ-জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় শুরু হবার পরে প্রোগ্রাম পড়বারও সময় থাকবে না, কেননা একবারও যবনিকা পড়বে না। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা-কিছু যদি করা যায় তা হলেও চলে— তা হলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার উপর দিয়ে কেটে যায়। আর-একটা কথা— অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তা হলে সেটাতে করে বিজ্ঞাপনও হবে, শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে। এটা ভেবে দেখো। প্রোগ্রামের নাম দিয়ো নাট্যবিষয়সার। দাদার চৌপদীগুলো প্রোগ্রামে ছাপানো থাকলে মন্দ হয় না। যে যে দৃশ্যে তার যে যে চৌপদী আছে সেই সেই দৃশ্যের গানগুলি যেমন ছাপা হবে অমনি তারই সঙ্গে 'দাদার চৌপদী' এই heading দিয়ে চৌপদীগুলোও ছাপিয়ে দিয়ো। তার কারণ, চৌপদীগুলো stage-এ প্রথমটা শোনবামাত্রই তার মানে বোঝা যায় না।

চেষ্টা করছি আমাদের শিশুগাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে।... দু-একটি বড়ো মেয়ের গলাও পাবার চেষ্টা করছি— এখানে কিছুকাল এসে থেকে শিখে যেতে পারে এমন বেশ গলাওয়ালা মেয়ের সন্ধান আছে কি। ছেলের দলের মধ্যে দু-চারটি মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে বেশ দেখতে হবে। রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের by play-টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।

... ফাল্গুনীর কথাটা মনের মধ্যে সর্বদাই জাগিয়ে রেখো— ভাবতে ভাবতে ক্রমে ক্রমে এক-একটা suggestion মনে এসে পড়বে। চোখ এবং কান দুইয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুলতে হবে। তার পরে মানে বুঝতে না পারে না-ই পারলে— বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার।

২

প্রোগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। তাতে 'বশীকরণ' নাম বদলে 'বহুবিবাহ' করে দিয়েছি।

তোমাদের রিহার্সেল কী রকম চলছে। মেয়ে সাজাবার সমস্যা কী রকম সমাধান করলে।...

বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। মনোরমাকে একটিও কথা বলতে হয় নি— সে audience-এর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে— গোঁফ দাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না— নেপথ্য থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে।

অবশ্য, মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে। তাকে দিব্য করে ত্রিপুন্ড্র প্রভৃতি এঁকে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবী-গোছের চেহারা করে দিতে হবে।— অথচ দেখতে ভালো হওয়া চাই।

ফাল্গুনীর সর্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তার হাতে ধনুর্বাণ দিতে হবে। সেটা তৈরি রেখো। সর্দারকে একটু বেশ সাজানো চাই। অন্য যারা আছে তারা নানা রঙ-বেরঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুলবে।

বাউলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ধবধবে সাদা করে দিয়ো।

৩

ফাল্গুনীটা এতই ছোটো যে যারা দশটাকা দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে। ওর সঙ্গে একটা ফাউ না দিলে কি চলবে। না-হয় বৈকুণ্ঠের খাতাটা জুড়ে দাও-না। বহুবিবাহটা ছোটো আছে, ধাঁ করে মুখস্থ হয়ে যাবে— চারু, দ্বিজেন বাগচী, সুরেশ, মণিলাল প্রভৃতিকে এতে লাগিয়ে দাও-না। নিতান্তই যদি না পার আমার addition[৪]-ওয়ালা বইটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো, দেখি যদি এখানে কোনোরকম করে করে-তুলতে পারি। আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত, তবু তোমরা যখন আমাদের পরিত্যাগই করলে তখন একবার প্রাণপণে চেষ্টা করব আত্মশক্তিতে কী করতে পারি।...

বাংলা প্রোগ্রামটা তুমি মনোমোহন ঘোষকে দিয়ে ইংরেজি করিয়ে নাও— এখন আমার এত কম সময় যে ও-ভার আমি নিতে পারব না।

৪

কাল সন্ধেবেলায় তোমার টেলিগ্রাফের তাড়া পেয়ে কালই লিখে ফেলেছি। সংক্ষেপে হলে চলবে না— কাজেই একটু ফলিয়ে ছেলেদের গানগুলো তর্জমা করে একটু বেশ পড়াবার যোগ্য করে তুলতে হল।...

৪ সংযোজনাংশ পরে দ্রষ্টব্য।

ভাবছিলুম উঠোনে স্টেজ না করে আটচালা বেঁধে তোমাদের দক্ষিণের আঙিনায় স্টেজ করলে কেমন হয়। এখন থেকেই সাজাতে পার— গাছপালা পোঁতা সহজ হয়, হয়তো seats বেশি ধরতে পারে, সামনের রোয়াকে এবং দোতলায় মেয়েদের জায়গা করা যায়, ইত্যাদি সুবিধা আছে। হোগলার চাল করলে একপশলা বৃষ্টিও কেটে যেতে পারে।

কাপড়ের কী করলে। আমার জন্যে যে সাদা ঝোলা করবে তার হাতের আস্তিনটা খুব ঝোলানো করতে হবে— মসলিনের কাপড় হলে সাদাটা বেশ খুলবে ভালো। মেয়ে যারা থাকবে, তাদের পেশোয়াজ গোছের সাজেই বোধ হয় মানাবে। কী বল।...

ব্যস্ত আছি। বৈকুণ্ঠের খাতার তালিমটা যেন ভালোরকম দেওয়া হয়— প্রম্‌প্‌টিঙের উপরেই কান পেতে থেকো না— ভালো মুখস্থ না হলে জমে না। মুশকিল, আমি ওখানে নেই— থাকলে জবরদস্তি করে খাড়া করে তুলতে পারতুম।

৫

আমিও সে-কথা ভাবছিলুম। বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে ফাল্গুনীকে জুড়ে দিলে বড্ড বড়ো হবে। তা ছাড়া দুটোর মধ্যে মিল থাকবে না। তাই ভাবছি, ফাল্গুনীরই একটা introduction গোছের scene জুড়ে দেব— সেটা ছোটো হবে, তাতে মেয়ে থাকবে না, আর যারা দেরিতে আসবে তাদের disturbance-টা ঐটের উপর দিয়েই যাবে। এটা রাজা ও রাজসভাসদ্‌দের ব্যাপার হবে। একটু কাপড়চোপড় হয়তো বেড়ে যাবে— কিন্তু এর অভিনয় তোমাদেরই ঘাড়ে ফেলব। কাল থেকে লিখতে শুরু করব।...

তোমরাই শুধু ব্যস্ত আছ তা নয়— আমরাও ভয়ানক ব্যস্ত। তোমাকে চিঠি লিখছি যেন স্বপ্নে লিখছি— মনটা কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলতে পারি নে।

... একা ফাল্গুনীতেই যাতে আগুন জ্বলে ওঠে সেই চেষ্টা করা যাবে। তোমরা stage effect জমাবার ভারটা নিয়ো— আমরা গানে ও অভিনয়ে আছি।

ইংরেজি synopsis-টা পড়লে বুঝতে পারবে ছেলেদের কাকে কী রকম সাজাতে হবে। বেণুবন, পাখি, ফুটন্ত চাঁপা, বকুল, পারুল, আমের বোল, শালের কচি পাতা ইত্যাদি।

ফাল্গুনীর আরম্ভে বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসন সংযোজনের যে-প্রস্তাব এই পত্রগুলিতে উল্লিখিত আছে সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় সৌজন্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহার খসড়া 'অভিনয়সূচি' অতঃপর মুদ্রিত হইল।

অভিনয়সূচি

বহুবিবাহ প্রহসন

কেমন করিয়া একটিকে লইয়াই বহুবিবাহ ঘটিতে পারে এই প্রহসনে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্য : আশুর বাড়ি

অন্নদা স্ত্রী-সত্ত্বেও দৈবদুর্যোগে স্ত্রীহারা। তিনি আশুর সহিত দ্বিতীয় স্ত্রী-সন্ধানের আলোচনায় রত। ৪৯ নম্বরের রামবৈরাগীর গলিতে পশ্চিম হইতে এক বিধবা তাঁহার বিবাহযোগ্যা কুমারী কন্যা মনোরমার যোগ্য পাত্র খুঁজিতেছেন। তাহাকে দেখিতে যাইবার পরামর্শ। কুমারব্রতধারী আশু যোগবিদ্যা চান, তিনি স্ত্রী চান না। তাঁহার অনুবর্তী রাধাচরণ সংবাদ দিল যে, মন্ত্রে তন্ত্রে সিদ্ধা মাতাজি ২২ নম্বর ভেড়াতলায় যোগবিদ্যা দান করিবার যোগ্য পাত্র খুঁজিতেছেন। অন্নদা কন্যার সন্ধানে চলিল ৪৯ নম্বরে, আশু যোগবিদ্যার সন্ধানে চলিল ২২ নম্বরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : ২২ নম্বর ভেড়াতলা

মাতাজি অনুভব করিয়াছেন, মন্ত্রসাধনার পক্ষে ২২ নম্বরটি অনুকূল নহে। বাড়ি বদল করিতে চান। বাড়িওয়ালার ৪৯ নম্বরের বাড়িতে পশ্চিম হইতে কন্যাসহ এক বিধবা মহিলা আসিয়াছেন। স্থির হইল তাঁহার ৪৯ নম্বরের সহিত মাতাজির ২২ নম্বরের বাসা বদল করা হইবে।

তৃতীয় দৃশ্য : ২২ নম্বর ভেড়াতলা

কন্যার মা আশঙ্কা করিতেছেন, যে-ছেলেটি মেয়ে দেখিতে আসিবে পাছে সে ৪৯ নম্বরে গিয়া খবর না পায়। এমন সময় যোগবিদ্যাপ্রার্থী আশু আসিয়া উপস্থিত। তাহার প্রার্থনার কিরূপ পূরণ হইল এই দৃশ্যে প্রকাশ পাইবে। গান। কী বলে করিব নিবেদন—

চতুর্থ দৃশ্য : ৪৯ নম্বর রামবৈরাগীর গলি

বিবাহযোগ্যা কন্যা দেখিতে আসিয়া ৪৯ নম্বরে অন্নদার কেমন করিয়া যোগবিদ্যার পরিচয় লাভ ঘটিল এই দৃশ্যে তাহাই বর্ণিত। গান। এবার বুঝি সোনার মৃগ—

সমাপ্ত

ফাল্গুনী : গীতিনাট্য

এককেই কোন্ পথে হারাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পাই, সেই রহস্য এই গীতিনাট্যে প্রকাশ হইয়াছে।

ভূমিকা

ফাল্গুনে বনে বনে নববসন্তের চর ও অনুচরগণের আবির্ভাব।

বেণুবনের গান

দখিন হাওয়া—

পাখির নীড়ের গান

আকাশ আমায়—

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী—

প্রথম দৃশ্য : বনপথ

নবযৌবনের দল প্রাণের বেগে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দলের মধ্যে প্রবীণ দাদা প্রাণের চাঞ্চল্য অশ্রদ্ধা করেন। তিনি উপদেশগর্ভ চৌপদী রচনা করিয়া তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক— নবযৌবনের দল তাহাতে কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক। নবযৌবনদলের নেতা জীবনসর্দারের প্রবেশ। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল, জগতে চিরকালের যে-বুড়োটা যৌবন-উৎসবের আলোটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া অন্ধকার করিয়া দেয় তাহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলিতে হইবে। গান। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে—

বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসনটিকে ফাল্গুনীর পূর্বে জুড়িবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, পরপৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত হইল :[৫]

৫ অন্নদা। হতে পারে না কী বলছ। হয়েছে, আবার হতে পারে না কী। একবার হয়েছে, এই আবার দু-বার হল, তুমি বলছ হতে পারে না! ('বশীকরণ', পঞ্চম অঙ্ক, রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, পৃ· ৩৮৩, সুলভ চতুর্থ পৃ· ৩৬৯)— এই উক্তির অনুবৃত্তিরূপে সংযোজনাংশটি পড়িতে হইবে।

[অন্নদা] বহুবিবাহ কাকে বলে এবার সেটা নতুন করে বুঝেছি।

আশু। কী রকম শুনি।

অন্নদা। একের সঙ্গেই আমাদের বহুবার করে মিলন হচ্ছে। একটি পুরাতনকেই আমরা বারে বারে নূতন করে পাচ্ছি।

আশু। আমি তো এই তত্ত্ব তোমাকে এর আগে বোঝাতে চেয়েছিলুম, তখন তুমি কান দেও নি।

অন্নদা। এখন ভালো গুরু পেয়েছি বলেই সব বোঝা এত সহজ হয়ে গেছে। তোমাকেও কতবার আমি বোঝাতে চেয়েছি, মন্ত্র জিনিসটা খুবই সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো পুঁথির মন্ত্র নয়— মন্ত্র আছে চোখে মুখে হাসিতে ইশারায়। আমার কথা বিশ্বাস কর নি— এখন মন্ত্রদাতা যেমনি পেয়েছ অম্‌নি সব সন্দেহ ঘুচে গেছে।

আশু। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। আর কুড়ি মিনিট বাকি।

অন্নদা। একটা কথা বলে নিই। তোমার তো অনেক কবিবন্ধু আছে— আমাদের এই বহুবিবাহের উৎসবে একটি নাটক ফরমাশ দিতে চাই।

আশু। বিষয়টা কী হবে বলো দেখি।

অন্নদা। হারাধনকে ফিরে পাওয়া।

আশু। যেমন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমরা পুরোনো জীবনকে আবার নতুন করে পাই।

অন্নদা। আশু, তোমার ও-সব তত্ত্বকথা রাখো। এখন আমার কবিত্বে ভারি দরকার। এমনি হয়েছে যদি শিগগির একটা কাব্য জুটিয়ে না দিতে পার তা হলে আমিই লিখতে বসে যাব— সম্পাদক, পাঠক, মাস্টারমশায়, পুলিসম্যান, কাউকে মানব না। সেই বিপদ থেকে গৌড়জনকে রক্ষা করো।

আশু৷ আচ্ছা বেশ, বিষয়টা তা হলে এই রইল— শীতের ভিতর দিয়ে একই বসন্তের বার বার নতুন হয়ে ফিরে ফিরে আসা। যখন মনে হচ্ছে সবই ঝরে পড়ল তার পরেই দেখি সবই গজিয়ে উঠছে, বনলক্ষ্মীর আঁচল যেই শূন্য হয় অমনিই তা দেখতে দেখতে ভরে ওঠে। এমনি করে একই ধনকে বার বার করে পাওয়া।

অন্নদা। বাহবা আশু! এ'কেই তো বলে কবিত্ব! কিন্তু বহুবিবাহ করলুম আমি, আর তোমার মাথায় তার কবিত্ব গজিয়ে উঠল কী করে।

আশু। বলব? বাইশ নম্বরে আমি যাঁর কাছে আজ মন্ত্র নিয়ে এসেছি, মনে হল এ-মন্ত্র তাঁরই চোখ মুখ হাসি থেকে যেন আমি বারে বারে নিয়েছি— নতুন নতুন নম্বরের গলিতে, নতুন নতুন ভাষায়। তোমার মহীমোহিনী যেমন তোমার একবারই মোহিনী নয়, আমার মনোরমাও তেমনি আমার লক্ষ যৌবনের লক্ষবারকার মনোরমা।

অন্নদা। হয়েছে, হয়েছে হে, আর বলতে হবে না। জীবনের লুকোচুরি খেলার রসটি আমরা দুই বন্ধুই ঠিক এই মুহূর্তে ধরতে পেরেছি।

আশু। (মহীমোহিনীর দিকে ফিরিয়া) দেবী, তোমাদের কল্যাণে আমরা অমৃতকে চক্ষে দেখেছি— আমরা চিরজীবনকে পাকড়াও করেছি। আমরা এখন থেকে পৃথিবীর সেই বুড়োটাকে আর বিশ্বাস করব না— তার মুখোশ খসে গেছে, সে চিরযৌবন, সে চিরপ্রাণ। তাকে যেমনি ধরতে যাই অমনি দেখি, সে নেই— তার জায়গায় তোমরা— হে চিরসুন্দর, হে চিরআনন্দ!

অন্নদা। আরে আরে আশু, কর কী, কর কী। তুমি আমার মুখের সব কথাই যে কেড়ে নিলে, কিছু আর বাকি রাখলে না! ভুলে যাচ্ছ, তোমার কুড়ি মিনিটের আর বারো মিনিট মাত্র বাকি।

আশু। ঠিক বটে, চললুম।

অন্নদা। কাজ সারা হলে তোমার কবিকে একবার ঠেলে তুলো— ভুলো না। ফাল্গুন মাসে

ত্রিশটা বই দিন নেই।

আশু। পাঁজির ফাল্গুনের সঙ্গে আমাদের ফাল্গুনের মিলবে না। আমাদের ফাল্গুনের দিন বেড়ে গেছে।

—শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৮

১৯২৫ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালে ঢাকায় একবার ফাল্গুনীর অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিম্নমুদ্রিত কথোপকথনটুকু নাটকের সূচনার শেষে যোজনার জন্য পাঠান :

কবি, তুমি যে এই ভরা বাদলের মাঝখানে ফাল্গুনের তলব করে বসলে, এ তোমার কী রকম খ্যাপামি।

এ খ্যাপামি শিখেছি সেই খ্যাপার কাছ থেকে যিনি জ্যৈষ্ঠের হোমহুতাশনের ভরা দাহনের মধ্যে সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত আষাঢ়ের অভিষেক-উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র জারি করে বসেন কদম্বের নবকিশলয়ে। যিনি পাতাঝরা উত্তুরে হাওয়ার সুর এক মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়ে বনসভায় দক্ষিণ হাওয়ার আসর জমিয়ে তোলেন। বর্ষার শিঙাখানা কেড়ে নিয়ে তাতেই যদি বসন্তের বাঁশি বাজিয়ে তুলতে না পারি তবে আমি কবি কিসের।

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল
কার মন্তরে।।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ মাঘ ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত— এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে— আচ্ছা দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে— চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে

জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়— সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে— আনব সেই জরাবুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়— তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বলছে— "যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা কী হত।"— বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র। যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে— তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হত— তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর্ সর্ শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে— এ-ই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে— যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না ; তারা জরাকে বরণ ক'রে জীবন্মৃত হয়ে থাকে— প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।—

চন্দ্রহাস। এ কী। এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দার? বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও তো নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে

তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে— এখন মনে হচ্ছে তুমি বালক— যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

—সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

দুই বোন

দুই বোন ১৩৩৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিচিত্রা মাসিক পত্রে (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৯) উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

দুই বোন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র বিচিত্রায় (শ্রাবণ ১৩৪০) মুদ্রিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা সংকলিত হইল :

তুমি লিখেছ তোমার বান্ধবী আমার কল্পিত 'দুই বোন' এর ভাগ্যবিভ্রাটের যত দোষ চাপিয়েছেন শশাঙ্কের ঘাড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে দোষটা প্রকৃতি মায়াবিনীর। মানুষের চলবার বাঁধা রাস্তায় সেই নিষ্ঠুর চোরা-ফাঁদ পেতে রাখে, অসন্দিগ্ধমনে চলতে চলতে হঠাৎ পথিক এমন জায়গায় পা ফেলে যেখানটাতে ঢাকা গর্ত। শশাঙ্কের সংসারযাত্রার রাস্তাটা দেখতে ছিল মজবুত, কিন্তু শশাঙ্কের চলনের পক্ষে ছিল পিছল। হতভাগা ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বার পূর্বে সে কথাটা তার আপনার কাছেও যথেষ্ট গোচর হয় নি। দিনগুলো চলছিল ভালোই, কিন্তু যে সাঁকো বেয়ে চলছিল তার বাঁধনে ছিল ফাঁক। কেননা শশাঙ্কে শর্মিলায় ভিতরে ভিতরে জোড় মেলে নি, অথচ ফাটলটা উপর থেকে ধরা পড়ে নি চোখে। হঠাৎ বাইরে থেকে মড়্‌মড়্‌ করে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি ওরা কেউ জানতে পেরেছিল। যখন জানা গেছে তখন তো কপাল ভেঙেছে। পরামর্শদাতা বলবে ফাটা কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে ভালোমানুষের মতো সেই সাবেক রাস্তায় উঁছোট খেতে খেতে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে চলা কর্তব্য। শশাঙ্ক সেইভাবেই চলত। কিন্তু শর্মিলা বলে বসল তেমন চলায় কোনো পক্ষেই সুখ নেই। স্পর্ধাপূর্বক আপন বিশেষ প্ল্যান অনুসারে ভাগ্যকে সংশোধন করবার প্রস্তাব জানালে। কিন্তু ভাগ্যলিপির উপরে কলম চালানো এত সহজ নয়। সে কথাটা বুঝেছিল ঊর্মিমালা। ভূমিকাম্পনিক কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মাল-মসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় আশ্রয় নিতে সে নারাজ। তাই সে দিলে দৌড়। তার পরে কী ঘটল তা কে বলবে ? কালক্রমে উপরকার কাটার দাগটা হয়তো মিলিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে মাঝে নাড়া খেয়ে ভিতরকার ছেঁড়া স্নায়ুর ব্যথাটা কি আজও টন্‌টনিয়ে ওঠে না। ব্যথা যারা পায় তাদেরই উপরে আমরা জজিয়তি করি, কিন্তু ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি সব সময়ে তারাই নিজে ? বজ্রাঘাতে ম'ল মানুষটা, তুমি বললে কিনা পূর্বজন্মের পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইচ্ছারই প্রমাণ হয়, দোষের প্রমাণ হয় না।

তুমি লিখেছ তোমার বান্ধবী আমার গল্পটার সব কটি পাত্রের 'পরেই বিমুখ। সংখ্যা অতি অল্প, তিনটিমাত্র প্রাণী, তবু তারা একজনও তাঁর মনের মতো নয়। তা নিয়ে দুঃখিত হবার কারণ নেই। কেননা, অভিব্যক্তিতত্ত্বের প্রাকৃতিক নির্বাচনপ্রণালী সাহিত্যে এবং সমাজে একই নয়। সমাজে যাদের আমরা বর্ধর কোঠায় গণ্য করি নে সাহিত্যে তারা সমাদর পেয়েছে, এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। আদর্শ মানবচরিত্রের মাপে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা-বিচার বাংলাদেশের সমালোচক-শ্রেণী ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। মনে আছে এমন তর্ক একদা প্রায়ই শোনা যেত যে, আদর্শ সতী নারী হিসাবে ভ্রমর এবং সূর্যমুখীর চরিত্রে আধরতি পরিমাণে শ্রেষ্ঠতার তারতম্য কোন্ কথা কোন্ ভঙ্গিটুকু নিয়ে। অল্প বয়স সত্ত্বেও মনে আক্ষেপ হত যে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং ইত্যাদি। সাহিত্য যে শ্রেয়স্তত্ত্বের নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই করা পুতুল

গড়বার কারখানা নয় এ কথাও কি বোঝাতে হবে। ম্যাক্‌বেথ নাটকে দুটিমাত্র প্রধান পাত্র, ম্যাক্‌বেথ ও লেডি ম্যাক্‌বেথ। বলা বাহুল্য, দুজনের কাউকেই সুকুমারমতি পাঠকদের চরিত্রগঠনযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা চলবে না। অ্যান্টনি অ্যান্ড্ ক্লিয়োপ্যাট্রা শেক্‌স্‌পীয়রের প্রধান নাটকের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ক্লিয়োপ্যাট্রা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে স্থান পাবার অধিকারিণী হলেও তাকে সাধ্বীর আদর্শ বলা চলবে না। আর, অ্যান্টনি আপন চরিত্রের অনিন্দ্য আদর্শে আধুনিক উচ্চ দরের বাংলা নভেলের নায়কদের সমশ্রেণীভুক্ত নয়, এ কথা মানতেই হবে। তথাপি এও না মেনে চলবে না যে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকটি উঁচুদরের বাংলা নভেলের চেয়ে অন্তত কোনো অংশে হীন নয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রকে তুচ্ছ করতে পারি নে, কিন্তু মহত্ত্বে তাঁর ন্যূনতা ছিল। কারই বা না ছিল ? স্বয়ম্বরসভার ব্যাপারে ভীষ্মই কি ক্ষমার যোগ্য। এমন-কি, কবির প্রিয়পাত্র পাণ্ডবদের আচরণে কলঙ্ক খুঁজে বের করবার জন্যে অধিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আধুনিক বাংলাদেশে বেদব্যাস জন্মান নি, সে তাঁর পুণ্যফলে।

অপর পক্ষ থেকে তর্ক করতে পারেন যে, সাহিত্যে সমাজধর্ম ও শাশ্বতধর্মের ত্রুটি দেখা দেয়, তার শোকাবহ পরিণাম প্রমাণ করবার জন্যেই। অর্থাৎ, এইটুকু দেখাবার জন্যে যে স্খলনের পথ আরামের পথ নয়। কিন্তু দেখতে পাই, আজকাল তাতেও ভালোমানুষ লোকের ক্ষোভ-শান্তি হয় না। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ বা বিমলা গৌরবজনক সিদ্ধিলাভ করে নি, কিন্তু তবু লেখক সেদিন সমালোচকের দরবারে দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলেন না। তারস্বরে ফরমাশ এই যে, যেমন করেই হোক, শ্রেষ্ঠ আদর্শ রচনা করতেই হবে। ছেলেমানুষি আবদার একেই বলে, যে চায় লালায়িত রসনা দিয়ে কেবলই চিনির পুতুল লেহন করতে।

'দুই বোন' গল্পটা সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যাখ্যা কিছু শুনতে চেয়েছ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছি। সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ের মিশোল। বাংলাদেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধবয়স পর্যন্তই মাতৃ-অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে। বিবাহে যাবার আগে বর বলে যায়, মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। অর্থাৎ স্ত্রী আসে মায়ের পরিশিষ্ট হয়ে— Alma Mater-এর পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রীর মতোই। ছেলে মায়ের কাছ থেকে আশৈশব যে-সকল সেবায় অভ্যস্ত বধূ এসে তারই অনুবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়। অল্প স্ত্রীই এমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র রীতিতেই স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নূতন করে তোলে।

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুসঙ্গ। তারা জানে স্ত্রী যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়। নইলে তাকে লালনরসলালায়িত শিশুগিরি করতে হয়। মায়ের দাসীকে নিয়ে থাকার মতো এমন দৌর্বল্য পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই।

শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্যস্নেহসতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় উর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটল। অপর পক্ষে অতিনির্ভরলোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণযাত্রার মোটর-রথের শোফার। তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীতজাতীয় মেয়েও নিশ্চয় আছে যারা অতিলালন-অসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায় যাকে পেলে তার নারীত্ব প্রতিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে উর্মি সেই জাতের। শুরুতেই চালককে নিয়ে, গুরুকে নিয়ে, তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে সে এমন পুরুষকে পেলে যার চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই। যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই, যে তার যথার্থ জুড়ি।

ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠল— এই হচ্ছে ব্যাপারটা।

উপসংহারে বলে রাখি, সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে, প্রিয়া আছে। কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ, কোন্‌টা এগিয়ে আছে কোন্‌টা পিছিয়ে, তাই নিয়েই তাদের স্বাতন্ত্র্য। ২৭ মার্চ ১৯৩৩।

মালঞ্চ

মালঞ্চ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিচিত্রা মাসিক-পত্রে (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০) উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপন্যাসটির বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুতকালে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ এক সময় নাটকে রূপান্তরিত করেন। সম্পূর্ণ নাটকের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় খণ্ডে (অগ্রহায়ণ ১৩৭৫) মালঞ্চ নাটক পাঠান্তর ও টীকা-সহ সংকলিত হইয়াছে। সম্প্রতি (১৩৮৬) স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত যন্ত্রস্থ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

স্বদেশ

স্বদেশ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে গদ্যগ্রন্থাবলীর দ্বাদশ ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে 'নূতন ও পুরাতন' 'নববর্ষ' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' 'দেশীয় রাজ্য' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত'— এই কয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছিল। 'নূতন ও পুরাতন' 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' ব্যতীত স্বদেশের অন্যান্য প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ইতিপূর্বেই অন্য গ্রন্থের (আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ; সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড। ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড ; সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড) অন্তর্গত হইয়াছে, এইজন্য পুনর্মুদ্রিত হইল না।

'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ডের (বৈশাখ ১২৯৮) প্রথম অংশ। রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের নানা-তথ্য-সমৃদ্ধ সচিত্র সংস্করণ (আশ্বিন ১৩৬৭) এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমাজ

সমাজ গদ্যগ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশ ভাগ রূপে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্বতন্ত্র সংস্করণ সমাজ গ্রন্থের 'চিঠিপত্র' অংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড) মুদ্রিত হইয়াছে, বর্তমান খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইল না। প্রথম সংস্করণ সমাজ গ্রন্থের 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধ 'কোট বা চাপকান' এবং 'নকলের নাকাল' এই দুইটি পৃথক সময়ে প্রকাশিত পৃথক প্রবন্ধের সংস্কৃত ও সংযোজিত রূপ। পঞ্চম সংস্করণে প্রবন্ধটি বর্জিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে মূল প্রবন্ধ দুইটি স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইল।

১৩১৫ বঙ্গাব্দ বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত এবং সমাজ গ্রন্থে অসংকলিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সমাজবিষয়ক রচনা বর্তমান খণ্ডে পরিশিষ্টের সমাজ অংশে সংকলিত হইল। মূল গ্রন্থে ও পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :

সমাজ

আচারের অত্যাচার[৬]	সাধনা। পৌষ ১২৯৯
(আদি নাম : 'কড়ায়-কড়া কাহন-কানা')	
সমুদ্রযাত্রা (প্রসঙ্গকথা)[৬]	সাধনা। ফাল্গুন ১২৯৯
বিলাসের ফাঁস	ভাণ্ডার। মাঘ ১৩১২
কোট বা চাপকান	ভারতী। আশ্বিন ১৩০৫
নকলের নাকাল	বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
অযোগ্য ভক্তি[৬]	ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩০৫
(আদি নাম : 'স্বাধীন ভক্তি')	
পূর্ব ও পশ্চিম	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩১৫

পরিশিষ্ট

হিন্দুবিবাহ	ভারতী ও বালক। আশ্বিন ১২৯৪
রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে : পত্র[৭]	ভারতী ও বালক। আষাঢ় ১২৯৬
মুসলমান মহিলা	সাধনা। অগ্রহায়ণ ১২৯৮
প্রাচ্য সমাজ	সাধনা। পৌষ ১২৯৮
আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত	সাধনা। পৌষ ১২৯৮
কর্মের উমেদার	সাধনা। মাঘ ১২৯৮
আদিম আর্যনিবাস	সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
আদিম সম্বল	সাধনা। আষাঢ় ১২৯৯
কর্তব্য নীতি	সাধনা। পৌষ ১৩০০
বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য[৮]	সাধনা। শ্রাবণ ১৩০১
ব্যাধি ও প্রতিকার	বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১৩০৮
আলোচনা : (নকলের নাকাল সম্বন্ধে)	বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮
স্মৃতিরক্ষা	ভাণ্ডার। বৈশাখ ১৩১২

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটি য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির প্রথম খণ্ডের (বৈশাখ ১২৯৮) দ্বিতীয়াংশ।

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত পাঠ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১৩১৫) প্রকাশিত হয়— "পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি ছাত্র-সমাজে যে-বক্তৃতা করেন ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম"।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ভারতের ইতিহাস কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে। যে-আর্যগণ একদিন তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে তমসাচ্ছন্ন ভারতকে মহিমালোকে সমুদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিয়া ভারতেতিহাসের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন,

৬ চিহ্নিত প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল।

৭ এই পত্রের মতামত লইয়া ভারতী ও বালকে (শ্রাবণ ১২৯৬) সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার 'রমাবাই' প্রবন্ধে আলোচনা করেন এবং উপসংহারে পণ্ডিত রমাবাই-এর বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত "শারদা-সদন" বিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করেন।

৮ 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি সাধনার একই সংখ্যায় এই প্রবন্ধটির অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়।

যে-আর্যগণ অতঃপর অনার্যগণের সহিত মিশিয়া প্রতিলোম বিবাহে এবং অনার্যাচরিত বিবিধ আচারধর্ম দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণে তাহাদিগকে সমাজান্তর্গত করিয়া লইয়া বৈদিক সমাজের সম্পূর্ণ বিরোধী আধুনিক সমাজকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, হিন্দুর আত্মঘাতী গৃহবিবাদের অবকাশে যে মুসলমান এ দেশে আসিয়া বংশপরম্পরাক্রমে জন্মমৃত্যু দ্বারা এ দেশের মাটিকে আপনার করিয়া লইল— ভারতের ইতিহাস ইহাদের মধ্যে কাহার ।— স্বতন্ত্র কাহারও নহে। তবে সে কি হিন্দু-মুসলমানের। তাহাও নহে। সংকীর্ণতার গণ্ডি দিয়া ইহাকে বাঁধিতে যাওয়া শুধু আমাদের অহংকার প্রকাশ করা মাত্র।

ভারতবর্ষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, এবং একদিন যে কোনো-এক বিশিষ্ট জাতি তাহার সর্বময় কর্তা হইয়া বসিবে তাহাও নহে। ভারতের ইতিহাস স্বত্বের ইতিহাস নহে, তাহা সত্যের ইতিহাস। যে মহান সত্য নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজবিশেষের কর্তৃত্বলাভের চেষ্টায় মর্যাদা কিছু নাই। ভারতবর্ষকে একটি অপূর্ব পরিপূর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা তাহার একটি উদাহরণমাত্র এ কথা যেন মনে রাখি। আমরা যদি দূরে দূরে থাকি বা নিজের স্বাতন্ত্র্যে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে চাই— সে নির্বুদ্ধিতার জন্য আমরাই দায়ী। আমরা যেটুকু মিলিতে পারিব সেইটুকুই সার্থক হইবে। যেটুকু গণ্ডিবদ্ধ সেটুকু নিরর্থক, এবং তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী।

আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমানব-ভাণ্ডারে তাহা অপেক্ষা নূতন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না। নিখিলমানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা আদানপ্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে ; ইংরেজ বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে— সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে। ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে তাড়াইবার আমাদের অধিকার ? আমরাই বা কাহারা।— হিন্দু না মুসলমান ? বাঙালি না মারাঠি না পাঞ্জাবি ? যাহারা— যে সম্মিলিত সমষ্টি— একদিন সম্পূর্ণ সত্যের সহিত 'আমরাই ভারতবর্ষ' এ কথা বলিতে পারিবে, এ অহংকার তাহাদের মুখে শোভা পাইবে।

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ এ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন ; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে ; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন— তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন— তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রও অসীম প্রতিভাবলে বাংলাসাহিত্যে পশ্চিম এবং পূর্বের মিলন সাধন করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করাইয়া, কম সার্থক করিয়া তোলেন নাই।

অতএব, আজ আমাদের এই মিলনের সাধনা করিতে হইবে ; রাজনৈতিক বললাভের জন্য নহে, মনুষ্যত্বলাভের জন্য ; স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়া নহে, ধর্মবুদ্ধির মধ্য দিয়া।

কিন্তু আজ এই মিলনের পথে যে-বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কি মিলনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাহা নহে। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে বিরোধও মিলনসাধনার একটা অঙ্গস্বরূপ। কারণ, অসত্যকে অবলম্বন করিয়া সত্যের নিকট যে পরাজয়, তাহার মতো স্থায়ী লাভ আর নাই। অসংশয়ে বিনা বিচারে যাহা গ্রহণ করিলাম, তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা থাকে কোথায়। আজ আমরা আমাদের জীবনের মাঝে এক অবমাননার বেদনা অনুভব করিতেছি। এতদিন আমরা নিজের মর্যাদার প্রতি লক্ষ না রাখিয়া শুধুই অপরের দান গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলাম। আত্মমর্যাদার প্রস্তরে ঘষিয়া তাহার মূল্য যাচাই করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে এত দিন পারি নাই। কাজে কাজেই সে দান আমাদের অন্তরে মিশিতে পায় নাই, তাহা শুধু বাহিরের পোশাকি জিনিস হইয়া উঠিতেছিল। সে যে দান নহে, সে যে শুধু অপমান, আজ তাহা আমরা আমাদের ক্ষুণ্ণ মর্যাদায় স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি এবং এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই আজ যত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

আপনার মর্যাদায় দণ্ডায়মান হইয়া যেদিন অপরের দান লইতে পারিব সেইদিন সে-গ্রহণে সার্থকতা, কারণ তাহাতে নীচতা নাই— সে-দান তখন আমাদের অন্তরাত্মার সহিত যথার্থ মিশিয়া আমাদের এই অতৃপ্তি অশান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা রামমোহন দীনের ন্যায় পাশ্চাত্যের চরণতলে উপস্থিত হন নাই, তিনি শুধু প্রতীচ্যের জ্ঞানে আপনার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাটুকুকে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। এবং সেইজন্যই তিনি প্রাচ্যের জ্ঞানরত্নভাণ্ডার-দ্বারে দাঁড়াইয়া গর্বের সহিত প্রতীচ্যের মুক্তারাজি আহরণ করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ আপনার করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

আসল কথা এই, পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতেই হইবে। আমাদের যদি আত্মশক্তির অভাব ঘটে বা পশ্চিম যদি আপনাকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে— উভয়ই ক্ষোভের বিষয়। অধুনা ইংরেজ, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ তাহার পূর্বতন মনীষিগণের ন্যায়, তাহার ইংরেজি সভ্যতার পূর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় আমাদিগকে দিতেছে না ; এবং সেইজন্যই পূর্বকালের ছাত্রসম্প্রদায়ের ন্যায় আধুনিক ছাত্রগণের শেক্‌স্‌পীয়র বা বায়রনের কাব্যপাঠে সে আন্তরিক অনুরাগ আর নাই ; সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইংরেজের সহিত যে-মিলন তখন ফুটিয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা প্রতিহত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা সত্য, তাহা হইতে ইংরেজ আজ আমাদিগকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখিতেছে ; এমত অবস্থায় যদি স্বভাবতই মিলন না আসে তবে প্রবল সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখা, অসন্তোষ বৃদ্ধি করা মাত্র— দূর করা নহে। সুশাসন এবং ভালো আইন মানুষের চরম লাভ নহে ; মানুষ মানুষকে চায়, মানুষ হৃদয়কে চায় ; তাহা যদি সে না পায় সে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না।

কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দীনতার নিকটেই হীনতা ধরা পড়ে— শক্তির নিকটেই যথার্থ মর্যাদা প্রকাশ পায় ; অতএব সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদিগের সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে— হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্ত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"— দুর্বল পরমাত্মাকে জানিতে পারে না ; দেবতাকে যে চাহে তাহাকে দেবগুণোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আজ আমাদিগকে শ্রেয়কে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যখন আমরা নিজের চেষ্টা দ্বারা, নিজের ত্যাগের দ্বারা, দেশকে আপন করিয়া লইতে এবং দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিতে পারিব— তখন আর আমরা দীন নই, আমরা তখন ইংরেজের সহযোগী। আমাদের দীনতার অভাবে তখন ইংরেজেরও আর হীনতা প্রকাশ পাইবে না। ভারত আজ আপনার মূঢ়তায় শাস্ত্রে ধর্মসমাজে কেবলই আপনাকে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে। সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা আজ

তাহাকে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা পাইব এবং পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যের মিলন সম্পূর্ণ হইবে। সেইদিনই ভারত-ইতিহাসের এই বিরোধসংকুল বর্তমান পর্বের অবসান হইবে।

পরিশিষ্টের 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি যখন সমাজ গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে (পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ) সংকলিত হয় তখন উহার অনেক অংশ বর্জিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রবন্ধটির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পাঠ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' প্রবন্ধটির অনুবৃত্তিস্বরূপ নিম্নের আলোচনাটি সাধনার (চৈত্র ১২৯৮) সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচনা হইতে মুদ্রিত হইল। ফাল্গুনের সাহিত্য পত্রিকার 'আহার' প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন, 'আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।' এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভূত— কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কী বুঝায়। যদি বল, ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান— মানুষের পক্ষে যাহা ভালো তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্ দেশে অবিদিত। শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে। যদি বল, এ স্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ডপুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্যধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনো এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে 'ত্রিকোটিকুল মুদ্ধরেৎ'; মানিয়া লওয়া যাক উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু— ঐ পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ঐ মিথ্যা প্রলোভনসূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিকতত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভালো এবং যাহা ভালো তাহাই কর্তব্য, এ কথা কোন্ দেশের লোক জানে না। আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধিসাধন করে, অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত, এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুলসমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য-মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে, তাহাকে কী বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়। স্বাস্থ্যরক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম, এ মূলনীতির কোনোকালে পরিবর্তন সম্ভব নহে; কিন্তু কোনো একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম, এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

"মানবনীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।[৯] আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন; এক অংশকে ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপর

৯ এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক, স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

দিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজজীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণশক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণশক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনই অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে, এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোওয়া কোনো বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই; সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহা আমাদের গৌরবের, আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানিও নষ্ট হইবে না, তোমার হিন্দুনামেও কলঙ্ক পড়িবে না।' অর্থাৎ এ-সকল বিষয় ধ্রুব ধর্মনিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

"কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না, আমি যদি প্রমাণস্বরূপ দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক্ স্মার্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন। যদি কোনো ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না। যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।"

শিক্ষা

শিক্ষা গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্দশ ভাগ রূপে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষার অন্তর্গত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' ও 'সাহিত্যসম্মিলন' প্রবন্ধ দুইটি ইতিপূর্বেই যথাক্রমে আত্মশক্তি (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ; সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড) ও সাহিত্য, পরিশিষ্টের (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড ; সুলভ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড) অন্তর্গত হইয়াছে ; এইজন্য পুনর্মুদ্রিত হইল না।

১৩১৫ সালের পূর্বে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক অধিকাংশ রচনা পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল :

শিক্ষা

শিক্ষার হেরফের[১০]	সাধনা। পৌষ ১২৯৯
শিক্ষা-সংস্কার	ভাণ্ডার। আষাঢ় ১৩১৩
শিক্ষাসমস্যা[১১]	বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩১৩
জাতীয় বিদ্যালয়[১২]	বঙ্গদর্শন। ভাদ্র ১৩১৩
আবরণ	বঙ্গদর্শন। ভাদ্র ১৩১৩

১০ রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত, ১২৯৯। প্রবন্ধটির বর্তমান সংস্করণের পাঠে প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদ সাধনায় প্রকাশিত পাঠ হইতে গৃহীত।

১১ ওভারটুন হলে আহূত সভায় পঠিত, বুধবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।

১২ কলিকাতা টাউনহলে পঠিত, ২৯ শ্রাবণ ১৩১৩।

পরিশিষ্ট

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি	সাধনা। আষাঢ় ১৩০০
প্রসঙ্গ কথা : ১, ২	ভারতী। বৈশাখ ১৩০৫
প্রাইমারি-শিক্ষা	ভাণ্ডার। বৈশাখ ১৩১২
পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি	ভাণ্ডার। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
বিজ্ঞানসভা	ভাণ্ডার। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
ইতিহাস কথা	ভাণ্ডার। আষাঢ় ১৩১২
স্বাধীন শিক্ষা	ভাণ্ডার। আষাঢ় ১৩১২
শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা	ভাণ্ডার। অগ্রহায়ণ ১৩১২

'শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি' নামক আলোচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের যে পত্রের উল্লেখ আছে, সাধনার (চৈত্র ১২৯৯) নিম্নমুদ্রিত 'প্রসঙ্গ কথায়' সেই তিনখানি পত্র উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে প্রকাশিত এই রচনাটিও 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের অনুবৃত্তিস্বরূপ :

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অনারেবল জস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধের লেখক উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে-পত্র পাইয়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি ; প্রার্থনা করি তাঁহারা আমাদিগকে মার্জনা করিবেন।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন :

পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

—কিন্তু কেন যে তাঁহার 'ক্ষীণস্বর' কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা 'অসংখ্য বালক বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে' কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যদি-বা কোনো কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

গুরুদাসবাবু লিখিয়াছেন :

আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই-একটি কথা (যথা, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাংলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা গৃহীত হয় নাই (Cal. University Minutes for 1891-92, pp. 56-58)...

কী উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড়ো সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমত, বঙ্গভাষায় এমন-সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়ত, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাংলাভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভাসমিতির কার্য ও বক্তৃতা ইংরেজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে

তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায় ; এবং সেই-সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।

আনন্দমোহনবাবু লিখিয়াছেন :

পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত ; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয়সম্বন্ধীয়, ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।

এখন আলোচ্য, প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কী। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্‌লিক ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে-পর্যন্ত এই পরিবর্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, এই পরিবর্তনসংসাধন পক্ষে আপনার সুন্দর প্রবন্ধটি বিশেষ সাহায্য করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের বহুলরূপে প্রচার প্রার্থনীয়।

উক্ত তিন পত্র হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, সিন্ডিকেটের সভ্যগণ বাঙালির শিক্ষায় বাংলার কোনো উপযোগিতা স্বীকার করেন না, এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই প্রধানত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য, আমাদের স্বদেশীয়েরা যে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দশা হইবে কেন। কিন্তু কিছু আশ্চর্যও আছে। আমরা কখনো কিছুতে আপত্তি করি নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি ; দেশের উপর যখন যে-কোনো অমঙ্গলস্রোত আসিয়া পড়িয়াছে আমরা বিনা আপত্তিতে তাহার নিকট মস্তক নত করিয়া দিয়াছি ; স্বদেশের কথা, ভবিষ্যতের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভাবিও নাই। আজ আমরা ইংরেজের কল্যাণে যদি-বা আপত্তি করিতে শিখিলাম, অভাগার অদৃষ্ট এমনই, অনেক সময় দেশের মঙ্গল প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বসি।

বোধ হয়, আপত্তি করিতেই একটা সুখ আছে। নতুবা, স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ কথা কে না বোঝে।

কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সহজ কথা না বুঝিলে তাহার মতো কঠিন কথা আর নাই। কারণ, কঠিন কথা না বুঝিলে সহজ কথার সাহায্যে বুঝাইতে হয়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝিলে আর উপায় দেখা যায় না।

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে ; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে— কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে ; যাহা-কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশ্ব ঐ বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্‌বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।

ভালোরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্‌বুদ্‌ বলিয়া বুঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

এ-সব কথা ইতিহাসে অনেকবার আলোচিত হইয়া গেছে, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও এ কথা লিখিয়াছেন। জর্মনিতে যতদিন না মাতৃভাষার আদর হইয়াছিল ততদিন তাহার যথার্থ আত্মাদর এবং আত্মোন্নতি হয় নাই। শিক্ষাসভার যে-সভ্যগণ মাতৃভাষার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন তাঁহারা এ-সমস্ত উদাহরণ অবগত আছেন, সেইজন্যই কথাটা তাঁহাদের বুঝানো আরো কঠিন, কারণ, বুঝাইবার কিছু নাই।

আর-একটা যুক্তি আছে। এতদিনকার ইংরেজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত মানসিক বিকাশ দেখা যায় না। তাঁহারা এমন একটা-কিছু করেন নাই যাহাকে পৃথিবীর একটা নূতন উপার্জন বলা যাইতে পারে, যাহাতে মনুষ্যজাতির একটা নূতন গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ ভালো ইংরেজি বলেন, কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করেন, কিন্তু ধাত্রীর অঞ্চল ছাড়িয়া কেহ এক পা হাঁটিতে পারেন না।

তাহার প্রধান কারণ, বিদেশী ভাষার ভার বড়ো গুরুতর। একজনের খোলস আর-একজনের স্কন্ধে চাপাইলে সে কখনোই তাহা লইয়া বেশ স্বাধীন সহজভাবে চলিতে পারে না। আমাদের ভাবকে বিদেশী ভাষার বোঝা কাঁধে লইয়া চলিতে হয়, প্রতি পদে পদস্খলনের ভয়ে তাহাকে বড়ো সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, কোনোমতে মান বাঁচাইয়া বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু ততটুকু করাই এত কঠিন যে, সেইটুকু সুসম্পন্ন করিলেই পরম একটা গৌরব অনুভব করা যায়, সেটাকে খুব-একটা মহৎ ফললাভ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্য দেশে একটা বড়ো কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল তাহা যে কিছুই নহে, এ কথা লোককে বোঝানো বড়ো শক্ত। এইজন্য মুখুজ্যের ছেলেকে গড়গড় শব্দে ইংরেজি বক্তৃতা করিতে শুনিলে বাঁড়ুজ্যের ছেলেকেও সেই চূড়ান্ত গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার বাপের প্রবৃত্তি হয় না। তখন যদি তাহাকে বুঝাইতে বসা যায় যে, বার্ক্‌ ব্রাইট্‌ গ্ল্যাডস্টোনের ভাষার সহিত প্রচুর পরিমাণে পানাপুকুরের জল মিশাইয়া একটি বঙ্গশাবক যে বহুকষ্টে অথবা অল্পায়াসে গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর কথা বলিয়া গেল, উহাতে কোনো কাজই হইল না, উহা না আমাদের দেশের অন্তঃকরণে স্থায়ী হইল, না বিলাতি সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল— কেবল নিষ্ফল শিলাবৃষ্টির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী চট্‌পট্‌ শব্দের করতালি আকর্ষণ করিয়া শস্যবীজহীন পথকর্দমের সহিত মিশাইয়া গেল ; উহা অপেক্ষা বাংলাভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টারও সহস্রগুণ সফলতা আছে।— তবে এ-সব কথা বাঁড়ুজ্যের কর্ণে স্থান লাভ করে না, মুখুজ্যের ছেলের ইংরেজি ফাঁকা আওয়াজের কাছে স্বদেশের সমস্ত দাবি তাহার নিকট এতই ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বুঝাইবার পক্ষে আর-একটা বড়ো বাধা আছে। অনেকে এমন কথা মনে করেন, আমরাও তো আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছি ; কই আমাদের মানসিক ঔৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের মনে তো কখনো তিলমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না। বুঝিতে পড়িতে কহিতে বলিতে আমরা তো বড়ো কম নহি।

সে কথা অস্বীকার করিয়া কাজ নাই। তাঁহাদিগকে বলা যাক, আপনারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। কিন্তু আরো ঢের বেশি হইতে পারিতেন। এখনই যদি আপিসের কাজ সুশৃঙ্খলমত

নির্বাহ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেছেন, বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম করিতে না হইলে না জানি কী হইতেন এবং কী করিতেন। তাঁহাদিগকে আরো বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। আপনারা যে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এত বড়ো হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আপনাদেরই বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, শিক্ষাপ্রণালীর নহে। কিন্তু দেশের সকলেই তো আপনাদের মতো হইতে পারে না।

শিক্ষায় স্বদেশী ভাষা অবলম্বন করিলে কেন যে মনের বিশেষ উন্নতি হয় সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে-সৌভাগ্যবান সভ্যজাতিরা দেশীভাষায় শিক্ষালাভ করে তাহারা প্রথম হইতেই ধারণা করিবার, চিন্তা করিবার অবসর পায়। আরম্ভ হইতেই তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে। কেবল যে কতকগুলা মুখস্থ জ্ঞান অর্জন হয় তাহা নহে, মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

একজন এন্ট্রেন্স ক্লাসের ছোকরা কতটুকুই বা বুঝিতে পারে, কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে। সে দশ-বারো বৎসরকাল খেলাধুলো ভুলিয়া প্রাণপণ করিয়া অতি যৎসামান্য ইংরেজি শিখে, তাহাতে তাহার মানসিক দৈন্য কিছুই দূর হয় না। নিজে কিছু বুঝিয়া উঠা, কিছু ভাবিয়া বলা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কারণ. সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কথার মানে দেখিতে দেখিতে, 'কী' মুখস্থ করিতে করিতে হতভাগ্য হয়রান হইয়া গিয়াছে, এ পর্যন্ত মনের মধ্যে একটি ভাব রীতিমত ধারণা করিবার অবকাশ তাহার হয় নাই।

কেবল তাহাই নহে। যেমন আহার করিয়া বলসঞ্চয়পূর্বক পরিশ্রম করিয়া পুনশ্চ তাহা কিয়দংশ ব্যয় না করিলে ক্ষুধা হয় না, পরিপাক হয় না, সে-আহার সম্যক্‌রূপ কাজে লাগে না— তেমনই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে, আলোচনা করিতে না পারিলে সে-শিক্ষা অপরিপক্ব অবস্থাতেই থাকিয়া যায় ; তাহার অধিকাংশই মনের সহিত মেশে না। য়ুরোপে ছাত্রেরা যেটুকু যখন শেখে সেটুকু তখনই প্রকাশ করিতে পারে। লেখায় না হৌক, কথায়। কিন্তু আমরা বহুকাল পর্যন্ত মূক। বলিবার কোনো বিষয়ও পাই না, বলিবার একটা ভাষাও নাই। কথার মানে বুঝিতে এতকাল লাগে যে, ভাব বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়, কেবল ভাষা রচনা করিতে এতদিন কাটিয়া যায় যে, ভাব প্রকাশ করিতে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়।

কোনো কোনো ইংরেজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙালি ছাত্রের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া, কলার কাঁদি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না। ঢেঁকির কাষ্ঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া সুচারুরূপে ধান ভানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলে না। এজন্য অন্য যে-খুশি আক্ষেপ করুক, কিন্তু যে-ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে সে কেন বিস্মিত হয়। মানুষের মনকে যদি মনরূপে বাড়িতে দিতে তবেই তো মধ্যে মধ্যে ওরিজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত, কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া কেবল শেখাকথা আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি, জর্মনি যখন ফরাসি শিখিত, তখন কি সে ফরাসিভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল। জর্মনরচিত কোন্‌ ফরাসি গ্রন্থ ফরাসি-সাহিত্যের স্থায়ী সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ এবং জর্মনদের ভাষা, ভাব, দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্মকর্মের যতটা ঐক্য আছে আমাদের সহিত ইংরেজের কি তাহার শতাংশ আছে। আমরা সেই ইংরেজি শিখিয়া সেই ইংরেজি ভাষায় ইংরেজ অধ্যাপকের নিকট ওরিজিন্যালিটি দেখাইব ? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারি না বলিয়া ধিক্কার দাও কেন।

সে যা-ই হোক, কথাটা সত্য যে আমাদের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির স্ফূর্তি হয় না— এবং তাহার প্রধান কারণ সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই।

অবশ্য, ওরিজিন্যালিটি না থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়, কারণ উহা বাড়ার ভাগ মাত্র। কিন্তু একটা কাজ সমাধা করিতে ঠিক যতটা শক্তির আবশ্যক তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হাতে রাখিতেই হয়। দুইশো জনকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলে ন্যূনপক্ষে আড়াইশো জনের মতো আয়োজন করিতে হয়। সমাজের সকল বিভাগে যখন এই বাড়তি ভাগ, এই ওরিজিন্যালিটি, এই প্রতিভা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায়, সমাজের সমস্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব ওরিজিন্যালিটি সমাজের সচ্ছলতা ও জীবনীশক্তির একটা লক্ষণ।

পরন্তু, আমাদের শিক্ষায় আমাদের অত্যাবশ্যকটুকুই ভালো করিয়া চলে না, ওরিজিন্যালিটির অভাবই তাহার প্রধান প্রমাণ। যেখানে বড়োলোক আছে সেখানে ছোটো কাজ রীতিমত চলিতেছে। যতক্ষণ অপর্যাপ্ত না হয় ততক্ষণ সমাজের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না।

দেশীভাষায় যদি আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম, তবে সে-শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্যাপ্ত হইত। আমরা তাহার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ সঞ্চরণ করিতে পারিতাম, তাহার মধ্যে বাস করিতে পারিতাম এবং ক্রীড়া করিতেও পারিতাম। তাহার মধ্যে কাজও পাইতাম অবকাশও পাইতাম, সেও আমাকে গঠন করিত আমিও তাহাকে গঠন করিতাম। শিক্ষা এবং মনের মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক চলাচল থাকিত।

এখন, কথা হইতে পারে বাংলায় এত বই কোথায়। তবে সেই কথাই হৌক। বাংলায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা করা যাক। সিণ্ডিকেট-সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন, তবে দরিদ্র বাঙালি এ কাজে এখনই নিযুক্ত হয়। ম্যাক্‌মিলান সাহেবকে অনেককাল অন্ন জোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিলে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় তো তর্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারের পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মতো সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।

কিন্তু বোধ করি প্রধান আপত্তি এই যে শিশুকাল হইতে সমস্ত শিক্ষা ইংরেজিভাষায় নির্বাহ না হইলে বাঙালির ছেলে ভালো করিয়া ইংরেজি শিখিতে পারিবে না।

চোর মনে করে, যত অধিক পরিমাণে লইব তত শীঘ্র শীঘ্র চুরি শেষ হইবে। থলির মুখ সংকীর্ণ, তাহার মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়; বহুলোভে দুই মুঠা ভরিয়া যখন হাত বাহির করিতে চায় তখন হাত বাহির হয় না, অবশেষে মুঠা হইতে অধিকাংশ চৌর্য সামগ্রী যখন পড়িয়া যায় তখন হাত বাহির হইয়া আসে।

আমাদের শিক্ষা-থলির প্রবেশপথও বড়ো সংকীর্ণ, কারণ, সে-থলি বিদেশী ভাষা। তাহার মধ্যে দুই মুঠা ভরিয়া আমরা লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন হাত টানিয়া লই তাহাতে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে! বোঝা ভারী করা সহজ, বহন করাই শক্ত।

সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম। শিক্ষার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করাই শিক্ষার একটি প্রধান বাধা, সেই ছাঁচটি একবার গড়িয়া লইতে পারিলে অনেক কঠিন শিক্ষা সহজ হইয়া আসে। ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে-ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কী অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়। কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট শব্দগুলি ছেলেদের পক্ষে কত কঠিন সকলেই জানেন; উপর্যুপরি সহজ উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি

কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণ দু'ই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে। তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে ভাষা সর্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম ; অবশেষে একবার ব্যাকরণজ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষাশিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

অতএব, শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ব হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

বাল্যকাল হইতেই ইংরেজিভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলাশিক্ষা ইংরেজিশিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষা রূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায় ; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।

সকলেই জানেন, আজকাল আমাদের ছাত্রেরা যে-পরিমাণে অনেক বিষয় শেখে সেই পরিমাণে ইংরেজি অল্প শেখে। তাহার প্রধান কারণ, আগাগোড়া মুখস্থ করিতে গিয়া ইংরেজি বুঝিবার এবং রচনা করিবার সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরেজিভাষাশিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরেজিভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।

বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যাঁহাদের শ্রুতিগম্য হয় নাই, আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না, হইলেও কোনো ফলের প্রত্যাশা করি না। কিন্তু যে-পাঠকগণ, অনুগ্রহ অথবা অনুরাগ -বশত আমাদের বাংলা কাগজ পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ ভরসা রাখি। তাঁহারা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য কথাটা ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন, এবং ঘরে ঘরে আপন আপন সন্তানকে মাতৃস্তন্যের ন্যায় মাতৃভাষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে কালক্রমে দেশের যে শ্রী ও উন্নতি হইবে সভাসমিতিতে সহস্র বৎসর ইংরেজি বক্তৃতা করিয়াও সেরূপ হইবে না। কেবল ভয় হয় এইজন্য যে, বাঙালি স্থায়ী গৌরব অপেক্ষা ক্ষণিক অহংকার-তৃপ্তি অধিক ভালোবাসে, ভবিষ্যৎ কার্যসিদ্ধির অপেক্ষা উপস্থিত করতালির জন্য অধিক লালায়িত ; এবং দেশের বৃহৎ কল্যাণ অপেক্ষা আশু ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভন গুরুতর ; তাহা ছাড়া মুখে যেমনই গর্ব করি, আত্মশক্তি আত্মভাষা এবং কোনো আপনার জিনিসের প্রতিই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস নাই ; মনে স্থির করিয়া বসিয়া আছি যে, ইংরেজ গবর্মেন্টি আমাদের সমস্ত উন্নতিসাধন করিয়া দিবে, আমরা কেবল দরখাস্ত করিব, ইংরেজিভাষাতেই আমাদের সমস্ত জাতীয়শিক্ষা সাধন করিবে, আমরা কেবল অভিধান ধরিয়া মুখস্থ করিয়া গেলেই হইবে।

'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা' নামক যে-প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের আনুষঙ্গিক শিক্ষাসমস্যা-সম্পর্কিত। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে ছাত্রগণের যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া স্কুল-কলেজে সার্কুলার (কার্লাইল সার্কুলার) প্রেরিত হইয়াছে, স্টেটসম্যান পত্রে (২২ অক্টোবর ১৯০৫, ৫ কার্তিক ১৩১২) এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে বিদ্যালয় বর্জন ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাংলাদেশে যে-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ (২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ পর্যন্ত)-সহ 'শিক্ষার আন্দোলন' বা

'শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা ভাণ্ডার পত্রের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, বর্তমান প্রবন্ধটি তাহারই ভূমিকা।

'শিক্ষার আন্দোলন' হইতে বিদ্যালয় বর্জন ও জাতীয়বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থাকল্পে আহূত বিভিন্ন সভায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বক্তৃতাও নিম্নে সংকলিত হইল— "বক্তা যে-ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন সে-ভাষায় বক্তৃতা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বক্তৃতার মর্মমাত্র সংকলিত হইয়াছে।"

১০ই কার্তিক [১৩১২] শুক্রবার অপরাহ্ণে পটলডাঙা মল্লিকবাড়িতে ছাত্রগণের এক বিরাট সভা হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।...

সভাপতির বক্তৃতা

এখন বোধ হয় উত্তেজনা দ্বারা আপনাদের উত্তপ্ত রক্তকে আর উত্তপ্ততর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা যে-মন্তব্য[১৩] গ্রহণ করিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহা হয়তো অসংগত মনে করিবেন। তাঁহারা চোখে খোঁচাও মারেন, আবার জল বাহির হইলে দোষও ধরেন। শুধু কর্তৃপক্ষ নয়, আমাদের দেশেও অনেক বিবেচক লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত ছাত্রগণের অন্য কোনো কার্যে নিযুক্ত হওয়া অন্যায়। অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হইতে পারা যায়, ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ বিশেষ সংকটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন বয়স্কেরা ব্যাবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা আমোদপ্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই এইরূপ ঘটে এবং এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি। বৃদ্ধেরাও বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সহিত বর্তমান আন্দোলনে মাতিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের আবার যদি কোনো বৃদ্ধতর অভিভাবক থাকিতেন, তবে তাঁহারা নিঃসন্দেহই বলিতেন যে, ইঁহাদের এই কাজ বৃদ্ধোচিত হইতেছে না।

ছাত্রগণ যে এ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, বিশেষত আমাদের দেশে। যে-সমাজের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হইয়া আপনার অভাব মোচনে নিযুক্ত থাকে, সে-সমাজে বরং ছাত্রেরা স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন। আমাদের সমাজের তো সেরূপ স্বাস্থ্যের অবস্থা নহে। আমাদের রাজা বিদেশী, প্রজার বেদনা বোঝেন না, বুঝিলেও অনেক সময়ে উভয়ের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আবার ইঁহারাই আমাদের শিক্ষক। ইংরেজের সমাজ স্বাধীন, সেখানে রাজা ও প্রজার মধ্যে জেতা-বিজিতের সম্পর্ক নাই। কাজেই এমন বিরোধও উপস্থিত হয় না। সেখানকার ছাত্রেরা এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, স্টেট সর্বপ্রযত্নে তাহাদের মঙ্গল চিন্তাই করিতেছে। কিন্তু বিশেষ কোনো সংকট উপস্থিত হইলে তাহারাও যে বিচলিত হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

১৩ "গবর্মেন্ট সম্প্রতি স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে যে-সার্কুলার জারি করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে স্বদেশের সেবা হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমরা কখনো সম্মত হইতে পারি না বা ভবিষ্যতে পারিব না। অতএব আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গবর্মেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনো পরিত্যাগ করিব না।"— প্রস্তাবক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অনুমোদক ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সিংহ ও মহম্মদ সিদ্দিক।

আমাদের দেশে শিক্ষার ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধ। সুতরাং ছাত্রেরা যে সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদিগের অনুবর্তী হইয়া চলিবে, তাহা সম্ভবপরও নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে। সকলেই জানেন যে, মুখগহ্বর নিশ্বাস গ্রহণের জন্য অভিপ্রেত হয় নাই, নাসাই নিশ্বাস গ্রহণের প্রকৃত দ্বার। কিন্তু যখন ফুসফুস বিকৃত হইয়া পড়ে, তখন মুখগহ্বরকেই সেই কাজ করিতে হয়। সমাজে যদি কখনো এমনতরো অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তাহার নাসা যথানির্দিষ্ট কাজ করিতে পারিতেছে না, তখন কি বলিব যে তার মুখ বন্ধ হইয়া থাকুক। ছাত্রেরা যদি আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন, তবে সে আনন্দেরই কথা। এই স্বদেশী আন্দোলন যে কৃত্রিম, সে কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না। আজ যে ছাত্রেরা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত এবং বৃদ্ধেরাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, সকলে মিলিয়া দেশকে এক মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া যাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা দেশকালপাত্রভেদে যে অবস্থার ভেদ হয়, তাহা বিবেচনা করেন না। আমাদের দেশের চাষাদিগকেও যদি আজ জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তোমরা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতেছ কেন।' তবে তাহারা বলে 'হুকুম হইয়াছে'। হুকুমই বটে, কিন্তু এ হুকুম তো কোনো নেতার হুকুম নয়। কোন্ স্বর্গ হইতে এ হুকুম নামিয়া আসিয়াছে কে বলিতে পারে। যে শক্তি আজ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, কই পূর্বে তো কখনো তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাই আমার মনে হয় যে, এ হুকুম অমান্য করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই।

সুতরাং আজ যে গবর্মেন্টের পরোয়ানায় আপনাদের তরুণ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোনো ঠাণ্ডা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাই না। আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে এক। আপনারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া— শুধু যোগ দিয়া নয়, বয়স্কদের মধ্যেও ইহা সঞ্চারিত করিয়া— বিধাতার হুকুম পালন করুন, প্রবীণেরা তাহাতে কোনো বাধা দিবেন না।

আবশ্যক হইলে দেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন, আপনারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই অপমানকার [সরকারী] পরোয়ানায় আপনারা যে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি। আপনারা যে এ সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আপনাদের কর্তব্য আপনারা করিয়াছেন। এখন প্রবীণ লোকদিগের কর্তব্য আপনাদিগকে যথার্থভাবে চালনা করা। যদি এই অপমানে আপনারা সত্য সত্যই ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হইয়া থাকেন, তবে প্রবীণ ব্যক্তিরা আপনাদিগকে কখনো পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহারা নিঃসন্দেহই চিন্তা করিতেছেন— কী উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করিয়া যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, গবর্মেন্টের চাকরি ও গবর্মেন্টের সম্মানের আশা বিসর্জন দিয়া স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। আজকার এই অবমাননা যে নূতন, তাহা নহে; অনেকদিন হইতেই ইহার সূত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার উপর গবর্মেন্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই; সুতরাং গবর্মেন্টি যদি এই পরোয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবুও আমরা তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া শান্ত থাকিতে পারিব না। গবর্মেন্টি এ দেশের অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারেন না। ইহার কারণ অক্ষমতাও হইতে পারে, অনিচ্ছাও হইতে পারে। অক্ষমতা— কেননা যেখানে হৃদয়ের যোগ না থাকে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না; অনিচ্ছা কেননা গবর্মেন্টি জানেন যে, তাঁহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের চিত্ত যে-ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নহে। ইহাতে আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থার আলোচনা করিয়া মূলগত প্রতিকারের

পন্থা অনুসন্ধান করিব, এইটিই স্বাভাবিক। আর আমরাও যে এতদিন আবেদন আন্দোলন প্রভৃতিতে খুব বিনীত বিনম্র ভাবের পরিচয় দিয়া আসিতেছি, তাহা বলিতে পারা যায় না। গবর্মেন্টি এ-সকল কথা বেশ বোঝেন। এমন অবস্থায় তাঁহাদের উপর শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আমরা কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

বাস্তবিক বর্তমান প্রণালীর বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না। বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এমন-একটা জিনিস পাই, যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। আমাদের উপনিষদে আছে, "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।" অশ্রদ্ধার সহিত দান করিলে দানের প্রকৃত ফল লাভ হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অন্তঃকরণকে অস্থিমজ্জাকে একেবারে দাসত্বে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমাদের নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে রাখিতেই হইবে। পূর্বে যখন দেশ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনও আমাদের সমাজ আপনাকে আপনি শিক্ষা দিয়াছে, আপনার ভিতরে আর প্রতিকূলতা জন্মায় নাই। আজ আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে যে বৃহৎ প্রয়োজন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিতে হইলে যাহাতে আমরা নিজেদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিতে পারি অধ্যবসায়ের সহিত, শান্তির সহিত, সাধনার সহিত, আমাদিগকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গবর্মেন্টি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপমান করিয়াছেন, তাহা নিজেকেই অপমান করা। ইহার জন্য গবর্মেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইলে আমরা দূরে গিয়া নিজেদের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব। আমরা ভারি দুর্বল, ভারি অসহায়, এই ভাবিয়াই আমরা এতদিন আমাদিগকে এরূপ অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আর আমরা ভয় পাই না। গবর্মেন্টি নিজের জিনিস চূর্ণ করুন, আমরা এই অপমানের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতের সরস্বতীকে আবার ভারতের নিজের মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করি।

জানি না আমাদের নেতারা বিষয়টিকে ঠিক কিরূপ ভাবে দেখিবেন। যদি দেশের হৃদয় এইদিকে যথার্থই উন্মুখ হইয়া থাকে, তবে স্থায়ীভাবে এ অপমানের প্রতিকারের জন্য তাঁহারা নিঃসন্দেহ চেষ্টিত হইবেন। ইহার চেয়েও গুরুতর আশার কথা এই যে, এ পর্যন্ত যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নেতৃগণের বা আপনাদের কাহারও রচিত নয়, তাহা বিধাতারই অমোঘ বিধানে ঘটিয়াছে। এই আন্দোলনের সফলতার ভার তাঁহার হাতে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে তিনিই শক্তি দিবেন। আপনারা নিজের আদর্শের কাছে, স্বদেশের কাছে, ঈশ্বরের কাছে সত্য থাকিবেন; তাহা হইলে আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

১৬ই কার্তিক বৃহস্পতিবার [১৩১২] 'ফিল্ড এন্ড একাডেমী' ভবনে মেম্বর এবং ছাত্রগণের এক সান্ধ্যসম্মিলন হয়।...

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [শিক্ষা এবং স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে] আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বর্তমান বঙ্গব্যবচ্ছেদঘটিত ব্যাপারটা সার্বজনীন। ছাত্ররা যে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে কোনো দোষ-দেওয়া যায় না। নেতৃগণ আশানুরূপ ত্যাগস্বীকার করিতেছেন না বলিয়া যে একটা কথা উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি নেতৃগণ এ বিষয়ে বাস্তবিকই অপরাধী হন, তবে সে-অপরাধ একা তাঁহাদের নয়, আমাদের পাঁচজনেরই; কেননা আমাদের পাঁচজনের শক্তি সংহত হওয়াতেই নেতার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-যে আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনাস্থার ভাব এটি খুব অমঙ্গলকর, ইহাতে আমাদের বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। জাতীয় ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহার ইংরেজি নাম দেওয়াটাই মস্ত ভুল হইয়াছে। ইংরেজি নাম শুনিলে মনে একটা বিরাট ভাবের উদয় হয়। যদি এই ভাণ্ডারের নাম National Fund না রাখিয়া আমরা 'বঙ্গভাণ্ডার'

রাখিতাম, তাহা হইলে ৭০ হাজার টাকা উঠিয়াছে শুনিয়া আমাদের তেমন দুঃখ হইত না। জাতীয় ধনভাণ্ডারে অল্প টাকা উঠিয়াছে বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এত অল্পদিনের মধ্যে আমরা পূর্বে কখনো দেশের নিকট হইতে এমনতরো উত্তর পাই নাই। আমরা সাহেবদের নিন্দাপ্রশংসাকে বড়ো ভয় করি। আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজন দেখিয়া সাহেবরা কী মনে করিতেছে এ বিষয়ে যদি আমরা বেশি ভাবনা না করি, তবে আমাদের নিজের যাহা সাধ্য তাহা অনেকটা শান্তি ও উৎসাহের সঙ্গে করিয়া উঠিতে পারিব। যোগানের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আজ যদি যথার্থই আমাদের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে দেশের ব্যবসায়বুদ্ধি আপনা আপনি আমাদের অভাবমোচনে নিযুক্ত হইবে। এত আন্দোলনেও তেমন কোনো কাজ দেখা যাইতেছে না বলিয়া কেহ কেহ যে আক্ষেপ করিতেছেন সে-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রথম-উত্তেজনার আবেগ কতকটা শান্ত হইয়া এখন কার্যের সময় আসিয়াছে। এখন নিঃসন্দেহেই অনেকে নীরবে কাজ করিতেছেন, সুতরাং আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, গবর্মেন্ট যদি দুই দিন পরে এই পরোয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনো ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ছাত্রেরা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা সত্যসত্যই গবর্মেন্টের সম্মান এবং চাকুরির মায়া পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না। যদি তাঁহারা যথার্থই প্রস্তুত হইয়া থাকেন তবে নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহ তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

১৯শে কার্তিক [১৩১২] অপরাহ্নে 'ডন সোসাইটি'তে একটি ছাত্রসভার অধিবেশন হয়।...
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে] আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বাংলাদেশে আজ যে-নবজীবনের উত্তেজনা লক্ষিত হইতেছে, তাহা দুই ভাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— বিদেশী পণ্য বর্জনের সংকল্পে এবং স্বদেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়। কিরূপে স্বদেশী দ্রব্যের অভাবমোচন হইবে, তাহা ধীরভাবে চিন্তা না করিয়াই যেমন আমরা বিদেশী পণ্য বর্জনের সংকল্প করিয়াছিলাম, তেমনই বিশুদ্ধ উৎসাহের সহিত যদি আজ আমরা স্বদেশের শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করি, তবে আরম্ভ যত সামান্যই হউক-না কেন আমরা ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহ সফলতালাভ করিতে পারিব। ছাত্রেরা যদি গবর্মেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সংকল্প দৃঢ় রাখিবেন। তাহা হইলে নেতারাও তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু ছাত্রগণের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ উদ্যোগে প্রথমেই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ফল লাভের আশা করা যাইতে পারে না।[১৪]

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস যে, ছাত্রগণ সংকল্পে দৃঢ় থাকিলে নেতারা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এখনো এ বিষয়ে কথাবার্তা

১৪ "অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর আহ্বানে যুবকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র রায়, চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করেন। তাঁহাদের আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, এ বিষয়ে নেতৃবর্গকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবিকোপার্জনের কোনো ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং অভিভাবকগণের মত প্রথমে গঠিত করিতে হইবে। 'অভিভাবকগণের সম্মতি যদি না পাওয়া যায় তবে কী করা কর্তব্য।' 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি ও ভূবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা যদি নববিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই না করিয়া উঠিতে পারেন, তবে ছাত্রেরা কী করিবেন।' 'ছাত্রেরা তো প্রস্তুত আছেন নেতারা কতদূর অগ্রসর হইলেন।' ইত্যাদি প্রশ্নও উত্থাপিত হয়।"

চলিতেছে। অনেক ধনীসন্তান এজন্য অর্থসাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এ বিষয়ে অন্যের কথা তিনি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন না। নেতৃগণের মধ্যে এখনো কাহারও কাহারও সন্দেহ আছে যে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ তাহাতে প্রবেশ করিবেন কি না। ছাত্রেরা সভা করিয়া নেতাদিগের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইয়া বা সতীশবাবুর [ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। প্রথম অবস্থাতেই আমাদের দেশের লোকের নিকট বেশি আশা করা দুরাশা। এতদিন আমরা কেবল বিদেশীর রুদ্ধ দ্বারেই আঘাত করিয়াছি, এখন কিছুদিন স্বদেশীর দ্বারে আঘাত করিতে হইবে। প্রত্যাখ্যাত হইলেও তাহাতে আমাদের কোনো অপমান নাই, কেননা তাহারা আমাদেরই নিজের লোক। অভিভাবকেরা ছাত্রগণকে কেন সম্মতি দিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আজ যে উত্তেজনার তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা কি অভিভাবকদিগের হৃদয়ও স্পর্শ করে নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রথমেই না হয়, তবে অবশ্যই তাহা ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিদেশেও যাইতে হইবে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষাকে কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। ছাত্রেরা সাময়িক আন্দোলনে যোগ দিবে কি না এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত মতের পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, ছাত্রজীবনে যদি কাহারও স্বদেশের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচয় না হয়, তবে পঁচিশ বৎসর বয়সের পরে যে তাহা হইবে, ইহা কখনোই স্বাভাবিক নহে, দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকরও হইতে পারে না। আজ যে-সকল ছাত্র গবর্মেন্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগকে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়দিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাত্রেরা কি তাহাতে প্রস্তুত আছেন। আজ জোয়ারের সময় তাঁহারা যে-আত্মদানের সংকল্প গ্রহণ করিবেন, ভাঁটার সময় যেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হন।

[সভার] উপসংহারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, ছাত্রমণ্ডলী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আত্মবিসর্জন করিবার যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। যদি তাঁহারা এই সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন, তবে এই দিন বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই আন্দোলনের ফলে যে 'জাতীয় শিক্ষাসমাজ' বা 'জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রাক্‌কালে আহূত বিভিন্ন মন্ত্রণাসভা, গঠনপ্রণালী-আলোচনাসমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, ও তাহার পর ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নানা কর্মভারের সহিত রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন যুক্ত ছিলেন।[১৫]

শিক্ষা গ্রন্থের প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে শিক্ষা-বিষয়ক আরো ১৭টি প্রবন্ধ সংকলিত আছে।

১৫ দ্রষ্টব্য :

১ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠা উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা : 'জাতীয় বিদ্যালয়'— রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড), পৃ· ৫৮৭

'শিক্ষাসমস্যা'— রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড), পৃ· ৫৭৬

২। 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' ইত্যাদি জাতীয় শিক্ষাপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী— 'সাহিত্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড (সুলভ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড)।

৩। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রশ্নপত্র— 'আদর্শ প্রশ্ন' পুস্তিকার পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।

ইহাদের মধ্যে ৫টি ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত ; বাকি ১২টি যন্ত্রস্থ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডে 'শিক্ষা'র সংযোজনরূপে মুদ্রিত হইবে।

শব্দতত্ত্ব

শব্দতত্ত্ব গদ্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ ভাগ রূপে ১৩১৫ সালে [১৯০৯] প্রকাশিত হয়।

১৩১৫ বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত শব্দতত্ত্ববিষয়ক যে-সকল রচনা কোনো কারণবশত প্রচলিত গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই, তাহাদের অধিকাংশই বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। রচনাবলী-সংস্করণের শব্দতত্ত্বসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীর পাঠপ্রস্তুত-কার্যে প্রবোধচন্দ্র সেন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সহযোগিতা করিয়াছেন। 'পরিশিষ্ট'-ভুক্ত অনেকগুলি প্রবন্ধের সংকলনে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের আনুপূর্বিক সূচী পরে প্রদত্ত হইল।

শব্দতত্ত্ব

বাংলা উচ্চারণ	বালক। আশ্বিন ১২৯২
স্বরবর্ণ অ	সাধনা। আষাঢ় ১২৯৯
স্বরবর্ণ এ	সাধনা। কার্তিক ১২৯৯
টা টো টে	সাধনা। অগ্রহায়ণ ১২৯৯
বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ	ভারতী। পৌষ ১৩০৫
বাংলা বহুবচন	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
সম্বন্ধে কার	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৫
বাংলা শব্দদ্বৈত	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৭ (৭ম ভাগ, ১ম সংখ্যা)
ধ্বন্যাত্মক শব্দ	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৭ (৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা)
বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত[১৬]	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৮ (৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা)
ভাষার ইঙ্গিত[১৭]	ভারতী। আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১১

পরিশিষ্ট[১৮]

একটি প্রশ্ন	বালক। অগ্রহায়ণ ১২৯২
সংজ্ঞাবিচার	বালক। ফাল্গুন ১২৯২

১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন) পঠিত।

১৭ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১১ সালের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে ১৯০৪) ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্ হলে পঠিত।

১৮ 'বঙ্গভাষা' প্রবন্ধে (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫) রবীন্দ্রনাথ প্রথম "বাংলাভাষাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা" প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ডে (পৃ· ৪৮৮) (সুলভ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ· ৭১১) 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

'নিছনি' : ১, ২[১৯]	সাধনা। চৈত্র ১২৯৮, বৈশাখ ১২৯৯
পঁহু	সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
প্রত্যুত্তর : ১, ২	সাধনা। শ্রাবণ, চৈত্র ১২৯৯
ভাষাবিচ্ছেদ	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৫
উপসর্গ-সমালোচনা	ভারতী। বৈশাখ ১৩০৬
প্রাকৃত ও সংস্কৃত	বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮
বাংলা ব্যাকরণ[২০]	বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩০৮

'বালা বহুবচন' এবং 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ দুইটির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল। এই সূত্রে পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত শেষোক্ত প্রবন্ধের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -কৃত ভ্রমসংশোধনটুকু উদ্ধারযোগ্য :

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে দুই-একটি সংস্কৃত প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃতশব্দ উদাহরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে ; যথা— ছাগল[২১], বাচাল। প্রত্যেক শব্দ ধরিয়া বিচার করিলে ঐরূপ উদাহরণ আরো মিলিতে পারে। তাহাতে মূল প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে না।

১৩০৮ সালে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত যে 'আন্দোলনে'র সূত্রপাত হয়[২২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রণীস্বরূপ। 'ধন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের "খাঁটি বাংলাশব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা সংকলনে"র যে-আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা অতি "শীঘ্র সার্থকতা লাভ করে"।[২৩] "রবিবাবুর লিখিত ও [পরিষৎ] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাংলাশব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা" হয়। "এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির" হয়।[২৪] "পত্রিকাসম্পাদকও এই শ্রেণীর শব্দসংগ্রহের জন্য পাঠকবর্গকে আহ্বান" করেন।[২৫]

সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১১ শ্রাবণ ১৩০৮) "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাংলাব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন" করেন।[২৬] শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া সেই অধিবেশনে যে-'বিচার বিতর্ক'[২৭] উপস্থিত হয় তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া" বলেন :

১৯ 'নিছনি' ২ -সংখ্যক আলোচনাটি বৈশাখের (১২৯৯) সাধনায় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পাদটীকাস্বরূপ প্রকাশিত।

২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ) পঠিত।

২১ এইটি এবং অন্যান্য কয়েকটি উদাহরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আর মুদ্রিত হয় নাই।

২২ দ্রষ্টব্য : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ (১৩০৮) :
বাংলা ব্যাকরণ— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃ· ২০১-২২৯
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণ

২৩ দ্রষ্টব্য : বাংলা-শব্দতত্ত্ব— জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ· ২২-২৯

২৪ শব্দ-সংগ্রহ : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃ· ৭৩-১৩০

২৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা— ৮ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ· ২৯; ২য় সংখ্যা, পৃ· ৭৩

২৬ বাংলা ব্যাকরণ— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ, ১ম সংখ্যা।

২৭ এই বিচারবিতর্কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগ দিয়াছিলেন : বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

আমাদের বাংলাভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ-প্রকৃতি গঠনপ্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র ; কেহ কিছু গড়িবেন না।

... শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্তী হওয়াই উচিত।

"তৎপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই ; নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর দিয়াছেন।... ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে গড়িতে পারি ভাঙিতে পারি এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে সেগুলি লক্ষ করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে, বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হইবে কেন। সংস্কৃতশব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশি বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে ? বাংলাভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না।"[২৮]

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্যে বলেন :

... আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাংলাভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক।... আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রীমহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় প্রভেদ যত কম থাকে ততই ভালো।

পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রবন্ধের "সংগ্রহাতিরিক্ত আরো কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ" সভায় উপস্থিত করেন। উহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের "পরিশিষ্টরূপে গৃহীত ও মুদ্রিত হয়"।[২৯]

সভার আলোচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

... বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পূর্বে বাংলা ব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনো হয় নি...। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণের চেষ্টা রেখে দিয়ে এখন পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করুন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন :

... প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর এই চেষ্টার পূর্ণতা সম্পাদন করা উচিত।... শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্রবাবু বাংলাভাষার প্রকৃতিনির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাংলাভাষার পাণিনি বলিলেই হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :

... একমাস পূর্বে আমি এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্রবাবুর মতো লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই। আরো অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।... যে-সকল বাংলাশব্দের উপর কাহারও কোনোদিন দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে।

২৮ দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণ— ১৩০৮ (সা· প· প)।

২৯ বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত— ব্যোমকেশ মুস্তফী : সা· প· প·, ৮ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ· ২২৯-২৪০। দ্রষ্টব্য : সম্পাদকীয় মন্তব্য, ঐ, পৃ· ২৪১

১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে 'নূতন বাংলা ব্যাকরণ' নামক একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সুদীর্ঘ এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ব্যাকরণ'[৩০] প্রবন্ধে তাহার উত্তর দেন। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বলাইচাঁদ গোস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বীরেশ্বর পাঁড়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ সভ্যগণ সেদিনের আলোচনায় ও বিতর্কে যোগদান করেন। আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

এত কথার পর আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমি বলিয়াছি বাংলা ব্যাকরণ বাংলা নিয়মে চলিবে, সংস্কৃত নিয়মে চলিবে না, এ কথার প্রতিবাদ কেন হয় বুঝি না। পণ্ডিতমহাশয়েরা মুখে যাহা বলিয়াই প্রতিবাদ করুন-না কেন, মনে মনে আমার কথাটা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি খাঁটি বাংলাশব্দ সংগ্রহ করিয়া আমি ইতিপূর্বে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমিই ব্যাকরণ লিখিতেছি বা লিখিব এরূপ দুরভিসন্ধি আমার ? আমি কতকগুলা শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণের কার্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই কি আমার এতটা অপরাধ হইয়াছে। যাঁহারা এই-সকল শব্দকে slang বলিয়া ঘৃণা করেন আর ভাষার মধ্যে আমিই এই-সকল slang আমদানি করিতেছি বলিয়া আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমি আমদানি করিতেছি এটা কী রকম কথা। পিতৃপিতামহাদি হইতে এই-সকল শব্দ কি আমরা পাই নাই। আজ সবগুলাকে কুড়াইয়া একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছি, ব্যবহার করিবেন আপনারা। তাহাদের মধ্যে যদি সংগ্রহের দোষে দু-একটা বিজাতীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি কি। ব্যবহারের সময়ে বিচার করিয়া লইবেন। সংগ্রহকারকের হস্তে বিচারভার দিতে নাই, তাহা হইলে অনেক আসল জিনিস বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যয়গুলির আমি যে-রূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছি সেইগুলিই প্রত্যয়ের প্রকৃত রূপ বলিয়া আমি আপনাদের গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমার নিজেরও সে-বিষয়ে সন্দেহ যে নাই এমন নহে। আরো একটা কথা, আমি যতগুলা প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছি তাহা দেখিয়া আপনাদেরও কি ধারণা হয় না যে, বাংলাপ্রত্যয় বলিয়া কতকগুলা পদার্থ বাস্তবিকই আছে— তা সেগুলার রূপ আমি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি তাহাই হউক আর আপনারা বিচার করিয়া যাহা স্থির করিতে পারেন তাহাই হউক। অনেকের মনের গূঢ় ভাব এই যে, অধিকাংশ কথাই যখন সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বাংলা ব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না। তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশ্যক। আমি তো কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি। সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্নকর্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না। সুতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য সিদ্ধ হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশ্যক। আমার গলদ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হইল। বাংলা ব্যাকরণে কতটা পরিমাণ সংস্কৃত নিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দসংগ্রহ দেখিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন যে, ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দগুলির চিরনির্বাসনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কিছুই আত্যন্তিক রকম ভালো বলি না। সংস্কৃত শব্দের

৩০ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড), পরিশিষ্ট।

সমাসঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোনোদিন বাংলাভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। তা কোনো দেশেই হয় না। একসময়ে ইংলন্ডে Anglo Saxon -দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা টিকিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল। তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়া গিয়াছে। বাংলাভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃত শব্দ হজম করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাংলাভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই ; সে-সকল নাই তাহার কারণ এই, ভাষায় যে-সকল কথা বলিবার আবশ্যক কোনোদিন হয় নাই সুতরাং সে-সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাংলাভাষার কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাংলাভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত 'ঘৃণা' বাংলায় 'ঘেন্না' হইয়াছে কিন্তু তাহাতে 'ঘৃণা'র অর্থ বজায় নাই। 'পিরীতি' শব্দে 'প্রীতি'র অর্থ নাই। কাজেই এ-সকল শব্দের মূলানুসন্ধান না করিলে বিশেষ ফল কী হইবে। এইরূপ অর্থান্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হইলে, আমাদের বাংলা শব্দভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিবে না। খাঁটি বাংলা শব্দ লইয়াই সকল ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাংলা শব্দের বানান লইয়া যে দাঁড়ি টানিবার কথা উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে আমি এই পর্যন্ত বলি, আমি কিছুই পাকাপাকি করিয়া দিই নাই। এ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা দীনেশবাবু ভালো বলিতে পারেন, কত প্রাচীন কাল হইতে কোন্ শব্দের কী বানান লেখা চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় যখন 'শ্রবণ' হইতে 'শোনা' লিখিবার সময় 'ন' লেখা হয়, মূর্ধন্য 'ণ' লিখিলে ভুল হয় তখন 'স্বর্ণ' হইতে 'সোনা' যদি 'ন' দিয়া লিখি তবে ভুল কেন হইবে। এই-সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলা ব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যে অপরিবর্তনীয়, তাহাই যে সর্বথা গ্রাহ্য, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাংলা ব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্যে বলেন :

... শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ যে-শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন[৩১] তাহাদের ব্যবহার ও গঠন সম্বন্ধে নিয়মাদি বাংলা ব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি Slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা বাংলাভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন।...

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে (২৮ পৌষ ১৩০৮) 'ব্যাকরণ ও বাংলাভাষা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩২] আলোচনার শেষে সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাংলাপ্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই, এ কথা তিনিও বলেন না। তাহাতে দুটা-একটা ভুল যে না আছে তাহাও নহে। সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দসমষ্টি ছাড়া ভাষার আর-একটি দিক যে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য।... প্রত্যয়াদির রূপ রবীন্দ্র যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই হউক, আর অন্যরূপই হউক, তাহাতে বড়ো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাহা আলোচনার মুখে স্থির হইবে।

১৩১১ সালে পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৪ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি পাঠের পর যে-আলোচনা হয় তাহাতে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে

৩১ দ্রষ্টব্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, বাংলাক্রিয়াপদের তালিকা ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)।

৩২ ব্যাকরণ ও বাংলাভাষা— ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৮।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ[৩৩], গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৪] ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত[৩৫] (সভাপতি) যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

৩৩ বাংলাভাষার গতিনির্দেশ ও লক্ষকারীদিগের দুই দল। এক দলের নেতা রবীন্দ্রবাবু। সামান্য হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকে কথাবার্তার ভাষায় যে-সকল শব্দ ব্যবহার করে, সেগুলি লেখার ভাষায় আমরা ব্যবহার করি না। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ সৃষ্টি করিয়া যদি ব্যবহার করি— তাহা হইলে ভাষার জীবনীশক্তি থাকে না। কথিত ভাষার শব্দের শক্তি ও মাধুর্য রবীন্দ্রবাবু দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহারই ফল। এ-সকল চলিত কথার শব্দ প্রদেশভেদে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতসাহিত্যেও অল্পসংখ্যক ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেখা যায়। এই-সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা বড়ো কঠিন। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি জীবিত শব্দ। সেগুলিকে রবীন্দ্রবাবুর কথিত নিয়মাদি দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের আবরণ দিয়া পাঠ করিতে গেলে, তাহাদের মাধুর্য নষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। এ যুগের শব্দরহস্য সংগৃহীত হউক, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বহুল ব্যবহার প্রার্থনীয় নহে!— সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৩৪ আমিও রবীন্দ্রবাবুকে তাঁহার এই অপূর্ব গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা জোড়াতাড়া দিয়া লউন। ভাষার ইঙ্গিত সকল বিষয়েই আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই-সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিবিধ, এক দল বলেন জন্তুধ্বনি হইতে, অপর দল বলেন মনুষ্যধ্বনি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের ইংরেজি নাম Bow-ow Theory ও Pugh-Pugh Theory। রবীন্দ্রবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আর জগদীশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। জগদীশবাবু বলেন, এমন অনেক রঙ আছে যাহা এ চোখে দেখা যায় না— এ চোখের ততটা বোধশক্তি নাই। শক্তির বৃদ্ধি হইলে আবার এই চোখেই দেখা যায়। অব্যক্ত ধ্বনির শব্দগুলির রহস্যবোধ সেইরূপ সকলের কানে হয় না। যে-কানের বোধশক্তি বর্ধিত সে-কানে হয়, কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদের ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন। যদিই তাহা হয় তবে একটা-দুইটা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দল সমস্তই নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদের বহুল ব্যবহার ইচ্ছা করেন না। তিনি না করিলেও লিখিত ভাষায় উহাদের প্রয়োজন আছে। নাটকে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। অপণ্ডিত ব্যক্তির কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতে হইলে উহাদের প্রয়োজন। এই-সকল শব্দ এত ছোটো যে, দু-একজন সহৃদয় কবি ইহাদের স্বরূপ দেখিতে চাহেন না। রবিবাবু একজন বৈজ্ঞানিক কবি। তিনি ইহাদের স্বরূপ যেভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে উহাদের আর ছোটত্ব নাই। তবে রবীন্দ্রবাবু বড়ো নজরে উহাদিগকে যতই ছোটো দেখুন, আমাদের কাছে এগুলি এখন অতি বড়ো জিনিস। ভাষায় প্রাকৃতত্ব এখন উহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে। রবীন্দ্রবাবুর একটা কথার সহিত আমার মতভেদ আছে। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় যে-সম্বন্ধ তাহা দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে; দেহের উৎকৃষ্ট অংশ বটে। দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ হইলে বাংলাভাষাকে শবদেহ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। জীবনীশক্তি বাংলাতেও আছে। শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সব বাংলা। কোনোটা একটু বর্ধিত কোনোটা একটু কর্তিত, ইহা দ্বারা আমি যেমন বাংলাভাষাকে একটু বাড়াইলাম তেমনই একটু কমাইয়াও দিলাম। তর্কের খাতিরে কাহাকেও অপদস্থ করিতে নাই। যাহার যে নাম সেই নামে ডাকিলে শীঘ্র ডাক শোনা যায়।— গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫ প্রবন্ধপাঠকের সহিত আমার একটা বিশেষ মতভেদ আছে। তিনি বলেন, এই-সকল বিষয় অকিঞ্চিৎকর ও বিস্মরণযোগ্য, আমি তাহা কিছুতেই স্বীকার করি না। অন্য কোনো বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার কোনো মতভেদ নাই। তাঁহার প্রবন্ধ রচনানির্দেশের নিয়মপ্রকাশক নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আশঙ্কিত হইয়াছেন কেন বলিতে পারি না। সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলাভাষা চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতের অনাবশ্যক প্রলেপ দিয়া বাংলাকে ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যক কী। রবীন্দ্রবাবু যে-সকল শব্দ সম্বন্ধে আজ নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর বলিতেছেন কেন। কতকগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষাই তো ভঙ্গুর। সংস্কৃতসাহিত্যের বৈদিক শব্দই আর এখন কি ব্যবহার

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাংলাভাষার আকৃতি কিরূপ হইলে ভালো হয়, সে সম্বন্ধে আমার মত যে কী, তাহা আমি এ প্রবন্ধে বলি নাই, বলিতে আসিও নাই। সংস্কৃতভাষার সাহায্য ভিন্ন বাংলাভাষা যে সুসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে-একটি সূক্ষ্ম সূত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া আপনাদের দেখাইতেছি। আপনারা দেখুন, আমি যাহা বাহির করিয়াছি তাহা ঠিক কি না, তাহা টেঁকে কি না। কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই-সকল শব্দ অবাধে যেখানে-সেখানে সাহিত্যে ব্যবহার করিতে চাই। আমি সে-পক্ষে বিধান দিবার চেষ্টা করি নাই। ভাষায় যাহা আছে আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। লিখিত ভাষায় এ-সকল শব্দ চলিবে কি না তাহা বিচার্য। আবশ্যক হয় চলিয়া যাইবে। প্রাদেশিকতা কথিত ভাষায় আছে সত্য, কিন্তু এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে। আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষৎও চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাষার অভিধানাদি কি পূর্ণাবয়ব হইবে না। আমি তো বলিয়াছি আমি এই প্রদেশের শব্দ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। আমার কার্য স্বতন্ত্র নহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শব্দসকল বাংলায় ব্যবহারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি পরিবর্তনশীল, কিন্তু আমার বিশ্বাস এগুলি সহজে পরিবর্তনীয় নহে। বড়ো বড়ো কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত অনেক শব্দ বাংলায় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্তিত হইবে কেন। বাঙালি কি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিবে না, প্যান প্যান করিয়া কাঁদিবে না, ঘ্যান ঘ্যান করিয়া চাহিবে না? প্রাকৃত বাংলা লিখিত ভাষায় যে আমি চালাইতে চাহি, তাহা নহে; তবে চলিবে কি না, তাহাদের প্রয়োজন হইবে কি না বা আছে কি না, তাহার বিচারক পাঠকগণ।

পরিশিষ্টের 'প্রাকৃত ও সংস্কৃত' প্রবন্ধটি সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে বঙ্গদর্শনে (১৩০৮) প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথবাবুর প্রবন্ধে যে-উদাহরণের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

৫০।৬০ বৎসর পূর্বে যে-সকল বাংলাপুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহাতে পর্যন্ত বাংলাকে প্রাকৃত বলা হইয়াছে। যথা—

হয়, না সে ভাষা চলে? শেক্স্পিয়রের ভাষা, ড্রাইডেনের ভাষা এখনকার ইংরেজিসাহিত্যে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। শেক্স্পিয়র অপেক্ষা ড্রাইডেন আধুনিক। তাঁহার শব্দগুলা পর্যন্ত অব্যবহার্য হইয়া যাইতেছে। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন ভাষাতত্ত্বেও খাটে। রবীন্দ্রবাবু এই-সকল শব্দকে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা পান নাই। শব্দকে স্থায়ী করিতে কেহ পারে না। মহাকবি-প্রয়োগে কতকটা হয়, সম্পূর্ণ হয় না। শেক্স্পিয়র তাহার উদাহরণ। বিভক্তিও ভাষার ইঙ্গিত। ইংরেজিতে বিভক্তির preposition পূর্বনিপাত এবং বাংলায় পরনিপাত (post-position) হয়। যেমন 'to me' ও 'গাছ-থেকে'। রবীন্দ্রবাবু কবির দৃষ্টিতে মাতৃভক্তের ভক্তিতে এই-সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। খুট্‌খাট্ শব্দ নুট্‌নাট্ হইয়া গেলে আত্মার দেহান্তর গ্রহণবৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু আমাদের চিরপরিচিত শব্দগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। এই-সকল শব্দের ভাষায় বহুল ব্যবহার হইবে কি না তাহা আর এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। নাটকে এই-সকল শব্দ গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুরচিত নাটক ভাষায় বহুকাল থাকিবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কিছুই নগণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট কোনো শব্দই উপেক্ষিত হইবার নহে। ব্যাকরণ আইননিগড় নয়। ভাষার স্বরূপ, ভাষার ইঙ্গিত, বিভক্তি প্রভৃতিকে ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখাইয়া দেয়। সিংহ বর্ণনায় কেশর বাদ দেওয়া যাহা, লাঙুল বাদ দেওয়া তাহা। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাদ দিলে ভাষাতত্ত্বালোচকের দৃষ্টি ভ্রান্ত হইবে। —হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শনির মাহাত্ম্য আছে স্কন্দ-পুরাণেতে,
'পরাকৃত'-বিনে কেহ না পারে বুঝিতে।
অতএব পয়ার প্রবন্ধে তাহা বলি,
একচিত্তে শুন সবে শনির পাঁচালী।
(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'শনির পাঁচালী')

বাবু দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "পূর্বে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই, বোধহয়, প্রাকৃত-সংজ্ঞায় অভিহিত হইত এবং এইরূপ বাংলাভাষাকেও প্রাকৃত বলিত। যথা—

ভারতের পুণ্যকথা শ্রদ্ধা দূর নহে।
'পরাকৃত' পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে।
(২০০ দুইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত সঞ্জয়কৃত মহাভারত)।"[৩৬]

'বিবিধ' প্রধানত ১৩০৮ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা হইতে সংকলিত হইয়াছে।

উহার প্রথম অনুচ্ছেদটি ভারতীর (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) সাময়িক সাহিত্য হইতে এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি ভাণ্ডারের (বৈশাখ ১৩১২) ৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকা হইতে সংকলিত।

এই সূত্রে সাধনার (৪র্থ বর্ষ প্রথম ভাগ) ১৯০ পৃষ্ঠার পাদটীকার একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ ॥...

'প্রৈতি' শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলাভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরেজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে প্রৈতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।"

'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' পুস্তিকাটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একটি নিবেদনসহ প্রচারিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত একখণ্ড পুস্তিকা হইতে নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল :

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষৎ সর্বপ্রথমে বাংলাভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বে পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে দু-একজন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তি স্ব স্ব ইচ্ছামতো শব্দসংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটা প্রণালী অনুসারে সংগ্রহকার্য চলিতে না থাকিলে কোনোদিন কার্যের উন্নতি এবং সমাপ্তি ঘটিবে না, এই বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগৃহীত 'বাংলা ক্রিয়াপদের' তালিকা প্রকাশ করিয়া আপনাদের নিকট পাঠাইতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একান্ত অনুরোধ, আপনি বা আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে এই তালিকার অতিরিক্ত বাংলাক্রিয়াপদের সংগ্রহ করিয়া দিলে পরিষদের বিশেষ সাহায্য হইবে। সংগ্রহ-বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি—

১ শব্দটির চলিত উচ্চারণ অর্থাৎ কথোপকথনকালে যে উচ্চারণ ব্যবহৃত হয়, তাহাই লিখিবেন ; তাহাকে শুদ্ধ করিয়া বা লিখিত ভাষায় কিরূপে ব্যবহার করিলে ভালো হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহার উচ্চারণ পরিবর্তন করিবেন না।

৩৬ ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা— শ্রীনাথ সেন। বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ· ১৩৫

২ আপনি যে-জেলার অধিবাসী সেই জেলার উচ্চারণ অনুসারে লিখিবেন। যদি আপনি প্রবাসী অর্থাৎ এখন যে-জেলায় বাস করেন সে-জেলার অধিবাসী না হন, তবে আপনার স্বদেশী উচ্চারণ অনুসারে লিখিবেন, এবং সুবিধা হইলে প্রবাসের উচ্চারণও দিবেন।

৩ বাংলাভাষার শব্দসংগ্রহ সকল জেলা হইতেই হওয়া আবশ্যক ; এমন অনেক কথা আছে যাহা এক স্থানে প্রচলিত কিন্তু অন্য স্থানে নাই বা অন্য স্থানে তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ চলিত আছে। এ-সকল শব্দও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। হয়তো এমন শব্দও আছে, যাহার উচ্চারণ নানা স্থানে এক কিন্তু অনেকস্থলে অর্থভেদ আছে। সেগুলির অর্থ পর্যন্তও সংগৃহীত হওয়া উচিত।

৪ স্বতন্ত্র কাগজে বা এই পুস্তিকার মধ্যে বর্ণানুক্রমে শব্দ সংগৃহীত হইলেই ভালো হয়।

৫ কেবল যে ক্রিয়াপদই সংগ্রহ করিতে হইবে এরূপ নহে ; অবসর সুবিধা এবং ইচ্ছাক্রমে এইরূপে অন্যান্য শ্রেণীর শব্দ এবং কৃষিদ্রব্য, গৃহজাত দ্রব্য, গৃহসজ্জার দ্রব্য, মৎস্য, বৃক্ষ, লতা, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতির নামাদি সংগ্রহ করিলে পরিষদের বিশেষ উপকার হইবে।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে যে 'দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত)' অগ্রহায়ণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের পরবর্তীকালে রচিত শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হইতে সংযোজিত হইয়াছিল, এই সংযোজন অংশ রচনাবলী-সংস্করণ-বহির্ভূত।

বিশ্বভারতী-কর্তৃক বাংলা শব্দতত্ত্বের 'তৃতীয় স্বতন্ত্র' সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৯১) শব্দতত্ত্বের বিভিন্ন সংস্করণের যাবতীয় রচনা ব্যতীত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অতিরিক্ত বহু রচনা সংকলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীতে রচনাগুলির বিন্যাসে শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের উপদেশ অনুসৃত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ-কৃত শব্দচয়ন সংযোজিত। এই সংস্করণ সংকলন ও সম্পাদন করিয়াছেন পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী সহকারীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সুলভ সংস্করণ



ISBN-81-7522-361-8 (V.6)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)